কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

দশম বর্ষ ১৯৮৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক সংখ্যা

সম্পাদক

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা ৭০০০৭৩

পত্রিকা পরিষদ :

ডঃ ভারতী রায়, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা)

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক)

সদস্য—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডঃ মানস মজুমদার, ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, ডঃ সুখেন্দু-সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ মণিলাল খান, ডঃ রামেশ্বর শ, ডঃ অপূর্বকুমার রায়, ডঃ সুপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, ডঃ রত্না বসু, ডঃ অরুণ মিত্র, ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সচিব : ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক : শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, সুপারিনটেনডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ বিভাগ, ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশকেন্দ্র : আশুতোষ ভবন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : ৫৫·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র

আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদকের কথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা এবার গ্রন্থবদ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের দেড়শো-বছর-পূর্তি উপলক্ষে দ্বারভাঙা হলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং মাননীয় উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর সহায়তায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্কিমচর্চায় উৎসাহী অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক এই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই পঠিত প্রবন্ধগুলি থেকে কিছু প্রবন্ধ নির্বাচন করে এই গ্রন্থবদ্ধ বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হলো। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ছাড়াও বিভাগীয় অধ্যাপকদের আরো কিছু বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক আলোচনা এই সংখ্যায় ছাপা হলো। কিছু প্রবন্ধ ইংরিজিতে লেখা। সেগুলিও আলাদা করে ছাপা হলো।

এই বিশেষ সংখ্যাটি গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ করবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্যবিভাগের সচিব ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁরই পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (অর্থ ও প্রশাসন) ডঃ সুনীলকুমার লাহিড়ীকে অনুরোধ করায় তিনি সানন্দে সম্মতি দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকেই গ্রন্থটি প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে দেন। গ্রন্থটি ছাপার ব্যাপারে সহ-উপাচার্য ডঃ ভারতী রায় আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছেন। মাননীয় উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী সেমিনার আয়োজনের প্রস্তুতিপর্ব থেকেই উৎসাহ দিয়েছেন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর সামগ্রিক আনুকূল্য এই সূত্রে স্মরণ করি। সেমিনার আয়োজনের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সকলেই সেমিনারের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটি ছাপা ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের কর্মীমণ্ডলী, বাঙলা বিভাগের সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ, বিভাগীয় পুঁথি ও প্রকাশনার দায়িত্ব-নির্বাহী অফিসার এবং বিভাগীয় সমস্ত কর্মীমণ্ডলী সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেমিনার আয়োজনের সাফল্যে বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের অক্লান্ত সহযোগিতার কথাও ভুলতে পারি না।

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ — বিভাগীয় প্রধান, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তাভাবনা

দিলীপকুমার সিংহ

প্রাবন্ধিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবমূর্তি আজও অটুট। এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত আকর্ষণীয় হতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রশংসায় সোচ্চার বঙ্কিমের প্রবন্ধ সম্পর্কে। 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী' ইত্যাদি যাঁরা একালের আধাপোড়া রাজনীতির ভাবনাচিন্তার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করেন, তাঁদের মধ্যে হঠাৎ কেউ কেউ বঙ্কিমের 'সাম্য', বা কোঁৎ, মিল প্রমুখ সম্বন্ধীয় রচনা সম্পর্কে হয়ত অতখানি স্পর্শকাতর নাও হতে পারেন। বঙ্কিম সম্পর্কে এইজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী যে বিজ্ঞানসম্মত নয়, তা' বললে অত্যুক্তি হবে না। হাল আমলের, বিশেষ করে এদেশে, 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদ' কথাটি যাঁরা প্রায়শ আওড়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে ক'জনের বিজ্ঞানসম্মত মেজাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক পড়াশুনা বা ঔৎসুক্য আছে তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। স্লোগানপুষ্ট রাজনীতির মাতামাতিতে পশ্চিমী ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে, অন্তত ঐতিহাসিক দিক থেকে, বিরূপ কথা-শোনা যায় যা প্রায় তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীলদের মতের কাছাকাছি বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই বঙ্কিমের মূল্যায়নে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বিম্বিত হবে এবং বিশেষ করে তাঁর রচিত বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধগুলির প্রতি যে খুব বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না, তা বলা বাহুল্য। বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য বঙ্কিমের এই বিশেষ ধরণের দিকে আলোকপাত করা ও সেটি যে বঙ্কিমী দৃষ্টিভঙ্গীর ও মননশীলতার একটি বিশেষ দিক, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করা।

বঙ্কিমের বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা যে তাঁর কালের সার্বিক মানসিকতার বিশেষ অংশ তা' সর্বজনবিদিত। পশ্চিমী ভাবনাচিন্তা সম্বলিত রচনা সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখা যে শিক্ষিত সমাজের অবশ্য কর্তব্য তার সাক্ষর বঙ্কিমের রচনা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের জগতে কি হচ্ছে বা ঘটছে তা যে শুধু নিজে জানলে চলবে না, অন্যকেও জানাতে হবে, সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ করি বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন যদিও প্রবন্ধের বৈচিত্র্যের জন্য 'বিজ্ঞান-কৌতুক' নাম দিয়ে বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত

রচনাগুলি পরবর্তী কালে 'বিজ্ঞান-রহস্য' নামে পুস্তক হিসাবে ১৮৭৫ সালে বেরিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বইটি যে কাদের জন্য রচিত তা'র ইঙ্গিত দেওয়া আছে। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, 'আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা, ও আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন'—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান সাক্ষরতার কথা তিনি ভেবেছেন, তবে আপামর জনসাধারণের জন্য যা আজকালকার নেতারা ভাবেন তা কিন্তু করে উঠতে পারেন নি।

'বিজ্ঞান-রহস্য' বইটির দুটি সংস্করণ হয়েছিল, দ্বিতীয়টি প্রায় দশ বছর পরে। প্রবন্ধগুলির পরম্পরারদিক থেকে হেরফের করা হয়েছিল। অর্থাৎ একটি/দুটি বাদ গিয়েছিল পরের সংস্করণে। ১২৯১ সালের 'বিজ্ঞান-রহস্য' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সংগ্রহে ৯টি নানাধরণের প্রবন্ধ আছে। কোন বিশেষ দিকের প্রতি বঙ্কিমের ঝোঁক ছিল বলে জোর করে বলা যায় না। তবে প্রথমে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে 'সংখ্যা' বা পরিমাণের দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। যেমন 'পরিমাণ-রহস্য'; এমনকি 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা আছে?' প্রবন্ধেও পরিমাণ নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। 'পরিমাণ-রহস্য'-এ নানাধরণের খবর আছে। যেমন পৃথিবীর ওজন, পৃথিবীর ব্যাস, সূর্যের 'দূরতা', নীহারিকার দূরত্ব, নক্ষত্রের সংখ্যা, সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ, লাপ্লাসের শব্দের গতি, জ্যোতিঃ তরঙ্গ, সমুদ্র তরঙ্গ—প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য হতে পারে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অবহিত করা; প্রত্যেকটিতে বহু বিজ্ঞানীর নামোল্লেখ করা আছে। তার থেকে এইটেই প্রতীয়মান হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বিধিবদ্ধভাবে পদার্থবিদ্যা বা গণিত না হলেও, এই সকল রচনার মাধ্যমে বঙ্কিম যে বঙ্গদর্শনের সাধারণ পাঠককে পদার্থবিদ্যা বা বলবিদ্যার, গতিবিদ্যার কয়েকটি মূলকথা, সঠিক একক (Unit) ব্যবহার করে আংশিক গাণিতিক বা পাটিগণিতিক রূপ দিয়ে বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তা' বললে অত্যুক্তি হবে না। আবার এইগুলির মারফত পূর্বে পরিবেশিত কিছু তথ্য বা তত্ত্ব সংশোধন করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত' ও 'গগন পর্য্যটন' প্রবন্ধ দুটির উল্লেখও করেছেন 'পরিমাণ রহস্য' রচনাগুচ্ছের মাধ্যমে।

পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গতিবিদ্যার দিকে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য ও পাঠককে তা জানানোর প্রবণতা ছিল, তা বঙ্কিমের বিজ্ঞানপ্রবন্ধ

থেকে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি দিক যেমন জীববিদ্যা, মনুষ্য-তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা যে সেই যুগের সাম্প্রতিক রচনা থেকে আহৃত তার সাক্ষরও বিদ্যমান। এইগুলি থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় বঙ্কিমের ব্যক্তিগত চর্চার পরিধি, কাদের রচনা পড়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি তা গোপন করেন নি। 'বিজ্ঞান রহস্য'-এর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনেই তা বলেছেন এবং এও বলেছেন, কোন প্রবন্ধই আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

এই ধরণের রচনাগুলির মধ্যে প্রথমেই আলোচনা করা যাক, 'ধূলা' রচনাটি নিয়ে। ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'ধূলা' রচনাটিতে বঙ্কিমের ভূমিকাটিই অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে এইটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যা নগণ্য বা খুবই পরিচিত, তার যে বৈজ্ঞানিক দিক থাকতে পারে, তার সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বঙ্কিমের স্বাভাবিক ব্যঙ্গ উক্তি 'ধূলা' সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি কটাক্ষপাত করলেও প্রবন্ধটি পড়লে স্বতঃই প্রতীয়মান হবে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সরস করে পরিবেশন করাই বঙ্কিমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। জন টিণ্ডাল (১৮২০-১৮৯৩) ছিলেন একজন পদার্থবিদ। 'আচার্য টিণ্ডল' ইয়োরোপের মান্য বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায়' হিসাবে বঙ্কিম তার পরিচয় দিয়েছেন। মুল উদ্দেশ্য ছিল, টিণ্ডাল ক্রিয়া বা Tyndall effect-টিই বোঝানো। পরিষ্কার বায়ুর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক আলো প্রবেশ করিয়ে ধূলা দেখতে পাওয়ার ঘটনাকেই এই ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই রচনাটিতে টিণ্ডাল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগুলিই সন্নিবেশিত হয়েছে; প্রমাণের জন্য বঙ্কিম টিণ্ডালের প্রামাণিক প্রবন্ধ (Dust and Diseases)-টি পাঠের জন্য অনুমোদন করেছেন। বঙ্গ-দর্শন ঐবৎসরই অর্থাৎ ১২৭৯ সালে, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'আকাশে কত তারা আছে?' ছাড়াও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বেরিয়েছিল 'আশ্চর্য সৌরোৎপাত'। —এই প্রবন্ধটি লেখাতে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ নর্মান লকিয়ারের রচনা থেকে। লকিয়ার ছিলেন, জ্যোতির্পদার্থবিদ, লকিয়ারের অবদান ছিল: সূর্যের বর্ণমণ্ডলের অভ্যুত্থানের ফলেই সৌরোৎপাতের উদ্ভব হয়। লকিয়ার বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে সৌরোৎপাত পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—এই যন্ত্র আবিষ্কারের প্রধান পুরোধা হিসাবে লকিয়ারকে গণ্য করা হয়। লকিয়ার (১৮৩৬-১৯২০) দীর্ঘকাল বিখ্যাত পত্রিকা 'নেচার'-এর, ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা থেকে আমৃত্যু, সম্পাদক ছিলেন। এই রকম আরেকজন বিজ্ঞানী ছিলেন চার্লস লায়েল, যিনি ছিলেন একজন ভূতত্ত্ববিদ; কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তাঁর রচনা অনবদ্য ছিল। 'কতকাল মনুষ্য'? রচনাটি (লায়েলের লেখা

'Antiquity of man'-এর উৎস) বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শনের ১২৮০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। এই বৎসরই পৌষ সংখ্যায় দেখতে পাই 'গগন পর্য্যটন' রচনাটি যা গ্লেশর সাহেবের রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে—ঋণ সম্পর্কে বঙ্কিমের স্বীকারোক্তি আছে। এই বৎসরের বঙ্গদর্শনে এবং প্রত্যেক সংখ্যাতেই বিজ্ঞানের কিছু না কিছু আলোচনা থাকত; যেমন পূর্বে উল্লিখিত 'পরিমাণ-রহস্য', আষাঢ় ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল; ভাদ্র সংখ্যায় 'চঞ্চল জগৎ' —জ্যোতির্বিদ্যা, গতিবিদ্যা সম্পর্কে আরেকটি রচনা। ঐ বৎসরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'জৈবনিক' —১২৮০ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এইটি হল বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলির (বঙ্কিম লিখেছেন হক্স্লী), অনুসরণ যাঁর রচনাটি হল 'Lay Sermons'; তিনি ছিলেন, প্রাণ-তত্ত্ববিদ জুলিয়ান ও সাহিত্যিক অলডাসের পিতামহ। 'জৈবনিক' কথাটি 'Protoplasm'র অনুবাদ। প্রবন্ধটি এযুগে কতখানি গ্রহণীয় হবে তা' বলা শক্ত, বিশেষ করে যেযুগে 'জীবকোষ' বা ডি· এন· এ· ইত্যাদি তত্ত্ব এসে গেছে। তবে নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনায়, যুক্তি তর্কের, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দিকে পাঠককে ধাবিত করানোর জন্য এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান; দার্শনিক মূল্য প্রবন্ধটির আজও আছে। এযুগের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গেলে, 'গগন পর্য্যটন' রচনাটির উল্লেখ করতে হয়। আজকাল মহাকাশ-বিজ্ঞান সমর্থিত, নানা তথ্যের ইঙ্গিত বঙ্কিমের এই রচনায় পাওয়া যায়; এই রচনায় বর্ণনার ভাষা অপূর্ব। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অন্য সবগুলি প্রকাশিত হলেও, ১২৮১ সালে 'ভ্রমর' মাসিক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় 'চন্দ্রলোক' বেরিয়েছিল। এই সবগুলিই 'বিজ্ঞান-রহস্য' পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

এবার আসা যাক, অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনা ও ভাষণ সম্পর্কে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক যে, ১৮৭০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় সমাজ·বিজ্ঞান সমিতির (Bengal Social Science Association)'র সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'A popular culture of Bengal' হলেও এই ভাষণের মুখ্য বক্তব্য ছিল যে পশ্চিমী বিজ্ঞানের নির্যাস বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে: এবং তা সম্ভব হবে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার মাধ্যম হয়। ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনের ভাদ্র সংখ্যায় তিনি 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই সভার অনুষ্ঠানপত্রের সাতটি ধারা আছে, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল। তা' আজও অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞান যে সমাজগঠন ও মানসিক

উৎকর্ষের জন্য বড় হাতিয়ার, তাই এই প্রবন্ধ পাঠ করলে বোধগম্য হবে। বঙ্কিম প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও গণিত চর্চার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এমনকি বীজগণিত, রেখাগণিত, মিশ্রগণিত সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন ; রেখেছেন বিজ্ঞানের অন্যান্য দিক সম্পর্কে যেমন আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কে। পরিশেষে সভার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে বিজ্ঞানসাধনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। এইসব থেকে মনে হয় যে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা ও মেজাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম মদত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এইটেই ফুটে উঠে যে বঙ্কিম বিজ্ঞানী হতে বা বিজ্ঞানের জ্ঞান জাহির করতে সচেষ্ট ছিলেন না ; তাঁর বিজ্ঞান-মনস্কতায় তাঁর যুক্তিবাদী মনের যে বিশেষ দিক সেইটিই প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনা ও আলোচনা থেকে বিজ্ঞানের জয়গান বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার, দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য, প্রয়োজনীয়তা, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অকাট্যতা সম্পর্কিত কোন বক্তব্য প্রকাশ—একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিম প্রয়াসী হন নি ; তাঁর জীবনের অনেকদিন পর্যন্ত তিনি যুক্তিসম্মত ছাড়া কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। বিজ্ঞান তাঁর ধ্রুববাদী ও যুক্তিবাদী মানসিকতার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'ধর্মতত্ত্বে'র পরিবেশনায় বঙ্কিম কোঁৎ, মিল, পরে স্পেন্সার ইত্যাদির কথা বিজ্ঞান শাস্ত্র আহরণের কথা ভোলেন নি। যেমন ধর্মতত্ত্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে, গুরুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে বহির্বিজ্ঞান আরও চর্চার জন্য কোমতের প্রথম চারি Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন, এবং পরবর্তীকালে, Biology ও Sociology জানতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত, 'জৈবনিক' প্রবন্ধে প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞানই দিতে পারে ও প্রমাণ-সমর্থিত ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ যোগ্য নয়, ..."সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস"। 'জৈবনিক' প্রবন্ধে আরও সোচ্চার হয়ে বলেছেন "যেটি যথার্থ তাহাই মানিব...যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব।" ১২৮২ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মিল, ডার্জিন ও হিন্দুধর্ম'-এ লিখেছিলেন যে জগতের চৈতন্যযুক্ত নির্মাতার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। প্রবন্ধটির পরবর্তীকালে শিরোনাম হয়, 'ত্রিদেব সম্পর্কে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে?' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের পাদটীকায় জানান: 'বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে

Science বুঝিতে হইবে।' 'Mill on Nature' ও 'Darwin's Origin of Species' থেকে এই প্রবন্ধে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য।

উপসংহারে এটুকুই বোধ করি বলা সমীচীন হবে যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ, বিজ্ঞানকে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি সব কিছু প্রকাশ পেয়েছে মোটামুটিভাবে তাঁর জীবনের একটি পর্যায়ে—১২৭৯ থেকে ১২৮১ পর্যন্ত এই জাতীয় লেখাপত্রে। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিম যখন দ্বিধাগ্রস্ত, আংশিকভাবে ধর্মাচ্ছন্ন তখন বিজ্ঞান সম্পর্কে অনীহা প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও, বিজ্ঞানের অমোঘ ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে লোকশিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় কোথায় যেন ভাঁটা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের নিরিখে যাচাই করে নেওয়ার প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়—বিজ্ঞান শিক্ষা উদ্ভূত যুক্তিবাদী চিন্তা আর অগ্রাধিকার পায়নি যদিও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের গতি অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত ছিল। ধ্রুববাদী বা যুক্তিবাদী মানসিকতার আংশিক বা পূর্ণ সংশোধনে জীবন-সায়াহ্নে কেন তাঁর রচনা নিছক বিজ্ঞানাশ্রয়ী হ'ল না তা' বিস্ময়ের ও গবেষণার বিষয়। তাহ'লে কি তাঁর সময়ের চালু তথাকথিত যুক্তিতত্ত্বের অতিরিক্ত বা উর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাঠামো যে তিনি রচনা করে যেতে পারেন নি, তা' কি বঙ্কিমের অনুধাবনের আওতায় পড়েনি? প্রশ্নের সদুত্তর পেলেই বোঝা যাবে বঙ্কিমের বিজ্ঞানচিন্তায় কোন স্বকীয়তা ছিল কি না। বঙ্কিম-রচনার অনেক কিছু শাশ্বত কীর্তির দাবি রাখে ও তা কালের নিরিখে প্রমাণিতও হয়েছে। বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের আপেক্ষিক প্রাচুর্য সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার; যদি কয়েকজনকে এই দিকের পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করতে হয়, তবে তার অগ্রণী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিজ্ঞানের খবর সরবরাহের কাজ যে সাহিত্যিক মূল্যবোধ বিঘ্নিত না করেই হতে পারে বা একেবারে আক্ষরিক তর্জমাও ভাষা-সর্বস্ব নাও হতে পারে, সেই দিকে পথ-দেখিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। খোলা মন যদি ওয়াকিবহাল থাকে তবে আহরণ করা ও তারপর নির্যাসটুকু ছড়িয়ে দেওয়া যে কত সহজ ও পরিবেশনায় সাবলীল ও স্বচ্ছ হতে পারে তার বোধ করি ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রথম নজির হল বঙ্কিমের বিজ্ঞানের উপর রচনা।

বিষবৃক্ষ : বঙ্কিম-সমালোচনার নানারূপ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এক

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' (বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আজ থেকে একশ' বার বছর পূর্বে।

গত শতাব্দের শেষপাদে হরপ্রসাদ এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বাঙালি যুবক আর রামায়ণ মহাভারতের অনুরাগী নন।

"যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন, তাঁহাদের নাম বায়রন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র। তিনজনই যুবকদিগের চিত্ত-আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ, তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবক-হৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে, শেষে তাঁহারা যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।"

সাহিত্যরুচি পরিবর্তনের মূলে সমাজবিপ্লব ক্রিয়াশীল, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎকালীন বাঙালি যুবকের রুচি পরিবর্তনের স্বরূপ বিচার করেছেন। তিন কবির কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে তিনি ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের সামাজিক প্রভাব ও বিচার করেছেন।

"চল্লিশ বৎসর পূর্বে [অর্থাৎ ১৮৩০-৩৫ খ্রীঃ] যখন ইংরেজী বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল, তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।"

রামায়ণ মহাভারতের আধুনিককালে অনুপযোগিতা আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক প্রশংসনীয় কালসচেতনতা ও সমাজসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ একালে অনুসরণ সম্ভব নয় বলেই তা পরিত্যক্ত হল, একথা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সে কারণেই পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যও বর্জিত হয়েছে। ব্যতিক্রম, মহাকবি কালিদাস, কারণ কালিদাসের বর্ণনা ও চরিত্রাংকনে সর্বকালীন মনোভাব আছে, তার জন্যই বাঙালি যুবক কালিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন।

উনবিংশ শতাব্দের দুই শিল্পী বায়রন ও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় যুবকের মনোহরণ করেছে বলে সমালোচক মনে করেন। বায়রনের মধ্যে যে সমাজদ্রোহিতা, যে অশান্ত চিত্তবিক্ষেপ, অচলায়তন সমাজের প্রতি যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, প্রকৃতি বর্ণনায় যে বক্র কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়, তা-ই বায়রনকে বাঙালি যুবকের প্রিয় কবিতে পরিণত করেছে বলে সমালোচক মনে করেন।

শেষ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজের শিক্ষক বলে মনে করেন :

"বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-বর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয়, তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে ; যেন যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। ……বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-

শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব-শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ আর কাছে যদি কেহ থাকে-দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। .....বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। এবং করিলেই শেষে আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার, শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐকথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। .....বঙ্কিমবাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুধু দাম্পত্যপ্রণয় আছে। .....বঙ্কিমবাবুর রচনায় প্রলোভন আছে, তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার করিলে সুখও আছে। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ......বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশ সুখ ও সামাজিক সুখ।"

স্বীকার্য, 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিম সাহিত্যের শিক্ষাকে বড় করে তুলে ধরেছেন।

বঙ্কিম-সমালোচনার সূত্রপাত এর পূর্বেই হয়েছে। স্বীকার্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সমালোচনাকে গড়ে তুলেছিলেন। আবার তাঁকে উপলক্ষ করেই দেখা গিয়েছে সুবিপুল সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই এই সমালোচনাকর্মের সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃণ্ময়ী' নিবন্ধ, জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮১/১৮৭৪), আর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৮৮৮)। [শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী বঙ্কিম-সমালোচনার বিশদ পর্যালোচনায় পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' গ্রন্থে (১৩৭২/১৯৬৫)।] স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন তিনটি প্রবন্ধ: 'রাজসিংহ' (সাধনা, ১৩০০ চৈত্র, ১৮৯৪), 'বঙ্কিমচন্দ্র' (সাধনা, ১৩০১ বৈশাখ, ১৮৯৪), 'কৃষ্ণচরিত্র' (সাধনা, ১৩০১ মাঘ-ফাল্গুন, ১৮৯৫)। এগুলি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

শতাব্দীর অধিককালব্যাপী বঙ্কিম-সমালোচনাকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। কেবল বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনাতেই সমালোচকরা নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি; বঙ্কিম-মনীষা ও বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপ ও মূল্য বিচারেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দের বঙ্কিম-সমালোচকদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দের বঙ্কিম-সমালোচকদের মতবিরোধ ঘটেছে। তা খুবই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমের পূর্বপ্রতিষ্ঠার পুনঃপুনঃ বিচার এ-কালে লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীলতা, হিঁদুয়ানি, গোঁড়ামি, উগ্র নীতিবাদের প্রচার, অষ্টাদশ শতকীয় শিল্প-পাসনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি,—এই ধরণের অভিযোগ বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে উত্থাপিত হয়েছে। আবার তার বিরোধিতাও করা হয়েছে। এইভাবে বঙ্কিম-বিরোধ ও বঙ্কিম-বরণের মধ্য দিয়ে বাংলা সমালোচনা পুষ্টি লাভ করেছে।

আমরা একটিমাত্র উপন্যাস অবলম্বনে বঙ্কিম-সমালোচনার নানা পর্ব লক্ষ্য করতে চাই। এর মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যসমালোচনার নানা রূপ অনুধাবন করা যায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) অবলম্বনে আমরা বঙ্কিম-সমালোচনার পথরেখা অনুসরণ করতে চাই।

স্বীকার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে যে-সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিতে উচ্ছ্বাস ও ভক্তি-আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক। তখনকার বঙ্কিম-সমালোচনা এই অধিনায়কের পাদপীঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের নামান্তর মাত্র। ভক্তিবিহ্বল সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতি-বহুল সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভঙ্গি ও ভাবানুসরণে সমালোচকেরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা করতেন। নীতিবাদ ও আদর্শ-প্রচারই বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল সুর বলে এই সমালোচকেরা বিশ্বাস করতেন। মনস্তাত্বিক আলোচনা, বাস্তবধর্মী চরিত্র-বিশ্লেষণ, বাস্তব পর্যবেক্ষণ তখনকার দিনে ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সমালোচনা ('বঙ্কিমচন্দ্র' ১৮৮৮/'গিরিজায়া' ও 'মনোরমা' —'প্রচার' ১২৯৫)। ব্যতিক্রমের দ্বারাই সেদিনের বঙ্কিম-সমালোচনার সাধারণ মান ও রীতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হয়।

শতাব্দী-প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' নিবন্ধ (১৮৯৪) আর একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এবং তারপর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯৫)। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-সমালোচনার মাধ্যমে আমরা বঙ্কিমচর্চার দ্বিতীয় পর্বে উপনীত হই।

বঙ্কিম-চর্চার তৃতীয় পর্ব দেখা গেল প্রথম বিশ্বসমরোত্তর কালে। বিপিনচন্দ্র পাল (১৯২১—২৪-এ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় লেখেন ষোলটি প্রবন্ধ, যার চারটি বঙ্কিম-সম্পর্কিত, যা পরে 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে ১৯৫৫ গ্রথিত)। এ সময়েই আসেন শশাঙ্ক-মোহন সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় আর অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। ঈষৎ পূর্বে দেখা দেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-চর্চার চতুর্থ পর্ব দেখা গেল বঙ্কিম-জন্মশত পূর্তি উৎসবের কালে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম উপন্যাস-আলোচনা এ সময়ে (১৯৩২—৪০) প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮-এ দেশব্যাপী বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিক উৎসব সমারোহে পালিত হয়। বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা' (১৯৩৮) এ সময়ে বঙ্কিম সমালোচনার দিগদর্শী।

বঙ্কিম-চর্চার পঞ্চম পর্ব দেখা গেল স্বাধীনতা পরবর্তী কালে—ষাটের ও সত্তরের দশকে। অরবিন্দ পোদ্দার, তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, ভবতোষ দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, ক্ষেত্র গুপ্ত, অসিতকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখের বঙ্কিম-চর্চা এইকালে (১৯৫১—১৯৬৬) প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিম-চর্চা এখানেই থেমে যায়নি। সাম্প্রতিককালে তা অব্যাহত আছে। পরবর্তী পঁচিশ বছরে নতুন সমালোচকদের দেখা পাওয়া গেছে। এভাবেই বঙ্কিম-চর্চা এগিয়ে চলেছে।

আমাদের অভিপ্রায়, বিষবৃক্ষ উপন্যাস অবলম্বনে বঙ্কিম-সমালোচনায় নানা পর্ব ও প্রশ্নের সন্ধান। এবার সেই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

দুই

বিষবৃক্ষ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সদ্যপ্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৭২) মাসের পর মাস বিষবৃক্ষ উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে (১৯১২)। এটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছেন, তথাপি এগার বছর বয়সের মুগ্ধতার রেশটুকু থেকে গেছে।

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশী দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘ অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।" (ঘরের পড়া। জীবনস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথ আর-একবার বঙ্গদর্শন-আবির্ভাবের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের কথা বলেছেন।

আটষট্টি বছর বয়সে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্ছে; ঘরে ঘরে দেশের মেয়ে-পুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রসভোগের কী নিবিড় আনন্দ।" (পথে ও পথের প্রান্তে। ৪১ সংখ্যক পত্র। ১৮ ভাদ্র ১৩৩৬, সেপ্টেম্বর ১৯২৯)

বিচার্য, শতাব্দপূর্বের বঙ্কিম-সমালোচকরা বিষবৃক্ষ উপন্যাস পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা কি নিছক 'রসভোগের নিবিড় আনন্দ'?

এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক নয়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম উল্লেখ্য সমালোচনা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ 'বিষবৃক্ষ' (আর্যদর্শন, ১২৮৪।১৮৭৭)।

এই সমালোচনা-কর্ম নিছক রসভোগের নিবিড় আনন্দ নয়, মনস্তাত্ত্বিক বিচার নয়। এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল নীতি-আদর্শশাসিত মনোভাব।

"যে গুণে বঙ্কিমবাবু বঙ্গীয় আখ্যায়িকা-লেখকদিগের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, যে গুণে তিনি বঙ্গের প্রতি গৃহে প্রতি হৃদয়ের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন, তাহা চরিত্র-চিত্রণ। আভ্যন্তরীণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতা অসীম। বাল্মীকি ও ব্যাস, ভবভূতি ও কালিদাস এবং বাণভট্টের পর ভারতে এইরূপ চিত্রকর অল্পই জন্মিয়াছেন।"

এই উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদে যোগেন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষ-সমালোচনার সূচনা। সমালোচকের মূল বক্তব্য :

"মানুষের সুখ ও দুঃখের প্রধান নিয়ন্তা, সেই প্রণয়ভাবের চিত্রণেই বঙ্কিমবাবুর বিশেষ পারদর্শিতা।"

যোগেন্দ্রনাথ মনে করেন, প্রণয়ভাবের চিত্রাঙ্কন দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন।

"মনুষ্যজাতিকে উন্নত করার প্রধান উপায় প্রণয়। ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না, যিনি লোককে পবিত্র ও নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে শিখাইতে পারেন—তিনি জগতে একজন প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতা। যে সূত্রেই হউক, আত্মবিসর্জনশিক্ষা একবার আরম্ভ হইলে, তাহা আধার হইতে আধারান্তরে ক্রমেই প্রসৃত হইয়া পড়ে। প্রণয়-মাহাত্ম্যে যিনি একবার একজনের জন্য আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছেন, অন্যের জন্য আত্মবিসর্জন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। যিনি সেই আত্মবিসর্জন শিক্ষা দেন, তিনি মানবজাতির পরম বন্ধু সন্দেহ নাই। এইজন্যই আমরা বঙ্কিমবাবুকে বঙ্গীয় যুবক যুবতীর প্রিয় বন্ধু ও প্রধান শিক্ষক বলিয়া মনে করি।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যোগেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রণয়ের আত্মবিসর্জনপ্রবণতা দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন ও চিত্তশুদ্ধিকরণই বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য বলে যোগেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর মধ্যে পার্থক্য কিসে? প্রণয়ের বিশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের পরিমাণেই এই পার্থক্য নির্ভর করে বলে যোগেন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

এই দুই প্রধান নারীচরিত্রের তুলনামূলক বিচারে যোগেন্দ্রনাথ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

"সূর্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্যমুখী একটি বিকশিত কুসুম, কুন্দ একটি কুসুমকোরক। সৌরভ উভয়েরই জগজ্জনমনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছে, আরএকজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত। ...সূর্যমুখী সীতা ও ডেসডিমোনার সংমিশ্রণ, কুন্দ শকুন্তলা ও মিরান্দার সংমিশ্রণ। সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা—সূর্যমুখীর প্রতি কার্যে ও প্রতি কথায় পরিব্যক্ত; কুন্দের নগেন্দ্রময়তা কুন্দের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত। ......উদ্যমশীলা ও বাকপটু সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে যতখানি ভালবাসিতেন, তাহা কার্যে ও বাক্যে প্রকাশ করিতেন; ভাবময়ী ও বাক্যবিধুরা কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা নগেন্দ্রের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর হৃদয়ের প্রতি অক্ষর পড়িতে পাইতেন; কিন্তু কুন্দ-হৃদয়ের জলন্ত বর্ণগুলিও তিনি দেখিতে পাইতেন না।"

দুই নারীচরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার যোগেন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয়, তা স্বীকার্য। নীতি-আদর্শশাসিত মনোভাব প্রবন্ধের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; তা সত্ত্বেও কুন্দ-সূর্যমুখীর চরিত্র-বিশ্লেষণে যোগেন্দ্রনাথ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রবন্ধ-সূচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' নিবন্ধের (১৮৭৮) আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও "নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার" —এমন নীতিশাসিত অভিমত দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।

বিষবৃক্ষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হননি গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। তাঁর "গিরিজিবা" ও "মনোরমা" প্রবন্ধ দুটি (প্রচার, ১২৯৫/১৮৮৮) সূক্ষ্মদর্শী রসগ্রাহী সমালোচনা। বীরেশ্বর পাঁড়ের "বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২/১৮৯৫) গত শতাব্দের বঙ্কিম সমালোচনার অভ্যস্ত পথে বিচরণের পরিচায়ক। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও দেবীচৌধুরাণী অবলম্বনে বীরেশ্বর পাঁড়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে—

"বঙ্কিমবাবু গোঁড়া হিন্দু নহেন, প্রত্যুত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন; তথাপি তিনি ঋষিগণের মহিমা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি কেবল পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া, একটা ওলট্-পালট করিতে রাজি নহেন।"

এখান থেকেই সমালোচকের যাত্রা শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে "অহিন্দু ভাবের অপকর্ষই সপ্রমাণ করিয়াছেন। ......তাঁর সমস্ত কাব্যেই জাতীয় ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। ......বঙ্কিমবাবু যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ গুরুর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন। ......বঙ্কিমবাবুর কোন নায়ক-নায়িকারই অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই, কোন বিবাহই অহিন্দুমতে সম্পন্ন হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর কাব্যে সে ভাব (পাশ্চাত্য মতে Love) বড় নাই। তিনি স্পষ্টই প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ......পুরুষকার অবলম্বনীয় হইলেও নিয়তি যে পরিহার্য নহে, হিন্দুর এ কথাটি বঙ্কিমবাবু প্রত্যেক গ্রন্থেই দেখাইয়াছেন।"

বীরেশ্বর পাঁড়ের মূল বক্তব্য এখানে নাই। সূর্যমুখী-ভ্রমর, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালের আলোচনায় সমালোচক দেখিয়েছেন "স্ত্রী-পুরুষে প্রণয়সাম্যে কি ভয়ানক অনিষ্ট", "ব্রজেশ্বরের উদাহরণে হিন্দুর পিতৃভক্তি" দেখিয়েছেন। ফল কথা, বঙ্কিমচন্দ্র আর্যশাস্ত্রের মহিমা দেখিয়েছেন। নীতি ও আদর্শ প্রচারের মানদণ্ডে বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচার করলে সমালোচনা কোন্ রূপ গ্রহণ করে ? —এই জিজ্ঞাসার উত্তর বীরেশ্বর পাঁড়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ'। বীরেশ্বর পাঁড়ের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষবৃক্ষ-সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' নামে ('সাহিত্য', ১৩০২/১৮৯৫ খ্রীঃ)। বঙ্কিম-সমালোচনার প্রথম যুগের লক্ষণ— ভাবাতিরেক, উচ্ছ্বসিত কাব্য-ভাষ্য, মনন-বিরলতা এখানে সহজে লক্ষ্য করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করেননি, 'বিষবৃক্ষ'-এর সৌন্দর্য উপর থেকেই দেখেছেন। বিষবৃক্ষকে তিনি 'জীবনের পঞ্চাঙ্ক অভিনয়ের আলেখ্য'-জাতীয় উপন্যাস মনে করেন :

'কুন্দ উষাময়ী, সূর্যমুখী সন্ধ্যাময়ী। ......কুন্দ ফুলের কুঁড়ি, সূর্যমুখী ফোটা ফুল। ......কুন্দ চটুল-স্রোতস্বিনী, সূর্যমুখী গভীর সমুদ্র। ......অম্লানবদনে বলিতে পারি সূর্যমুখী

সুন্দরতম, কুন্দ সুন্দরতর। ......সূর্যমুখী এদেশেও দুর্লভ, কিন্তু যদি কোন দেশে সূর্যমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, ত কেবল এদেশেই। কমলমণি এদেশে সুলভা হইলেও পাশ্চাত্ত্য দেশে বিরল নহে। কুন্দনন্দিনী এদেশে দুর্লভা, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে সুলভা। উপন্যাস-নায়িকা কুন্দনন্দিনী পাশ্চাত্ত্য দেশের সামগ্রী, কিন্তু গৃহবধুর আদর্শস্থল সূর্যমুখী আমাদের দেশের সামগ্রী—তাহার উপর আমাদের একাধিপত্য আছে--অন্তরূপ এইরূপ নারী হইতে বঞ্চিত।'

এ কেবল উচ্ছ্বাস, ফেনায়িত সরব ভাবাস্রোতের কলরোল।

বঙ্কিম-সমালোচনার প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি।

তিন

বঙ্কিম-সমালোচনার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা রবীন্দ্র-কৃত বঙ্কিম-সমালোচনায়, একথা পূর্বেই লিখেছি। 'রাজসিংহ' ('সাধনা' ১৩০০ বঙ্গাব্দ, চৈত্র, ১৮৯৪), 'বঙ্কিমচন্দ্র' ('সাধনা', ১৩০০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, ১৮৯৪), 'কৃষ্ণচরিত্র' ('সাধনা', ১৩০১ বঙ্গাব্দ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৮৯৪)—প্রবন্ধত্রয় বাংলা সমালোচনা তথা বঙ্কিম সমালোচনাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করে ছিল। রচনার স্বরূপ নির্ণয়, রসের যথার্থ পরিচয়দান ও লেখকের শিল্পকৌশলের রহস্য উদ্‌ঘাটন যদি আদর্শ সমালোচনা হয়, তবে 'রাজসিংহ' প্রবন্ধ উপস্থিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে সমালোচনাকে সৃষ্টিকর্মে উন্নীত করেছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধ যদিচ সন্তপ্রয়াত সাহিত্য-অধিনায়কের প্রতি পরবর্তী অধিনায়কের শ্রদ্ধাঞ্জলি, তথাপি শোকোচ্ছ্বাস ও ব্যক্তিগত নৈকট্য এখানে নিরাসক্ত মূল্যায়নের পক্ষে বাধা ঘটায়নি। 'কৃষ্ণচরিত্র' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অসাধারণ মনন-কর্ম 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্বসাধারণের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।'

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল' অনুভব করেছেন, তা 'আমাদের ন্যায় হীনবীর্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড' মনে করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে 'স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন' করেছেন বলে বিশ্বাস করেছেন।

'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।' —একথা বলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-মনীষার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত বঙ্কিমের মতকে অগ্রাহ্য করেছেন, তার নির্মম সমালোচনা করেছেন। বস্তুত কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্র, দুই মনীষার বিচারপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে। (এর বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস', অধ্যায় ৫।১৯৬৫)

'রাজসিংহ' উপন্যাসের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ইম্প্রেশনধর্মী রসবাদী সমালোচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। (এর বিশদ আলোচনার জন্য সদ্যোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

আফশোষের কথা, বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সেরকম বিশদ সমালোচনা করেননি। জীবন-সায়াহ্নে বঙ্কিম-উপন্যাসের সামান্য উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনায় দেখা যায়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকালে পাঠকের মুগ্ধতার যে বিবরণ রবীন্দ্রনাথ রেখে গিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) আর 'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্রধারায় (১৯২৯), তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পরিণত বয়সের যে বিচার তার পরিচয় পাই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে (১৮৯৭)। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়।' (নরনারী/পঞ্চভূত)

এখানে স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনায় বঙ্কিমকে আদর্শ বলে অনুসরণ করেন নি। বঙ্কিমের পথ ছেড়েই তিনি স্বকীয়তায় উপনীত হয়েছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধে তিনি বঙ্কিমকে অনেক কিছুর জন্য প্রশংসা করেছেন, উপন্যাসের জন্য নয়।

চার

বিংশ শতাব্দের সূচনায় বঙ্কিম-সমালোচনার চতুর্থ পর্বের দেখা পাওয়া গেল। এই শতাব্দের সমালোচনায় বঙ্কিম-বরণ ও বঙ্কিম-বিরোধ, দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম-সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাংলা সমালোচনা বিচিত্র বিকাশ লাভ করেছে। গত শতাব্দের ভক্তি উচ্ছ্বাস ও অন্ধ শ্রদ্ধার দিন শেষ হয়েছে। তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তীক্ষ্ণ তীব্র বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বের প্রথম সমালোচক। ১৩২০-২৩ বঙ্গাব্দের (১৯১৩-১৯১৬ খ্রীঃ) 'ভারতবর্ষ' ও 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় তিনি বঙ্কিম-সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির আলোচনা করেন। যেগুলি সংকলিত হয় 'কাব্যসুধা' গ্রন্থে (১৯১৬)। এর ভূমিকায় ললিতকুমার লিখেছেন:

"এক একটি গার্হস্থ্য সম্পর্ক সমালোচনা করা হইয়াছে এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং ইংরেজি সাহিত্যে ঐ শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাহার সহিতও তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে।"

ললিতকুমার ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে বঙ্কিম প্রেমকাহিনী লেখেননি, একথা বলার অধিকার তাঁর ছিল। তিনি বঙ্কিম-উপন্যাস সম্পর্কে এই ধরণের সুলভ অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। ভূমিকায় তিনি আরো লেখেন:

"এই সকল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজে, শাশুড়ী-বৌয়ে, বোনে-বোনে, সতীনে-সতীনে ভালবাসা, মাতার সন্তানস্নেহ, বিমাতার সপত্নী-সন্তানের প্রতি অপক্ষপাত স্নেহ প্রভৃতির সুন্দর ও উজ্জ্বল চিত্র একাধিক স্থলে অঙ্কিত করিয়াছেন।"

এই সূত্রেই এসেছে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ নর নারীর চরিত্রালোচনা।

ললিতকুমারের সময়ে—প্রথম বিশ্বসমরকালে—প্রতিকূল বঙ্কিম-সমালোচনায় দুটি অভিযোগ প্রধান হয়ে উঠেছিল : বঙ্কিম বিলাতী নভেলের অনুকরণে ও বিলাতী সামাজিক প্রথার অনুমোদনে বাংলা সাহিত্যে বিদেশী বিজাতীয় আদর্শ আমদানি করেছেন ; বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙালি সমাজের সত্যকারের আলেখ্য নেই। ললিতকুমার এ-দুটি অভিযোগই খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, বঙ্কিম জাতীয় আদর্শ ও বাঙালী সমাজকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু মামুলি গার্হস্থ্য চিত্রাঙ্কন বঙ্কিমের সাধনা নয়, বঙ্কিমের আদর্শ নরনারীর প্রেমালেখ্য রচনা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্কিমের ত্রয়ী' উপন্যাস সম্পর্কে নূতন ভাবনা উপস্থিত করেছেন ('নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২/১৯১৬)। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম—তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিম 'বাঙালীর প্রকৃতির আধারে সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট' করেছেন বলে সমালোচক মনে করেন।

স্বীকার্য, এই ধরনের পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের অনুক্রমে সমালোচনা আমাদেরকে উপন্যাস বুঝতে সাহায্য করে না। বঙ্কিমের শেষ ত্রয়ী-উপন্যাস থেকে পাঠককুল যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তার জন্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা দায়ী। মূলত তত্ত্বমুখী আলোচনায় মনীষী বঙ্কিমকেই ত্রয়ী-উপন্যাসে সমালোচক প্রত্যক্ষ করেছেন। পাঁচকড়ি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো সামাজিক উপন্যাসের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। স্বীকার্য, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি।

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে মূল্যবান বঙ্কিম-চর্চা করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে ব্রাহ্ম হলেও বিপিনচন্দ্র হিন্দুধর্মের নির্বিশেষ যুক্তিকে আশ্রয় করেছিলেন। বাস্তব প্রয়োজনকে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা কম মূল্য দিতেন না। বৈষ্ণব ধর্মমতকে তিনি ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির উপায় মাত্র মনে করেন নি, আধুনিক যুগের রুচি ও আদর্শের উপযোগী করে গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৌরাণিক সমন্বয় কল্পনার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

'বাংলার নবযুগের কথা' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়কে (রচনা ১৯২১-২৪) এই দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। 'সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র', 'বঙ্কিমসাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা', 'বঙ্কিমসাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি'—এই চারটি প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বহুল পরিমাণে বঙ্কিম-চিন্তার অনুসরণ করেছেন। তিনি গত শতাব্দের স্বসমাজ ও স্বধর্মনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় করেছিলেন। বঙ্কিমযুগে প্রথম মৌলিক বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটে বলে বিপিনচন্দ্র মনে করেন। বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বঙ্কিম-মনীষার পরিচয়, এক উদার ও সার্বভৌম মানবজীবনসম্বন্ধীয় ধারণা। স্বীকার্য, এই বিচারে উপন্যাসের শিল্পমূল্য অপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে সমাজমূল্য ও ভাবমূল্য।

শশাঙ্কমোহন সেন বঙ্কিম-উপন্যাসে অদৃষ্টের অরুন্তুদ পরিহাস ও 'প্রকৃতির বিধ্বংসী

রূপ' লক্ষ্য করেছিলেন 'বাণীমন্দির' গ্রন্থে (১৯২৮)। তাঁর মতে, 'জবাবদায়ী (responsible) পাপই প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পসাহিত্যের বিষয় হইতে পারে।' (পৃঃ ৬০৪-০৫)

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। তিনি বঙ্কিম সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী সমালোচক। তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে (১৯২০) বঙ্কিম-জীবন ও বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে। বঙ্কিম-প্রবন্ধ ও উপন্যাসে তিনি মনীষী বঙ্কিমকে লক্ষ্য করেছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় ফলে অক্ষয়কুমার বঙ্কিম-সাহিত্যের তুলনামূলক ও নিরাসক্ত আলোচনা করতে পেরেছেন। বঙ্কিম-ব্যাখাত অনুশীলন-তত্ত্বে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কারের সমন্বয়ে একটা তত্ত্ব দাঁড় করাইয়া মিল কোম্‌তে প্রভৃতির মত উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন' (পৃঃ ৩৮০), একথা লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত।

এই পর্বের বঙ্কিম-সমালোচনায় লক্ষণীয়—বঙ্কিমের উপন্যাস অপেক্ষা প্রবন্ধাদির আলোচনায় ঝোঁক; বঙ্কিমের উপন্যাসে রূপায়িত জীবনরহস্য অপেক্ষা অনুশীলন তত্ত্বের আলোচনায় ঝোঁক; বঙ্কিমের লক্ষ্য Idealism,—Realism নয়, এমত বক্তব্য উপস্থাপনার প্রবণতা। উপন্যাসলেখক বঙ্কিম অপেক্ষা মনীষী বঙ্কিম এই পর্বের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেকারণে বিভিন্ন বঙ্কিম-উপন্যাসের বিশদ রসগ্রাহী আলোচনা পাই না।

বঙ্কিম-সমালোচনার চতুর্থপর্বের সূচনা হল দেশব্যাপী বঙ্কিম জন্মশতবর্ষপূর্তির(১৯৩৮) প্রাক্কালে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩২), শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৩৮) এসময়ে প্রকাশিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৯৩২), মোহিতলাল মজুমদারের 'বিবিধ কথা' (১৯৪১) গ্রন্থে বঙ্কিম-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। শেষোক্তের বঙ্কিম-চর্চার উজ্জ্বল পরিচায়ক 'বঙ্কিম-বরণ' (১৯৪৯) ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৫৫)। মোহিতলালের শেষোক্ত সমালোচনা কর্ম ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হলেও তিনি চিন্তা ও চর্চার দিক দিয়ে বঙ্কিম সমালোচনার চতুর্থ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৩৮) বঙ্কিমজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন। সেদিনকার বঙ্কিম সমালোচনার গতি-প্রকৃতির পরিচয় এ গ্রন্থে লভ্য। উপরিউক্ত সকল সমালোচকই বঙ্কিমের উপন্যাসে লক্ষ্য করেছিলেন ক্রান্তদর্শী শিল্পীকে, আবিষ্কার করেছিলেন high seriousness ও জীবনের আপাতপ্রচ্ছন্ন দুর্নিবার গতি। জীবনরহস্যের রূপকার বঙ্কিমের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

১৯৪১-এ ('বিবিধ কথা' গ্রন্থে) মোহিতলাল মজুমদার এবং ১৯৪৯-এ ('বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা'গ্রন্থের ভূমিকায়) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বঙ্কিম-চর্চার মানসিকতার সামগ্রিক পর্যালোচনা করেছিলেন। চতুর্থ পর্বের বঙ্কিম-সমালোচনাকর্মের বিশদ বিবেচনার পূর্বে সেদিনকার এই মানসিকতার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

মোহিতলাল লিখেছিলেন :

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তাঁহার কল্পনার 'অ্যারিষ্টোক্রেসি'; তিনি

নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে লইয়া উপন্যাস রচনা করেন নাই, অর্থাৎ রামা-শ্যামা বা রামী-বামা তাঁহার সহানুভূতি লাভ করে নাই—তিনি জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন নাই। আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি ধর্ম নীতিকে তাঁহার রচিত চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টিতে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তাহাতে রসিকের রসবোধকে পীড়িত অপমানিত করা হইয়াছে। এতবড় জবরদস্ত নীতিশিক্ষক ও গোঁড়া বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ যে, সে কবি হয় কেমন করিয়া ? তাঁহার উপন্যাসগুলির প্লট এক-একটা ছেলে-ভুলানো ফাঁকি—তাঁহার চরিত্রগুলা এমনভাবে চলে যে, তাহাতে সাইকলজির সত্য নাই, জীবনের স্ফূর্তি তাহাতে নাই।" (বিবিধকথা, ১৯৪১)

মোহিতলাল এই তিনটি অভিযোগই অগ্রাহ্য করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরে বঙ্কিম-চর্চার চরিত্র বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন :

"অধুনা বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা অনেকটা নিশ্চল প্রথাবদ্ধতার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। এই সাহিত্যবিষয়ে অভিমত দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদে ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে। নব্যপন্থী পাঠক ও সমালোচক বঙ্কিমের মধ্যে মার্কস্-প্রবর্তিত শ্রেণী-সংঘাত ও ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠিত যৌনবিজ্ঞানের বিশেষ কোনো ছায়াপাত না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসন হইতে সরাসরি খারিজ করিয়া দেন। তাঁহার জীবনদর্শন খণ্ডিত ও একদেশদর্শী, তাঁহার মধ্যে বাস্তবতার আদর্শ শিথিল ও ভ্রান্তিসংকুল, তিনি রোমান্সমূলভ ভাববিলাসের কারবারী, তাঁহার আলোচনা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন কাহিনীতে সীমাবদ্ধ—ইত্যাদি নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ আরোপিত হয়। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ-রচনা কবি কল্পনার বিষয় হইতে পারে, ঠিক উপন্যাসের বিষয় নয়। সর্ব্বহারার প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতি যে আজকালকার তথাকথিত দীনবন্ধুদের অপেক্ষা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহার প্রমাণ, তাঁহার সমাজবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে অখণ্ডনীয়ভাবে নিহিত আছে। কিন্তু তিনি এই বিষয়ের আলোচনার জন্য উপন্যাসকে ঠিক উপযোগী ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন নাই। ......তাঁহার উপন্যাসে দারিদ্র্যের সার্থক ইঙ্গিত আছে—অতিপল্লবিত চিন্তার নাই; লালসার সর্বধ্বংসী প্রভাবের দ্যোতনা আছে—ইহার কুৎসিত, পঙ্কিল ইতিহাস নাই। ......বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক নায়িকাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র—কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, প্রফুল্ল, শ্রী—ইহারা সকলেই অভাবের সহিত পরিচিত। কিন্তু অভাবের আঁচে ইহাদের প্রকৃতির সরল মাধুর্য ঝলসিয়া যায় নাই, কিংবা আত্মার স্বাধীন উন্মেষ ব্যাহত হয় নাই। দারিদ্র যেখানে মানস আভিজাত্য নষ্ট করে, সেইখানেই ইহা সত্যই দীন। বর্ত্তমান যুগের বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্জীর্ণ বিকার বঙ্কিমের উপন্যাসে নাই বলিয়া তিনি অনেকের রুচির নিকট স্পৃহণীয় না হইতে পারেন, কিন্তু এই হেতুবাদে তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অস্বীকারকে বিচার-বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

আর যাঁহারা এখনও বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি আস্থা হারান নাই, তাঁহারাও বঙ্কিমের রসাস্বাদানে আগেকার সেই তীব্র আগ্রহ, সেই সর্বতোমুখী গ্রহণশীলতা হারাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বঙ্কিমকে ক্লাসিক-এর পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি

করিয়াছেন। ...বঙ্কিমী নেশা, বঙ্কিম-সম্বন্ধে রসবিভোরতা, তাঁহার যাদুকরী প্রভাবে আত্ম-সমর্পণের আবেশ আজ টুটিয়া গিয়াছে। সেই উচ্ছ্বসিত স্তুতি, সেই মনঃপ্রাণ উৎসর্গকারী পূজা, সেই মন্ত্রসুলভ নিগূঢ় শক্তির উপলব্ধি, —সেই প্রশ্নাতীত, সন্দেহাতীত শিষ্যমনোভাব বর্তমান যুগে বিরল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঁচিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মাসিকপত্রে প্রবর্তিত অসংখ্য সমালোচকের ভক্তি-গদ্‌গদ্‌ বিস্ময়-বিহ্বল শ্রদ্ধানিবেদনের ধারা আজ শুকাইয়া আসিতেছে।" (অজয়চন্দ্র সরকার লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা'-গ্রন্থের ভূমিকা, ১৯৪৯। পরে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে'-গ্রন্থভুক্ত।

এই বক্তব্য উপস্থাপনের বিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (জানুয়ারী ১৯৩৯, মাঘ ১৩৪৩)। এর অনেকাংশ প্রথম প্রকাশিত হয় 'নব্যভারত' (১৯২৩/১৩০০) ও 'বঙ্গবাণী' (১৯২৮/১৩৩৫) মাসিকপত্রে। সুতরাং একথা বলা যায়, যে পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার ভক্তি-গদ্‌গদ চিন্তাবিহ্বল শ্রদ্ধানিবেদনের উল্লেখ করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সে সময়েই রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে তাঁর বঙ্কিম-সমালোচনা, যা তাঁকে বঙ্কিম-সমালোচকদের শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছে। (তৎকৃত বঙ্কিম-চর্চার বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস' গ্রন্থে ১৯৬৫)।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসকে মূলত দুভাগে ভাগ করেছেন—রোমান্স আর নভেল। 'নভেল' পর্যায়ে সমালোচক চারটি উপন্যাসকে রেখেছেন—বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ইন্দিরা (১৮৭৩) রজনী (১৮৭৭) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।

সাহিত্য-সমালোচনা কতো গভীর, দূরপ্রসারী, সূক্ষ্মদর্শী ও উজ্জ্বল হতে পারে তা এই সমালোচকের বঙ্কিম-বিচারে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ সমালোচনার লক্ষণ এই যে তা পাঠকের সামনে নব নব সৌন্দর্য উদঘাটিত করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-সমালোচনা সে বিচারে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।

বিষবৃক্ষ উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর রসগভীর বিচারের কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধার করছি। তা থেকে উপরিধৃত বক্তব্য সমর্থিত হবে। দুয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্ত আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই।

ক। "বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট, 'বিষবৃক্ষ'এও একটা সাংকেতিকতার আভাস বর্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই উপন্যাসেও অনৈসর্গিকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।" (বাং সা উ ধা তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৬/পৃঃ ৯৬)

খ। "বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল—এই দুইখানিই বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস; এই দুইখানি উপন্যাসই গভীর রসাত্মক, ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ—অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপমুগ্ধ

পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সুক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাব-প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঘটনাবহুল, রস-বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটকের দৃশ্যের ন্যায় এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্যায় আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অনুকরণ করি; যে সমস্ত দুর্নিবার শক্তি আমাদের এই আপাত নিশ্চল জীবনকে চালিত করিতেছে, তাহাদের প্রচণ্ড গতিবেগ অনুভব করি।" (পৃঃ ১০২)

গ। "উপন্যাসের মধ্যে প্রধান সমস্যা হইতেছে অনিন্দিত-চরিত্র, পত্নীবৎসল নগেন্দ্রের পদস্খলন, ইহার জন্য লেখক সন্তোষজনক কারণ দিয়াছেন কিনা, ইহার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিনা, তাহাই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান প্রশ্ন। ...সুতরাং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ-স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই প্রাথমিক দুর্বলতার উপরই জোর দিতে হইবে, তাঁহার পদস্খলনের কেবল ঘটনামূলক নহে, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বঙ্কিম প্রথমত কেবল ঘটনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেমপ্রকাশের পূর্বলক্ষণগুলিই বিবৃত করিয়াছেন, সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহা বলেন নাই, বা নগেন্দ্রর চরিত্রগত কোন বিশেষ দুর্বলতার সহিত তাহাদিগকে সম্পর্কান্বিত করেন নাই।

সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে একটি মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—নগেন্দ্রের পূর্বজীবনে কোন বিষয়ের অভাব হয় নাই বলিয়া তাহার চিত্তসংযম শিক্ষা হয় নাই; 'অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ীসুখ জন্মে না'— এই ব্যাখ্যাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না; ইহা নীতিবিদের ব্যাখ্যা হইতে পারে, মনস্তত্ত্ব-বিদের নহে।" (পৃ ১০৭-০৮)

রোমান্টিক সমালোচনা কতো যুক্তিপূর্ণ ও ভূয়োদর্শী হতে পারে, তার পরিচয় এই উদ্ধৃতিত্রয়ে আমরা পাই। উপন্যাসের মর্মলোকে প্রবেশের সহজ নৈপুণ্য ও অভ্রান্ত রসাধিচার-বুদ্ধিবলে চরিত্রের নির্মোহ উন্মোচন-সামর্থ্য এখানে সংশয়াতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত। সমালোচনাকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবলীলায় একটি বিশাল প্রেক্ষাপটের সামনে স্থাপন করতে পারেন বলেই লিখতে পেরেছেন—

"এখানে (বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল) বঙ্কিম মানব-হৃদয়ের গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, সত্যের নগ্নমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন; দুজ্ঞেয় ভাগ্যবিধাতা মানবের মর্মের মধ্য দিয়া যে গভীর কৃষ্ণ অথচ রক্তরঞ্জিত নিয়তির রেখাটি টানিয়া দেন, তাহার গতি রহস্যটি খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৩৮) সমালোচনা কর্মরূপে অর্ধ শতাব্দ যাবৎ পাঠকমহলে গৃহীত। বঙ্কিম-উপন্যাস সম্পর্কে সুবোধচন্দ্রের আলোচনার তত্ত্ব-সূত্রটি কী? প্রথম পরিচ্ছেদেই তার উত্তর পাই।

"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তিনি সর্বত্র এই শৃঙ্খলার (জড়পিণ্ডের সমষ্টির অন্তরালে অনির্বচনীয় শৃঙ্খলা) অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং পার্থিব

জগতে এই অনির্বচনীয় ঐক্যের প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়ার রূপ আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি এই শৃঙ্খলার সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের সম্পর্ক দেখিয়াছেন এবং ইহাকেই নিজের ধর্মতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি বলিয়াছেন, এই শৃঙ্খলার ফল হইতেছে সুখ, আনন্দ। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহার এই বিশ্বাস স্পষ্ট হয় নাই, বরং তিনি বিশ্বশক্তিকে সমবেদনাহীন নিয়তি বলিয়া কল্পনা করিতে চাহিয়াছেন।"

সুবোধচন্দ্র বঙ্কিম-উপন্যাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতি যুগে একটি বিশেষ ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। প্রথম যুগে (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ) নিষ্ঠুর নিয়তির প্রাধান্য, দ্বিতীয় যুগে (চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ) নিয়তির অপ্রাধান্য ও নীতির প্রাধান্য, তৃতীয় যুগে (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম) নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন।

সুবোধচন্দ্র বঙ্কিম উপন্যাসের আঙ্গিকগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে নাট্য ও উপন্যাস-রীতির সংমিশ্রণ সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। নাটকের প্রত্যক্ষতা ও উপন্যাসের বিস্তৃতির মধ্যে বঙ্কিম একটি সামঞ্জস্য সাধন করতে পেরেছেন বলে তিনি মনে করেন। সমগ্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আঙ্গিক আলোচনায় নিযুক্ত। এর মধ্য দিয়ে সমালোচক শিল্পী বঙ্কিমের মাহাত্ম্য আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন।

সুবোধচন্দ্রের মতে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নিয়তির অনতিক্রমনীয়তা তীব্র হয়ে উঠেছে। বিষবৃক্ষের ঘটনাসন্নিবেশের গুরুত্ব তিনি বিচার করেছেন।

"বিষবৃক্ষ উপন্যাসকে ঘটনাসন্নিবেশ অতি কলাকৌশলময়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপাখ্যান যেখানে আখ্যায়িকা নানা খণ্ডে বিভক্ত না হইয়া একটানা ভাবে চলিয়াছে; গণিতের ধাপের মত একটির পর একটি পরিচ্ছেদ অনিবার্যভাবে আসিয়াছে। কোথাও অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয় নাই, কোথাও কাহিনী অনাবশ্যক ভাবে থামিয়া থাকে নাই। এ উপন্যাসে পরিচ্ছেদ আছে পঞ্চাশটি। ইহার কেন্দ্রীয় ঘটনা—নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ—আসিয়াছে ঠিক মাঝখানে—পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে। এই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে নিয়তি। তাই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে এখানে আকস্মিক কিছুই নাই; সকল পরিণতিই পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুন্দের মা উপসংহারের পূর্বাভাস দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের কাছে তাহা যথেষ্ট মনে হয় নাই। তিনি নিজেও একাধিকবার অনিবার্য পরিণতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। নিয়তি পূর্ব হইতেই ছক কাটিয়া রাখিয়াছে; তাহা এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। ঘটনার এইরূপ সন্নিবেশের দ্বারা নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় শক্তি বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।" (পরিচ্ছেদ ৩)

সুবোধচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কলাকৌশলের নানাদিক বিশদ আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল—(১) সময়ের গতি সম্পর্কে লেখকের সজাগতা, (২) দুটি কাহিনীর (নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দ, কুন্দ-দেবেন্দ্র-হীরা) একসূত্রে গ্রন্থনের কৌশল, (৩) গৌণচরিত্রগুলির সংশয়াতীত সার্থকতা, (৪) কাহিনীর অনেক মৌলিক অংশ পত্রের সাহায্যে বর্ণনা, বিশেষত সূর্যমুখীর

পত্র, এখানে যে রীতি অবলম্বিত তা বিশেষভাবে উপন্যাসের রীতি, (৫) কুন্দের মৃতা জননীর দুইবার আবির্ভাব, বিশেষত দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কারণ—সন্তানের শিথিল সংকল্পের দৃঢ়ীকরণ ; এখানে রাজকুমার হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব তুলনীয়, (৬) উপন্যাসের শেষে এক করুণ মধুর সুসঙ্গতি আবিষ্কার।

শেষোক্ত কৌশল সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"যে দুইটি প্রধানা নায়িকাকে লইয়া গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহারা উভয়েই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী। কিন্তু এই ঐক্য ছাড়িয়া দিলে তাহাদের চরিত্রে ও জীবনের পরিণতিতে প্রভেদের অন্ত নাই। সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী দুইটি বিভিন্ন জগতের মানুষ। অথচ গভীরতম অভিজ্ঞতায় ইহাদের মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে ; চরম সঙ্কটে উভয়ের হৃদয়সাগর বিমথিত করিয়া একই সুধা আহৃত হইয়াছে। উভয়েই নগেন্দ্রগতপ্রাণ! একে অপরের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করিয়াছে—কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর পথে কাঁটা হইয়া থাকিতে চাহে নাই, সূর্যমুখী নিজে উদ্যোগ করিয়া স্বামীর বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু উভয়েই ফিরিয়া আসিয়াছে স্বামীকে দেখিবার জন্য। মৃত্যুর প্রাক্কালে অবাকপটু কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছে, 'ছিঃ! তুমি অমন নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।' সূর্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ; অন্তকালে সবাই সমান।" নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে এইরূপ সৌসাদৃশ্য উপন্যাসের মৌলিক ঐক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" (তদেব)

সুবোধচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মৌলিক ঐক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা।

মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্কিম-বরণ' (১৯৪৯) ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' চতুর্থপর্বভুক্ত, একই মানসিকতাপ্রসূত, একথা পূর্বেই লিখেছি। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের সমধর্মী 'পুরুষ-বীর' বলেছেন। তাঁর মতে,

"বঙ্কিম-সাহিত্য যিনি আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই ধারণা অনিবার্য ; এমনকি তাঁহার মনীষা ও কবিশক্তি অপেক্ষা তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রের এই পৌরুষ সকলকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে।" ('বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য' ; 'বঙ্কিম-বরণ' পৃঃ ১৩১)

রাস্‌কিন্, ম্যাথু আর্নল্ড ও ব্র্যাডলির অভিমত বঙ্কিম-আলোচনায় তিনি বারবার উদ্ধার করেছেন। তা থেকে মোহিতলালের সমালোচনাদর্শটি বোঝা যায়। 'বঙ্কিম-প্রতিভার পৌরুষ' সমালোচককে প্রবল বেগে আকর্ষণ করেছে। তাঁর কাছে অন্যসব বিচার বিবেচনা তুচ্ছ হয়ে গেছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগনায়ক রূপে দেখতে চেয়েছেন ('বাংলা নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র,' তদেব, পৃঃ ৪৪)।

বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনাতেও মোহিতলাল এই দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন :

"দুর্গেশনন্দিনী বাংলা ভাষার প্রথম রোমান্স—ইংরাজী রোমান্সের বাঁধা আদর্শে রচিত। মৃণালিনী, যুগলাঙ্গরীয়, রাধারাণীও এই একই আদর্শে রচিত।' কেবল কপালকুণ্ডলার
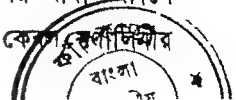
কল্পনামূলে স্বদেশপ্রেম সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তারপর সমাজ-সমস্যা ও চরিত্রনীতির প্রেরণায় চতুর্থ উপন্যাস বিষবৃক্ষ। চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল একই প্রেরণার ফল। আনন্দমঠ ও রাজসিংহে দেশাত্মবোধ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারামে ধর্মসমস্যা, রজনীতে মনস্তত্ত্ব এবং ইন্দিরায় শুধু গল্প রচনার আনন্দ আছে।" ('বঙ্কিমচন্দ্র,' তদেব, পৃঃ ১২)।

বঙ্কিম-সমালোচক মোহিতলালের সমালোচনাশক্তির শেষতম ও পরিণততম পরিচয় 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৫৫)। বঙ্কিমের সঙ্গে সমালোচকের নিবিড় একাত্মতা এই গ্রন্থে সংশয়হীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"বঙ্কিমের নিজের সাহিত্যালোচনার একটি মূলসূত্র—'কাব্যকে জানিয়া লাভ আছে সত্য, কিন্তু কবিকে জানিয়া আরও লাভ আছে'—মোহিতলাল বঙ্কিমের আলোচনাতে অতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন।" ('বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস,' ভূমিকা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

মোহিতলালের মতে ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ—এই পাঁচ বছরই "বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার মধ্যাহ্নকাল, এই কালে তিনি যে চারিখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার কবিচিত্তের পরমোৎকর্ষও যেমন, তেমনই সেই জীবন-জিজ্ঞাসার একটি দিক—পরিবর্তনও দেখা দিয়াছে।" ('বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' ১৯৫৫, বিদ্যোদয় সংস্করণ ১৯৭৯, পৃঃ ২৭)।

এই চারটি উপন্যাস হল—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। "বিষবৃক্ষে তাঁহার কবি-প্রতিভা কথাশিল্পকে একটা মৌলিক রসরূপে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই।" (তদেব, পৃঃ ২৭)

"এই বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-কাব্য একটি অখণ্ড রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অর্থাৎ জীবনের জবানীতে তত্ত্ব ও কাব্য এক হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, এখানে সেই নারী—সেই প্রকৃতি-শক্তি আর কপালকুণ্ডলা বা মনোরমা নয়—একেবারে পূর্ণ নারীরূপ ধারণ করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে পুরুষের চরিত্র আরও পূর্ণায়ত ও সংগ্রামশীল হইয়াছে; তৃতীয়তঃ, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও আখ্যানবস্তুর উদ্ভাবনায় বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি এইবার এমন একটি কেন্দ্রগত ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছে যে, ঐ দুইয়ে মিলিয়া কাব্যের গঠন যেমন নিশ্ছিদ্র, তাহার আকারও তেমনই মণ্ডলায়িত হইয়াছে। নিছক উপন্যাস রচনার দিক দিয়া তাঁহার কবিশক্তি ইহার উপরে আর উঠে নাই—'বিষবৃক্ষ'ই বঙ্কিমী কাব্যকলার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার কি হইল? কবি-বঙ্কিম তাঁহার সেই তীর্থযাত্রায় কতখানি পথ অতিক্রম করিলেন? নগেন্দ্র দত্ত ও দেবেন্দ্র দত্ত দুই চরিত্রের দুই পুরুষ, একই বাসনা-বহ্নি দুইটা স্বতন্ত্র দেহবেদীতে জ্বালাইল, কিন্তু তাহাতে দগ্ধ হইল দুই নারী · একজন প্রেমে, আর একজন পিপাসার প্রবল পীড়নে, আত্মাহুতি দান করিল। পুরুষ দুইজনের একজন নিজেই জ্বলন্ত মশালের মত জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইল। আর একজন নারীর স্নেহে—একের আত্মবিসর্জনে এবং অপরের অভিমানবর্জনে কোনরূপে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত বাঁচিয়া

রহিল। নগেন্দ্র দত্তের মত এমন নারীশক্তির আশ্রিত সেন্টিমেন্টাল কাপুরুষ কোন য়ুরোপীয় নাটকের নায়ক হইতে পারিত না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের দ্বন্দ্বে এখানেও তিনি পুরুষের দুর্বলতাই দেখিয়াছেন। কিন্তু নারীর মধ্যে সেই প্রকৃতি-শক্তির যে বিভিন্ন রূপবিকাশ দেখাইয়াছেন তাহার কোনটা দুর্বল বা মহিমাহীন নয়।" (তদেব, পৃঃ ২৯-৩০)

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে মোহিতলাল রহস্যময় নিয়তির লীলা আর মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন তথা আশীর্বাদ প্রেমের লীলা দেখেছেন। নিয়তি একটি শক্তি, প্রেমও একটি শক্তি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দুয়েরই চূড়ান্ত লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিম্নধৃত দুটি অংশে এর সমর্থন পাই।

ক। "বঙ্কিমের নিজের ভাষায়—ঐ [প্রকৃতি]-শক্তি 'অশেষ ক্লেশের জননী আবার সর্বসুখের আকর, সকল কামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী'—কাহার পাত্রে বিষ, কাহার পাত্রে অমৃত ঢালিয়া দিবে তাহার স্থিরতা নাই; অতিবড় যে সেও বিষপান করিতে বাধ্য হয়, আবার অধমের ভাগ্যেও অমৃত উঠিতে পারে। এই শেষের তত্ত্বটিই সকল যুক্তিবিচার, সকল আশা-বিশ্বাসের বাহিরে। উহার নাম সেই অদৃষ্ট বা নিয়তি; এখানে সকল morality, সকল ধর্মাধর্ম বিচার নিষ্ফল। কুন্দ মরিল কেন? যদি মরিবেই, তবু সেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ হীরা কেন? একদিকে আত্মহারা প্রেমের অসীম নিরীহতা। অপরদিকে আত্ম-সচেতন অপমানিত প্রেমের ভীষণ নৃশংসতা—ঘটনার চক্র বা কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য নিয়মে উহারা কিরূপ মুখামুখী দাঁড়াইয়াছে! ঐ দুইয়ের যে প্রকৃতিগত বৈষম্য তাহাই যেন এই ট্র্যাজেডির সাক্ষাৎ কারণ; আখ্যানের ঘটনাচক্র সেই তত্ত্বকে কিরূপ চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়াছে! তাই বলিতেছিলাম এই আখ্যানের পরিকল্পনায় যে একটি সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য আছে—ঘটনার গ্রন্থিপরম্পরায়, চরিত্রের স্বতন্ত্র স্ফূর্তি ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়, এবং ঐ রহস্যময় নিয়তির লীলায়,—এমন আর বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে নাই। ইহাতে একটি ঘটনা, একটি চরিত্র, একটি বাক্যও কম বা বেশী নাই; এই 'economy of means' বঙ্কিমের সকল উপন্যাসেরই বিশিষ্ট গুণ হইলেও, 'বিষবৃক্ষে'ই ইহার চূড়ান্ত হইয়াছে।" (তদেব, পৃঃ ৩০)

খ। "বঙ্কিমচন্দ্র···প্রেমকে সকল বিষের বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন।···শেষ পর্যন্ত তিনি উহাকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।···ঐ প্রেমের আদর্শ যেমন উচ্চ—উপন্যাসগুলিতে জীবনের বাস্তবের সহিত তাহার দ্বন্দ্বও তেমনই ভীষণ। সেই দ্বন্দ্ব—উপন্যাসের নায়ক-জীবনের দ্বন্দ্বই নয়, তাঁহার কবিহৃদয়ের দ্বন্দ্বও কাব্যগুলিতে একটি অপূর্ব রসের সঞ্চার করিয়াছে। বিষবৃক্ষেই তাহার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রকাশ, এবং সেই কারণেই এই উপন্যাস এমন ঘনঘোর ট্র্যাজেডির মেঘে মেদুর হইয়া উঠিয়াছে।" (তদেব, পৃঃ ৩১)

স্বীকার্য, মোহিতলাল শুধু বঙ্কিমের উপন্যাসের কাব্যমূল্য বিচার করেন নি, তাঁর কাব্য-প্রেরণা ও মনোগত অভিপ্রায়ের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। কবিমন দিয়ে কবিকে বুঝবার প্রয়াসরূপে মোহিতলালের এই প্রয়াস বাংলা সমালোচনায় নূতন কীর্তি।

পাঁচ

বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাকালে বঙ্কিম-সমালোচনায় একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হল—মার্কসবাদী সমালোচনা দেখা গেল। এখানেই বঙ্কিম-চর্চার পঞ্চম পাঠের সূচনা।

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার রচিত 'বঙ্কিম-মানস' (১৯৫১) বঙ্কিম-চর্চার এক নূতন সংযোজন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের দাবী—বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদী সূত্রের প্রয়োগ। সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে সমাজ-প্রতিবেশ-প্রভাব, সমকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লেখকের নিগূঢ় ভাবাভিপ্রায় ও সমাজচেতনা কতটা ক্রিয়াশীল তারই বিচার-বিশ্লষণ এই রীতির বৈশিষ্ট্য। "বঙ্কিমচন্দ্রকে সমকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করিয়া কি ভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার মধ্যে বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহার মন ও শিল্প বিবর্তিত হইয়াছে," সমালোচক তা দেখাবার প্রয়াস করেছেন ('লেখকের কথা')।

'বঙ্কিম-মানস'গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, খুব-একটা অভিনব রীতি এখানে প্রযুক্ত হয়নি। Man and the Moment সূত্র এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। কোনও লেখককে বুঝতে হলে তার পটভূমিকা স্বরূপে তাঁর যুগের মানুষের বিষয় জানা আবশ্যক। লেখকের কালের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তার রাজনীতিক অবস্থা এবং জীবনের মুখ্য ক্ষেত্রে লেখকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্তি বা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ব্যর্থতা,—এরই বাতাবরণে লেখক আত্মপ্রকাশ করেন। সামাজিক পরিবেশ ও যুগগত লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা এই দৃষ্টির উৎস। Taine অনেক পূর্বেই তা বলে গিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচনায় তার প্রয়োগ পূর্বেই হয়েছে।

অবশ্য সমালোচকের দাবি, এটি মার্কসবাদী রীতির প্রয়োগ, তা মেনে নিয়েছেন গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"লেখক এই গ্রন্থে মার্কসীয় সমালোচনা-রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়া বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজ-প্রতিবেশের প্রভাব ও সাহিত্যিকের মানস ভঙ্গিমার বিশ্লেষণ ও ইহাদের উপর প্রাধান্য আরোপ এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন শিল্পীর সৌন্দর্য সৃষ্টিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই সৌন্দর্য-সৃষ্টি, ঘটনা-সন্নিবেশ ও যাহা ঘটিয়াছে তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণের পিছনে যুগের আশা- আকাঙ্ক্ষা ও লেখকের নিগূঢ় ভাবাভিপ্রায় কতক সচেতন কতক বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রেরণাটী শ্রীমান পোদ্দারের গ্রন্থে দীপ্ত মনীষার সহিত আলোচিত হইয়াছে।" অবশ্য এই রীতি প্রয়োগের বিপদ সম্পর্কেও ভূমিকাকার সচেতন—"আমরা যদি রচনার বস্তুগত উপাদানের উপর বেশী জোর দিই, তবে যে সামঞ্জস্য সাহিত্যের প্রাণ তাহা বিচলিত হইবার আশঙ্কা আছে।" এবং শ্রীযুক্ত পোদ্দারের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"শ্রীমান অরবিন্দের বিচার-পদ্ধতিতে এই বিপদ যে মাঝে মাঝে দেখা না দিয়াছে তাহা বলা যায় না।"

বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচারে এই রীতির প্রয়োগ কতটা সফল তা বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত পোদ্দার দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থে শুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক অধিকারের মতো বিধবাদের বিবাহের অধিকার স্বীকার করেছেন, তার যৌক্তিকতাও স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রচলিত সামাজিক নীতিবোধের মানদণ্ডে তাকে অস্বীকার করেছেন। বঙ্কিম-মানসে এই স্ববিরোধিতার নিপুণ বিশ্লেষণের ('বঙ্কিম-মানস', ১৯৫১, পৃ ৫৯-৬০) পর সমালোচক কুন্দ-নগেন্দ্র তথা সূর্যমুখী নগেন্দ্রর সম্পর্কের ট্রাজেডি বিশ্লেষণ করেছেন—

"কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের সহানুভূতি ও উদার মনোভাব যে নূতন ভাবে কুন্দকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, এবং নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের অনুরাগ যে নূতন ভাবে নগেন্দ্রকেও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, তাহা শিল্পীর দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আর সূর্যমুখীর স্বাভাবিক অহমিকার জন্য হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক, সূর্যমুখী-নগেন্দ্র সম্পর্ক যে উত্তর-উত্তর একটা প্রাণহীন গতানুগতিকে পরিণত হইয়া গিয়াছিল; এ সত্যও শিল্পী উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উপেক্ষার একমাত্র কারণ, শিল্পী আনুকৃতিক সত্যকে মর্যাদা দানের জন্য অথবা নিরপেক্ষভাবে এই প্রবাহকে অনুকরণ করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই, প্রচলিত নৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিষবৃক্ষ রচনা করিয়াছিলেন।

সুতরাং কুন্দর ট্রাজেডি অথবা কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের ট্রাজেডি এই জন্য নয় যে, সামাজিক অচলায়তন ইহার সার্থক পরিণতির গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কুন্দ নগেন্দ্রের সীমাবদ্ধ শক্তি দুর্জয় সংকল্প লইয়া সংগ্রাম করিয়াও কেহ অচলায়তনকে জয় করিতে পারে নাই। কুন্দর ট্রাজেডি এবং কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের অনিবার্য ব্যর্থতা এইজন্যই যে, তাহা সনাতন নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে পাপাচারে নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্যর্থতা এই জন্য নয় যে, সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে; ব্যর্থতা এই জন্য যে, তাহারাই বিধিবদ্ধ নৈতিক আচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যে মানস-বিপ্লব ও ভাবতরঙ্গ নগেন্দ্রর সমস্ত নীতিবোধকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণে নগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল; তাহার নীতিবোধ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে আর কুন্দনন্দিনীর অগোচরে পাপ-চেতনা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। সমস্ত সুখেরই সীমা আছে। কিন্তু কিভাবে এই উদ্দাম ভাবতরঙ্গ নিমেষে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গেল, তাহার সঙ্গত কোন মীমাংসা বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই। অবশ্য তাহা প্রত্যাশিতও নয়। কারণ তাঁহার শিল্পসৃষ্টি নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণের বাহন মাত্র।······বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নগেন্দ্রর এই মানসিক বিক্ষেপ পাপ। কুন্দের ভালবাসাও পাপ। কেননা মানবিক সম্পর্ক ধর্ম সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেই তাহা সার্থক, অন্যথায় নয়। এই সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।" (তদেব, পৃ ৬১-৬২)

শ্রীযুক্ত পোদ্দারের মূল বক্তব্য এখানেই পাই,—মানবিক সম্পর্ককে যথার্থ মানবিক সত্য দ্বারা বিচার না করে অতিপ্রাকৃত সত্য দ্বারা বিচারের প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করেছে, এবং তাঁর রক্ষণশীলতাকে প্রকট করেছে। (তদেব, পৃ ৬৩)।

বিপরীতপন্থী সমালোচনার পরিচয় পাই শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা'

গ্রন্থে (১৯৫৯)। সমালোচক তাঁর গ্রন্থকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন : ধর্মচেতনা, জীবনচেতনা, শিল্পচেতনা, সমাজচেতনা, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনা। বঙ্কিমকে সমালোচক গভীর অধ্যয়নের মধ্য যে ভাবে পেয়েছেন সে-ভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন। পূর্ববর্তী বঙ্কিম-সমালোচকদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। উদাহরণস্বরূপ দেখান যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের কয়েকটি সিদ্ধান্তকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন (পৃ ৩০, ৩২, ৩৮)। সূর্যমুখী, কুন্দ, রোহিণী প্রমুখ নারীচরিত্রে প্রেম, সতীত্ব, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা প্রভৃতি বিষয়ে তপনকুমার আপন প্রত্যয়কে বিশেষ জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। রূপমোহ, প্রেম,—এ দুই এক নয়; 'আনুভূতিক সত্য' ও 'বাস্তব সত্য' আখ্যা দিলেই তা কখনো এক হয় না; জীবনের মৌলিক সত্যকে বঙ্কিম চিনতে কখনো ভুল করেননি বলে সমালোচক মনে করেন। (পৃ ৩১)

তপনকুমারের বক্তব্য :

"প্রেম ও রূপমোহের কোন পার্থক্য যদি স্বীকার না করি, রূপমোহকেই একমাত্র সত্য বলে প্রেমকে বাস্তবতা-বিবর্জিত আদর্শবাদ বলে যদি প্রচার করি, তবে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত নৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে কুন্দ ও রোহিণী চরিত্রের পরিণাম প্রসঙ্গে বঙ্কিম সম্বন্ধে আমরা এই অভিযোগ নিয়েই আসি।

কিন্তু বঙ্কিমের বক্তব্যটা কী আগে বুঝে দেখি। নগেন্দ্রনাথ তার স্ত্রী সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে আশ্রিতা বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই আকর্ষণের কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম বললেন যে, এ প্রেম নয় রূপমোহ। বোঝাবার জন্যে হরদেব ঘোষালের পত্রে বললেন, সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ ছিল তা প্রেমধর্মের প্রবর্তনায়; কুন্দের প্রতি যে আকর্ষণ, তা মোহধর্মের বিভ্রমে। তবে এই মোহও পরে স্থায়ী প্রেমে রূপ নিতে পারে, একথাও জানালেন। কাজেই আনুভূতিক সত্যকে তথা মনের সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতিকে বঙ্কিম অস্বীকার করলেন একথা বলা চলে না, কিন্তু একে প্রেম বলে বঙ্কিম মর্যাদা দেননি, সমাজনীতির দিক থেকে নয়, প্রেমেরই সত্য থেকে। ……সূর্যমুখী যদি অভিমানে গৃহত্যাগ করে না যেতেন তবে নগেন্দ্রনাথের মোহ কুন্দকে ঘিরে ব্যস্ত থাকত, সূর্যমুখীর অভাব তিনি অনুভব করতেন না। কিন্তু ঔপন্যাসিক কৌশলে সূর্যমুখীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নগেন্দ্রনাথের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছেন। তখন—'দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃত পুরী অন্ধকার হইল। ……যেমন বালক চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে, তেমনি কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃত পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।'

এরপর কুন্দের বিষপান কি এর চেয়ে মারাত্মক ঘটনা? কুন্দের এই মৃত্যুর চেয়ে সেই মৃত্যু কি বেশী ভালো? সে মৃত্যু তো ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য পরিণাম। সেখানে তো আর কোন বিস্মিত রহস্য নেই। রহস্য যা, তা হল এই—'আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?'

রূপমোহের এই চাঞ্চল্য ও বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনশীলতার জন্যই তার বিষময় পরিণামের কথা বঙ্কিম বিশেষ করে বলতে চান।······

বঙ্কিম বলেন, রূপমোহ ভালমন্দের জ্ঞান হারায়, অসামাজিক হয়ে প্রকাশ পায়, সুখের সংসার ছারখার করে দেয়, জীবনে চতুর্দিকে বহু ধ্বংসব রচনা করে,—তাই তা নিন্দনীয়।

বহুগামিতার এই চাঞ্চল্য বঙ্কিম নিন্দা করেছেন, সেইজন্য কি বলতে চাই বঙ্কিম রক্ষণশীল, নীতিবাদী ? কিন্তু যদি বুঝে দেখি বঙ্কিম কেন নিন্দা করেছেন, তাহলে সূর্যমুখী ভ্রমরের বেদনার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

—'সে হাসি আর নাই, সে চাহনি আর নাই, সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই, সে কথা কহার প্রণালী আর নাই।······সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে, কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।'

রূপমোহের আপাত রক্তিমার অন্তরস্থ কালিমা প্রেমের শুভ্র দ্যুতির কাছে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন বঙ্কিম। প্রেমের একটা গভীর বক্তব্য ছিল বঙ্কিমের, জীবনের সত্য বলেই তাকে অনুভব করেছিলেন ; তাই রূপমোহকে সমর্থন করেন নি।" ('বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা' পৃ ৩১-৩৩)।

এই অভিমত ব্যক্ত করে তপনকুমার ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের নিম্নধৃত সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন,—'মানবিক সম্পর্ককে যথাযথ মানবিক সম্পর্ক দ্বারা বিচার না করিয়া অতিপ্রাকৃত সত্যের দ্বারা বিচারের প্রচেষ্টা তাঁহার শিল্প-ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার রক্ষণশীলতাকে প্রকট করিয়াছে।' ('বঙ্কিমমানস')।

তপনকুমার মনে করেন এই সিদ্ধান্তের উৎসে যে মানসিকতা তা প্রেম ও রূপমোহের পার্থক্য স্বীকার করে না। "এ মন্তব্যে জীবনবোধের মৌল পার্থক্যটাই প্রকট হয় এবং তাতে বঙ্কিমের সঙ্গে কলহই সার হয়, বঙ্কিমমানসের সম্যক পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না বলেই আমাদের ধারণা।" ('বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা' পৃ ৩২)।

বিংশ শতাব্দের মধ্যবিন্দু অতিক্রমণের পরে ষাটের দশকে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের এই পার্থক্য আমাদেরকে বঙ্কিম-সমালোচনার বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

ছয়

সত্তরের দশকের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয় : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র' ('আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত; ১৯৬১) এবং প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাসসাহিত্যে বঙ্কিম' (প্রথম সং ১৯৬১, দ্বিতীয় সং ১৯৭১)।

অমূল্যধন বঙ্কিম-উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা গোড়াতেই করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে গল্পের প্রচণ্ড আকর্ষণ, সরলগতি আখ্যান, ঘটনাবৃত্তের সুনিপুণ গ্রন্থন; আখ্যানরীতির বৈঠকী চাল, ঘটনা-পরম্পরার বৈচিত্র্য ও বিস্তার, প্রাকৃতিক বর্ণনার প্রচুর

সমাবেশ, চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণ নিপুণতা, বাস্তবভিত্তিক রোমান্স, ইতিহাসরসের সৃষ্টি প্রভৃতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমালোচক দেখিয়েছেন।

এহ বাহ্য। অমূল্যধন বঙ্কিম-উপন্যাসের মর্মমূলে উপনীত হয়ে জীবনের গভীরতর সত্য আবিষ্কার করেছেন। জীবনশিল্পী বঙ্কিম সম্পর্কে অমূল্যধন লিখেছেন :

"তিনি জীবনসত্যের বোদ্ধা ও দ্রষ্টা ; যে সনাতন সত্য জীবনের মধ্যে অনুস্যূত, যাহাতে সমগ্র জগৎ বিধৃত ও সঞ্জীবিত, সেই সত্যই অর্থাৎ ধর্মই তাঁহার উপন্যাসের বিষয়। এই ধর্মের উপলব্ধিই তাঁহার উপন্যাসে প্রকটিত হইয়াছে। সমাজসংস্কার, কোন বিশিষ্ট মতবাদের প্রচার বা ক্লিষ্ট মানবহৃদয়ের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিপাদন মাত্র তাঁহার উপন্যাসের বস্তু নহে। তিনি যথার্থ জীবন-দার্শনিক। এইজন্য আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাসের প্রভাব এত ব্যাপক ও গভীর। তাঁহার উপন্যাস জীবনসমস্যার বিশ্লেষণমাত্র নহে, তাহা মহীয়সী কবি-কল্পনার এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমের উপন্যাস এক জাতীয় মহাকাব্য। Dante-র মহাকাব্য Divine Comedy-তে যে জীবনসত্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে পার্থিব অভিজ্ঞতা ও সাংসারিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও Dante-র নিজস্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই তাহার প্রধান উপাদান। এই উপলব্ধি ও এই সত্য কাব্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের রচনায় রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী Divine Comedy-র অনুরূপ মহাকাব্য। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মানুষের জীবন কাব্যবিশেষ'। কবির দৃষ্টি দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং উপন্যাসে তিনি মানবজীবনের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাও কাব্যবিশেষ। তাহা শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনার সৃষ্টি। এই জাতীয় কল্পনা বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া বাস্তবাতীতের সহিত তাহার সংযোগ লক্ষ্য করে এবং বাস্তবকে এক মহাসত্যের প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করে। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে তথাকথিত হিন্দুয়ানি ও গোঁড়ামির প্রচারক বা উকিল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধি—উভয়ের সম্বন্ধেই অজ্ঞতার পরিচয় দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বস্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন। যদি হিন্দু আদর্শের সহিত তাহার মিল থাকে, তবে তাহার কারণ এই যে, উভয়ই জীবনের সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। Dante-র মহাকাব্য রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ তথাচ তাহার কাব্যগুণের হানি হয় নাই ; বঙ্কিমের উপন্যাসও হিন্দুধর্মনীতির সহিত সংসৃষ্ট হইলেও তাহার রস বা সত্যের লাঘব হয় নাই।"

অমূল্যধনের এই বক্তব্য স্বচ্ছ, যুক্তিনিষ্ঠ, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। 'জীবনজিজ্ঞাসাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়'—অমূল্যধন এই বক্তব্যকে নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমের 'রোমান্স ললিত কামনার স্বপ্নবিলাস' নয়, তা 'বিশ্বরূপ-দর্শন'। এই 'বিশ্বরূপ-দর্শন' বলতে কী বোঝায়? অমূল্যধন এই প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন :

'বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বরূপ-দর্শনের সম্যক্ পরিচয় দুই-এক কথায় দেওয়া সম্ভব নহে। মানবজীবনে তিনি দেখিয়াছেন দুইটি প্রধান শক্তির লীলা,—একটি প্রণয়, অপরটি নিয়তি। প্রণয়ের নানা রূপ ও নানা প্রকাশ দেখিয়া কখনও তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে, 'হায় রমণী-রূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্!' আবার কখনও দেখাইতে হইয়াছে, 'বসুধালিঙ্গন

ধূসরস্তনী বিলাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা'। এই প্রণয়ের প্রবৃত্তি একটা অদ্ভুত শক্তি, মানুষের স্বেচ্ছা, বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত ইহার সম্পর্ক খুবই সামান্য, সব জানিয়া শুনিয়াও বহ্নি-বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় মানুষ অনেক সময় ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' ইহা মানুষের জীবনে আবির্ভূত হয়। প্রণয়ের 'তপ্ত ইক্ষু চর্বন' করিয়া কেহ সুখ বা শান্তি পায় কিনা সন্দেহ। কেবল যখন এই প্রণয় ইন্দ্রিয়সংযম, কর্মযোগ বা চিত্তপ্রসাদের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই ইহা সার্থক হইতে পারে।

কিন্তু প্রণয়ও অপর একটা মহত্তর শক্তির করধৃত যন্ত্র মাত্র। সংক্ষেপে এই বিরাট শক্তিকে বলা যায় নিয়তি; সংসারের সনাতন নিয়ম ও সনাতন ধর্মনীতি ইত্যাদি এই নিয়তিরই প্রকাশ। ইহার মধ্যে একটা ক্রুর পরিহাসপ্রিয়তা অনেক সময় দেখা যায়, যাহার ফলে আমরা জীবনে অনেক সময় 'শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।' মানুষকে লইয়া নিয়তি খেলা করে, আমাদের বোড়ের মত সাজাইয়া দাবা খেলে, মানুষকে দিয়া আপন লীলা সম্পূর্ণ করে, কিন্তু চিরকাল ধরিয়া অনন্ত-কলরোল-মুখর এই যে লীলা চলিতেছে, তাহার তাৎপর্য কি বুঝিতে পারা যায় না। কখনও কখনও মনে হয় যে ইহার লীলা চলিতেছে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। ইহারই নির্দেশে রাজ্য নগর জনপদের ধ্বংস ও সৃষ্টি চলিতেছে; বাদশাহের লাঞ্ছনা, শাহ্‌জাদীর গর্ব খর্ব হইতেছে, মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইংরাজ রাজ্য উঠিতেছে। কিন্তু অতি নিরীহ, এমন কি মহদাশয় মানব-মানবীও ইহার প্রকোপ হইতে বাদ যায় না। কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে, প্রতাপকে জীবন বিসর্জন করিতে হয়। কে ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবে? 'তুমি ঐশী মায়া, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।' প্রাচীনকালের গ্রীক সাহিত্যে ও আধুনিক কালে হার্ডি-র উপন্যাসে এই নিয়তি সম্পর্কে যেরূপ উপলব্ধির পরিচয় আছে, প্রায় তজ্জাতীয় উপলব্ধিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সবিলাসী গল্পকার মাত্র নহেন।"

এই আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করি, বিষবৃক্ষ উপন্যাস প্রণয় ও নিয়তি, দুই শক্তিরই লীলাক্ষেত্র। প্রথমটির বলি নগেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়টির কুন্দনন্দিনী।

একই বছরে (১৯৬১) প্রকাশিত হয় প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাসসাহিত্যে বঙ্কিম'। তাঁর সমালোচনা বিশ্লেষণধর্মী, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। তৃতীয় অধ্যায় —'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ'। এ অধ্যায়ে বঙ্কিম-উপন্যাসকে লেখক ভাগ করেছেন তিন পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) মূল কথা সৌন্দর্যসৃষ্টি ও অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়তি ও বিশ্বনীতির সহাবস্থান (বিষবৃক্ষ থেকে রাজসিংহ)। তৃতীয় পর্যায়ে ঘটনার বহিরাবরণের তলায় ধর্মতত্ত্বের অন্তর-রূপ প্রকটন (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম)।

বঙ্কিমের প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষের আলোচনায় সমালোচক বঙ্কিমের scheme of life লক্ষ্য করেছেন—"বিষবৃক্ষে প্রকৃতির বিধানে অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সূর্যমুখীর অকারণ তিরস্কারে কুন্দকে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে, ফলে কুন্দকেই গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূর্যমুখীকে গৃহত্যাগ করিতে হইল।

নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে নির্মম আঘাত দিয়া বলিয়াছেন, কুন্দের সন্ধানে তিনি দেশদেশান্তরে ঘুরিবেন ; তাঁহাকে দেশদেশান্তরে ঘুরিতে হইল সত্য, কিন্তু কুন্দের সন্ধানে নহে, সূর্যমুখীর সন্ধানে। আবার, সূর্যমুখী যেমন চক্ষের জলে সঙ্কল্প করিলেন কুন্দকে ফিরিয়া পাইলে তাহারই হাতে স্বামীকে সঁপিয়া দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবেন, কুন্দকেও তেমনি চক্ষের জলে সঙ্কল্প করিতে হইল, সূর্যমুখী ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জিনিষ তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইবে। এইরূপ, হীরার জীবনেও এই প্রতিশোধবিধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। হীরা যেমন নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর প্রণয়-নীড়ে ভাঙ্গন ধরাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তেমনই প্রণয় হইতেই চরম শাস্তি আসিল।" ('উপন্যাসসাহিত্যে বঙ্কিম', ২য় সং পৃ ১৩৪)।

প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্তের সমালোচনা পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব, কিছুটা মৌলিকতাবিশিষ্ট। তার প্রমাণ উপরোক্ত উদ্ধৃতি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধির কার্যকারিতা তিনি দেখেছেন।

পূর্ববর্তী সমালোচককের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন প্রফুল্লকুমার। এই প্রতিবাদে ও নিজমত প্রতিষ্ঠায় তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ও মৌলিকতা দেখা যায়। তিনি কুন্দচরিত্র সম্পর্কে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১) ও মোহিতলাল মজুমদারের (১৯৫৩) বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর অভিমত যুক্তিনিষ্ঠ, সাহসিকতাপূর্ণ। এখানে তা উদ্ধার করি।

(ক) "বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ)। প্রধানতঃ এই উক্তির ভিত্তিতে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "নগেন্দ্রের প্রথম দর্শনে কুন্দ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল' (৪র্থ পরিচ্ছেদ), নগেন্দ্রের পত্রে, সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না' (৫ম পরিচ্ছেদ)—এ শুধু বিস্ময় নহে, রূপমোহ।" ('বিধবা'—'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩২৮, ৪১৯ পৃঃ)। কিন্তু নগেন্দ্রের প্রথম দর্শনে কুন্দের বিস্ময় ও বিমূঢ়ভাবের সুস্পষ্ট কারণ এই যে, তিনি কুন্দের স্বপ্নদৃষ্ট 'দেবকান্তি' পুরুষ। এ অবস্থায় বিস্ময় শুধু স্বাভাবিক নহে, অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে রূপমোহ বলা চলে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে অবশ্য পরবর্তীকালে, অর্থাৎ নগেন্দ্রের নিকট আশ্রয় পাইবার পর কৃতজ্ঞতামিশ্রিত বিস্ময়ে যে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল, বঙ্কিমের নিজের উক্তির পর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু তাহা নগেন্দ্র যে সময় হরদেব ঘোষালের নিকট পত্র লিখিলেন সম্ভবত তাহার পরের কথা, নহিলে চারি চক্ষের মিলন হইলেই তাহার 'বৃহৎ নীল...চক্ষু দুইটি' আপনা হইতেই ব্রীড়াবনত হইত।" (তদেব, পৃ ১৪৬, পাদটীকা)।

(খ) "সুসাহিত্যিক মোহিতলাল বলেন কুন্দনন্দিনী আয়েষারই নব সংস্করণ।' ('বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস,' ৩৪ পৃঃ)। 'প্রেমের আত্মবিসর্জনের মধ্যে নারীর যে অসীম শক্তি —অতখানি কোমলের মধ্যেও ঐ কঠিন আত্মস্থতা' নিঃসন্দেহ উভয় চরিত্রের আত্মিক যোগসূত্র। কিন্তু মোহিতলালের মন্তব্য আতিশয্যদোষদুষ্ট। এক হিসাবে ইহারা বিপরীত-ধর্মী—আয়েষা আত্মনির্ভরশীল, কুন্দ সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীলা।" (তদেব, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা)।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের বঙ্কিম সমালোচনাকর্মে যে মৌলিকতা আমরা লক্ষ্য করেছি, তা সমকালে সুলভ ছিল না। তার প্রমাণ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৬৩)। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'বিষবৃক্ষ' (পৃঃ ৯৯-১৩২)। কাহিনী, ঘটনাকাল, পরিকল্পনায় ত্রুটি ও অসঙ্গতি, পূর্ববর্তি গ্রন্থাদির তুলনায় বিচার প্রভৃতি পর্যায়ে আলোচিত এই গ্রন্থে বঙ্কিম-উপন্যাস সম্পর্কে কোনো মৌলিক চিন্তা ও বক্তব্য পাই না। অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের 'বঙ্কিম-সাহিত্যপাঠ' গ্রন্থে (১৯৬৪)। এই গ্রন্থে বঙ্কিম-মনীষা সম্পর্কে কিন্তু নতুন চিন্তা আছে। ম্যাথু আর্নল্ডের 'Culture' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন', এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বা অসম্পর্ক বিষয়ে সমালোচক নতুন ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন (দ্রষ্টঃ পৃঃ ১৪৭-১৫১)। এই বক্তব্য আমাদের বঙ্কিম-মনীষা সম্পর্কিত ভাবনাকে উসকে দেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনায় এমন কিছু নতুন বক্তব্য পাওয়া যায় না, যা আমাদের ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-সম্পর্কিত ভাবনাকে উদ্রিক্ত করতে পারে।

সত্তরের দশকে বঙ্কিম-সমালোচনায় উজ্জ্বলতম নাম প্রমথনাথ বিশী। তাঁর বঙ্কিম সমালোচনা গভীর, বিস্তীর্ণ ও মৌলিকভাবনাসমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অধ্যাপক বিশী চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন—বঙ্কিম-রচনাসম্ভার, বঙ্কিম-সরণী (১৯৬৭), বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমসাহিত্যবিচার (১৯৭১)। বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচক সামগ্রিকভাবে দেখেছেন। মানবসংসার ও বাঙালি সংসারের পটভূমে দেখেছেন। তাঁর বঙ্কিম-দর্শনে চিন্তা ও দৃষ্টির মৌলিকতা অবশ্যস্বীকার্য।

"বঙ্কিম-সরণী" গ্রন্থের মুখ-প্রবন্ধে সমালোচক বঙ্কিমের জীবনজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটি ধরেছেন। তা অনুধাবনযোগ্য।—

"কালের ও সমাজের দাবিতে দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় নিছক শিল্পীকে সমাজ-চিন্তা ও দেশচিন্তার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। কপালকুণ্ডলার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে স্তম্ভিত নিষ্কলঙ্ক কল্পনা বিগলিত ধারায় কমলাকান্তের ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে; বহু তরণীর যাতায়াতে আবিল, বহু প্রয়োজনের চিহ্নে মলিন, কিন্তু এই তো নদীর সার্থকতা। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুধা ভাবে কমলাকান্তের মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে, 'আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?' জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নদী বিস্তৃততর, জিজ্ঞাসা গভীরতর হয়েছে এবং অবশেষে গুরু-শিষ্য সংবাদের গুরুর প্রমুখাৎ সেই জিজ্ঞাসা আর্তনাদরূপে প্রকাশিত হয়েছে—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' সারা জীবন এই উত্তরের মীমাংসা তিনি সন্ধান করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশের পরে লিখিত যাবতীয় উপন্যাস, তার আগে ও পরে লিখিত যাবতীয় প্রবন্ধাদি এই প্রশ্নের সন্ধান। একটু অনুধাবন করে পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাকে এই প্রশ্নের সূত্রে একটি অখণ্ড মাল্যরূপে গ্রন্থন করা সম্ভব। এমন একধ্যান, একাগ্রমুখা লেখক সত্যই বিরল। ...প্রত্যেক পদক্ষেপে নতুন নতুন প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছে তাঁকে—সব প্রশ্নের মূল প্রশ্ন 'এ জীবন লইয়া কি করিব?'" (বঙ্কিম-সরণী, পৃঃ ১১-১২)।

সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর বঙ্কিম-সমালোচনায় এই মৌলিক দৃষ্টির মূল্য ও তাৎপর্য অবশ্যস্বীকার্য। তিনি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন এই মূল জিজ্ঞাসা থেকে প্রসূত হয়েছে অনেক অনু-জিজ্ঞাসা। বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য এসব অনু-জিজ্ঞাসার সমাধান করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন মূল জিজ্ঞাসাটির দিকে। মুখ-প্রবন্ধে এইসব অনু-জিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে মূল-জিজ্ঞাসার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন ও এই সমাধানের মধ্যে অন্যসব জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন, তার আলোচনা করেছেন সমালোচক। (তদেব, পৃঃ ১১-২৬)

এই পথে অগ্রসর হয়ে সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বীকার্য, একে ইমপ্রেশ্যনিষ্টিক সমালোচনা বলা যেতে পারে। চতুর্থ প্রবন্ধের শিরোনাম— 'বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে'। বিষবৃক্ষ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের ধারণার ইঙ্গিত এখানে পাই।

"এত দুঃখ কেন, এই চিরাগত প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধানে বিরাম নাই। একটা সহজ উত্তর অর্থাভাব। আরও উত্তর মৃত্যু বিচ্ছেদ, পীড়া, আধি ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এ সমস্তের অনস্তিত্ব সেখানে দুঃখ কেন? নগেন্দ্রনাথের দুঃখ কেন, গোবিন্দলালের দুঃখ কেন? তারা তো পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার অভাবের উর্ধ্বে, তবে কেন?......

'চিত্তসংযমের অভাবেই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী একেবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।'

এ উত্তর সর্বদেশের সর্বকালের জ্ঞানী গুণী ও মানবচরিত্রবিদ্‌গণের; দেশভেদে যুগভেদে ভাষাটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ও ভিন্ন অন্য উত্তর নাই। প্রাচীন গ্রীকদের মতে অহংবোধের প্রাবল্যে চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মানুষের পতন ঘটায়; ভারসাম্য যে নষ্ট হয় তার মূলে Fate। শেক্‌সপীয়র বলেন,ভারসম্য নষ্ট হওয়ার কারণ চরিত্রের মধ্যেই আছে, কাজেই অদৃষ্ট নয় চরিত্র। জন্মান্তরবাদী হিন্দু অন্তকার আমির সংস্কৃতির ও দুষ্কৃতির দায়িত্ব পশ্চাতের আমির উপর ন্যস্ত করেছেন, এটা Fate ও Character-এর সমন্বয়ের চেষ্টা। কাজেই 'অদৃষ্ট' বা চরিত্র বা উভয়ের সমন্বয় যাই হোক; অন্য উত্তর নাই; বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি চরিত্রকে দায়ী করেছেন, তবে ভাষাটা কিছু আলাদা। রিপুর প্রাবল্য বিষবৃক্ষের বীজ, ঘটনাধীনে এ বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল ফলায়। 'বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে'। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের বিষবৃক্ষ সহজেই পরিণত হয়ে ফল ধরেছে; সীতারামের বিষবৃক্ষেও ফল ফলেছে, কিন্তু সহজে নয়; অমরনাথের প্রাঙ্গণের বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হওয়ামাত্র লবঙ্গলতা সবলে উন্মুলিত করে ফেলে দিয়েছে, অমরনাথ বাধা দেয়নি; আর প্রতাপের প্রাঙ্গণেও বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল, তার 'বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম অতি রমণীয়'; প্রাণপণ প্রযত্নে ও সমগ্র জীবনের আয়াসে সেই অঙ্কুর উৎখাত করতে গিয়ে প্রতাপকে মৃত্যু স্বীকার করতে হল। রিপুর প্রাবল্যজনিত বিষবৃক্ষের সৃষ্টি ও তার প্রক্রিয়া বঙ্কিম-উপন্যাসের একটি

প্রধান বিভূতি। বস্তুত, অন্য কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক এই পথে মানবচরিত্রের এত গভীরে আর প্রবেশ করতে সমর্থ হননি।

নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন তারা বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ। কিন্তু যে সুখের আশায় এত কাণ্ড সে সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী বুঝলো 'সকল সুখেরই সীমা আছে', নগেন্দ্রনাথও বুঝলো সে কি কেবল সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছে বলে? সূর্যমুখীর অন্তর্ধানের অগ্ন্যুৎপাতের শিখায় যে বিপত্তি তাদের চোখে পড়লো তার হেতু তাদের মনের মধ্যেই ছিল, আগে বুঝতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মোহ দুই প্রকার, রূপজ মোহ এবং গুণজ মোহ। রূপজ মোহ স্থায়ী হয় না, গুণজ মোহ কালক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়।......

এই রূপজ মোহজনিত ভ্রান্তির বশে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আসক্তি, সূর্যমুখীর প্রতি অনাদর।

এ ভ্রান্তি যত শীঘ্র জন্মেছিল ততোধিক শীঘ্র অপনোদিত হল, নগেন্দ্র ও কুন্দ দুজনেই আবিষ্কার করলো 'সকল সুখেরই সীমা আছে'। যতক্ষণ কুন্দ অপ্রাপ্য ছিল ততক্ষণ নগেন্দ্রের আগ্রহ, করায়ত্ত হতেই সূর্যমুখী করচ্যুত হল, তখন তার মন মুগ্ধ কুরঙ্গের মতো তার পিছে ছুটলো। মানুষের উপরে দুষ্প্রাপণীয়ের এমনই দুর্জয় প্রতিক্রিয়া!" (তদেব, পৃ ১০৫—০৭)

সমালোচক প্রমথনাথ জীবনকে ও বঙ্কিমসাহিত্যলোককে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাস থেকে জীবনের একটি মহৎ সত্যকে ধরতে চেয়েছেন। এবং আলোচনার শেষে উচ্চারণ করেছেন তত্ত্ব-বাক্য :

"ট্রাজেডি রচনা মনে ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে পাঠকের আত্মশোধনে সাহায্য করে। এমন তো আমার ভাগ্যেও হতে পারতো আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে পাঠককে উত্তেজিত করতে থাকে। গ্রীক ও সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির নায়কগণ অতিকায় পুরুষ, তৎসত্ত্বেও পাঠকেরা তাদের প্রতি করুণা অনুভব করে, বীরপুরুষের পতনাশঙ্কায় ভীত হয়ে ওঠে। এমন যে সম্ভব তার কারণ তারা যতই অসামান্য আর পাঠক যতই সামান্য হোক নিয়তির কাছে সকলেই সমান অকিঞ্চিৎকর। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই মিশ্ররস উৎপাদন করবার ক্ষমতা সুপ্রচুর। পাঠকের মন নিরন্তর ভীতি ও করুণায় আন্দোলিত হতে হতে শেষ ছত্রটির দিকে এগিয়ে চলে। সীতারাম ও রাজসিংহ না-হয় আমাদের তুলনায় বড়, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল তোমার আমার মতোই বাঙালী ভদ্রলোক, না-হয় কিছু ধনী। প্রতি পদক্ষেপে গভীরতর সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলতে দেখে তাদের জন্যে মন করুণায় ভরে ওঠে, মনে হয় হাত দিয়ে টেনে ধরে ওদের চট্‌কা ভাঙিয়ে সাবধান করে দি, এমন সময়ে লেখকের কণ্ঠে সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়, 'বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে', তখন করুণার সঙ্গে অকস্মাৎ ভীতি মিলিত হয়ে ট্রাজেডির ভরা পূর্ণ করে তোলে, আর অমনি মনের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়, কে কাকে হাত ধরে সাবধান করে দেবে, সকলেরই প্রাঙ্গণে যে বিষবৃক্ষ, কারো উপ্ত, কারো অঙ্কুরিত, কারো বা সম্পূর্ণ ফলবান।" (তদেব, পৃ ১১২—১১৩)।

এখানে সমালোচক যে ভরত-বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তা নিছক উপন্যাস-সমালোচনার স্তর অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে মহত্তর জীবন-বাণীরূপে উচ্চারিত হয়েছে। লক্ষণীয়, পূর্বে আলোচিত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় বঙ্কিম-উপন্যাসে জীবনের যে scheme প্রতিভাত হয়েছে, তার সঙ্গে প্রমথনাথের জীবন-বীক্ষার মিল দেখা যায়।

সাত

আশির দশকে বঙ্কিম-সমালোচনায় উল্লেখ্য সংযোজন শ্রীক্ষেত্র গুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' (১৯৭৪)।

লেখকের নিবেদনে সমালোচক জানিয়েছেন, 'শিল্পরীতির দিক দিয়ে উপন্যাসের আলোচনা করলে নানা অনুদ্‌ঘাটিত বিস্ময়ে চমকিত হতে হয়। এরূপ বিশ্বাসের বশে বর্তমান গ্রন্থ রচনা।'

সূচনায় 'বঙ্কিমীরীতির মূলসূত্র' অধ্যায়ে সমালোচক সূত্রাকারে তাঁর পথের—আলোচনার দিগদর্শন করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসের দেহগঠনের আদর্শ (শেকস্‌পীরীয় নাটক), প্লট গঠনে বৃত্ত-ভঙ্গীর প্রতি গভীর আস্থা, কাহিনী-বিন্যাসের নানা লক্ষণ, বিবৃতি বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, উপন্যাসে নানা উপাদানের ব্যবহার, নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে গোটা জীবনকে প্রত্যক্ষ করার শিল্পরীতি (যা মূলত মহাকবির, উচ্চাঙ্গের নাট্যকারের), ভাষারীতি বিশিষ্টতা, শিল্পরীতির অনুগামী চরিত্রচিত্রণপদ্ধতি : এই সব সূত্রাকারে নিবদ্ধ করে সমালোচক বঙ্কিম-উপন্যাসের রূপরীতির চর্চায় অগ্রসর হয়েছেন। এবং কেবলমাত্র তার উপর নির্ভর করেই বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচার করেছেন। নিঃসন্দেহেই এই সমালোচনা-রীতি আধুনিক এবং তা সমালোচকের শিল্পবিচারসামর্থ্যের পরিচায়ক।

বঙ্কিমের প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষের আলোচনা বিধৃত এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে। সমালোচক স্পষ্ট করে বলেছেন, 'সামাজিক উপন্যাসের শিল্পরীতি রোমান্স থেকে পৃথক্ হবে, এরূপ বিশ্বাস নিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন। মানবপ্রবৃত্তির চিরন্তন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সমকালীন জীবন-প্রশ্নকে মেলানো এবং তারই জন্য কল্পনার বর্ণবস্তু অতীত থেকে পরিচিত ঘরসংসারের কাছাকাছি নেমে আসা দরকার এ বোধ তাঁর হয়েছিল। বিষবৃক্ষের শৈলী তাই কতকটা নতুন পথ ধরেছে।' ('বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি' : ১ম সং,পৃ ৯৫)

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের জীবনবোধ ও চরিত্রভাবনায় গভীরতার সঙ্গে জটিলতাও সমন্বিত। সেকারণে শিল্পরীতিও হয়ে উঠেছে সেই জটিল গভীরতার সার্থক দেহরূপ। —এটাই সমালোচকের প্রতিপাদ্য। এই অধ্যায়ে তিনি নানাভাবে তাকেই প্রতিপাদন করেছেন।

সমালোচকের ব্যবহৃত রীতিটি বাংলা উপন্যাস বিচারে নতুন। তাঁর বিচার থেকে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের যে-সব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, সেগুলি হচ্ছে—

ঘটনার বহুলতা ও চমৎকারিত্ব বঙ্কিমী রোমান্সের বৈশিষ্ট্য। বিষবৃক্ষ এই রোমান্সের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত নয়। তথাপি বিষবৃক্ষ মূলতঃ সামাজিক উপন্যাস বলে' ঘটনা নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় পূর্ববর্তী রোমান্সগুলির তুলনায় ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। স্বীকার্য, এই উপন্যাসেও বঙ্কিম ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যে মানব-সমস্যার কেন্দ্রে বৃত্তায়িত প্লট গঠনে যত্ন নিয়েছেন। শিল্পরীতির বিচারে একথা মানতে হয় যে রোমান্সে (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) হাত-পাকানো লেখক সামাজিক উপন্যাসে সুস্থির সাফল্যে পৌঁছেছেন।

এরপর সমালোচক বিষবৃক্ষের পরিচ্ছেদ-বিন্যাস আলোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন খণ্ডভাগের পরিকল্পনা না থাকায় এ উপন্যাসে অবিরাম গতির ভাগ প্রকাশ পেয়েছে। আরো দেখিয়েছেন, ত্রিভুজ-প্রণয়ে দুইয়ের অধিক পাত্রপাত্রীর মধ্যে অন্যোন্য সম্পর্ক স্থাপন বঙ্কিম-উপন্যাসে এই প্রথম। পরিচ্ছেদ-বিন্যাস কৌশল আলোচনার শেষে সমালোচকের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য—

"সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনের পারিবারিক আনন্দোচ্ছ্বাস মিলিয়ে যাবার আগেই কুন্দের বিষপানে আত্মহত্যার তীব্র ঘটনা। উত্তেজনার শৃঙ্গ থেকে উচ্চতর শৃঙ্গে লাফিয়ে উঠে মূল প্লট শেষ হল। কুন্দের বিষপানে মৃত্যুর পেছনে তার ব্যক্তিগত চরিত্রবৈশিষ্ট, তার প্রতি মুখ্যত নগেন্দ্র এবং গৌণত অপর পুরবাসীদের আচরণ ও মনোভাব, স্বপ্নদর্শন, হীরার প্ররোচনা ও বিষ যোগানো—প্রভৃতি বাইরের ও ভিতরের নানা কারণ জড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ আকস্মিক ঘটনাকে লেখক নিপুণভাবে নিশ্ছিদ্র ও অপরিহার্য করতে চেয়েছেন।" (তদেব, পৃঃ ১০৪)

প্লট-বিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে হীরা-দেবেন্দ্র উপকাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সমালোচক দেখিয়েছেন, সেইসঙ্গে উপকাহিনী হিসেবে এর প্রয়োগ-চাতুর্যের বিভিন্ন দিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেছেন। (তদেব, পৃঃ ১০৫)। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শিল্পরীতিতে স্বপ্নপ্রসঙ্গ, পত্র, গান, বর্ণনা : স্থানের ও গৃহের, নরনারীর রূপবর্ণনার বিশেষ স্থান সমালোচক বিচার করেছেন (পৃঃ ১০৬-১১৩)। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চরিত্রাঙ্কনের রোমান্স-রীতিগুলির ব্যবহার ঘটেছে, একথা বলেই সমালোচক ক্ষান্ত হন নি, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন—একথাটাও জোর দিয়ে বলেছেন। "চরিত্ররচনায় বিশ্লেষণরীতি প্রথম প্রতিষ্ঠা পেল বিষবৃক্ষেই।" (পৃঃ ১২৯)। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শিল্পরীতি উপন্যাসের জীবনবোধ ও চরিত্রভাবনার জটিলতা ও গভীরতার সার্থক দেহরূপ,—এটাই সমালোচক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। সন্দেহ নেই, বঙ্কিম-উপন্যাস-বিচারে এই দেখাটা নতুন।

১৮৭৪ খ্রীঃ থেকে ১৯৭৪ খ্রীঃ—এক শতাব্দীর বঙ্কিম-বিচার আমরা প্রদক্ষিণ করলাম।

এক শতাব্দীর বঙ্কিম-বিচার-প্রদক্ষিণকালে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নানা রূপ সমালোচকদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তা আমরা এ যাবৎ লক্ষ্য করেছি ; দেখেছি বঙ্কিম-উপন্যাস কেবল উৎকৃষ্ট সাহিত্য মাত্র নয়, তা বহুজনের চিত্তে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস উৎপাদনে সক্ষম।

এই শতাব্দী-প্রদক্ষিণ শেষে আমাদের স্বীকার করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয় নি। হয়ত আরো অনেক সমালোচক বঙ্কিম-উপন্যাসে নবতর সৌন্দর্য ও জীবন-তাৎপর্য আবিষ্কার করবেন।

আমাদের মনে হয়েছে সূর্যমুখীকে আরো একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে।

বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের ও বাংলাভাষার প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস আর সূর্যমুখী তার প্রথম সার্থক নায়িকা। সূর্যমুখীর আচার ব্যবহারে কথায় তার দ্যুতিশালিনী ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। বলা যেতে পারে, সূর্যমুখী বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়িকা যার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আর তা ব্যক্ত হয়েছে তার প্রতিবাদে, তার গৃহত্যাগে। এই গৃহত্যাগ প্রমাণ করেছে, সূর্যমুখী আধুনিক রমণী; যে সহস্রাব্দের পুরুষ-শাসন নতমস্তকে মেনে নেয়নি। কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর পত্র (পরিচ্ছেদ ২৫) ও সূর্যমুখীর নগেন্দ্র-কুন্দ বিবাহে উদ্যোগ (পরিচ্ছেদ ২৬) থেকে প্রতিবাদী সূর্যমুখীকে নগেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি চিনতে পারেন নি। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও (২৭ সংখ্যক) সূর্যমুখীর সঙ্গে কথালাপে কমলমণি সূর্যমুখীকে বুঝতে পারেননি। পূর্বের এক পরিচ্ছেদে (২১ সংখ্যক) নগেন্দ্রনাথও পারেননি, সূর্যমুখীর অন্তরকে ঠিকমত দেখতে পারেন নি। সেদিনই সূর্যমুখী কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহদানে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেদিনই এই বিবাহের পরে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত মনে মনে করেছিলেন। ২১ থেকে ২৭ পরিচ্ছেদে প্রতিবাদী সূর্যমুখীর চেহারা অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু এখানেই সূর্যমুখীর একক সাহসিক সিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছিল। কমলমণিকে লেখা আশীর্বাদ-পত্রে (পরিচ্ছেদ ২৮) সেই প্রতিবাদী সূর্যমুখীর আসল মনোভাব সংসারে সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে স্তম্ভিত হয়েছিল দত্তবাড়ির সকলেই। গৃহত্যাগ, একাকি পদব্রজে নিরুদ্দেশ যাত্রা, পথে ক্লেশভোগ, পীড়া, পীড়াশেষে আরোগ্যলাভের পর প্রতাপপুর থেকে পুনরায় গোবিন্দপুর অভিমুখে যাত্রা, নগেন্দ্রর প্রায়শ্চিত্ত-কাহিনী-শ্রবণের পরই দেখা দেওয়ার বাসনা, এবং দেখা দেওয়া (পরিচ্ছেদ ৪৫)—এইসব ঘটনার মধ্য থেকে প্রতিবাদিনী অনুরাগিণী সূর্যমুখীর দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়। আপন জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ সূর্যমুখী পাঠকের কাছে আধুনিকা নায়িকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বড়ো কম প্রাপ্তি নয়॥

সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিষয়ক যে-সমস্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন কিংবা যে-সমস্ত কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা প্রসঙ্গান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-তত্ত্বভাবনার পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনার কিছু কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথাও বলা হয়েছে। কারণ এই সব পদ্ধতিগুলির সাহিত্যের সঙ্গে যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। স্থূলভাবে সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাপক পরিধিতে সমালোচনাতত্ত্বেরও স্থান আছে। সাহিত্যতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই সমালোচনা-তত্ত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত বিশিষ্ট ধারণাই সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রগুলি নির্দেশ করে দেয়। একদিকে সাহিত্যতত্ত্ব ও অন্যদিকে ব্যবহারিক সমালোচনা অর্থাৎ কোনো লেখক বা তাঁর গ্রন্থ বা কীর্তি সম্পর্কিত আলোচনা আর তারই মধ্যবর্তী হল সমালোচনাতত্ত্ব—ব্যবহারিক সমালোচনার সূত্রাবলী। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetic গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে সমালোচকের কর্তব্য, দায়িত্ব ও কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁকে সচেতনতাও অবলম্বন করতে হয়, তাঁর সামনে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে ও তার সমাধান কী-ভাবেই বা করা দরকার সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা আমাদের দিতে চাননি, সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক নানা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে যখন যেটুকু বলা প্রয়োজন, তাই বলেছেন। সমালোচনার তত্ত্বকথা নিয়ে তাঁর আলোচনা আরও কম। সাহিত্যের তত্ত্বকথায় যেমন তাঁর প্রথমদিকের সকল বক্তব্যই পরবর্তীকালে তিনি নিজেই অবিকল গ্রহণ করেননি, তাঁর সমালোচনার সূত্রগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ সমালোচকই যাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব বা সমালোচনাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁদের নিজের ব্যবহারিক সমালোচনায় সেই আদর্শ ও সূত্রাবলী পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র 'সমালোচনা' বলতে অর্থাৎ সাহিত্য-সমালোচনা বলতে কী ধারণা পোষণ করতেন, সে কথা জানা দরকার। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় প্রাপ্ত গ্রন্থের প্রথম সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি সমালোচনা সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন, তা এইরূপ :—"আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় ওরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণ-দোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই

উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভ করিবেন তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহা বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা, এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।" (নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৭৯, পৃঃ ৩৩৬-৩৭)

এই বক্তব্য থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনা সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র স্পষ্টভাবেই আমরা পাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁর এ বক্তব্য পুরোপুরি সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়। গ্রন্থের বিষয় যাই হোক না কেন; সাধারণভাবে পুস্তক-সমালোচনার উদ্দেশ্য এতে ব্যক্ত হয়েছে। বোঝা গেল, তিনি গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনার পক্ষপাতী। গ্রন্থের গুণ-দোষের বিচারই আসল, গ্রন্থকারের নিন্দা বা প্রশংসা সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়। গ্রন্থ পাঠ ক'রে পাঠক যে সুখ-লাভ করবেন (অর্থাৎ তা যদি সাহিত্য-গ্রন্থ হয়) তাকে আরও স্পষ্ট করে তু'লে ঐ সুখকে বাড়িয়ে তোলা সমালোচকের কাজ। আর গ্রন্থ যদি জ্ঞান-বিষয়ক হয় তাও স্পষ্ট ক'রে তোলা বা তাকে বাড়িয়ে তোলাও সমালোচকের কাজ। এটি সমালোচকের প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকারের ভ্রম বা ত্রুটি সংশোধন করাও সমালোচকের দ্বিতীয় কর্তব্য। তৃতীয়তঃ কোনো গ্রন্থ যদি সাধারণের অনিষ্ট করতে পারে—এরূপ আশঙ্কা থাকলে সমালোচক তাও স্পষ্টভাবে বলবেন। আর সর্বোপরি গ্রন্থের গুণ বা দোষ বিচার করাই সমালোচনার অভিপ্রায়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা বলতে যে গ্রন্থের 'দোষ-গুণ' বিচারের কথা বলেছেন, তা অ্যারিস্টটলের বক্তব্যকেই স্মরণ করায়। তিনি রচনার গঠন বা রূপের পারিপাট্যের কথা বলেছেন। রূপের পারিপাট্য এবং তার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার চিত্তে উদ্রিক্ত ঈপ্সিত ভাবের যাথাযথ্যের ওপর রচনার গুণ নির্ভর করে। এই দোষ-গুণ বিচার করতে গেলেই সূত্রের আলোকেই তা করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে এই দোষ-গুণের ব্যাখ্যা বা আলোচনা করেননি বটে, কিন্তু তাঁর উক্তি যে Judicial Criticism-এর কথাই বলছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই—এই সমালোচনা..."Proceeds upon the hypothesis that there are 'fixed standards' by which literature may be tried and adjudged."

গ্রন্থপাঠ ক'রে পাঠকের সুখ বা আনন্দকে আস্বাদন করার ব্যাপারে সহায়তার কথা—যা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তা রোম্যান্টিক সমালোচকের মন নিয়েই। ওই শ্রেণীর সমালোচক সাহিত্যের রস আস্বাদনের মধ্য দিয়ে আনন্দলাভের কথাই বলেন। আমাদের ভারতীয় আলংকারিকদের রস আস্বাদনও এই শ্রেণীভুক্ত। সাহিত্যপাঠে জ্ঞানলাভের কথা যা বঙ্কিম-চন্দ্র বলেছেন, মনে হয় তা সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কে নয়; কারণ তিনি 'বঙ্গদর্শন'এ এমন অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন যার বিষয় সাহিত্য নয়। অবশ্য ক্রোচে জ্ঞানকে নৈয়ায়িক ও স্বতঃ-জ্ঞান (Intuitive) ব'লে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে সাহিত্য-সৃষ্টিতে স্বতোজ্ঞানের ভূমিকাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইংরেজ কবি কীট্স সাহিত্যকে এক অপূর্ব জ্ঞানযোগ বলেছেন সৌন্দর্য ও সত্যের অবিনাবদ্ধভাবের কথা বলতে গিয়ে। এঁরাও রোম্যান্টিকপন্থী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই জ্ঞানের কথা বলেছেন বলে মনে করি না।

লেখকের ভ্রান্তি বা ত্রুটি থাকলে সমালোচককে তা সংশোধন করার কথা যে বঙ্কিম বলেছেন, তাও কিছু নূতন কথা নয়। অ্যারিস্টটলও কী কী কারণে সমালোচক রচনার নিন্দে করে থাকেন, তা'র একটি তালিকা দিয়েছেন। রচনা যখন অসম্ভব (impossible), অবিশ্বাস্য (irrational), নীতিবিরুদ্ধ (morally hurtful), স্বতোবিরুদ্ধ (contradictory) ও অসঙ্গত (contradictory to artistic correctness) হয়, তখন তা দোষের। এই দোষ কখনো শিল্পের আত্মাকে স্পর্শ করে; কখনো তা করে না—প্রথমটি মারাত্মক, দ্বিতীয়টি কিন্তু তা নয়। এও ক্লাসিকপন্থী সমালোচকদের সূত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভ্রান্তি নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। তিনি ভ্রান্তি থাকলে সমালোচক কর্তৃক তার সংশোধনের কথা বলেছেন।

সর্বশেষে তিনি অনিষ্টকর গ্রন্থের অনিষ্টকারিতাকে তুলে ধরার দায়িত্ব যে সমালোচকের একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল morally hurtful ব'লে কোনো রচনা যে নিন্দনীয় হতে পারে তার ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু তিনিও বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। এখানেই নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মনটিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সাহিত্য-শিল্পে যাঁরা উদ্দেশ্যবাদী তাঁদের সমালোচনায় এই নীতির দিকটি বড় হয়ে উঠবেই; মানুষের কল্যাণ-পরিপন্থী হলেই এই শ্রেণীর সমালোচক সেই রচনাকে দুষ্ট বলবেনই।

'বঙ্গদর্শন'এ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-তত্ত্ব সম্পর্কিত এই সামান্য বক্তব্য থেকে তাঁর এ-বিষয়ক ধারণাকে যেটুকু বোঝা যায়, তা আমরা বিশ্লেষণ করলাম। এইখানে তিনি সমালোচকের কর্তব্যের তালিকা দিতে গিয়ে জ্ঞান ও নীতির কথা যাই বলুন না কেন (জ্ঞান যদি সংকীর্ণ অর্থে লেখকের গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞান হয়) নিজের ব্যবহারিক সমালোচনায় অগ্রসর হয়ে এ দুই বিষয় নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখিনি।

ব্যবহারিক সমালোচনায় অগ্রসর হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। প্রসঙ্গান্তরে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ বা পুস্তক সমালোচনা কিরূপ তা লক্ষ্য করা যাক।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত পুস্তকসমালোচনার মূল্যায়ন করছি, সেগুলি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে একত্রে এদের পাওয়া যাবে। প্রথমেই **'Three years in Europe'** গ্রন্থটির কথা। এদেশের কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে গমন ক'রে সেখানে তিন বৎসর অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি নানা সময়ে ভ্রাতাকে যে সকল পত্র লিখতেন তারই কিয়দংশ সংগৃহীত হয়ে এই পুস্তক। পুস্তকটির পত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় হলেও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় এগুলির সমালোচনা করেছিলেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইংরেজের চোখে ইংলণ্ড নয়, বাঙালীর চোখে ইংলণ্ডের চিত্র দেখার একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। মসিয়ে তাইনের লেখা 'ইংলণ্ডের বিবরণ' গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান ও স্বতন্ত্র। কারণ তা' ফরাসীর চোখে ইংলণ্ড। সুতরাং বাঙালীর চোখে দেখা এই-গ্রন্থের বিবরণেও স্বাতন্ত্র্য আছে ব'লেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। এই প্রশংসার পরই

তিনি বলেছেন যে লেখক ইউরোপকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেছেন ; ইংলণ্ডের জন কয়েক ব্যক্তি পাঁচ হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসে এদেশে প্রত্যহ বিস্ময়কর কাজ ক'রে চলেছেন। সেই সমস্ত লোকেদের স্বদেশ যে আমাদের কাছে প্রশংসনীয় হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদেশে গেলে সেখানকার সকল বিষয় ভালো লাগে না—সেগুলি শোনবার কৌতূহল এ গ্রন্থে মিটায় না। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের কোনো কিছুই প্রশংসনীয় নয় —একথা বঙ্কিমচন্দ্র বারংবার শুনেছেন। কিন্তু আমাদের বা আমাদের দেশের কোনো প্রশংসনীয় কিছু আছে কিনা তা শোনার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থের লেখক ইংরেজপ্রিয় বা স্বদেশদ্বেষী নন—কিন্তু এ গ্রন্থ স্বদেশবৎসল ইংরেজবাসীকে দেশভক্তিতে উদ্বোধিত করে না। অবশ্য এ পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তিনি ভ্রাতাকে প্রবাস থেকে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় তিনি স্বদেশবৎসল।

এ গ্রন্থের রচনা-চাতুর্য বা বিষয়ঘটিত পারিপাট্য লক্ষ্য করার নয়, কারণ সাধারণ্যে প্রকাশের জন্যে প্রথমে এটি লিখিত হয়নি। ভ্রাতার সঙ্গে সরল কথোপকথনের অভিপ্রায়ে পত্রগুলি লিখিত। "অতএব সমালোচক যে সকল দোষ-গুণের সন্ধান করেন, ইহাতে তাহার সন্ধান কর্তব্য নহে।" তথাপি সে সন্ধান করলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এতে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই বেশী লক্ষ্য করা যাবে। এর ভাষা সরল, আড়ম্বরশূন্য, ভাবও তাই। এরই সঙ্গে বলা যায় হৃদয়ও সরল ও অনাড়ম্বর। লেখক সর্বত্র গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল এবং সুপ্রসন্ন। তার রুচি সুন্দর বুদ্ধি মার্জিত এবং বিচার-ক্ষমতা অনিন্দনীয়। লেখকের চিত্র সমালোচনায় রসানুভাবকতা ও সহৃদয়তার চমৎকার নিদর্শন আছে। লেখকের রসগ্রাহিকা শক্তি স্বভাবজাত। যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য দেখেছেন, তার রস পরিবেশনে তিনি দ্বিধা করেননি। লেখক মাঝে মাঝে ইংরেজিতে যে সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলির সমালোচক প্রশংসা করতে চান না—কারণ বাঙালী হয়ে ইংরেজিতে কবিতা লেখার তিনি বিরোধী। পরিশেষে সমালোচক বইটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছেন—বিশেষ ক'রে বাঙালী মেয়েদের স্বার্থে। দেখা গেল, এ গ্রন্থের ভাল-মন্দ (merits and demerits) দুই এর দিকেই সমলোচক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখকের চিত্রাঙ্কনী শক্তি, বর্ণনাশক্তি এবং রস-গ্রহণের ক্ষমতার তিনি প্রশংসাই করেছেন। সমালোচকের গভীর দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রেম, ও বাঙালী লেখকের ইংরেজি কবিতা লেখার প্রতি বিরূপতা—একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব প্রবণতা। সমালোচ্য গ্রন্থে এই দুইটি দাবী পরিতৃপ্ত হয় না ব'লে তিনি মৃদুভাবে লেখকের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার কথা ব'লে তার ইষ্ট কবিতার কথাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। মোটকথা 'বঙ্গদর্শন' এ সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এখানে বহুলাংশেই তিনি মেনে চলেছেন।

রাজনারায়ণ বসুর লেখা **'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'** গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন সেখানেও তাঁর অপক্ষপাত দৃষ্টিতে এর ভাল-মন্দ দুই দিক বিচারের প্রতিশ্রুতি আছে। গ্রন্থটি ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্ম যে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ—একথা প্রতিপন্ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লেখক ব্রহ্মোপাসনাকেই বলেছেন হিন্দুধর্ম এবং তারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন এই

পুস্তিকায়—এদেশের সাধারণ ধর্মের তিনি কোনো প্রশংসা করেন নি। "পরব্রহ্মের উপাসনা সকল ধর্মেরই সারভাগ—সকল ধর্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং এ-বিষয়ে কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু তিনি যে ধর্মের উল্লেখ করেছেন, তা হিন্দুধর্মের একাংশ মাত্র। তিনি যে অংশকে নিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, তেমনি এর অপর অংশকে নিয়ে তাঁর মতের খণ্ডনও করা কিছু কঠিন নয়। এইভাবে এ পুস্তিকার সমালোচনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রশংসনীয় দিকের কথায় বলেছেন, এই প্রবন্ধের রচনাবলী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতিসুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়া দেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য সমাধা করিয়াছেন।" এটি অবশ্য ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়। তথাপি রচনার গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি এর ভাব ও ভাষার প্রশংসা করেছেন এবং এ রচনা অবান্তর বিষয়-ভারে পীড়িত নয় সে কথাও জানিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষভাগে 'সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ' ও সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করেছে। লেখকের দেশপ্রীতি সমালোচককে পরিতৃপ্ত করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'কিঞ্চিৎ জলযোগ'** ফার্সটির আলোচনা যথার্থই সাহিত্য-সমালোচনা। অসাধারণ ধীশক্তি বলে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ফল কাজ ও সফল কাজের মধ্যে কোন্‌গুলি ব্যঙ্গের যোগ্য ও কোন্‌গুলি নয়, তা যেমন দেখিয়ে দিয়েছেন, তেমনি মনের ভাবগুলি সম্পর্কেও এ ইঙ্গিত করেছেন। তারপর নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসঙ্গত কার্য ও ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি চরিত্র নিয়ে ব্যঙ্গের যৌক্তিকতার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেকালের বাঙলা প্রহসনের অশ্লীলতায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই তুলনায় এ নাটিকা যে আদ্যোপান্ত পাঠ করা যায় বা অভিনয় দর্শনে প্রীত হওয়া যায়—সেকথা জানিয়ে বাংলা সাহিত্যের সেই কাল পর্যন্ত তিনখানি শ্রেষ্ঠ ফার্সের মধ্যে তিনি এটিকে স্থান দিয়েছেন। দু'একটি স্থলে বিশেষ ক'রে এর ভাষার তিনি দোষ লক্ষ্য করেও তাকে বড় ক'রে দেখেননি। পরবর্তী বাংলা সমালোচনায় বঙ্কিমের এই মতই গৃহীত হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'কল্পতরু'** গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'কাব্যের বিষয় মনুষ্য চরিত্র'। গদ্যে লিখিত উপন্যাসকে তিনি এখানে কাব্যেই বলতে চান। এই মনুষ্য চরিত্র একদিকে স্বার্থপর অন্যদিকে পরোপকারী। একই মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা এবং পরোপকারবৃত্তি দুইই আছে। কারো মধ্যে কোনো একটি বৃত্তির প্রাবল্য, কিন্তু কেউই একটি মাত্র বৃত্তিতে সম্পূর্ণ নয়। তাই মানুষ পশুবৃত্ত ও দেবতুল্য। দ্বিপ্রাকৃতিক মানুষের দুটি ভাগই সম্পূর্ণ কাব্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন কোন কবি একটিমাত্র ভাগকে গ্রহণ করেন। যাঁরা মানুষের মহদংশ গ্রহণ ক'রে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভিক্টর হুগোর নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁরা অসদ্ভাব গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সকলেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের লেখক, যেমন সর্ বন্টিস। এঁদের সকলেরই কাব্য বঙ্কিমের মতে অসম্পূর্ণ। এই রহস্য-লেখকদের মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম পেঁচার লেখকের পরই তৃতীয় জনের নাম করতে গেলে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কল্পতরু'র লেখক ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অপর দুই লেখকের তুলনা করেছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের দূরদর্শিতায় এবং লিপিচাতুর্যে ইন্দ্রনাথ টেঁকচাঁদ ও হুতোমের সমকক্ষ। হুতোম ক্ষমতাশালী হলেও পরনিন্দক ও সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির বিরোধী। অপরপক্ষে ইন্দ্রনাথ পরদুঃখে কাতর, সুনীতির পরিপোষক এবং সুরুচির পক্ষভুক্ত। আবার তাঁর লিপিকৌশল 'আলালের ঘরে দুলাল'এ নেই। তাঁর গ্রন্থের রঙ্গদর্শনপ্রিয়তা ও বক্রদৃষ্টি দুজনের কারো গ্রন্থে নেই। "দীনবন্ধু মিত্রের মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না। হুতোমের মত 'বেলেল্লাগিরি'তে প্রবৃত্ত হয়েন না। কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে। মধুর সর্বদা সহনীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।" এ গ্রন্থ সমালোচকের কথায় সম্পূর্ণ নয়। যিনি মানুষের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখতে চান, তিনি এ গ্রন্থে তা যথেষ্ট পাবেন। তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্বোধ, ভণ্ড ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবক হল এ গ্রন্থের নরেন্দ্রনাথ। শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী চালাকদাস হল রামদাস। সাহেবদের তোষামোদকারী বন্যজন্তুদের প্রতিনিধি হল কালীনাথ ধর—'ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া। গণেশচন্দ্র গায়েনের চূড়া'। এই সমস্ত চরিত্র-চিত্র প্রকৃতিমূলক হলেও তাদের কার্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন আছে।

মানুষ অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ নয়। ভালয়-মন্দয় মানুষের চরিত্র। মানব-চরিত্র সম্পর্কে এই উক্তি মনস্তত্ত্বসম্মত এবং অতিশয় যথার্থ। তথাপি কোনো কোনো লেখক মনুষ্য-চরিত্রের সদ্‌গুণগুলিকেই দেখতে চান আবার কেউ কেউ চান অসদ্‌গুণগুলিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির পশ্চাতে অ্যারিষ্টটলের ট্রাজেডি রচনায় 'higher type' এর মানুষ এবং কমেডিতে 'Lower type'-এর মানুষের অনুকরণের কথা'র সংস্কার থাকা সম্ভব। তবে তিনি যে এই উভয় শ্রেণীর কার্যকে অসম্পূর্ণ বলতে চান—এটি তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। ট্রাজেডির নায়ক পুরোপুরি সদগুণে ভূষিত নন, তাঁর মধ্যেও দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকে তিনি অতিশয় সজ্জন বা দুর্জন নন। তবুও ট্রাজেডি কাব্য সম্পূর্ণ কাব্য, কিন্তু কমেডি কাব্যই হল অসম্পূর্ণ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কমেডিকে অসম্পূর্ণ কাব্য বলা কি ঠিক? সেখানে সব চরিত্রই কি দুর্জন বা অসৎ? তাই এই 'অসম্পূর্ণ' শব্দটি খুব সতর্কতার সঙ্গেই কাব্য সমালোচনায় প্রয়োগ করা উচিত। রঙ্গব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যে অসম্পূর্ণ কাব্য বলতে চান, তার মূল কারণ এ-সাহিত্য মানবজীবনের সমগ্র ও সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করে না। কিন্তু জীবনের খণ্ড-চিত্রের মধ্য দিয়েও শ্রেষ্ঠ কমিডি বা ক্লাসিক্যাল কমেডি তার মূল্যকে হারায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে উদ্ভট নাটক রচয়িতাদের মনোভাবই যেন উঁকি দিয়েছে এক হিসাবে। তাঁরা বলেন জীবনে ট্রাজেডি ও কমেডি দুইই আছে—সুতরাং একই নাটকে দুই ভাবের মিশ্রণ থাকবেই যদি তাকে সম্পূর্ণতা দান করতে হয়।

বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮০ তে **'মানস-বিকাশ'** নাম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি গীতি-কাব্যের যে সমালোচনা করেছিলেন, পরে তাঁর সেই আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ **'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'** নামে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি পুস্তক-সমালোচনা হলেও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ যে ভাবে স্থান পেয়েছে, তাতে এটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি জয়দেবকে বাংলা

সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট গীতি কবি ব'লে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবির নামোল্লেখ করেছেন—এঁরা হলেন, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাসাদি। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'ও উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। রামপ্রসাদ সেন, কবিওলাদের মধ্যে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও গীতি কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ। 'মানস বিকাশ'কেও তিনি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য-গ্রন্থ বলে মনে করেন।

পরের অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের একটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করেন 'সাহিত্যও নিয়মের ফল।...সাহিত্যও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।...সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব।' ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচক তেইনের 'race, milieu and the moment' জাতি, পরিবেশ এবং যুগ এই তিনের দ্বারা সাহিত্য প্রভাবিত হয়, সৃষ্ট হয়—এই মতবাদের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমের ঐ উক্তিতে। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ে পাশ্চাত্যে কেউ কেউ আলোচনা করলেও আমাদের দেশে এ-তত্ত্ব নিয়ে কেউ তখনো পর্যন্ত আলোচনা করেন নি। 'সাহিত্য যে দেশের অবস্থাও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব' —এই সূত্র মনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র 'রামায়ণ' সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। আর্যরা তখন অনার্যদের বীরবিক্রমে পরাস্ত করছেন, তারা বিবাদে ব্যস্ত, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী-বীর জাতি। এই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষ তাদের করায়ত্ত হয়েছে। মহাসমৃদ্ধিশালী এই দেশের সম্পদ প্রচুর। বাইরের কোনো শত্রু আর নেই। এর আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে তখন আর্যেরা ব্যস্ত। হস্তগতা সমস্ত রত্নশালিনী দেশকে কে ভোগ করবে—এই নিয়ে তাই ধীরে ধীরে দেখা দিল আভ্যন্তরীণ বিরোধ। আর্যদের পৌরুষের চরম বিকাশ-কালেই এই বিরোধ। আর এরই ফল মহাভারত-কাব্য। বল যায় ভারত তারই করায়ত্ত হল। বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হল। উন্নতপ্রকৃতির আর্যেরা দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে শান্তি-সুখে মন দিলেন। রোম, যবদ্বীপ ও চীন পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্য-তরণী ছুটতে লাগল। নতুন নতুন নগরী নদীকূলে গড়ে উঠতে লাগল। সুখী ও কৃতী এই ভারতীয়দের চিত্র কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী সর্বদা চিরচঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হল, সাহিত্য-রসগ্রাহিণী শক্তিও ঐ ধর্মশৃঙ্খলের বশীভূতা হল। সাহিত্য ও ধর্মানুসারিণী হল। বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হল—প্রকৃতকে ত্যাগ করে অপ্রকৃতের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিল। ধর্মই হল তৃষ্ণা, আলোচনা ও সাহিত্যের বিষয়। আর এরই ফল পুরাণ। অতিশয় সংক্ষিপ্ত হলেও সূত্র-অনুযায়ী এ বিশ্লেষণ যথার্থ। এই সূত্রেরই আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার গীতিকাব্যের উদ্ভব ও তার বাহুল্যের কারণ নির্দেশ করেছেন। পুরাণ-কাব্য রচনার পরের যুগে ভারতবর্ষীয়েরা শেষে এমন একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলে, যেখানকার জলবায়ুর গুণে তাদের স্বাভাবিক তেজ বিনষ্ট হতে লাগল। এখানকার তাপ অসহ্য। বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ। ভূমি নিম্ন ও উর্বর এবং সেখানে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাকে প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করলে বলহানি ঘটে। আর্যতেজঃ এখানে এসে অন্তর্হিত হল—তার প্রকৃতি হয়ে উঠল কোমল, উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট এবং গৃহ-পরায়ণ স্বভাব তার দেখা দিল।

এই অঞ্চলই হল আমাদের বঙ্গভূমি এবং এখানে এক বিচিত্র ধরণের গীতিকাব্য সৃষ্ট হতে থাকল। আর এ গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত ও গৃহসুখপরায়ণ। জাতি-চরিত্র-অনুযায়ী এই সাহিত্যই আর সকলকে পশ্চাতে ফেলে বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই কারণেই এদেশে গীতিকবিতার এতো বাহুল্য।

অতঃপর সমালোচনায় অগ্রসর হয়ে তিনি বাংলার গীতিকাব্য লেখকদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—একদল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত ক'রে তার প্রতি দৃষ্টি করেন, অন্যদল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রেখে মনুষ্যহৃদয়ের দিকেই অধিক দৃষ্টি দেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান হল জয়দেব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির কাব্যের বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—একথা ঠিক নয়—তবে বাহ্যপ্রকৃতির অস্পষ্ট কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবের প্রাধান্য সেখানে। তাই "জয়দেবাদিতে বহিঃ প্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃ প্রকৃতির রাজ্য।" জয়দেবের কবিতায় মাধবী যামিনী, মলয় সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী; কোকিল কূজিত কুঞ্জ, নবজলধর ইত্যাদির প্রাধান্য। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা জয়দেব ও বিদ্যাপতি দুজনেরই উপজীব্য। কিন্তু জয়দেবের প্রণয় গীত বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী, বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের উর্ধে। ইনি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃ প্রকৃতি ছাড়া করে কেবল তার প্রতি দৃষ্টি দেন। তাই তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য; বিলাসশূন্য ও পবিত্র। কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতির শক্তির প্রভাবে জয়দেবে একটু ইন্দ্রিয়-আধিক্য। "স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে।" দুই কবির পার্থক্য এর পরে কবিজনোচিত দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবে করেছেন—"বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।…জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা।" সমালোচক জানিয়েছেন যে তিনি জয়দেব সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা ভারতচন্দ্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য এবং বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবি সম্পর্কে প্রযোজ্য।

গীতিকাব্য লেখকদের বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, এঁরা হলেন আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদের অনুগামী। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে এঁদের এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। পূর্বোক্ত কবিরা নিজেকে ও নিজের নিকটবর্তী সমস্ত কিছুতেই ভালোভাবে জানতেন। কিন্তু বর্তমান কালের কবিরা জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি। তাঁরা বহু বিষয় জানেন বলে তাঁদের কবিতাও বহু বিষয়িণী। তাঁদের কাব্যের বিস্তৃতিগুণ অনেক বেশী। কিন্তু এই কারণেই এদের কবিতায় গভীরতাও কম পূর্বোক্ত কবিদের অন্ততঃ বিদ্যাপতি শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে তুলনায়। বিদ্যাপতির গভীরতা মধুসূদন বা হেমচন্দ্রে লক্ষণীয় নয়। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তি হ্রাস পায়—এও তার একটি কারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণে আধুনিক গীতিকবিদের কাব্যের বিস্তৃতিগুণ যে ধরা পড়েছে তা খুবই যথার্থ, কিন্তু তাই বলে সকল কবির এমন কি শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের গভীরতা হ্রাস পাবে—এ উক্তি তত্ত্বের দিক থেকে সত্য হলেও কার্যতঃ শ্রেষ্ঠ কবির ক্ষেত্রে সব সময় লক্ষিত হয় না। তাছাড়া প্রাচীন বিদ্যাপতি গোত্রের সকল কবিরই গভীরতা

আধুনিককালের সকল কবির গভীরতা চেয়ে বেশী—এ কথাও মানা যায় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাসের কথা মেকলে প্রমুখ পাশ্চাত্যের কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এ মতও বিতর্কিত।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তা অত্যন্ত চিন্তাগর্ভ। তিনি বলেছেন যে একের মধ্যে আর একটির প্রতিবিম্ব পতিত হয়। "অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়াসহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য গীতিকবির সৃষ্টি-ক্রিয়ারই একটি গূঢ়তত্ত্ব। বাইরের প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবন দুইই কাব্যের বিষয়। একদল কবি বাইরের প্রকৃতিকে দীপ ক'রে তারই আলোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত ও প্রস্ফুট করেন—এঁদের কাব্যেও মনুষ্য জীবন বা অন্তঃপ্রকৃতির ছায়া পড়ে, কিন্তু তা প্রধান নয় এবং খুব পরিস্ফুটও নয়। অন্যদল স্বীয় প্রতিভাতেই সব কিছুতেই উজ্জ্বল করে তোলেন মনুষ্য-চরিত্রের খনিতে যে বস্তু মেলে তার জন্যে অন্য দীপের প্রয়োজন নেই। এদের কাব্যেও বহিঃপ্রকৃতির ছায়া পড়ে কিন্তু তা প্রধান নয় এবং খুব পরিস্ফুটও নয়। কাব্যসৃজনের এই সূত্র যিনি মান্য না করেন, তাঁর কাব্যে হয় ইন্দ্রিয়পরতা নইলে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। অর্থাৎ ছায়াসমেত বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে যিনি পরিস্ফুট করতে পারেন তাঁর কাব্য দোষহীন।

এখানে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই তিনি ইন্দ্রিয়পরতা বলেন নি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তিই ইন্দ্রিয়পরতা। "ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ পোপ ও জনসন।" বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে যে-দোষের কথা বলেছেন এবং যেভাবে কালিদাস ও জয়দেবকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন, তাতে মনে হয়, তাঁর শ্রেণীবিভাগের ব্যাপকতা দেখানোর জন্যেই। নইলে জয়দেবের দোষ ও কালিদাসের দোষকে একই প্রকার মনে করা যায় কি? ভারতচন্দ্রাদি কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ ক'রে কাব্য লিখেছেন ব'লে তাঁদেরই কাব্য ইন্দ্রিয়পর। তারপরেই তিনি বলেছেন "কোন মূর্খ না মনে করেন যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্বাচন হইতেছে মাত্র"। শ্রেণী নির্বাচনের জন্যই যদি তিনি এ সব কথা বলে থাকেন তাহলে সুকবির উদ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয়পরতা ও আধ্যাত্মিকতা-দোষের উল্লেখ করলেন কেন? আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি যেমন পোপ-জনসনের কথা বলেছেন তেমনি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থেরও নাম করেছেন। দোষের স্বরূপ ও মাত্রা ঠিক না হলে শ্রেণীর দিক থেকে এই তিন কবি কবি-শক্তিকে অভিন্ন হয়ে যান। কিন্তু তিনের এই অভিন্নতা কি স্বীকার্য? তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উক্তিরও সমালোচনা করতে হয়। তিনি লিখেছেন, "যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্পর্কে বেশী খাটে, বিদ্যাপতির সম্বন্ধে তত খাটে না।" তাই যদি হয়, তাহলে বিদ্যাপতিকে একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরূপে নির্বাচন না ক'রে গোবিন্দদাস বা

চণ্ডীদাসকেই তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। মোটকথা অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির বিশেষ একটি আনুপাতিক সমন্বয়েই যে কাব্য সৃষ্ট হয় একথা পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা যেমন, আমাদের দেশের আলংকারিকেরাও তা বলেছেন। এ-উক্তি সর্বজনগ্রাহ্যই বটে। বঙ্কিমচন্দ্র এই একই বক্তব্য নিজস্ব চিন্তার আলোকে আরো একটু সহজগ্রাহ্য করে বলেছেন। গীতিকাব্যের শ্রেণীবিভাগ তিনি যা করেছেন স্থূলভাবে তাও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই শ্রেণীতে নানা কবিকে তিনি যে-ভাবে অন্তর্গত করেছেন, তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবাদ-স্পৃহা উদ্রিক্ত করে। আর একটি কথা। প্রবন্ধের আসল নাম 'মানস বিকাশ'। এই কাব্যের আধ্যাত্মিকতা-দোষ প্রতিপাদনই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর এই প্রবন্ধে সেই অংশ বর্জন করা হয়েছে। সেইজন্যই এর নাম পরিবর্তন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনার মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যেরও সামান্য আলোচনা আছে। এত ক্ষুদ্র আলোচনায় আমাদের মন ভরে না।—বিশেষত 'বৃত্রসংহারে'র মতো সে-কালের একটি প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের। বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য হিসেবে এ-কাব্যের বিচার করেন নি। এর কাহিনী অংশের সামান্য উল্লেখ ক'রে তিনটি সর্গ সম্পর্কে অল্প কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন ও প্রশংসনীয় কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর এই অতি ক্ষুদ্র আলোচনাতেও তুলনামূলক সমালোচনার মনোবৃত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। মিল্টনের Paradise Lost মহাকাব্যের প্যাণ্ডিমোনিয়ামে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের ছায়ায় হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' এর প্রথম সর্গ সূচিত হলেও তাঁর মৌলিকতা যে ক্ষুণ্ণ হয়নি একথা তিনি জানিয়েছেন। 'নিবিড়ধূম্রল ঘোর' পাতালপুরীর মধ্যে দীপ্তিশূন্য দেবতাদের দীপ্তিশূন্য সভা বর্ণনায় কবির কৃতিত্বকে তিনি স্মরণ করেছেন এবং একটি 'ভয়ঙ্কর শ্লোক' এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরও তিনটি প্রশংসনীয় শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তিনি বলেছেন, "এ সর্গে অনেকস্থানে আশ্চর্য কবিত্ব-প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদের অবসর নাই।" প্রথম সর্গে বীর ও রৌদ্র রসের তরঙ্গ তু'লে কুশলময় কবি দ্বিতীয় সর্গে সেই ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করেছেন। নন্দন বনে বৃত্রমহিষী সুখময়ী ঐন্দ্রিলার চিত্র অঙ্কন করে এক মাধুর্যময়ী সৃষ্টি কবি যে সম্প্রসারিত করেছেন সেকথা তিনি জানিয়েছেন। ঐন্দ্রিলা এমন সুখে থেকেও শান্তি পাচ্ছেন না কিন্তু—শচীকে দাসী ক'রে না আনলেই নয়। বৃত্রাসুর স্ত্রীর কথায় সম্মত হলেন। এই কথোপকথনের দোষ বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। এই কথোপকথনে মনে হয় যেন 'বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ' চলছে। তৃতীয় সর্গে বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করছেন -

" নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,

পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—"

এখানে হেমচন্দ্র 'পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ' বলে যা ব্যক্ত করেছেন তা বঙ্কিমের মতে "প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্যের মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে। কিন্তু এই মহাকাব্যের ত্রুটি বা দোষের দিকটি সমালোচক একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। বৃত্রসংহার কাব্য সম্পর্কে আরো একটুখানি নিরপেক্ষ হলেই বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সমালোচনার মূল্য বৃদ্ধি পেত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' দুই খণ্ড প্রকাশিত করলে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' এ 'কৃষ্ণচরিত্র' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি নানা কারণেই মূল্যবান। পরবর্তী সময়ে তিনি যে অতিশয়-প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থ রচনা করেন, এই প্রবন্ধই তার মূল প্রেরণা। তাছাড়া এই প্রবন্ধে তিনি মহাভারতের কৃষ্ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের কৃষ্ণ, জয়দেবের কৃষ্ণ এবং বিদ্যাপতির কৃষ্ণ-চরিত্রের পার্থক্যের আলোচনায় যা বলেছেন এবং বিভিন্ন যুগের কৃষ্ণকে যে-দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তেইনের সাহিত্য-বিচারের সূত্রকে অবলম্বন ক'রেও তিনি যে-মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন এখানেও সেই মৌলিকতা লক্ষণীয়। সেখানে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ দেশের কোন্ অবস্থায় সৃষ্ট এবং তার মধ্যে যে জাতির জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব আছে বলেছিলেন এখানে তা আরো একটু বিস্তৃত ভাবে বলেছেন এবং বিশেষ ক'রে তেইনের সময় (time) বা যুগের দিক থেকে কৃষ্ণ-চরিত্রকে বিচার করেছেন।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের বক্তব্যের পুনরুক্তি ক'রে বলেছেন, "... যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্য ও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে-অবস্থার নয়। আবার মহাভারত যে-অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সেই অবস্থার নয়। বাংলার গীতিকাব্য বাঙালী সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল।

তারপরেই তিনি বলেছেন বিদ্যাপতি ও তৎপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের গানের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধা। আধুনিক বাঙালীদের কাছে এদের গীত অরুচিকর; কারণ এ নায়িকা কুমারী নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নয়, অন্যের পত্নী। তাছাড়া এ সব কবিতা অনেক সময় অশ্লীল ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকর। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এঁদের ধারণা অত্যন্ত অসমীচীন। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যাই সঠিক হত, তাহলে এদেশে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণচর্চা এতকাল স্থায়ী হত না।

কৃষ্ণচরিত্রের আদি মহাভারতে। তারপর শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং তারও পরে জয়দেবে ও বিদ্যাপতিতে। চার গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে 'ঐশিক অবতার' বলে মনে করেছেন। কিন্তু চারজনের ঐশিক অবতারের চিত্র একইরূপ নয়। প্রভেদ আছে। কিন্তু এ-প্রভেদের কারণ কি? এর সঙ্গে সামাজিক অবস্থার কোনো সম্পর্ক আছে কি? অবশ্য প্রভেদ থাকলেই তা যে সামাজিক অবস্থা ভেদের ফল আর কিছু নয় এমন মনে করা ঠিক নয়। "কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লেখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ...অতএব কাব্যবৈচিত্র্যের কারণ তিনটি—জাতীয়তা, সাময়িকতা ও স্বাতন্ত্র্য।" চারজন কবির গীত কৃষ্ণচরিত্রে এই তিন প্রকার প্রভেদের কারণই নিহিত আছে। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের দিকটি আলোচনা না ক'রে সাময়িকতার দিক থেকে বা কালের দিক থেকে এই চার কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ তা আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন যে দ্বাপর যুগের কাব্য হল মহাভারত। এই সময় আর্যেরা বাইরের শত্রুভয় থেকে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি-সম্পাদনে সচেষ্ট, অনন্তরত্নের আকর ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যা সকলে জয় করেছে, তা কে ভোগ করবে? -এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। এই দ্বাপরে যে হলাহলের বীজ উপ্ত হয়েছিল তাই দু' হাজার পরে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের বিবাদে লক্ষ্য করা গেছে এবং তার ফল উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলস্থ। মহাভারতীয় কালের সমাজে সমরবিজয়ী বীর ও রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রী—এই দুই শ্রেণীর লোক প্রাধান্য লাভ করেন। মহাভারতেও অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্তি। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র সংসারে অতুলনীয়। যে ব্রজলীলা জয়দেব বিদ্যাপতি ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের একমাত্র অবলম্বন এখানে তার সূচনাও সেই। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ, সাম্রাজ্য গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য—সেইজন্যই ঈশ্বরাবতার ব'লে কল্পিত। উচ্চতর মানসিক বলে তিনি বলীয়ান। মহাভারতের সকল ঘটনার মূল গ্রন্থিরজ্জু এঁরই হাতে। ভারতবর্ষের ঐক্যই তাঁর লক্ষ্য। দেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। লোকের রক্ষা, শান্তি ও উন্নতিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বিলাসপ্রিয়তার বা গোপবালকের চিহ্নমাত্র তাঁর চরিত্রে নেই।

এরপর দর্শনশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনায় আর্যেরা আর সন্তুষ্ট নন। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ নিয়ে গোলযোগ দেখা দিল। কেউ বললেন ঈশ্বর আছেন, কেউ বললেন নেই। কেউ বললেন এই জড় জগৎ থেকে ঈশ্বর পৃথক, কেউ বললেন এই জড়জগৎই ঈশ্বর। এই গোলযোগে অর্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল। সনাতন ধর্ম মহাসংকটে পড়ল। দীর্ঘকাল এইভাবে কাটলে শ্রীমদ্‌ভাগবতকার সেই ধর্মের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হলেন। এরই ফলে দ্বিতীয় কৃষ্ণচরিত্রের সৃষ্টি হল।

আচার্য টিণ্ডলের মত উদ্ধৃত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক তিনিই ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করতে পারবেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতকাব্যের মধ্যে এই দুই গুণের সমাবেশ না থাকলেও এঁর রচয়িতা একাধারে দার্শনিক ও কবি। দর্শনে ও কাব্যে মিলিয়ে তিনি তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের আলোকে শ্রীমদ্‌ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণ ও গোপকন্যা শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষরূপে গ্রহণ ক'রে এবং স্বকপোল থেকে রাধাকে সৃষ্টি ক'রে তাকে তিনি প্রকৃতিস্থানীয়া করেছেন। বাল্যলীলায় প্রকৃতি-পুরুষের আসক্তি দেখানো হয়েছে। সাংখ্য বলেন এদের মিলনেই জীবের দুঃখ। তাই কবি এ-মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র ক'রে সাজালেন। "শ্রীমদ্‌ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ, পরে বিয়োগ পরে মুক্তি।"

জয়দেবের কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক নেই। তখন আর্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধর্মের বার্ধক্য দেখা দিয়েছে। উগ্রতেজস্বী রাজনীতিবিশারদ আর্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়েছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতরুচি দার্শনিকদের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত ও গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হয়েছেন। দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, ভোগপরায়ণ দেশবাসীর যখন সামাজিক অবস্থা এইরূপ—তখনই জয়দেবের আবির্ভাব। সেইজন্যেই গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিলাসরসের রসিক কিশোর নায়ক। আদিরসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল

রত্নে তিনি কিশোর-কিশোরীকে সাজিয়েছেন। ইন্দ্রিয়পরতার ছায়া প্রখর সুখতৃষাতৃপ্ত আর্বপাঠকদের শীতল করছে।

তারপর বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হয়েছে। প্রথমে বাংলা নামমাত্র দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবনশাসিত বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন হল। আবার বাংলার জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হল। এরই ফলে শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথের আবির্ভাব। আর বিদ্যাপতি এঁদের পূর্ববর্তী—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেবের চিত্রে নূতন রঙ চাললেন। তিনি জয়দেবের মতো বাহ্য প্রকৃতিকে প্রধান করলেন না অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রধান করলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, বিদ্যাপতির সময় দুঃখের কাল। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল—সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হচ্ছে—কবি এই দুঃখ দেখিয়ে দুঃখের গান গাইলেন। মোটামুটি এই হল এই প্রবন্ধের মূল কথা।

'বঙ্গদর্শন'এ কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনাও খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ ও স্বকীয় চিন্তাশক্তির পরিচয় লভ্য। 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও এ কাব্যে অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে—কারণ ঐ যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় নি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র দূর অতীতের পুরাণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে কাব্য লিখেছেন। সেখানে সব ঘটনাই কাল্পনিক; তাই কবিদ্বয়ের যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ ঘটেছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয় আধুনিক। সুতরাং এখানে কবির আকাশে উড়ে গান করার স্বাধীনতা নেই। অতএব কাব্যের বিষয় নির্বাচনে কবি সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নি।

তুলনামূলক আলোচনার সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে ঘটনাবৈচিত্র্য ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি কবির একটি প্রধান কাজ হলেও এ-বিষয়ে নবীন সেন সার্থক নন। বৃত্রসংহার কাব্য উপাখ্যান, নাটক ও গীতিকাব্যের সমন্বয়ে খুবই আকর্ষণীয়; কিন্তু নবীন সেনের গ্রন্থে উপাখ্যান ও নাটকের ভাগ অত্যন্ত অল্প—'গীতি অতি প্রবল'। তিনি 'বর্ণনা ও গীতিতে মন্ত্রসিদ্ধ'। আর এরই জন্যে এর মনোহারিত্ব।

অতঃপর সমালোচক ইংরেজ কবি বাইরণের লিপিপ্রণালীর সঙ্গে নবীন সেনের তুলনা করেছেন। দুজনেরই চরিত্রের বিশ্লেষণে কিছু শক্তি আছে, কিন্তু চরিত্রের আশ্লেষণে নয়। নাটকের যা প্রাণ, সেই ঘাতপ্রতিঘাত—দুজনের কাব্যে কিছু মাত্র নেই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই শক্তিশালী। বাইরণের কবিতা জ্বালাময়ী, 'তীব্র তেজস্বিনী ও অগ্নিতুল্য', নবীন সেনের কবিতাতেও এই গুণগুলি বর্তমান। দুজনের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাবসকল 'আগ্নেয় গিরিনিরুদ্ধ'। 'অগ্নিশিখাবৎ' নবীন সেনের স্বদেশবাৎসল্য স্রোত গৈরিক স্রাবের মতো। বাইরণের মতো নবীন সেনের বর্ণনা অত্যন্ত শক্তিশালী। ক্লাইভের নৌকারোহণ অল্প কথায় উৎকৃষ্ট বর্ণনা। কিন্তু অনেক সময় তিনি বর্ণনায় মনোযোগী হয়ে অযথা কালহরণ করেন। তিনি বাংলার বাইরণ—এ প্রশংসাও নবীন সেনের অল্প নয়। বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারে এ গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। বাঙালী হ'য়ে বাঙালীর আন্তরিক রোদন বোঝবার জন্য এ গ্রন্থ পাঠকের পড়া দরকার।

সমকালের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুর নিরপেক্ষ সমালোচনা সমালোচকের পক্ষে শক্ত। নবীনচন্দ্রের ত্রুটির কথা বলা হলেও এবং তার সঙ্গে দু'একটি বিষয়ে বাইরণের সাদৃশ্য থাকলেও তাঁকে 'বাংলার বাইরণ' বলার মধ্যে প্রশংসার আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদর্শন (১২৮০) এ **'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত'** নামে যে কয়েকটি কথা বঙ্কিমচন্দ্র একদা বলেছিলেন, তাতে মধুসূদনের সাহিত্য-বিচার নেই, কিন্তু বাঙালীর সাহিত্যে তাঁর স্থান এবং তাঁকে নিয়ে বাঙালীর গর্ব কেন—এ সম্পর্কে অতিশয় মূল্যবান কথা বলেছেন।

মধুসূদনের প্রয়াণে বাঙালী যে শোক প্রকাশ করেছে, তাতেই প্রমাণ হয় বাঙালী জাতি হিসেবে গৌরবান্বিত। যে দেশে সুকবি যশস্বী হন, সে দেশ আরো গৌরবান্বিত। মধুসূদন যশস্বী হয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই তাঁর বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে উন্নতির পথে চলছে। তিনি লিখেছেন, "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকদের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন এর জন্যে গর্ববোধ করতেন। তিনি বলেছেন,—

"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

এক এক দেশে জাতীয় উন্নতির এক একটি উপায়। প্রাচীন ভারত বিদ্যালোচনার জন্যই উন্নত হয়েছিল—সেই পথেই উন্নতি হবে। "কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুবহন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" জাতীয় কবি মধুসূদনের প্রতি সমালোচকের শ্রদ্ধাঞ্জলি এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

ভবভূতির **'উত্তরচরিত'** বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯) এ এই দীর্ঘ সমালোচনাটি পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু অংশ বর্জন ক'রে পরে 'বিবিধপ্রবন্ধ' গ্রন্থে 'উত্তরচরিত' নামেই সমালোচনাটি অন্তর্গত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় সাধারণতঃ যে সংহতি ও পঠন-পারিপাট্য লক্ষ্য করা যায় আয়তনের দীর্ঘতার জন্যই হোক বা 'বঙ্গদর্শন' এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার জন্যেই হোক—এর মধ্যে তা লক্ষণীয় নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভবভূতির 'উত্তরচরিত' এর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র এই আলোচনাটি লিখেছিলেন। অবশ্য ঐ অনুবাদটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তাঁর এ আলোচনায় দেখা যায় না।

প্রবন্ধের প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে মূল রামায়ণ থেকে গৃহীত 'উত্তরচরিত' এর কাহিনী গৃহীত হলেও বহু বিষয়েই তিনি স্বতন্ত্র পথে বিচরণ করেছেন। রামায়ণে যেমন বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, ঘটনাচক্রে রামের সঙ্গে পুনর্মিলন ও মিলনান্তে সীতার পাতাল-প্রবেশের কথা আছে, এখানে তা নেই। 'উত্তরচরিত' এ সীতার রসাতল বাস,

লবের যুদ্ধ এবং তারপর রামের সঙ্গে সীতার পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে বাল্মীকি থেকে ভিন্ন পথে গমন ভবভূতির রসজ্ঞতা ও আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচায়ক। সমালোচক এই প্রসঙ্গে সেক্সপীয়রের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বলেছেন যে তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকের উপাখ্যান অন্য লেখকের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করলেও ভিন্ন পথে যান নি। এর কারণ অদ্বিতীয় কবি সেক্সপীয়র জানতেন যে তিনি পূর্বগামী লেখকদের উপাখ্যান গ্রহণ করলেও তাঁর রচনাশক্তি আর সকলের কাহিনীকে ম্লান করে দেবে। ভবভূতি নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে বাল্মীকির পথে বাল্মীকিকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর ভিন্নপথে বিচরণ।

এই কথা ব'লে সমালোচক 'উত্তরচরিত' এর 'চিত্রদর্শন' নামে প্রথমাঙ্কের আলোচনা করেছেন। এই অঙ্ক অবলম্বন করেই বিদ্যাসাগর মশায়ের 'সীতার বনবাস' এর প্রথম অধ্যায় রচনা। চিত্র-দর্শন উপলক্ষে রামসীতার পূর্ববৃত্তান্ত এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই বৃত্তান্ত বর্ণনার লক্ষ্য কিন্তু রামসীতার অ-লৌকিক, প্রগাঢ় প্রণয়ের স্বরূপ-প্রকৃতি নিরূপণ। এটি অনুভব করতে না পারলে সীতা নির্বাসনের ভয়ঙ্কর তাৎপর্য বোঝা যাবে না। সীতা বিসর্জন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নয়। রামের মতো ভালবাসার গভীরতা কার? স্ত্রী-বিসর্জন মাত্রই মর্মবিদারী—আবার রামের মতো স্বামীর স্ত্রী-বিসর্জন। যিনি সীতার স্পর্শমাত্রে অস্থিরতার সঙ্গে বলেন—

> সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
> প্রবোধে নিদ্রা বা কিমু বিষ-বিসর্পঃ কিমু মদঃ,
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥

[এখন আমি সুখভোগ করছি কি দুঃখভোগ করছি, নিদ্রিত আছি কি জাগরিত আছি, কিংবা বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, আমার এরূপ অবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছে, অথবা মদ জনিত মত্ততাবশতঃ এমন হচ্ছে, কিছুই ঠিক করতে পারছি না] তৃতীয় অঙ্কে রামের যন্ত্রনার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের জন্যেই প্রথমাঙ্কে কবির এই চিত্রাঙ্কন।

ভবভূতির কবিত্ব কৌশলময় চিত্রবর্ণনার প্রশংসা করে সমালোচক কালিদাসের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতি দুজনেরই বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়; তবে দুয়ের বর্ণনারীতি পৃথক। অতুল উপমাপ্রয়োগে কালিদাসের বর্ণনা মনোহারিণী, কিন্তু ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ বিরল। তথাপি তাঁর বর্ণনা স্বাভাবিক শোভাকে অতিক্রম করে। কালিদাস একটি একটি ক'রে নির্বাচন ক'রে সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্র করেন, সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তার মধুর ক্রিয়াসকল সূচিত করেন এবং এর উপর আরো কিছু সুন্দর সামগ্রী নিয়ে আসেন। তাই তার বর্ণনা স্বভাবের অবিকল অনুরূপ হয়েও মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়। বীভৎসাদি রসে তাই তিনি সিদ্ধ নন। ভবভূতি বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশই অঙ্কিত করেন, দু'চারটি স্থূল কথায় একটি চিত্রকে সমগ্রতা দান করেন, কালিদাসের মতো বসে বসে তুলি ঘষেন না। কিন্তু দু'চারটি কথায় এমন একটু রস ঠেলে দেন, তাতে চিত্র সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হয়ে ওঠে। "মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়-উৎকটে ভবভূতি।"

ভবভূতির বর্ণনাশক্তির নৈপুণ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান ও পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠ অঙ্কে কুমারদের যুদ্ধ বর্ণনায় লক্ষণীয়।

বাল্মীকির রামায়ণে রামের বহু সদ্‌গুণ থাকলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষবর্জিত নন। তাঁর কিছু দোষ আছে যদিও বঙ্কিমের কথায় সেগুলি 'মনোহর'। আর এই দোষগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর হল সীতা-নির্বাসন। লোকোপবাদ হেতুই ইক্ষ্বাকুবংশীয় শ্রীরামচন্দ্র পতিগতপ্রাণা সীতাকে পবিত্রা জেনেও পরিত্যাগ করেছিলেন। লোকোপবাদ অকীর্তিই ঘোষণা করে। অকীর্তি-আশঙ্কাতেই রাজা রাম সীতাকে বিসর্জন দিলেন। ভবভূতির রাম সীতাকে বিসর্জন দেন প্রজানুরঞ্জনের জন্যে। তিনি বলেছিলেন—"প্রজানুরঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ কিংবা জানকীকে বিসর্জন করতে হলেও আমি কোনরূপ ক্লেশবোধ করব না।" রামায়ণের রামচন্দ্রে গর্বিত চিত্তভাব, ভবভূতি রাম কোমল প্রকৃতির। উভয়-গ্রন্থ রচনাকালে সময়ের বা কালের প্রভাবেই উভয় রামের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আর্যজাতি যখন বীর, সেইকালে সৃষ্ট রামায়ণের রামও মহাবীর এবং তাঁর চরিত্র গাম্ভীর্য ও ধৈর্যে পরিপূর্ণ। অপরপক্ষে ভবভূতির কালে ভোগকামনা অলসতাদির জন্যে ভারতবর্ষীয়দের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হয়ে গেছে। ভবভূতির রামও তাই এইরূপ। সীতাবিহনে অনেক সময় বালিকার মতো তাঁর কান্না অশোভন বলেই মনে হয়। বাল্মীকির রামচন্দ্রে এই কান্না লক্ষ্য করা যায় না। অনেক স্থলে ভবভূতির রামের বিলাপ ও হাহাকার সকরুণ, কিন্তু অনেক সময় মনে হয় ঐ সকল উক্তি কোনো বাঙালী বাবুর মুখনিঃসৃত। উত্তরচরিত নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে কালগত ব্যবধান দ্বাদশ বৎসর। নাটকবর্ণিত ক্রিয়াসমূহের পরস্পর কালগত যে নৈকট্য নেই—এটি ভবভূতির নাটকের একটি প্রধান দোষ। শেক্সপীয়রের 'উইন্টার্স টেল' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের সঙ্গে এ বিষয়ে 'উত্তরচরিত'-এর সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সীতা যমজ সন্তান প্রসব ক'রে স্বয়ং পাতালে অবস্থান করলেন, তাঁর পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হতে থাকল। এদিকে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য নিয়ে যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হলেন। এরই মধ্যে দৈবাদেশে রামচন্দ্র একদিন জানলেন যে তাঁর রাজ্যে শম্বুক নামে এক নীচ জাতীয় ব্যক্তি তপশ্চরণ করছে বলে রাজ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হচ্ছে। শম্বুক পঞ্চবটীবনে তপস্যা করছিল। আর রামচন্দ্র তার শিরচ্ছেদ করার জন্যে তার অনুসন্ধানে নানাদেশে পরিভ্রমণ করছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবী বাসন্তীর মুখে এ-সকল কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা ও বাকী অঙ্কগুলিতে একটি করে বিষ্কম্ভক আছে। এগুলিও সমালোচকের মতে 'অতি মনোহর'।

ভবভূতির নাটকের প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সকল অঙ্কই বিস্তৃত, কিন্তু সেই তুলনায় নাটকীয় ক্রিয়া-পরম্পরা কম, বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। এ-বিষয়ে ম্যাকবেথের ঘটনাধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ভবভূতির নাটকে নাট্যক্রিয়া কতো কম। তৃতীয়াঙ্কে জনস্থানে ছায়ারূপিণী সীতার কণ্ঠস্বর শুনে এবং সেখানকার নানাবস্তু পূর্বস্মৃতি উদ্রেকে রামচন্দ্রের সীতার জন্যে কাতরতা এবং সীতারও রামের জন্য ব্যাকুলতা, উভয়ের ক্ষণে ক্ষণে

চৈতন্যহীনতা, সীতার স্পর্শে রামের চৈতন্য, আনন্দোচ্ছ্বাস ও সীতার আনন্দ ইত্যাদির যে কবিত্বপূর্ণ চিত্র ভবভূতি অঙ্কিত করেছেন, তার অপরূপ বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কাব্যাংশে এর তুল্য রচনা অতি দুর্লভ বলেও কিন্তু তিনি এ অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে নাটকের যা কার্য—বিসর্জনের পরে রামসীতার পুনর্মিলন তার সঙ্গে এ অঙ্কের কোনো সম্পর্ক নেই। "এই অঙ্ক পরিত্যাক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য সকলেই গ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিম যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু রামসীতার পুনর্মিলনের পূর্বে রামের অজ্ঞাতে ছায়ারূপিণী সীতার সঙ্গে এই মিলনের যে-উৎকণ্ঠা যে-মাধুর্য আভাসিত, তা পরবর্তী মিলনকে কি গভীরতর তাৎপর্য দান করছে না? আমাদের তো মনে হয় এই মিলনের মধ্য দিয়েই শেষোক্ত মিলন অধিকতর মনোহর ও তাৎপর্যবহ হয়েছে।

সমালোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ছে ব'লে বাকী অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বাল্মীকি এক অভিনব নাটক রচনা ক'রে তা দেখবার জন্যে বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতিকে নিমন্ত্রিত করলেন। লবের সুন্দর কান্তি ও রামের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে কৌশল্যার তার সঙ্গে আলাপ, ও কন্যা-বিচ্ছেদে শোককাতর জনকের সঙ্গে কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদিও বড় সুন্দর। চন্দ্রকেতুর সঙ্গে লবের অতিশয় সৌজন্যপূর্ণ পারস্পরিক আচরণ সেইকালের সামাজিক ব্যবহারের উৎকর্ষের পরিচায়ক ব'লে সমালোচক মনে করেছেন। লবের সঙ্গে রামের রূপসাদৃশ্য দেখে সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মেই সীতা নেই, এ কথা মনে পড়ায় সে-আশা নিবারিত হয়। তিনি ভাবলেন—"লতায়াং পূর্ব্বলুনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ"। বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই কথায় সমালোচকের মনে রোমিও সম্পর্কে মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভবভূতির কাব্যকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনার নিদর্শন বলে' তাতে অর্থবোধ রসগ্রহণে বিঘ্ন ঘটার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তা মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন তথাপি এগুলির কাব্যগুণ প্রশংসনীয়। এরপর লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের মাঝখানে রাম উপস্থিত হয়ে তাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। লব ভক্তিভাবে রামকে প্রণাম ক'রে আলাপ করলেন. কুশও এসে লবকে অনুসরণ করলেন। পরে তাঁরা সকলে বাল্মীকির আশ্রমে তাঁর রচিত নাটক দেখতে গেলেন। সীতাবিসর্জন বৃত্তান্তই এ নাটকের প্রথমাংশ। এ নাটকের অভিনয় দেখে রাম মূর্ছিত হলে লক্ষ্মণ বাল্মীকিকে বললেন যে রামকে রক্ষা করুন। নটদের অভিনয় বন্ধ করতে বলা হল। এরপর ভাগীরথী ও পৃথিবীর সঙ্গে জলমধ্য থেকে সীতার আবির্ভাব ঘটল। অচেতন রামকে অরুন্ধতীর আদেশে তিনি স্পর্শ করলে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হলেন। সর্বলোকমাঝে সীতার সতীত্ব স্বীকৃত হল। প্রজাগণ দেববাক্যে বিশ্বাস করলেন। সীতা লবকুশকে পেলেন, রামও তাঁদের পুত্র বলে চিনলেন। এই হল ভবভূতির নাটক।

ভবভূতির নাটকের তৃতীয় অঙ্কের নাট্যগত অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তা কেউ কেউ মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য হল সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে একদিকে প্রজানুরঞ্জন ও অন্যদিকে সীতার প্রতি গভীর ভালোবাসা—এই দুয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত রামচন্দ্রেরই বিলাপে পরিপূর্ণ তৃতীয় অঙ্ক। সীতাও আনন্দে-উৎকণ্ঠায়-

বেদনায় এই সর্গে কাতরা। বিপ্রলম্ভ-করুণ এ সর্গের মূল রস এবং সমগ্র নাটকের অঙ্গীরস করুণের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ। তাই এ সর্গ অবান্তর নয়। এই তৃতীয় অঙ্কেই বাসন্তী রামকে সীতাবিসর্জনের মতো হৃদয়হীন কাজ কেন করলেন জিজ্ঞেস করায় রাম উত্তর দিয়েছিলেন 'লোকে বোঝে না বলেই'। তারা যে কেন বোঝে না তা তারাই জানে। রামের এই উত্তরে বাসন্তী রামকে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং যশোলোভী বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাসন্তী ও রামের এই কথোপকথনের প্রশংসা করতে পারেন নি। লোকোপবাদের জন্যে সীতাবিসর্জন হল—সমাজশক্তির কাছে ব্যক্তির ইচ্ছার পরাজয়। সীতা বিসর্জনকে নাটকের প্রধান কার্য বলে ধরলে এই সর্গের এই দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সমালোচকদের বক্তব্য খুব যুক্তিযুক্ত নয়। এ নাটকের অঙ্গীরস করুণ নয়। করুণরস থাকলেও শেষ পর্যন্ত শান্ত রসেই এর উপসংহার। রামায়ণের অঙ্গীরস করুণ হলেও ভবভূতি করুণরসকে অঙ্গী ক'রে এ নাটক লেখেন নি। ভারতীয় আলংকারিক মতে নাটকের করুণ অঙ্গীরস হয় না। একজন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, "রামসীতার পুনর্মিলন, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নাটকের 'কার্য' বলেছেন, সেইটেই কি নাটকের কেন্দ্রস্থ ঘটনা, এর নাট্যিক শিখরচূড়া? পুনর্মিলনের প্রসন্ন পরিতৃপ্তিই কি উত্তরচরিত নাটকের অঙ্গীরস?" (সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পৃঃ ১৩৪) সমালোচক ভারতীয় আলঙ্কারিকদের 'নাট্যকার্য' কথাটির অর্থ ঠিক উপলব্ধি করেন নি। প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা বিসর্জন থেকে রামসীতার পুনর্মিলন—সমগ্র নাটক জুড়ে বিভিন্ন অঙ্কের মধ্য দিয়ে এই ঘটনা ও তার পরিণামই নাট্যকার্য। এটি নাটকের কেন্দ্রস্থ ঘটনা নয়, একে নাট্যিক শিখরচূড়া বা climaxও বলে না। স্বপ্নে ও জাগরণে, বাস্তবে ও কল্পনায় মেশা তৃতীয় সর্গে ছায়ারূপিনী সীতার সঙ্গে রামের তৃতীয় সর্গে মিলনই হল বিমর্ষসন্ধি—সেখানেই নাট্যিক শিখরচূড়া। এই মায়ালোকের মিলনই পরিণামে যথার্থ মিলনকে এনে দিয়েছে।

সমালোচক আরো বলেছেন, "একদিকে প্রজানুরঞ্জন বা কুলধর্ম বা লোকোপবাদ আর অন্যদিকে পত্নীপ্রেম—পরিণামে 'সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কার্য'—এই হল নাটকের নাট্যশক্তি—এর কারুণ্যই উত্তরচরিত নাটকের রসের উৎস।" নাটকে যে করুণরস অভিব্যক্ত হয়েছে তার মূলে রামের এই অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষত মানসিক চিত্র থাকলে তা খুবই উপভোগ্য হত। কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বময় রামচরিত্র নাটকে আছে কি? বাসন্তীকে তৃতীয় সর্গে রাম বলেছেন যে লোকে বোঝে না বলেই তিনি এই হৃদয়হীন কাজ করেছেন। বাসন্তী রামের এই আচরণে স্বার্থপরতা লোভ ও যশোলিপ্সাই লক্ষ্য করেছিলেন। মোটকথা তৃতীয় সর্গ কাব্যগুণে অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও এর নাট্যগুণ খুবই কম। কবি সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'কালিদাস ও ভবভূতি' শীর্ষক অতিশয় দীর্ঘ প্রবন্ধে এ নাটকের প্রথম ও সপ্তম অঙ্ক ব্যতীত অন্য অঙ্কগুলির নাটকীয়তার অভাবের কথা বলেছেন। নাটকের দিক থেকে লবের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করেছেন।

সমালোচনার পরবর্তী অংশে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্টা হওয়া চাই। এই দুই গুণ

থাকলেই কবি প্রধান—কবি বলে গণ্য হন এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা করতে হয়। 'কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন-চিত্তশুদ্ধিজনন।' সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার সৃষ্টি বলতে সত্যের বা স্বভাবের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়, 'যা স্বভানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত' তাই প্রশংসনীয় সৃষ্টি। এরপর আবার উত্তরচরিতের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন যে ভবভূতি অনেকদূর পর্যন্ত বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন, 'সীতা রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতিমাত্র', রামের চরিত্র ভবভূতির হাতে বিকৃত হয়ে গেছে। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি, চন্দ্রকেতু ও লবের চরিত্রও প্রশংসনীয়। জড়পদার্থকে রূপবানকরণে ভবভূতি নিপুণ। তমসা, মুরলা, গঙ্গা ও পৃথিবী এ নাটকে মানবরূপিণী। রসোদ্ভাবনের শক্তিও ভবভূতির অসীম। নানা রসকে তিনি নাটকে স্বেচ্ছামতো অভিব্যক্ত করতে পারেন। বাহ্যপ্রকৃতির শোভাবর্ণনাও তাঁর অত্যন্ত মনোহর। এই গুণটি শেক্সপীয়রে অত্যন্ত প্রকট। ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। প্রসঙ্গান্তরে সাহিত্যতত্ত্বের এ দিকটি আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে সে আলোচনা করা হল না।

'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে শকুন্তলার সঙ্গে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের মিরন্দা চরিত্রের এবং পরে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Criticism) এর দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্মদর্শিতা, চিন্তাশক্তির গভীরতা ও মৌলিকতার পরিচায়ক। মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনায় তিনি যা বলেছেন তা মোটামুটি এইরূপ : শকুন্তলা ও মিরন্দা দুজনেই ঋষি কন্যা—বিশ্বামিত্র এবং প্রস্পেরো দুজনেই রাজর্ষি। ঋষিকন্যা বলে এরা দুজনেই অলৌকিক সাহায্য লাভ করেছে—মিরন্দাকে এরিয়ল এবং শকুন্তলাকে অপ্সরা রক্ষা করেছে। দুজনেই ঋষিপালিতা—দুজনেই বনলতা—দুয়ের সৌন্দর্যেই উদ্যানলতা ম্লান। শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের মনে হয়েছিল রাজ-অন্তঃপুরের আর সকলেরই সৌন্দর্য ম্লান। ফার্দিনান্দও মিরান্দাকে দেখে ভেবেছিলেন যে অনেক নারী দেখলেও মিরন্দার মতো আর কেউই নয়—

> "......but you so you
> so perfect and so peerless, are created of every creatures best"

মিরন্দা ও শকুন্তলা দুজনেই অরণ্যপালিতা ও সরলা। মনুষ্যালয়ে বাস না করার ফলে তাদের মধ্যে কোনো কামনা বা বিলাসবিভ্রমাদির কালিমা নেই। শকুন্তলা বল্কল পরে ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করে দিনপাত করেছেন ; নবমল্লিকার মতো সেও শুভ্র ও প্রফুল্ল। নবমল্লিকাকে বোনের মতো, সহকারকে ভাইএর মতো, হরিণশিশুকে পুত্রের মতো তার স্নেহ। পতিগৃহে গমনের সময় এদের বিচ্ছেদ চিন্তায় সে অশ্রুমুখী, কাতরা ও বিবশা। বৃক্ষ ও লতার সঙ্গে কথোপকথনে—কখনো ব্যঙ্গে কখনো আদরে সে সুখী। কিন্তু সরলা হলেও শকুন্তলা অশিক্ষিতা নয়। লজ্জাই তার শিক্ষার লক্ষণ। দুষ্মন্তের সামনে সে লজ্জামুখী, সখীদের সামনে সে হৃদয়ের ভাব লজ্জায় ব্যক্ত করতে পারেনা। কিন্তু মিরন্দা এতো সরলা যে তার লজ্জাও নেই। পিতা ছাড়া অন্য পুরুষ সে কোনদিন

দেখেনি ব'লে তার মধ্যে লজ্জা নেই। সমাজপ্রদত্ত সকল সংস্কার শকুন্তলায় আছে। কিন্তু মিরন্দায় নেই। পিতার সামনে ফার্দিনান্দের প্রশংসায় তার কোনো সংকোচ নেই।

"I might call him
A thing divine for no thing natural
I ever saw so noble"

অথচ স্ত্রী-চরিত্রের পবিত্রতা যা লজ্জার চেয়েও বড় তা তার মধ্যে আছে। তাই মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য বেশী। পিতা ফার্দিনান্দকে পীড়ন করলে মিরন্দা তাঁকে নিষ্ঠুর হতে নিষেধ করে, তার রূপের নিন্দা শুনে সে তার চেয়ে অধিকতর সুন্দর পুরুষ দেখতে চায় না—একথা বলে। মিরন্দা সংস্কারমুক্তা, কিন্তু সে পরদুঃখকাতরা ও স্নেহশালিনী।

পিতা ও কলিবন ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে দেখেনি ব'লে ফার্দিনান্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় মিরন্দার হৃদয়ে প্রেম ছিল না। শকুন্তলাও ঋষিগণ ছাড়া পুরুষ দেখেনি বলে শকুন্তলার হৃদয় দুষ্মন্তকে প্রথম দেখার সময় প্রেমশূন্য ছিল। দুজনেই পিতার তপোবনে নায়ককে দেখামাত্র প্রণয়শালিনী হল। দুই ভিন্ন কবির সৃষ্ট দুই চরিত্র হলেও কী আশ্চর্য মিল দুই চরিত্রে। দুষ্মন্তকে দেখে শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা হলেও স্বেচ্ছায় সখীদের কাছে এ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল না—কেবল লক্ষণেই তা বোঝা গেল। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছেড়ে চলে যেতে গেলে গাছে বল্কল বেঁধে যায়, পায়ে কুশাঙ্কুর বেঁধে। কিন্তু মিরন্দা এ-সব জানে না। প্রথম দেখেই (ফার্দিনান্দকে) তিনি পিতার কাছে অসংকোচে প্রণয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ একরূপ লুকোচুরি খেলা। 'সখি রাজাকে ধরে রাখিস কেন?' 'তবে আমি উঠে যাই', 'আমি গাছের আড়ালে লুকাই' ইত্যাদি বাহানা আছে; কিন্তু মিরন্দার এ সব নেই। প্রভাত-পাখীর মতো মিরন্দার গেয়ে উঠতে লজ্জা করে না। লতামণ্ডপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার আলাপের চেয়ে মিরন্দা-ফার্দিনান্দের আলাপ অধিকতর গৌরবময়। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে শকুন্তলা অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে; কিন্তু প্রায় সমবয়স্ক ক্ষুদ্র ব্যক্তি ফার্দিনান্দের সমতুল্যা মিরন্দা। পৃথিবীপতি দুষ্মন্তর সামনে শকুন্তলা তত ফুটে উঠতে পারেনি। যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটেছে, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফোটেনি। এর কারণ লোকাচার ভেদ বা দেশভেদ নয়। মানুষের হৃদয় সকল দেশে সকল কালে একই। যে শকুন্তলা গৌরবের সভাতলে দুষ্মন্তকে তিরস্কার করেছিল সে লতামণ্ডপে যে বালিকাই রইল তার কারণ দুষ্মন্ত চরিত্রের বিস্তার। সভাতলে পতিত্যক্তা শকুন্তলা পত্নী ও রাজমহিষী—মাতৃপদে আরোহণ-উন্মতা; কিন্তু লতামণ্ডপে সে তপস্বিকন্যা মাত্র। শকুন্তলা ও মিরন্দার মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেও সমালোচক দেখিয়েছেন যে দুই চরিত্র ঠিক এক নয়।

সমালোচনার পরবর্তী অংশে শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনা। মিরন্দার সঙ্গে তুলনায় শকুন্তলার একভাগ পরিস্ফুট হয়েছে, দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনায় বাকী আর এক ভাগ বোঝা যাবে ব'লে সমালোচকের ধারণা।

শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা দুজনেই গুরুজনের অপেক্ষা না ক'রে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বীরপুরুষকে। দুজনেই মহামহীরুহ অবলম্বন ক'রে উঠেছিল। কিন্তু

বীরমন্ত্রের মোহ দেসদিমোনায় যতখানি পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তা নয়। ওথেলো বীর ও কৃষ্ণকায়। ইতালীয় বালার কাছে বীর্যের মোহই বেশী। দুই নায়িকার 'দুরারোহিণী আশালতা' পরিশেষে ভগ্ন হয়েছিল—দুজনেই স্বামীকর্তৃক বিসর্জিতা হন। দুঃখ ও অনাদরের মধ্য দিয়ে দুজনেরই উচ্চাশয় মনোবৃত্তি স্ফুরিত হয়েছিল। দুজনেই স্নেহশালিনী ও সতী। অত্যাচারে কলঙ্কে ও বিসর্জনে যে ভক্তি অবিচলিত, তা যদি সতীত্ব হয়, তাহলে দেসদিমোনা শকুন্তলার চেয়ে গরিয়সী। স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা, শকুন্তলা দলিত সর্পের মতো মস্তক উন্নত ক'রে স্বামীকে ভৎর্সনা করেছিলেন। কিন্তু যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সকলের সামনে প্রহার করেন, তখন তাকে 'কুলটা' বলেন, কিংবা শয্যাশায়িনী তাঁকে বধ করবে বলেন, তখনও স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। তাই শকুন্তলার সঙ্গে একদিক থেকে দেসদিমোনা তুলনীয়া হলেও অন্যদিক থেকে তুলনীয়া নন—কারণ ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ে তুলনা হয় না। ভিন্ন জাতীয় কেন বলা হচ্ছে তার উত্তরে বলা যায় যে শকুন্তলা নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য, কিন্তু নাটক নয়। ইউরোপীয় নাট্যলক্ষণ অনুযায়ী নাটক নয়। এই লক্ষণ কিন্তু ওথেলোতে যথেষ্টই আছে। আবার টেম্পেষ্টও নাটকাকারে উপাখ্যান কাব্য। নাটকাকারে উপাখ্যান কাব্য বলে এগুলিকে নিকৃষ্ট মনে করার কোনো কারণ নেই। যাই হোক, এই কারণে দেসদিমোনা যত পরিস্ফুট, মিরন্দা বা শকুন্তলা তত নয়। "দেসদিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্ত।" ...শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না, সে সকল দেসদিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। তাই শেষ সিদ্ধান্ত হল, "শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী।"

মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুষ্মন্তের প্রণয়-সম্ভাষণে মিরন্দার অধিকার গৌরবের কথা বলেছেন। মিরন্দার প্রণয়-সম্ভাষণে শকুন্তলার মতো কোনো লুকোচুরি খেলা নেই। এমন হওয়ার কারণ দেশাচার বা লোকাচার নয়—দুষ্মন্ত চরিত্রের বিস্তার। দুষ্মন্তের চরিত্র- গৌরবে শকুন্তলা ম্লান হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এইটিই একমাত্র কারণ নয়। দেশাচার ও লোকাচারেরও কতকটা প্রভাব আছে, যা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করতে চাননি। ঋষিদের পরিবার-সান্নিধ্যে বাস ক'রে শকুন্তলার দেশাচার-লোকাচার সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা হয়েছিল মিরন্দার তা হয়নি। তাই শকুন্তলা লজ্জাশীলা এবং এরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হয়, তার কতকটা পূর্ব-সংস্কার থাকাই সম্ভব।

দ্বিতীয়ত দেসদিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার পার্থক্য দেখতে গিয়ে তিনি সময় বা কালের প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন। উত্তর চরিত এ বাল্মীকির রাম ও ভবভূতির রামের চরিত্রে পার্থক্য দেখতে গিয়ে তিনি কালের প্রভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখানে তিনি নাটক ও উপাখ্যান-কাব্যের পার্থক্যের ওপর জোর দিয়ে দুই চরিত্রের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' এ প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' এর সমালোচনায় তিনি কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ নির্দেশ করেছিলেন—'জাতীয়তা, সাময়িকতা ও স্বাতন্ত্র্য'। এর মধ্যে তিনি

সাময়িকতা বা কালের পার্থক্যের দিকটিকে বড় মনে করে বিভিন্ন যুগের কৃষ্ণচরিত্রের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। এখানে ঐ তিনটি কারণের বাইরেও আর একটি কারণ নির্দেশ করলেন তা হল কাব্যও নাটকের শ্রেণীগত পার্থক্য।

কিন্তু সে যাই হোক, মিরন্দা ও শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা ও শকুন্তলার তুলনামূলক আলোচনায় তিনি যথেষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সাদৃশ্য দেখালেও বৈসাদৃশ্যের দিকটি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন এবং 'শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা ও অধেক দেসদিমোনা' —তাঁর এ সিদ্ধান্তও মৌলিক ও সুক্ষ্ম বিচার শক্তির নিদর্শন। বঙ্কিম সমসাময়িক কালে তুলনামূলক আলোচনায় এতোখানি গভীরতা বিরল দৃষ্ট।

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্র অবলম্বন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র দশবৎসরের ব্যবধানে যে-দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন তা তাঁর সমালোচনা-শক্তির অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। "দ্রৌপদী (প্রথম প্রস্তাব)" যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল তা শুরু হয়েছে সীতার সঙ্গে দ্রৌপদীর তুলনার মধ্য দিয়ে। আর্যসাহিত্যে সাধারণতঃ পতিপরায়ণা, কোমলা, লজ্জাশীলা, ও সর্বংসহা নারীর চরিত্রই আদর্শ। এই আদর্শেই বাল্মীকি সীতা চরিত্র সৃজন করেছিলেন। শকুন্তলা, দময়ন্তী রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ সীতারই অনুকরণমাত্র। এই আদর্শের নারীচরিত্রেরই আর্যসাহিত্যে আধিক্য। সীতা চরিত্র অনুকরণে প্রবণতা যে অধিক তার কারণ সীতা চরিত্রের মাধুর্য, আর্যজাতির নিকট এ-চরিত্রের প্রিয়তা এবং আর্য-স্ত্রীগণের এই আদর্শের প্রতি আকর্ষণ।

কেবল "দ্রৌপদী সীতার ছায়া ও স্পর্শ করেন নাই।" এ এক নূতন সৃষ্টি। এর অনুকরণ হয়নি। দ্রৌপদীও সীতার মতই সতী। পতি পাঁচ হলেও পতিমাত্রই যার ভজনীয় তিনিই সতী। পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্তব্য পালনে, ধর্মনিষ্ঠায় এবং গুরুজনদের প্রতি আনুগত্যে সীতা ও দ্রৌপদীর সাদৃশ্য কিছু আছে। কিন্তু সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। সীতা রাজ্ঞী হয়েও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হয়েও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতার স্ত্রী-জাতীর কোমল গুণ, দ্রৌপদীতে কঠিন গুণ। সীতা যেমন রামের যোগ্য জায়া, দ্রৌপদীও তেমনি ভীমসেনের যোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাহরণে রাবণের কোনো কষ্ট হয়নি, কিন্তু অতসহজে দ্রৌপদী-হরণ সম্ভব নয়। দ্রৌপদীর চরিত্রবিশ্লেষণ দুরূহ, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল, কর্ণ প্রভৃতি বীরদের মধ্যে কর্ণ যখন লক্ষ্যভেদ করতে উঠলেন তখন মহাকবির সামনে বিষম সংকট। কর্ণকে বীর হিসেবে গৌরবহীন করলে অর্জুনের বীরত্বও ম্লান হবে, কারণ এই অর্জুনই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ণকে পরাভূত করবেন। মহাকবি আশ্চর্য কৌশলে এই সংকট থেকে মুক্ত হলেন দ্রৌপদীর আচরণের মধ্য দিয়ে। যে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে একদা ভূতলশায়ী করেছিলেন, যে দ্রৌপদী দুর্যোধনের সভাস্থলে দ্যূতজিতা অপমানিতা হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—এখানে তারই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কর্ণকে লক্ষ্যভেদে উদ্যত দেখে তিনি বললেন। "আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।" রাজনন্দিনীর দুর্দমনীয় গর্ব এতে প্রকাশিত হয়েছে। একটিমাত্র কথায় এতে চরিত্রটি যতখানি পরিস্ফুট হয়েছে শতপৃষ্ঠা লিখেও তা সম্ভব হত না। দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর উক্তিও লক্ষণীয়। তিনি

প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্তা এবং দুর্যোধনের সভায় তাঁর আহ্বান শুনে বললেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস কর তিনি আগে আমাকে না আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জন করেছেন জেনে এসে আমাকে নিয়ে যেও। ধর্মরাজ কীভাবে পরাজিত তা জেনে আমি সেখানে যাব।" দ্রৌপদী যে দাসত্ব স্বীকার করবেন—এ থেকে এই অনুমানই করা চলে।

দ্রৌপদী চরিত্রের দুটি প্রধান লক্ষণ—এক ধর্মাচরণ ও দ্বিতীয় দর্প। এই দুই লক্ষণের একত্রে সমাবেশ মহাভারতের ভীম, অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রেও দেখা যায়। এখানে দর্প আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নয়, মানসিক তেজস্বিতা। রাজসভায় ধর্মবলে শক্তিমতী দ্রৌপদী দু:শাসনকে বলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হয়, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে ক্ষমা করবে না।" সকলকে মুক্তকণ্ঠে বললেন, 'ভরতবংশীয়দের ধর্মে ধিক।' ভীষ্মাদি গুরুজনদের তিরস্কার ক'রে বললেন, "বুঝলাম—দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নেই।' কিন্তু নারীর এই তেজস্বিতা বেশীক্ষণ থাকল না। যখন কর্ণ তাকে 'বেশ্যা' বলল, দুঃশাসন তার পরিধেয় আকর্ষণ করতে গেল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধারের জন্য ডাকতে লাগল। দ্রৌপদীর মধ্যে ধর্মানুরাগ ও তেজস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁর বর গ্রহণ-কালে। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি প্রথমে যুধিষ্ঠিরের পরে অন্যান্য পাণ্ডবদের দাসত্বমুক্তির বর চাইলেন। কিন্তু তৃতীয় বর তিনি নিতে চাইলেন না। কারণ ক্ষত্রিয় পত্নীর দুই বর নেওয়াই কর্তব্য। তাছাড়া লোভ ধর্মনাশের হেতু; তাই তিনি তৃতীয় বর নেবেন না।

জয়দ্রথের সঙ্গে আচরণেও তার তেজস্বিতা ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় মেলে। তাকে হরণ করবার জন্য কাম্যক বনে জয়দ্রথ যখন একাকিনী পান, তখন দ্রৌপদী প্রথমে তাঁকে ধর্মাচার-সঙ্গত অতিথিরূপে আপ্যায়িত করেন। পরে জয়দ্রথ তাঁকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে গিয়ে সমুচিত ফল পান, তাঁর বাহুবলে জয়দ্রথ ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো ভূতলশায়ী হন। শেষে আবার বলপূর্বক তাঁকে রথে তুললে বিলাপ বা চীৎকার করলেন না। রথে দৃশ্যমান পাণ্ডবদের পরিচয় জয়দ্রথ জিজ্ঞেস করলে তিনি গর্বিত বচনে অবলীলাক্রমে স্বামীদের পরিচয় দেন।

'দ্রৌপদী (দ্বিতীয় প্রস্তাব)' দশ বৎসর পরে রচিত। এইখানে বঙ্কিম দ্রৌপদী-চরিত্রের মূল তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেছেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর কেন পঞ্চস্বামী এবং এর তাৎপর্য কি? প্রাচীন আর্যদের নানা গ্রন্থের মধ্যে কোথাও স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের কথা সমর্থিত হয়নি—বিশেষত এক নারীর একাধিক স্বামী। মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও এর সকল কথা ইতিহাস-সম্মত নয়। তবে কি মহাভারত রচনাকালে ইতিহাসবেত্তা কবি এবং কবি ইতিহাসবেত্তা হওয়ায় এই ঘটনা কবিকল্পনা মাত্র? দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ঠিকই, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী—এও কি ঐতিহাসিক সত্য? বিধবা হলে স্ত্রীলোক বিবাহ করতে পারত, কিন্তু কেউ একাধিক পতির ভার্যা ছিল—এ ঘটনার প্রমাণ নেই। যা সমাজে কোথাও ছিল না, যা লোকসমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় তা পাণ্ডবদের মতো লোকবিখ্যাত বংশে যখন তা ঘটবারও সম্ভাবনা ছিল না তখন কবি নিশ্চয়ই কোনো তত্ত্ব-বিশেষকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ ঘটনা দেখিয়েছেন এমন মনে করা যায়।

এ যে গড়াকথা তার প্রমাণ—দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে একটি ক'রে পাঁচপুত্র, কারো ঔরসে একাধিক সন্তান বা কন্যাসন্তান জন্মাল না। এই পাঁচপুত্র কেউ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হল না, কেউ বেঁচে রইল না, সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হাতে প্রাণ-হারাল। অন্যদিকে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন কেমন সব জীবন্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে যদি দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরেরই ভার্যা, তাঁর পঞ্চবিবাহ গড়া কথা, তাহলে চারপাণ্ডব কি অবিবাহিত ছিলেন? ভীম ও অর্জুনের অন্য বিবাহ ছিল। নকুল ও সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল কিনা মহাভারতে অন্ততঃ নেই। এক হিসেবে মহাভারত প্রথম তিন পাণ্ডবেরই জীবনী—নকুল সহদেব ছায়ামাত্র। তাদের বিবাহ থাকলে তা বলার প্রয়োজনীয়তা মহাভারতকার অনুভব করেননি—এমন হতে পারে। যদি দ্রৌপদীর বিবাহ কবির কল্পনা হয়, তাহলে এমন বিস্ময়কর কল্পনার কারণ কি?

গীতায় একটি শ্লোক আছে যার অর্থ "আসক্তি বিদ্বেষরহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ ক'রে সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হন।" অতএব অনাসক্তের পক্ষে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে উপভোগ-বর্জন নিষ্প্রয়োজন। বর্জনের প্রয়োজন আছে বললে ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে বোঝায়। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে লিপ্ত থেকেও তাতে অনুরাগশূন্য, তিনিই যথার্থ নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত। 'নির্লোপ' বা 'অনাসঙ্গ' পরিস্ফুট করার জন্যে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিক মাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন।

মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনাদের মধ্যবর্তী করেছেন, তান্ত্রিকদের সাধনপ্রণালীতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর এইজন্যই আধিক্য। এসকলের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেও যিনি অনাসক্ত তিনিই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহুস্বামিত্বও এইরূপ। তিনি "স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্মের মূর্তিস্বরূপিনী।" তাই তিনি গণিকার মতো 'পঞ্চপুরুষের সান্নিধ্যে থেকেও সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা।' যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বরমাত্র। তেমনি দ্রৌপদীর নিকট পঞ্চস্বামীও এক স্বামীমাত্র—একমাত্র ধর্মাচরণের স্থল। এধর্ম পালন অত্যন্ত কঠিন। মহাভারতকার মহাপ্রস্থানিক পর্বে তা বুঝিয়েছেন। সেখানে দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল ব'লে—সেই পাপের ফলে সশরীরে স্বর্গারোহন করতে পারলেন না। ধর্মের প্রয়োজনেই সব স্বামীকে ধর্মফল দানের জন্যেই প্রত্যেকের ঔরসে তিনি গর্ভে এক একটি পুত্র ধারণ করলেন। এ প্রয়োজন সিদ্ধ হলে স্বামীদের সঙ্গে তাঁর ঐন্দ্রিয়িক সম্পর্ক ছিন্ন হল। এর থেকে এমন মনে করা ঠিক নয় যে অনাসঙ্গ ধর্ম পালনের জন্য সকল স্ত্রীলোক একাধিক স্বামী গ্রহণ করবে। যার চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে মহাপাপের মধ্যে পতিত হয়েও সে উদ্ধার পায়। দ্রৌপদীর তাই হয়েছিল—ঘোরতর মহাপাপের মধ্যে তিনি পড়েছিলেন অদৃষ্টদোষে। কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়েছেন—পাপকে ধর্মে পরিণত করে।

এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র সীতা চরিত্রের সঙ্গে দ্রৌপদীর পার্থক্য নির্ণয়কালে কালের কথা, জাতীয়তার কথা বা কবিদের স্বাতন্ত্র্যের কথা তোলেন নি। তিনি বলেছেন মহাভারত কাব্যের এ এক 'নূতন সৃষ্টি'। অর্থাৎ কবি প্রতিভার গুণেই

দ্রৌপদী সীতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্যে টেইনের সূত্রের সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে এর দ্বারা বিভিন্ন কবির সৃষ্টি-পার্থক্য বোঝা যায় না। জাতি, পরিবেশ ও যুগের প্রভাবে যদি সাহিত্য রচিত হয়, তাহলে সব কবির সৃষ্টিই একরূপ হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে টেইনের সূত্রের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন কবির আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্যেই পার্থক্য দেখা দেয় সেকথা বলেছিলেন। কৃষ্ণ চরিত্র-এর সমালোচনায় এখানে সেই আত্মস্বাতন্ত্র্যকে কবি প্রতিভার রহস্যের মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর দ্রৌপদী-চরিত্র বিশ্লেষণ এবং তাঁর পঞ্চস্বামিত্বের তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ ধীশক্তি ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ-ধরণের উচ্চাঙ্গের সমালোচনা আমাদের বিস্মিত করে।

'বাঙ্গালা ভাষা' (বঙ্গদর্শন ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ) শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সাধুভাষা বা লিখিতভাষা এবং কথ্য বা চলিতভাষা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর সমকালে এই দুই ভাষার যে-রূপ তিনি দেখেছিলেন তাদের প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় দিকগুলি উল্লেখ করে উৎকৃষ্ট রচনারীতি কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রচনা বা গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা' বলেছেন তাতে তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হতে পারি। 'নব্য লেখকদের প্রতি' নাম দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' ও একদা তিনি যা' বলেছিলেন তার সঙ্গে এই বক্তব্য মিলিয়ে নিয়ে রচনা বা গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'উত্তরচরিত'-এ তাঁর বক্তব্যের কিন্তু পুরোপুরি মিল নেই। সে-কথায় আমরা পরে আসছি। তার পূর্বে তিনি এই প্রবন্ধে কি বলেছেন তা দেখা যাক্।

প্রায় সব দেশেই লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যে ভেদ তা এই লিখিত ও কথিত ভাষারই ভেদ। আর এই প্রভেদই ভারতের বিভিন্ন ভাষা সকলের জন্ম দিয়েছে। বাংলা ভাষায় এই লিখিত ও কথিত ভাষার প্রভেদ বোধহয় সব থেকে বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু পূর্বেই বাংলায় দুটি পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল—একটি লেখার ভাষা বা সাধুভাষা এবং অপরটি একটি কথিত ভাষা বা অপর ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটিই দেখা যেত, দ্বিতীয়টির কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না। লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ না হলে সাধুভাষায় তার স্থান হত না।

গদ্য গ্রন্থেই সাধুভাষার ব্যবহার হত। যাঁরা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী বা পণ্ডিত তাঁরা ছাড়া বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লেখার কারো অধিকার ছিল না। ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিতেরা বাংলা না জানার মধ্যে গৌরববোধ করতেন। তাই "বাঙ্গালা রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল।" সংস্কৃতপ্রিয়তা বা সংস্কৃতানুকারিতার ফলে তখন বাংলা ভাষা শ্রীহীন, নীরস ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরই প্রথম এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখে তিনি বাংলার প্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখলেন। এই দিন থেকেই বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। এই দিন থেকেই সাধুভাষা ও চলিতভাষা দুই ভাষাতেই বাংলা গ্রন্থ লেখা হতে থাকল। এতে সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এইকালে বাংলার সমালোচকেরা দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন—একদল খাঁটি

সংস্কৃতবাদী, অন্যদল সমাজে যে ভাষা প্রচলিত, যাতে বাংলার দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন হয়, যা সকলের বোধগম্য সেই ভাষা গ্রন্থে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। অধিকাংশ নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি এই শ্রেণীভুক্ত।

এই দুই সম্প্রদায়ের এক একজন মুখপাত্রের এ-বিষয়ে বক্তব্য কি তা উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তা সমালোচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের মুখপাত্ররূপে রামগতি ন্যায়রত্নকে এবং প্রচলিত কথিত ভাষার মুখপাত্ররূপে তিনি 'কলিকাতা রিভিউ'তে বাংলাভাষা সম্পর্কে একজন আলোচক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রহণ করেছেন। এঁর আলোচনার অনেক দিক তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মশায় প্রচলিত ভাষা গ্রহণে পক্ষপাতী নন। তাঁর যুক্তি হল পিতা-পুত্রে একত্রে ব'সে এ ভাষা ব্যবহার করতে পারে না; বড় বড় সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষাতেই তা সম্ভব। তিনি সকলের সামনে সরলভাষা ব্যবহৃত হোক—এমন চাননা—এ ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ ব'লেও তিনি মনে করেন না। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাষাকেই যথার্থ শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তিনি নিজে যে ভাষায় বাঙ্গালা বিষয়ক প্রস্তাব লিখেছিলেন তাও সরল প্রচলিত ভাষা। তফাত শুধু রঙ্গরসের দিকথেকে। টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে বলেই পিতা-পুত্রে একসঙ্গে ব'সে পড়তে পারে না। রঙ্গরস উঠে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু অপ্রচলিত ভাষায় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত নয়।

এরপর শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অনেক মত সুসঙ্গত ও আদরণীয়; কিন্তু অনেকস্থলে তিনি কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। বহুবচনে 'গণ' শব্দের ব্যবহার, বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ-করণ, পৃথিবীকে বাংলাভাষায় স্ত্রীলিঙ্গরূপে গ্রহণ, 'অনেক' শব্দের ব্যবহার, ত্ব ও য-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃতের সংখ্যাবাচক শব্দ প্রভৃতি ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী। ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক ইত্যাদি শব্দও বাংলায় ব্যবহার তাঁর মতে নিষিদ্ধ। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তিনি "বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।" তথাপি ঐ প্রবন্ধে তিনি কিছু সারগর্ভ কথাও বলেছেন। তিনি তিন রকম বাংলা শব্দের কথা বলেছেন—ক. সংস্কৃতমূলক শব্দ—যার বাংলায় রূপান্তর ঘটেছে যেমন গৃহ ঘর, ভ্রাতা/ভাই খ. সংস্কৃতমূলক শব্দ যা রূপান্তরিত হয়নি—যেমন জল, মেঘ, সূর্য্য ইত্যাদি। আর গ. সেই সব শব্দ যার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে শ্যামাচরণবাবু বলেছেন যে রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দগুলির বাংলা ভাষায় ব্যবহার অনুচিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য যা প্রচলিত হয়ে গেছে তার উচ্ছেদের দরকার নেই। উচ্ছেদে ভাষা ধনশূন্যা হবে। কতকগুলি শব্দের রূপান্তর ঘটেছে বলে মনে হয় কিন্তু তা ঠিক নয়—সেখানে উচ্চারণ-দোষ রূপান্তরিত। এ সব ক্ষেত্রে আপাত রূপান্তরিত শব্দ-গ্রহণ অনুচিত।

আবার যে সব শব্দের আদিমরূপ সাধারণের বোধগম্য নয়, তাও ব্যবহার্য নয়। বাংলা লিখতে গিয়ে অকারণে বাংলা শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ-ব্যবহার ঠিক নয়। দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বলেন নি। তার তৃতীয় শ্রেণী যার-সঙ্গে সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধ নেই সে সম্পর্কে শ্যামাচরণবাবুর বক্তব্যকে তিনি অনুমোদন করেছেন। সংস্কৃতপ্রিয় ব্যক্তিরা এই সকল শব্দকে একেবারে বের করে দিতে চান। কিন্তু এটি মূর্খতা।

অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য নিয়ে এরপর বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেছেন। একথা ঠিক যে বঙ্কিমের কালে অসম্পূর্ণ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্য ভাষা থেকে কর্জ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। কর্জই যদি গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংস্কৃতের মতো বড় মহাজনের আশ্রয় নেওয়াই ভালো। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষা থেকে কর্জ করা এই সকল শব্দ বাংলায় ভালোভাবে মিশে যায় এবং তৃতীয়তঃ সংস্কৃত থেকে আগত নূতন শব্দ অনেকের নিকট বোধগম্য হতে পারে, যা ইংরেজি বা আরবী ভাষা থেকে হলে সম্ভব নয়। যেখানে বাংলা শব্দের অভাব সেখানে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ চলতে পারে। কিন্তু যেখানে অভাব নাই, সেখানে ঐ গ্রহণ অনুচিত।

এরপরই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ও গ্রন্থ কি জন্য এ-প্রশ্ন তুলেছেন। যে পড়বে তার বোঝবার জন্যই গ্রন্থ লিখিত হয়। একথা সত্য হলে যে ভাষা সকলের বা যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাতেই গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। "যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই। জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

এর দ্বারা বঙ্কিম একথা বলেন না যে বাংলার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষায় চিরকাল পার্থক্য থাকবে। "কথনের উদ্দেশ্য সামান্য জ্ঞাপন। লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন।" এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় সিদ্ধ হবে না। এ-ভাষা দরিদ্র, এর তত শব্দ সম্পদ নেই। এ-ভাষা নিস্তেজ, অসুন্দর। টেকচাঁদী ভাষা এর এক পৈঠা উপরে—হাস্য ও করুণরসে এ-ভাষা খুবই উপযোগী। স্কটল্যাণ্ডের কবি বার্ণস্ হাস্য ও করুণরসের কবিতায় স্কচ ভাষার ব্যবহার করেছিলেন এবং গম্ভীর ও উন্নত বিষয়ে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার করেছেন। গম্ভীর বা উন্নত ভাবের ক্ষেত্রে টেকচাঁদী ভাষা চলে না। এ ভাষাও দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষায় উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলের বোধগম্য তার অর্থগৌরব থাকলে তাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। এরপরই ভাষার সৌন্দর্য। ঐ সরলতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যে রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, তার শব্দের অসাধারণতা কিছু থাকবেই। লেখক যা বলতে চান, তা যে ভাষায় সব থেকে সুস্পষ্টরূপে, সুন্দররূপে বা সরলভাবে বলা যায়, তা প্রচলিত ভাষায় হোক, টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় হোক, তারই আশ্রয় নিতে হবে। যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেবের সংস্কৃত বহুল ভাষায় এই কাজ সিদ্ধ হয়, তবে তারই আশ্রয় নিতে হবে। এখন যে ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করবার তা গ্রহণ করতে হবে—শুধু অশ্লীল শব্দ বর্জন ক'রে। তারপর তাকে সুন্দর করতে হবে। এই হল বঙ্কিমের মতে বাংলা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। এ প্রবন্ধ বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ মননশীলতা, ভাষাবিজ্ঞানীর বিশ্লেষাত্মক মনোভঙ্গী; প্রাবন্ধিকের নিরাসক্ত মেজাজ এবং শিল্পীর মৌলিক রস-সৃষ্টির পরিচায়ক।

সাহিত্যের বাহন হিসেবে ভাষার সাফল্য "depends largely upon the combination in varying degree of the social and individual aspects of

any given author's speech". (D. O. W. L. Page 246) এবং সাহিত্যিক ভাষা ফলপ্রসূ হয় এর ব্যবহারকারীরা কতোখানি cultural level-এ উন্নীত হয়েছে তার ওপর এবং সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার ওপর। ভাষার সামাজিক দিক বললেই এর সহজবোধ্যতা ও সরলতার কথা আসবে এবং লেখকের প্রতিভার কথা বললেই সৌন্দর্যের কথা আসবে। এদিক থেকে বঙ্কিমের বক্তব্য যথার্থ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বিষয়ক এই বক্তব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র (লুপ্তরত্নোদ্ধার এর ভূমিকা) প্রবন্ধেও বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধেও টেকচাঁদী ভাষা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন তার গুণ-দোষ দুইই দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে। "তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।" এই কথাটি বোঝানোর জন্যে তিনি বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করা উচিত। সংস্কৃতে কাদম্বরী প্রণেতা এবং ইংরেজীতে এমর্সনের রচনার ভাষা সাধারণের বোধগম্য নয় ব'লে অনেকেই তাঁদের গ্রন্থ থেকে রস পান না। কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মহাকবিগণ তাঁদের উন্নত ভাবকে প্রচলিত সহজবোধ্য ভাষায় রূপ দিতে পারেন না ব'লে দুরূহ ভাষার আশ্রয় নেন। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োজন নেই।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পূর্বে বাংলা গ্রন্থ পদ্যেই লিখিত হত; তখনো গদ্য ছিল, এবং হস্তলিখিত গদ্যগ্রন্থের কথা শোনা গেলেও সে সব গ্রন্থ এখন নেই। তাই তার ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর থেকেই বাংলা গদ্যের প্রচার। প্রবাদ আছে যে রামমোহনই প্রথম গদ্য লেখক। এরপর ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা সাধু বা পণ্ডিতী ভাষা এবং অপর ভাষা বা প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা এই দুই পৃথক ভাষায় পরিণত হয়েছিল। পণ্ডিতদের কথোপকথণের ভাষাও ছিল সংস্কৃতানুসারী। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে ভট্টাচার্যদের ভাষা শুনেছেন—খয়ের এর পরিবর্তে খদির, চিনির পরিবর্তে শর্করা, ঘিয়ের পরিবর্তে আজ্য প্রভৃতি শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন। তাঁদের লিখিত ভাষা ছিল আরও ভয়ঙ্কর। পণ্ডিতদের এই উৎকট ভয়ঙ্কর ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছুটা সংস্কারপ্রাপ্ত হয়। এঁদের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হলেও তত দুরূহ নয়। বিশেষ করে "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য কেহ লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও পারে নাই।" তবুও এ ভাষা সর্বজনবোধ্য নয়। সকল রকম কথা এ ভাষায় ব্যবহৃত হত না ব'লে এতে সব রকম ভাবও প্রকাশ করা যেত না। বিদ্যাসাগরের ভাষার মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়ে এবং প্রাচীন প্রথার প্রতি আসক্ত হয়ে কেউ আর নতুন ক'রে ভাষা নিয়ে চিন্তা করতেন না। তাই বাংলা ভাষা পূর্বের মতো সংকীর্ণ পথেই চলছিল। এটি ভাষার ক্ষেত্রে প্রথম বিপদ। দ্বিতীয় বিপদ হল শুধু ভাষা নয়, সাহিত্যের বিষয়ও সংকীর্ণ পথে চলছিল। বাংলা ভাষা যেমন সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, তার ভাবও তেমনি সংস্কৃত বা ইংরেজির ছায়ামাত্র ছিল। বিদ্যাসাগর প্রতিভাবান্ ব্যক্তি হলেও তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' সংস্কৃত থেকে, 'ভ্রান্তিবিলাস' ইংরেজি থেকে এবং

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দী থেকে সংগৃহীত। অক্ষয় কুমার দত্তের অবলম্বন ছিল ইংরেজি এবং আর সকলে তাঁর অনুকারী। জগতের অখণ্ড ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে না এনে সংস্কৃত ও ইংরেজির ভাণ্ডারে সকলেই চুরির সন্ধানে ছিলেন। সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর বিপদ আর হয় না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবু সময়ের প্রয়োজনে যা করেছেন তা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্ত বাঙালী লেখকদেরই সেই পন্থাবলম্বন ঠিক নয়।

এ দুটি গুরুতর বিপদ থেকে বাংলা সাহিত্যকে প্যারীচাঁদ মিত্র উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙালীর বোধগম্য ও সকল বাঙালী কর্তৃক ব্যবহৃত, তিনি সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখলেন। তিনিই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান করলেন এবং স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে রচনার উপাদান সংগ্রহ করলেন। 'আলালের ঘরে দুলাল' এ তাঁর এ দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। এ গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হবে। এর দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে উপকার হয়েছে, কোন গ্রন্থের দ্বারা তা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ।

এর ভাষা আদর্শ নয় ঠিকই, এতে গাম্ভীর্যের ও বিশুদ্ধির অভাব অবশ্যই আছে। এতে উন্নত ভাব সকল সব সময়ে পরিস্ফুটও করা যায় না ঠিকই, কিন্তু এ-গ্রন্থ প্রথম প্রচার করল যে সর্বজনবোধ্য কথ্য ভাষায় গ্রন্থ লেখা যায় এবং তা সুন্দরও হয়। যে সর্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুসারী ভাষায় দেখা যায় না, এ ভাষার তাই সর্বাপেক্ষা বড গুণ। আর এ কথা জানার পর বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথে চলেছে। বঙ্কিমের কথায় "বাঙ্গালা ভাষার এক-সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহারা কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' এর পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে চলছে—এর প্রথম ও প্রধান কারণ প্যারীচাঁদ। এটি তাঁর প্রথম কীর্তি। তাঁর দ্বিতীয় এবং অক্ষয় কীর্তি এই যে তিনিই প্রথম দেখালেন সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত সাহিত্যের মূল্যায়ন এ প্রবন্ধে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শে প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রলাল মিত্র পিতার গ্রন্থগুলি একত্র পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন। এইরূপ সংগৃহীত গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছিল 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার'। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এবং বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের ভূমিকা কি এবং সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান কি—এ বিষয়ে সূত্র নির্দেশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাদির বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধুমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' এর ভাষা ও ভাবের কথা মনে রেখেই তিনি এই সূত্র নির্দেশ করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও গদ্যের যে সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গভীর ও বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস দিয়েছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের লাবণ্যময়ী গদ্য ভাষা দেখার সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের হয় নি। তাই তাঁর সমকালে

তিনি যে বাংলা গদ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার ওপর ভিত্তি ক'রে তাঁর এই আলোচনা যথেষ্ট মৌলিক ও মনীষাদীপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী' সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা নয়। এতে অগ্রজের জীবন-বৃত্তান্তই তিনি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। জীবনী লেখার উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, "যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ-গুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না।" তিনি অগ্রজের জীবনী লিখতে গিয়ে গুণের কথা বেশী বললেও দোষের কথাও একেবারে উপেক্ষা করেন নি।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আকাশ রঙ্গিনী'র সমালোচনা উপলক্ষে রচিত বঙ্কিমের 'গীতিকাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে 'কাব্য' শব্দের ব্যাপক অর্থ ইঙ্গিত ক'রে কাব্যের শ্রেণী সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং পরে খণ্ড কাব্য বা গীতিকাব্যের স্বরূপ এবং নাটক, গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে কাব্য কাকে বলে তা বোঝানোর জন্য অনেকে চেষ্টা করলেও কারো উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা সন্দেহ। কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তা সত্বেও কাব্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই কাব্য কি তা অপরকে বোঝাতে না পারলেও নিজে একপ্রকার অনুভব করতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন কিছু গ্রন্থকে কাব্য বলা না হলেও তাদের কাব্য নাম প্রাপ্য। যেমন রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ-বিশেষ কাব্য। স্কটের উপন্যাসও কাব্য এবং নাটককেও তিনি কাব্য ব'লে গণ্য করেন।

ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের শ্রেণী বিভাগের মাত্র তিনটিকে গ্রহণ করতে চান, বাকী বিভাগগুলিকে 'অনর্থক' মনে করেছেন। প্রথম দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি দ্বিতীয় আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য। রঘুবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এমনকি বাসবদত্তা কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য এবং আধুনিক উপন্যাসসমূহও এই বিভাগের মধ্যেই পড়ে। যে সব কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নয়, তাকেই তিনি বলেছেন 'খণ্ডকাব্য'। এই তিন প্রকার কাব্যের মধ্যে রূপগত পার্থক্য আছে। আবার রূপগত বৈষম্যও অনেক সময় প্রকৃত পার্থক্যের সন্ধান দেয় না। দৃশ্যকাব্য সাধারণতঃ কথোপকথনে রচিত হয় এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। কিন্তু যা কথোপকথনে রচিত ও অভিনয়োপযোগী তাকেই নাটক বলা যায় না। নাটকের মতো কথোপকথনে রচিত হলেও পাশ্চাত্যের Comus, Manfred, Faust প্রকৃতপক্ষে নাটক নয়। অনেকে আবার 'শকুন্তলা' ও 'উত্তরচরিত'কে নাটক বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। গেটে বলেন যে কথোপকথনে গ্রন্থন ও অভিনয়ের উপযোগিতা প্রকৃত নাটকের পক্ষে আবশ্যক নয়। বঙ্কিম নিজে Bride of Lamermoor-কে নাটক বলতে ইচ্ছুক। এর থেকে বোঝা যায় আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে লিখিত হতে পারে। বাংলাভাষায় এমন গ্রন্থ অনেক। আবার অনেক খণ্ডকাব্যও মহাকাব্যের আকারে লেখা হয়েছে। সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য বলা ঠিক নয়। Excursion or Child

Harold খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র। খণ্ডকাব্যের মধ্যে অনেক রকম কাব্য অন্তর্গত হতে পারে। তার মধ্যে একরকম কাব্য ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করেছে।

এর নাম গীতিকাব্য (lyric)। ইউরোপে পার্থক্য করা হয়েছে বলে আমাদেরও খণ্ডকাব্যের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে—একথা বঙ্কিম মানেন না। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামের পার্থক্য থাকা আবশ্যক। যদি 'বস্তুর' জন্যই গীতিকাব্য নামটি নিতেই হয়, তাহলে ইউরোপের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

গীত বা গান মানুষের স্বভাবজাত। মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করা গেলেও কণ্ঠস্বরে তা আরো স্পষ্ট হয়। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ছাড়া তো মনের ভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ দরকার। এই সংযোগ থেকে উৎপন্ন বাক্যের নাম গীত। গীতের পারিপাট্যের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন—স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। এই দুটি শক্তি পৃথক এবং একজনের মধ্যে দুটি শক্তি সাধারণতঃ থাকে না। তাই একজন গান লেখেন আর একজন গান করে। এইভাবে গীত ও গীতিকাব্যের পার্থক্য দেখা দেয়। গীত হওয়াটাই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে দেখা গেল যে গীত হলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তভাব প্রকাশক। তাই গীতের উদ্দেশ্য বর্জন ক'রেও গীতিকাব্য রচিত হতে থাকল। এখন এ গীতিকাব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। "গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিদের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী—এগুলিই বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। 'অবকাশরঞ্জিনী' আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

এই প্রবন্ধে এরপর বঙ্কিমচন্দ্র নাটক, গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে যে একটি প্রধান বিষয়ে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, তা অত্যন্ত সুচিন্তিত। তিনি বলেছেন যে মানুষের হৃদয় শোক, ভয়, হাস্য ইত্যাদি কোনো বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, তখন সেই ভাব কতকটা ব্যক্ত হয় কতকটা ব্যক্ত হয় না। যেটুকু ব্যক্ত হয় তা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। "সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী।" আর এই অব্যক্তটুকু যা সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় তাকে ব্যক্ত করতেই হয়, কারণ তা ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়কে করে উচ্ছ্বসিত। গীতিকবির হৃদয়োচ্ছ্বসিত এই অব্যক্ত ভাব নিয়েই কারবার। কিন্তু মহাকাব্যের কবির বক্তব্য এবং অবক্তব্য এই দুই প্রকার ভাব প্রকাশের অধিকার আয়ত্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রামায়ণ মহাকাব্য, ভবভূতির উত্তরচরিত নাটক ও সেক্সপীয়রের ওথেলোর কথা বলেছেন। মহাকবি বাল্মিকী এবং নাট্যকার ভবভূতি সীতা বিসর্জনকালে ও তারপরে রামের ব্যবহারের যে তারতম্য দেখিয়েছেন, তা এই কারণেই। রামের চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়েছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করেছেন। নায়কের হৃদয় অনুসন্ধান ক'রে ভিতর থেকে এক একটি ভাব টেনে এনে তিনি সারি দিয়ে সাজিয়েছেন। বক্তব্য এবং অবক্তব্য দুইকেই তিনি নাটকের অন্তর্গত করেছেন। এতে নাট্যকারের কাজ না ক'রে তিনি

গীতিকাব্যকারের কাজ করেছেন। বাল্মীকি কিন্তু তা করেননি। তিনি কেবল রামের কার্যগুলির বর্ণনা করেছেন এবং সেই কাজ সম্পাদনের জন্য যতখানি ভাব-ব্যক্তি প্রয়োজন, তাই ব্যক্ত করেছেন। ভবভূতির সঙ্গে সেক্সপীয়রের তুলনাতেও বোঝা যায়। সেক্সপীয়র কোনো কথা ওথেলোর মুখে দেন নি, যা সে সময়ের কাজ বা অন্যের কথার উত্তরে বলার প্রয়োজন নেই।

আমরা পূর্বেই বলেছি বঙ্কিমের এই আলোচনা অত্যন্ত চিন্তাগর্ভ। তিনি নাটককেও যে কাব্য বলেছেন এবং অনেক গ্রন্থ যা কাব্য নামে পরিচিত নয় তাকেও কাব্য বলেছেন, তা কাব্যের ব্যাপক অর্থ মনে রেখেই। ভারতীয় আলংকারিকগণ কাব্যকে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ক'রে নাটককে কাব্যই বলেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, স্কটের উপন্যাস প্রভৃতিকে কাব্যমধ্যে গণ্য করায় তাঁর মৌলিকতা আছে। নাটকের মতো কথোপকথন থাকলেই এবং অভিনয়োপযোগী হলেই তিনি যে কোনো গ্রন্থকে নাটক বলতে চাননি তার জন্য অবশ্য তিনি গেটের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত একথা তাঁর আলোচনাতেই বোঝা যায়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের সূক্ষ্ম কাব্যশ্রেণীবিভাগকে তিনি সমর্থন না ক'রে মাত্র তিনটি বিভাগকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের অন্তর্গত করেছেন আধুনিক উপন্যাসকে। সংস্কৃতে গদ্যে রচিত কাদম্বরী বা 'কথা'র সংস্কারবশতঃই তিনি এ কাজ করেছেন।

কিন্তু বর্তমানকালে উপন্যাস গদ্য রচিত একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে গণ্য করা হয় —উপন্যাসকে কাব্যমধ্যে গণ্য করা হয় না। নাটক ও মহাকাব্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আরিস্টটল তাঁর Poetics এ অনেকগুলি সূত্র দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তা আরিস্টটলর ওপর ভিত্তি করে হলেও বঙ্কিমের বক্তব্যও মূল্যবান। এইখানে তিনি অ্যারিস্টটলের আভাসিত বক্তব্যকে নূতন ভাবে রূপ দিয়েছেন। নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও যথেষ্ট মৌলিক গীতিকাব্যের আদিম লক্ষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের ইতিহাসেই মেলে। গীতিকাব্যের সংজ্ঞা ও তার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও নূতন। তিনি Comus, Manfred ইত্যাদিকে নাটক বলতে চাননি—কিন্তু এগুলিকে 'নাট্যকাব্য' বলাই যথার্থ। বঙ্কিমচন্দ্র এই দিকটি অবশ্য ভেবে দেখেননি। আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয় উক্তি নাটকে থাকতে পারে একথা তিনি বললেও কখন কোন সময়ে থাকা প্রয়োজন তা জানতে আমাদের কৌতূহল হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ-প্রশ্নের উত্তর নেই।

'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যে অতিপ্রকৃত বিষয় সংস্থানের উদ্দেশ্য প্রকৃতের সঙ্গে অতিপ্রকৃতের সম্পর্ক এবং দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে অতিপ্রকৃত উপাদান-যোজনায় কবিদের কৃতিত্ব বিচার করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়।' কিন্তু কখনো কখনো মহাকবিরা যা অতিমানুষ তারও বর্ণনা করেন। অবশ্য এই বর্ণনায় অধিকাংশ চরিত্রই মানবচরিত্রেরই আনুষঙ্গিক হয়। মহাভারত, ইলিয়াদ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে মানবচরিত্রের সঙ্গে দেবচরিত্রের বর্ণনাতেও পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনাতে সাধারণতঃ

রসহানি ঘটে, কারণ এই সকল চরিত্র মনুষ্য-চরিত্রানুকারী নয় বলে তাদের সঙ্গে পাঠকের সহৃদয়তা জন্মে না। তবুও প্রাচীন কবিরা দেবচরিত্র অঙ্কন করেও যে সফল হয়েছেন, তার কারণ দেবচরিত্রগুলিকে তাঁরা মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা পূর্ণাবতার স্বরূপ হলেও মানুষের মতই তিনি মানবধর্মাবলম্বী। মানুষিক চরিত্রের ওপর অতিমানবীয় বল ও বুদ্ধির সংযোগে এ চরিত্র মনোহারী হয়ে উঠেছে। তাই এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত "কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃত ও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।"

সংস্কৃতে কুমার সম্ভব এবং ইংরেজিতে Paradise Lost এই দুইখানি কাব্যে অতিপ্রকৃত বা দৈব আনুষঙ্গিক বিষয় নয়—মূল বিষয়। মিল্টনের নায়ক তার অনুচরবর্গ ঈশ্বর বিদ্রোহী ও শয়তান। মিল্টন এখানে কোনো পক্ষকেই মানবপ্রকৃতি বিশিষ্ট করেন নি। তাই তিনি কাব্যরসের অবতারণা করেও লোক-মনোরঞ্জনে তেমন সাফল্যলাভ করেন নি। অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হয়েও Paradise Lost বহুপঠিত কাব্য নয়, সকলে এটি আনুপূর্বিক পড়েন না—পড়তে কষ্ট হয়। আদম ও ইভের চরিত্র অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক—কিন্তু এরা কাব্যের নায়ক-নায়িকা নন। আবার আদম ও ইভ প্রথম মনুষ্য চরিত্র, তাই যে সকল শিক্ষারগুণে মানুষ মানুষ, তা এদের শিক্ষা হয়নি। এ কারণে এ-কাব্যে প্রকৃত মানব-মানবী নেই।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেও মনুষ্যচরিত্র নেই। নায়ক পরমেশ্বর এবং নায়িকা পরমেশ্বরী। তাছাড়া আছে আরো অনেক দেবদেবী। এ-কাব্যের তাৎপর্য অত্যন্ত গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সর্বদা বিবাদে মত্ত। একদল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঐহিক সুখলাভে প্রয়াসী ও ঈশ্বর চিন্তায় বিরত। অন্যদল বিষয়-বিবিক্ত, সাংসারিক সুখ-বিদ্বেষী এব ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। একদল শারীরিক সুখকেই সার করেন। অন্যদল শারীরিক সুখের ঘোর বিরোধী। কিন্তু দুই দলই ভ্রান্ত। শারীরিক ভোগাতিশয্য দোষের, কিন্তু পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম—সংসার রক্ষার কারণ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত। শারীরিক এবং পারত্রিকের সম্মেলন-গানই কুমারসম্ভবের উদ্দেশ্য। পর্বতকন্যা উমা শরীররূপিণী আর মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। উমা প্রথমে ভুল করেছিলেন। পরে চিত্ত বিশুদ্ধ করে যখন শান্তির প্রতি মন দিলেন, তখন তাঁকে লাভ করলেন। দেব চরিত্র অঙ্কনে কালিদাস মিল্টনের চেয়ে সার্থক। কারণ তিনি কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করে অঙ্কন করেছেন। উমা আগাগোড়া মানুষী। মেনকাও তাই। উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতির—হাড়ে হাড়ে মানব। তাছাড়া কুমারসম্ভব-এর কবিত্ব বিশেষ করে তৃতীয় সর্গের কবিত্ব অতুলনীয়। মিল্টনের চেয়ে এর কাব্যগুণও অনেক বেশী। সাহিত্যে দৈব বা অতিপ্রকৃতের সন্নিবেশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বক্তব্যের অনুরূপ এবং এই বিষয় সাহিত্যে প্রয়োগ করে যাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন, তাঁদের ভূমিকার কথা স্মরণ করলেও তাঁর উক্তির যাথার্থ উপলব্ধি করা যায়। হোমরের ইলিয়াদ মহাকাব্যে যে-সকল দেব-দেবীর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও মানবীয় গুণ যথেষ্টই আছে। ইংরেজ কবি কোলরীজ অতিপ্রকৃত বিষয়-

সন্নিবেশে যে অসাধারণ সার্থকতা অর্জন করেছেন, তার মূলে রয়েছে দৈনন্দিন পরিচিত জীবনের মাঝখানে তিনি তাকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যে, তা আমাদের মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে গিয়েও বাধা পায়। কোথাও মনস্তাত্ত্বিক পথ ধরে এমনই একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে তাকে আনা হয়েছে—যা কাব্য পাঠকালে আমাদের অভিভূত ক'রে রাখে। অতিপ্রকৃত-সন্নিবেশের সার্থকতার সূত্রটি হল 'A willing suspension of disbelief'. সূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে থাকবে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে অতিপ্রকৃত বলতে যা অতিমানবীয় দেবদেবী সম্পর্কিত—তাকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু ভূত-প্রেত বা অশরীরীরাও যে অতিপ্রকৃতের অন্তর্গত, এরাও যে অনৈসর্গিক বা Supernaturalএর অন্তর্গত সে-বিষয়ে কিছু বলেন নি। ইংরেজ কবি কোল্‌রীজকে প্রকৃতের সঙ্গে অতিপ্রকৃতের সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। Ancient Mariner ও Christabel এ দুই কবিতায় তিনি শরীরী প্রেতের আমদানী করেছেন বিশেষ পরিমণ্ডল, কিন্তু পরিচিত সংসারের মধ্যে সেই রহস্যময়তাকে দেখান নি। দেব চরিত্রকে অতিপ্রকৃত ধরে তার মধ্যে মানবীয় ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই অতিপ্রকৃতের সার্থকতা—বঙ্কিমের এ উক্তি গ্রাহ্য।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক আরো দুটি প্রবন্ধের আলোচনা ক'রে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। দুটি প্রবন্ধেই বঙ্কিমের সমালোচনা শক্তির চূড়ান্ত পরিচয় আছে। একটি ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক এবং অন্যটি দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত। দুইটিই অত্যন্ত দীর্ঘ সমালোচনা। প্রথমটির নাম—**"ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—ভূমিকা। (জীবন চরিত ও কবিত্ব)** এবং দ্বিতীয়টির নাম **"রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা"** প্রথম প্রবন্ধটির শুরুতেই একটি 'উপক্রমণিকা' তারপর তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের 'বাল্য ও শিক্ষা' পরিচয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কর্ম' কথা এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কবিত্ব' সম্পর্কে আলোচনা। 'উপক্রমণিকায়' বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন যে সুলেখক ও সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী বহু কষ্টে সংগ্রহ করে তাঁকে কতকগুলি 'নোট' দিয়েছিলেন। সেই নোটগুলি অবলম্বন করেই এই জীবনী লিখেছেন। তাঁর নোটগুলি এমনই পরিপাটি যে তিনি কাটাকুটি বেশী করেন নি। শুধু নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদটি এইভাবেই লেখা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের নিজের বক্তব্যও গ্রথিত করার প্রয়োজন হয় নি। একমাত্র তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর লেখা। এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের অপরূপ বিশ্লেষণ।

মনে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম প্রভাতে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং গুরুর প্রতি তাঁর একটা কৃতজ্ঞও ছিল। এই আলোচনার মাঝে মাঝে গুরুর প্রতি ভক্তিবশত উচ্ছ্বাস এবং অতিরিক্ত প্রশংসা যে না আছে তা নয়। তবুও ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা অতিশয় গভীর এবং উচ্চাঙ্গের। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে এমন আলোচনা বিরলদৃষ্ট। উপক্রমণিকায় খাঁটি বাঙালী কথায় বাঙালী মনের ভাব যে ঈশ্বর গুপ্তের পর অন্তর্হিত হচ্ছে—এনিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মেনা—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।" বাঙ্গালার অবনত অবস্থাতেই এ ধরনের কবির জন্ম হয় বলে তাঁর ধারণা। 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করে 'পৌষপার্বন' কেউ আর এখন চায় না, কিন্তু পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে তা 'বৃত্রসংহার' এ নেই একথাও স্বীকার্য। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার জিনিসগুলি দেশী—মায়ের প্রসাদ। এগুলিকে যত্ন করে রাখা দরকার। জননী জন্মভূমির প্রতি যার ভালোবাসা আছে, সে এগুলিকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের বাল্য, শিক্ষা ও কর্ম সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত আছে তার বিস্তারিত পরিচয় দিতে চাই না। এ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি। ঈশ্বর গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অলংকার। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ দাস এবং মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। বাংলা ১২১৮ সালের ২৫-এ ফাল্গুন কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে মধ্যবিত্ত পরিবারে কবির জন্ম। তাঁর মাতামহের নাম জোড়াসাঁকোর রামমোহন গুপ্ত, কানপুরে বিষয়কর্ম করতেন—অবস্থা তাঁর সচ্ছল ছিল না। বাল্যকালে, ঈশ্বর গুপ্ত, খুব দুরন্ত ও সাহসী ছিলেন। তাঁর দশ বৎসর বয়সের সময় মাতার মৃত্যু হয়। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে বালক ঈশ্বর গুপ্ত 'মেকি' মাকে সহ্য করতে পারলেন না। প্রথম সাক্ষাতেই একগাছা রুল ছুঁড়ে তাকে মারেন। আঘাত তাঁকে না লাগলেও জ্যেঠা মশায় এসে ঈশ্বর গুপ্তকে জুতার সাহায্যে প্রহার করেন। পিতামহও 'তোদের মা নাই, মা হইল' ইত্যাদি বলে তাঁকে বোঝালেন। ঈশ্বর গুপ্ত বুঝলেন এ সংসারে মেকির পক্ষ হয়ে না চললে জুতো খেতে হবে। ভবিষ্যতে এই কবিই সকল রকম মেকিকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেন। তাঁর বাল্যকালের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মাত্র তিন বছর বয়সে মাতুলালয়ে এসে তিনি মশা-মাছির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। শয্যাগত অবস্থায় তিনি নাকি স্বতঃই আবৃত্তি করতে থাকেন—

'রেতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি'।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তিন বছর বয়সে জন স্টুয়ার্ট মিল গ্রীক লিখেছিলেন—একথাটি যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে এটিও চলুক। ঈশ্বর গুপ্তের পিতা ও পিতৃব্যদের সঙ্গীতরচনা-শক্তি ছিল। বীজগুণে তো অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তাই ঈশ্বর গুপ্ত এই গুণটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়া শেখায় ঈশ্বর গুপ্ত তেমন মনোযোগী ছিলেন না। মুখে মুখে এই সময় কবিতা রচনা করতে পারতেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা পারস্য ভাষায় যে সব বই অর্থ ক'রে পাঠ করত, তা শুনে এক একটি স্থল অবলম্বনপূর্বক তিনি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেন।

মাতৃহীন হওয়ার পর ঈশ্বর গুপ্ত মাতুলালয়ে এসে সামান্য শিক্ষালাভ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত শিক্ষিত হলে বংলা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হত—বাংলার উন্নতি ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হয়ে যেত। তাঁর রচনায় দুটি বস্তুর অভাব—(ক) মার্জিত রুচির এবং (খ) উচ্চ লক্ষ্যের।

তাঁর রচনা অনেকটাই ইয়ারকি। জগদীশ্বরের সঙ্গেও ইয়ারকি। অবশ্য তাঁর রচনার ইয়ারকির একটি মূল্য আছে—অনেক সময় তা বিশুদ্ধ ও পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। সুশিক্ষার অভাবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় নি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কঠিন সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা একবার শুনেই তা নিয়ে অবিকল কবিতা রচনা করতে তিনি পারতেন। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখ তাঁর একজন বাল্যসখা 'সংবাদ প্রভাকর' এ লেখেন যে বাল্যকালে পাঠদ্দশায় ঈশ্বর গুপ্তের এক একটি অলৌকিক কাণ্ড লক্ষ্য করছেন। "প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃদসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন।" তিনি আরো লিখেছেন যে কবির ১৭।১৮ বছর বয়সের সময় লেখক তাঁর সঙ্গে একত্র সহবাস করতেন এবং তাঁর কাছে কবি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে থাকেন। একমাস কি দেড়মাসের মধ্যেই তিনি 'মিশ্র পর্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।'

কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে তাঁর মাতামহের পরিচয় থাকাতে তিনিও সে বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হন। পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সখ্য জন্মে। তাঁর নিকট থেকে তিনি অনেক কবিতা লিখতেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবী সৌভাগ্য ও যশের কারণ এই যোগেন্দ্রমোহন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা গৌরীমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গৌরীমণি দেখতে কুৎসিত, হাবা-বোবার মতো। তার সঙ্গে তিনি কথা কইলেন না—আবার মেকি। ঈশ্বর গুপ্ত নাকি কাঁচড়াপাড়ার এক ধনবানের পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা তাঁর অমতে ঐ কুলীন মল্লিক-কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন ব'লে এ-বিবাহ সুখের হয় নি। তিনি অবশ্য অনুরুদ্ধ হয়েও আর বিবাহ করেন নি। চিরকাল ঘরে রেখে স্ত্রীর ভরণপোষণর দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কিছু কাগজও রেখে যান। স্ত্রীলোকেব কাছ থেকে মানুষের যে শিক্ষা হয়, কপালগুণে ঈশ্বর গুপ্তের তা হয় নি। স্ত্রীলোক তাই তাঁর কাছে ব্যঙ্গের পাত্র। ১২৩৭ সালে ঈশ্বর গুপ্তের পিতা মারা যান। তখন অর্থোপার্জন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কর্ম' বৃত্তান্তের শুরুতেই ঈশ্বর গুপ্ত কিভাবে 'সংবাদ-প্রভাকর' এর সঙ্গে যুক্ত হলেন তারই কথা। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তি দেখে ১২৩৭ সালে সংবাদ-প্রভাকর সাপ্তাহিক পত্ররূপে বের করেন। এর পূর্বে ১, বাঙ্গালা গেজেট—১২২২, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ২ সমাচার দর্পণ (১২২৪, শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত), ৩ সংবাদ কৌমুদী—১২২৭ রাজা রামমোহন রায়, ৪ সমাচার চন্দ্রিকা—১২২৮, ৫ সংবাদ তিমির নাশন এবং ৬ বঙ্গদূত—নীলরত্ন হালদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর ১২৩৭ এর ১৬ই মাঘ প্রথম বের হয়। ১২৫৩ এর ১লা বৈশাখ ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছিলেন, "বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রথমে চোরবাগানে এক মুদ্রণযন্ত্র ভাড়া করে এটি ছাপা হত, পরে

ঠাকুর বাড়ীতে স্বাধীনভাবে যন্ত্রালয় স্থাপিত হয় এবং ৩৯ সাল পর্যন্ত তা চলে। ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত এই পত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে যাঁরা লিখতেন তাঁদের তালিকা কবি নিজেই ঐ সংখ্যায় দিয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, নন্দলাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। 'প্রভাকর' বাংলা রচনার রীতিও অনেকাংশে পরিবর্তিত করে। ভারতচন্দ্রী ধরণটা 'প্রভাকরের' অনেকখানি ছিল ; কিন্তু আর একটা ছিল—যা কখনো পূর্বে ছিল না। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা—এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হতে পারে এটা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখায়। তাছাড়া এর শিক্ষানবীশদের কীর্তিও স্মরণীয়। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এখানে লিখতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমকে রচনায় উৎসাহ দিতেন সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে কিছু দিন 'প্রভাকর' বন্ধ থাকে। সেই সময় ঈশ্বর গুপ্তের শক্তির পরিচয় পেয়ে আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণ তাঁকে সম্পাদক করে 'সংবাদ রত্নাবলী' বের করেন। সাধারণের নিকট এ পত্রিকাও আদৃত হয়েছিল।

এই সময় কিছুদিন কটকে গিয়ে সেখানে এক পণ্ডিতের তিনি তন্ত্রশাস্ত্র শিখে আসেন। তারপর কলকাতায় এসে আবার 'সংবাদ প্রভাকর' এর প্রচারের চেষ্টা ক'রে সফল হন। ১২৪৩ সালের ১লা বৈশাখ আবার 'প্রভাকর' প্রকাশিত হল কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে। প্রথমে চার মাস অন্তর এটি বের হত, পরে হল সাপ্তাহিক (১২৪৬এর ১লা আষাঢ়)। ভারতবর্ষের প্রথম সাপ্তাহিক দেশীয় পত্র 'প্রভাকর'। এর গ্রাহকের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত বেশী।

১২৫৩ সালে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্র থেকে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আরও একটি পত্রিকা বের করেন। ১২৫৪ সালে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্রিকা বের করেন। এঁর সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বিবাদ শুরু হয়। 'পাষণ্ডপীড়ন' ও 'রসরাজ' এ কবিতা-যুদ্ধ চলে অত্যন্ত কুৎসাপূর্ণ ভাষায়। এই দুই পত্রের অশ্লীলতা দেখে লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণে আইন প্রণয়ন করেন ও সফল হন। তারপর থেকেই এই পাপ আর নেই ১২৫৪ সালের ভাদ্রমাসে 'পাষণ্ডপীড়ন' উঠে গেলে ঈশ্বর গুপ্ত 'সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এতে তাঁর ছাত্রদের কবিতা ও প্রবন্ধ বের হত। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরও কয়েক বছর এটি চলেছিল। তিনি কলকাতা ও মফঃস্বলের অনেকগুলি 'সভার' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা, নীতিতরঙ্গিণী সভা ইত্যাদি।

একাল ও সেকালের সন্ধিস্থলে তাঁর আবির্ভাব। একালের মত তিনি নানা সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আবার অন্যদিকে কবির দলে, হাফ আখড়াই এর দলে গান বাঁধতেন তিনি।

১২৫৭ সাল থেকে নববর্ষে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভাপতিত্বে একটি অনুষ্ঠান করতেন। তিনি নিজে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করতেন, তারপর

ছাত্রেরা। উৎকৃষ্ট রচনার জন্ত ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হত। সভাভঙ্গের পর সকলকে মহাভোজ দিতেন। ১২৬০ সালের ১লা তারিখ থেকে স্থূলকায় করা হল 'প্রভাকর' কে মাসিক পত্র ক'রে। এতে খণ্ড কবিতা, ছড়া ও গন্ত-পন্তপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশিত হত। 'দৈনিক প্রভাকর' এর সম্পাদনার ভার দেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর—নিজে মাসিক পত্র যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করতেন। শেষ জীবনে ঈশ্বর গুপ্ত দেশপর্যটন করতেন খুবই। পূর্ববাংলা, গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও নানা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। মিষ্টভাষিতা ও সরলতার জন্ত তিনি সকলের হৃদয় জয় করেন।

প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতা, গীত, পদাবলী এবং তাঁদের জীবনী প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে তিনি ক্রমাগত দশ বছর নানা স্থান পর্যটন করেন ও এ বিষয়ে সফল হন। সর্বপ্রথম ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে রামপ্রসাদ সেনের জীবনী, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন বিষয়ক গীত তিনি প্রকাশ করেন। তারপর রামনিধি সেন, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাসবৈরাগী, লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, রাসু, নৃসিংহ এবং আরো অনেকের গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁর লুপ্তপ্রায় অনেক কবিতা বহু কষ্টে সংগ্রহ ক'রে ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রভাকরে তিনি প্রকাশ করেন, পরে স্বতন্ত্র আকারে বের হয়। ঈশ্বর গুপ্তের এটিই প্রথম পুস্তক প্রকাশ। 'প্রবোধপ্রভাকর' পুস্তকও এইভাবে বের হয়। এরপরে 'হিতপ্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ'ও প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং গীতি কবিতা 'গীতিহার' নামে প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা কবিতার অনুবাদেও তিনি হাত দেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি। ১২৬৫ সালে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১০ই মাঘ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'প্রভাকর' থেকে প্রচুর অর্থোপার্জন যেমন হত, ঈশ্বর গুপ্ত তেমনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রচুর অর্থ সাহায্যও করতেন। তাঁর বাড়ীতে আহারের দ্বার সব সময় অবারিত ছিল। বাল্যে দুরন্ত হলেও পরে তিনি মিষ্টভাষী, হাস্যময়, সুরসিক ব্যক্তিরূপেই খ্যাত হন। পানদোষ অবশ্য তাঁর ছিল। এর জন্য যাঁরা তাঁর নিন্দা করত, তিনি তাঁদের কবিতায় আক্রমণ করতেন। বঙ্কিম তাঁকে দেখেছিলেন সুপুরুষ ও সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে। নিজের কবিতা পড়ে তিনি শোনাতে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জিত ছিল না আর। তিনি বিলাসী ছিলেন না।

এরপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমালোচনা তা তুলনারহিত। মনুষ্যহৃদয়ের কোমল-উন্নত গম্ভীর অস্ফুট ভাবগুলিকে—অব্যক্তকে রূপ দিতে ঈশ্বর গুপ্ত জানতেন না। সৌন্দর্য-সৃষ্টিতেও তিনি তেমন নিপুণ নন। তাই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁরা সকলেই কবিত্বে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের মতো হীরা মালিনীর সৃষ্টি, কাশীরামের মতো সুভদ্রাহরণ বর্ণনা, কৃত্তিবাসের মতো তরণীসেন-বধ বর্ণনা কিংবা মুকুন্দরামের মতো ফুল্লরা সৃষ্টিও তিনি করতে পারেন নি। সুন্দর, করুণ, প্রেম এসব তাঁর কাব্যে তেমন নেই। কিন্তু তাঁর যা আছে, আর কারো তা নেই।

'আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।' বাস্তবকে আরো ভালো বা আদর্শান্বিত ক'রে তার রূপ-দান মধুসূদনাদি কবি করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তা করেন নি। তাই বলে কি পূর্বোক্ত কবিরা শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর গুপ্তের স্থান নিম্নে? বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যা বাস্তব, যা প্রত্যক্ষ তাতেও রস আছে, সৌন্দর্য আছে। ঈশ্বর গুপ্ত এই রস ও সৌন্দর্যের কবি এই বাংলা সমাজে—শহরের ও গ্রামের তিনি কবি। তিনি পৌষপার্বণে পিঠেপুলিতে রস পান, দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি চালের দরটি কষে রস পান। তিনি সুন্দরীদের রান্নাঘরে উনুন-পাশে বসিয়ে শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলে এক রকম খাঁটি রস বের করেন। তাঁর কাব্য "চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির কজীর ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায় পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়।" আমাদের এ-সমাজ রঙ্গভরা। তিনি রঙ্গ দেখেন, কে কাকে ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি দেখেন পুরুষ যেমন বাঁদর পোষে, পুরুষে তেমনি মেয়ে মানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙানোতে সুখ। স্ত্রীলোকের রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে হাসেন, তাদের প্রাতঃস্নানের সময় রূপ দেখার বদলে তাদের নাকাল দেখতে যান। মোট কথা "ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরগুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং এখানে তিনি অদ্বিতীয়।"

ব্যঙ্গ অনেক সময়েই বিদ্বেষ প্রসূত। ইউরোপের বহু ব্যঙ্গকুশল লেখকের রচনায় হিংসা, অসূয়া পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই। তিনি কারো অনিষ্ট কামনা করেন না; তাঁর গালি অসূয়া বা বিদ্বেষ বর্জিত। মেকির ওপর রাগ থাকলেও সবটাই রঙ্গ—ঘোর ইয়ারকি। যাকে সামনে পান, গালে একটি চড় বা কাণমলা দিয়ে ছেড়ে দেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত (ক) 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে'। (খ) মহারাণীকে স্তুতি করতে গিয়ে দেশীয় Agitatorদের ব্যঙ্গ—

"তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালী ঘাস।"

(গ) সাহেবদের নৃত্যগীত—গুড়ু "গুড়ু গুম গুম্ লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥" ইত্যাদি।

অবশ্য মেকি নিয়ে তিনি গালাগালাজ করেছেন। মেকির ওপর ক্রোধ থেকেই অনেক সময় তাঁর কাব্যে অশ্লীলতা দোষ এসেছে। অবশ্য প্রকৃত অর্থে তাঁর কাব্যে অশ্লীলতা ঠিক নেই। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা বা হৃদয়ের কদর্য ভাব থাকলেই তা অশ্লীল। ঈশ্বর গুপ্তে তা নেই। তখনকার ক্রোধের ভাষাই ছিল অশ্লীল। ঈশ্বর গুপ্ত পাপকে উৎসাহিত বা তিরস্কৃত করার জন্ম রুচি ও সভ্যতা বিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে তাকে যথার্থ অর্থে অশ্লীল বলা উচিত নয়। তিনি সেকেলে বাঙালী বলে তাঁর কবিতা অশ্লীল। সংসার ও সমাজের ওপর তাঁর রাগবশতঃ তিনি অশ্লীল। সেকালে বাঙালীর ক্রোধ অশ্লীল ভাষাতেই প্রকাশ পেত। এই ভাবে তাঁর কাব্যে এসেছে অশ্লীলতা। শুধু ইয়ারকির জন্যও অন্য ধরণের অশ্লীলতাও অবশ্য কিছু আছে। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করলে এ অপরাধ ক্ষমার্হ। তাছাড়া দেশীয় রুচিতে যা অশ্লীল নয়, পাশ্চাত্য রুচিতে তা অশ্লীল—এর বিপরীত

দিকও আছে। তবুও একথাও অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর কিছু কিছু কবিতায় অশ্লীলতা আছে। যে সব কবিতা বাদ দিয়ে বা অংশ-বিশেষ ছাটাই করে বঙ্কিমচন্দ্র এই সংগ্রহ প্রস্তুত করেছেন। কবির দোষ-গুণ দুইই আলোচনা প্রয়োজন। তাই অশ্লীলতার কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত আর একটি দিকে বঙ্কিম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে দেখি যে একজন অশিক্ষিত যুবক কলকাতার সমাজে ও সাহিত্যে নিজ প্রতিভার গুণেই আধিপত্য স্থাপন করল। কিন্তু তাঁর প্রতিভা যেমন, তা তার উপযুক্ত ফল পায় নি। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। বিশুদ্ধ রুচির অভাবেই এ-মেঘ। দেশের রুচি, কালের রুচি ও পাত্রের রুচি মিলেই এই বিশুদ্ধ রুচি বিঘ্নিত। পুস্তকের শিক্ষার অভাব, মায়ের সংসর্গের অভাব ও পত্নীর সাহচর্যের অভাব পাত্রের রুচিকে ঠিক পথে চালিত করেনি। ঈশ্বর গুপ্তের নৈতিক ও পারমার্থিক কবিতাগুলি যতই নীরস হোক, এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এগুলির মধ্য দিয়ে বুঝি যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মে কোনো ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল।

সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মতো তিনি ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে যেন প্রত্যক্ষ দেখতেন, যেন মুখোমুখি হয়ে কথা কইতেন। নিজেকে পুত্র ভেবে বাপের সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। উত্তর না পেলে কাঁদাকাটি করতেন। তাঁর ঈশ্বর ভক্তির স্বরূপ জানতে গেলে গদ্য ও পদ্য এই বিষয়ক সব রচনাই পড়া দরকার। রামপ্রসাদ মাতৃভাবে ও ঈশ্বর গুপ্ত পিতৃভাবে ঈশ্বর-সাধনা করেছিলেন, এঁরা কেউই কিন্তু বৈষ্ণব নন।

দৃষ্টান্ত—"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥"

যাঁর এমন ঈশ্বরভক্তি তিনি কি বিলাসী হতে পারেন? অবশ্য তিনি ভোজন বিলাসী ছিলেন ঠিকই।

"যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥"

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ধার্মিক, ধর্মে খাটি এবং মেকির ওপর খড়্গহস্ত।

শব্দাড়ম্বর প্রিয়তাও তাঁর রচনার আর একটি দোষ। শব্দচ্ছটার অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাঁর ভাবার্থ অনেক সময় বোঝা যায় না। দেশ-কাল পাত্রের প্রভাবেই তাঁর যমকানুপ্রাসে প্রীতি। কবি-ওয়ালাদের কবিতায়, পাঁচালিওয়ালাদের পাঁচালিতে এর বেশ বাড়াবাড়ি। দাশরথির এটি একটি দোষ। ঈশ্বর গুপ্তের মতো এতো অনুপ্রাস, যমক আর কোন বাঙালী কবি ব্যবহার করেন নি। অবশ্য এক আধ জায়গায় তাঁর অনুপ্রাস প্রসংসনীয় যেমন—'বিবিজান চলে যান লবেজান করে।'

শব্দকৌশলী কবি বলে ঈশ্বর গুপ্তের যেমন একটি দোষ দেখা দিয়েছে, তেমনি একটি গুণও জন্মেছে। অনুপ্রাস, যমকের দিকে যখন তাঁর মন নেই, তখন তাঁর ভাষা খাটি বাংলা। —বাঙালীর প্রাণের ভাষা। "পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই,—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না, সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।"

সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনায় মনোহারিত্বও তাঁর আর একটি গুণ। মোটকথা তিনি কবিতার অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রই প্রায়ই সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত তাই ছিলেন। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। প্রথম দেশবাৎসল্য। এ জিনিসটি ঈশ্বর গুপ্তের সমকালে বিরল ছিল। রামমোহনকে বাদ দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশ বাৎসল্যের প্রথম নেতা ছিলেন এ-দেশে। এঁদেরও কিছু পূর্বগামী ঈশ্বর গুপ্তের দেশ বাৎসল্য। তাঁর দেশবাৎসল্য এঁদের মতো ফলপ্রদ না হলেও তীব্র ও বিশুদ্ধ।

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

তিনি 'মাতৃভাষাকে মাতৃসম' বলেছেন। এ কথা তাঁর সমকালে কয়জন বলতে পেরেছে; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম। ধর্মেও তিনি সমকালীন লোকেদের অগ্রবর্তী ছিলেন। শিক্ষিত হিন্দুরা যাকে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলেন, তাঁর ধর্মও ছিল তাই। অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে তিনি এই ধর্ম সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা যে করেছিলেন তাঁর গদ্যে-পদ্যে তার প্রমাণ আছে। একসময় তিনি ব্রাহ্মও ছিলেন বলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যও ছিলেন তিনি। তৃতীয়তঃ রাজনীতিও ছিল তাঁর অত্যন্ত উদার এবং এক্ষেত্রেও তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কিত দীর্ঘ প্রবন্ধটির আমরা সার সংকলন করে দিয়েছি এই কারণে যে এ ধরণের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ এবং এর ভিতর দিয়ে বিস্মৃতপ্রায় এই কবি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা এবং তাঁর জীবনী সম্পর্কেও প্রামাণ্য বিবরণ সহজেই জানা যাবে। এই সমালোচনায় দুটি দিক-একদিকে জীবনী অংশ ও অন্যদিকে কবির কবিত্ব বিচার এবং অনেকখানি ঐ জীবনীর আলোকে। পাশ্চাত্যে ফরাসী সমালোচক সাঁত বোভ এই জীবনীভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের সেই সমালোচনা-সূত্রের দ্বারা এখানে যে অনেকখানি চালিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের পরিচয় দানকালে সাঁত বোভের সঙ্গে বঙ্কিমের সমালোচনা-সূত্রের সাদৃশ্যের কথা আমরা বলেছি। তাই এখানে এ-বিষয়ে আর আলোচনা করছি না। শুধু একটি কথাই বলব। কেউ কেউ বঙ্কিমের সেই বিখ্যাত বক্তব্য কবির কবিতাকে জানিয়া লাভ আছে বটে কিন্তু কবিকে জানিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ—ইত্যাদি তিন চার লাইন উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এখানে তাঁর বক্তব্যে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে।

আমাদের কিন্তু একথা মনে হয়নি। কবিতাকে বঙ্কিম যে দর্পণ বলেছেন, তা কবি-আত্মারই দর্পণ এবং এই কবি-আত্মা কবির ব্যক্তি-জীবনেরই সূক্ষ্মরূপ। বাস্তব-জগতের যা কিছু ঘটনা বা দৃশ্য কবির মনে গিয়ে তারই আত্মান্তররঞ্জনে রঞ্জিত হয়, তখন ঐ জীবনের সূক্ষ্মরূপ তার মধ্যে অনুস্যূত থাকে। সুতরাং কবির জীবনকে এক হিসেবে উপেক্ষা করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ঈশ্বর গুপ্তের স্থূল বাইরের জীবনকে দেখে নিয়ে তার অন্তর্জীবনের দিকে তাকাতে বলেছেন। আর এই অন্তর্জীবনেরই ছায়া কাব্যে পতিত হয়। তিনি কাব্য পড়ে জীবনী বুঝতে বলেন নি, জীবনী জেনে নিয়ে কাব্যকে জানতে বলেছেন। কাব্যে কবি-জীবনেরই ছায়াপাত ঘটে। কায়াকে ভালোভাবে জানলেই ছায়া বুঝতে সুবিধে হয়।

এ সমালোচনায় বঙ্কিমের উদার মানসিকতার চমৎকার নিদর্শন আছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ যখন বের হয়েছে তখনই তিনি তাঁর মধ্যে ভাবী শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ দেখতে পেয়ে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁরও নাম করেছেন। আবার ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর গুরু হলেও তাঁর অশ্লীলতা-দোষের কথা আলোচনা না ক'রে পারেন নি। অশ্লীলতাকে বোঝাতে গিয়ে বিশেষ ক'রে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে এই অশ্লীলতা দেখা দেওয়ার হেতু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি দেশ কাল-পাত্রের পটভূমিকায় যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা ঐতিহাসিক সমালোচনার পদ্ধতিকেই স্মরণ করায়।

ঈশ্বর গুপ্ত যে শ্রেষ্ঠ কবি নন, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা, কাব্যকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করার নৈপুণ্য এবং বাস্তবকে আদর্শায়িত করার শক্তি যে নেই-একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁর এ-উক্তির মধ্যে সমালোচকের অপক্ষপাত মনোভাবই লক্ষণীয়। কিন্তু যা বাস্তব, যা প্রত্যক্ষ তার মধ্যেও যে এক ধরনের রস আছে, অতিশয় পরিচিত ও তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও যে এক ধরনের মহিমা আছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ঈশ্বর গুপ্তকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি ব'লে তিনি তাঁকেও মূল্য দিতে চেয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত পরিহাসের মধ্যেও ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতায় আন্তরিকতাকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কবির পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ আবিষ্কার ক'রে তিনি রামপ্রসাদের আরাধ্যাদেবীর সঙ্গে মাতা-পুত্র সম্পর্কের যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, তা যথেষ্ট চিন্তাগর্ভ।

খুব উচ্চস্তরের রসবোধসম্পন্ন সহৃদয়-সামাজিকগণের বিচারে ঈশ্বর গুপ্ত কখনই বড় কবি নন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সাধারণ রস-বোধবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকার কাছে তিনি যথেষ্ট প্রিয় কবি যে হতে পারেন—এমন উপকরণ তাঁর কাব্যে প্রচুর আছে। পরিচিত বাঙালী জীবনের এমন বাস্তব চিত্র এবং সেই সব চিত্রের মধ্যেও যে একধরনের রস আছে—তা পরিবেশন করতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুণ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তাঁর যা আছে আর কারো তা নেই এবং 'তিনি আপন অধিকারের মধ্যে রাজা'। আবার তিনি রিয়ালিষ্ট হলেও স্যাটায়ারিস্ট। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষ বা দংশনের তীব্র হুল থাকলে, তা কখনোই প্রশংসনীয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকে সূক্ষ্মভাবে রঙ্গ বা fun বলাই ভাল। এই Fun বা কৌতুক বা রঙ্গের সঙ্গে Satire এর

মিশ্রণ যে নেই, তা নয়—কিন্তু তাই প্রাধান্য পেয়ে Fun কে ম্লান করে নি। এইজন্যই তা এতো উপভোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরসের স্বরূপ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের গভীরগাহী স্বচ্ছ-দৃষ্টির পরিচায়ক।

এই কবি সম্পর্কে তাঁর আর একটি মন্তব্য ও অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রীতি, ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতির আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে তিনি তাঁর 'সময়ের অগ্রবর্তী' ছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে অনেকখানি অগভীর হাস্যরস পরিবেশণ করলেও তিনি যে মাঝে মাঝে কতো গহন-গম্ভীর (serious) কথা বলতে পারতেন এবং তাঁর চিন্তা যে সমকালীন ভাবধারারও উর্ধ্বে উঠতে পারতো—এ ইঙ্গিত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র এ কবির যুগোত্তীর্ণ রূপ ও আধুনিকতার সঙ্গে সংযোগকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এ-কবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের নিকট অল্পবিস্তর সকল আলোচনাই ঋণী।

"রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা" শীর্ষক আলোচনাটিও বেশ দীর্ঘ। এই আলোচনার প্রথমভাগে দীনবন্ধুর যে জীবন-বৃত্তান্তের কিছু পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, তা মূলতঃ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। দীনবন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক ছিল। তাই দীনবন্ধুর জীবনী-সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণিক ব'লে ধরে নিতে পারি। দীনবন্ধুর নাটক আমাদের কাছে খুবই পরিচিত; কিন্তু তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের যে জীবনী সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন আমরা তাঁর মূল বক্তব্যের অল্প পরিচয় দিচ্ছি।

তিনি জীবনী আলোচনায় সুরুতেই জানিয়েছেন যে দীনবন্ধুর জীবনী লেখার এখনও (অর্থাৎ দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর যে-সময় তিনি এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন) সময় হয়নি। এর কারণ-স্বরূপ বলেছেন সবেমাত্র যিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁর কথা বলতে গেলে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক জীবিত ব্যক্তিদের কথাও বলতে হয়। সব সময় জীবিত ব্যক্তিদের প্রশংসাও করা চলে না। অনেক গুহ্য কথা ব্যক্ত করতে হয়। তাছাড়া বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ-গুণ দুইই জীবনীতে বলতে হয়। দীনবন্ধুর গুণের ভাগ বেশী হলেও দোষও কিছু ছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি বলেছেন দীনবন্ধুর জীবনী লেখার সময় এখনো আসেনি। তবু বঙ্কিম যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে তাঁর জীবনী বর্ণনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের কয়েক ক্রোশ দূরে যমুনা নদী দ্বারা বেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৮ সালে নদীয়া জেলায় দীনবন্ধুর জন্ম। দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার একটি গর্ব আছে, দীনবন্ধুর নাম আরও একটি গৌরবের স্থল। তাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অল্প বয়সে হেয়ার স্কুলে এসে কলকাতায় তিনি ইংরেজি শিক্ষা করেন। এখানে থাকবার সময়েই তিনি বাংলা রচনা সুরু করেন।

বাংলা সাহিত্যের তখন খুব দুর্দিন। এই সময় তিনি তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্র 'সংবাদ-প্রভাকর'এর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে যাঁরা

সাহিত্যক্ষেত্রে বা অন্যান্য বিষয় রচনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ঈশ্বর গুপ্তের রুচি বিশুদ্ধ ছিল না—তাঁর অনেক শিষ্যই গুরুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য পথে যান। দীনবন্ধুর মধ্যে অবশ্য গুরুর কিছু প্রভাব ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলায় টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু—এই চারজন রহস্যপটু লেখকদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর সাদৃশ্য টেকচাঁদের সঙ্গে হুতোমের সাদৃশ্যের চেয়ে কম। ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধুর প্রভেদ হল প্রথম জনের রচনা ব্যঙ্গ (wit) প্রধান এবং দ্বিতীয় জনের হাস্য-প্রধান। অবশ্য উভয়বিধ রচনাই দু'জনে লিখেছেন। তবে হাস্যরসে দীনবন্ধু গুরুকে অতিক্রম করে গেছেন।

দীনবন্ধুর প্রধান রচনা 'মানব-চরিত্র' নামে একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সাধু-রঞ্জন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প বয়সের এ লেখায় অনুপ্রাসের আড়ম্বর বেশী—হয়তো গুরুর শিক্ষার ফল। বঙ্কিমচন্দ্র এ কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তার আরম্ভ এইরূপ—

"মানব-চরিত্র ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া॥"

'প্রভাকর'এ তাঁর অনেক কবিতা বের হয়েছিল। এইসব কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যে কবিত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন 'সুরধুনী' এবং 'দ্বাদশ কবিতা'য় তা পান নি। 'জামাইষষ্ঠী' নামে তাঁর দুটি কবিতাও খুব প্রসংশিত হয়। হাস্যরসপ্রধান জামাইষষ্ঠী কবিতাটিতে হাস্যরসসৃষ্টিতে অদ্বিতীয় দীনবন্ধু খুব খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রভাকরে বড় কবিতাগুলি পুনর্মুদ্রিত হলে তিনি সমাদৃত হবেন বলে বঙ্কিমের বিশ্বাস।

দীনবন্ধু 'প্রভাকর' এ 'বিজয়কাহিনী' নামে একটি উপাখ্যানে কাব্য লেখেন; এর নায়ক বিজয় এবং নায়িকা কামিনী। এর ১০/১২ বছর পরে লেখা 'নবীন তপস্বিনী' নাটকেরও নায়ক-নায়িকার একই নাম লক্ষ্য করা যায়। এই দুয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

হেয়ার স্কুল থেকে দীনবন্ধু হিন্দু কলেজে যান এবং সেখানে ছাত্রবৃত্তি নিয়ে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন তিনি। দীনবন্ধুর পাঠ্যাবস্থার কথা বঙ্কিমের জানা নেই। সম্ভবত ১৮৫৫ সালে কলেজ পরিত্যাগ ক'রে ১৫০ টাকা বেতনে তিনি পাটনায় পোষ্টমাস্টারের পদ লাভ করেন। ছয় মাস পরেই তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাস্টার হন। এই কাজে থাকার সময় নানা স্থানে তাঁকে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে, কোথাও স্থির হয়ে থাকার সুযোগ ছিল না। এতে অকালেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। তবে এর ফলে লেখক দীনবন্ধুর উপকার হয়েছিল। তিনি নানা শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। রহস্যজনক চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্বের মূলে এই ভ্রমণ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। উড়িষ্যা থেকে নদীয়া ও নদীয়া থেকে ঢাকায় তিনি বদলি হন। এই সময়েই নীলবিষয়ক গোলযোগ হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রে নীলকরদের

উপদ্রব বিশেষ ভাবে অবগত হন। আর এই সময়েই তাঁর 'নীলদর্পণ'-এর সৃষ্টি। 'নীলদর্পণ' রচনার জন্যে তাঁর অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা জেনেও তিনি ভীত হন নি। গ্রন্থে তাঁর নাম না থাকলেও নাম গোপনের চেষ্টাও কিছু করেন নি। সবাই জেনে যায় যে তিনিই এর রচয়িতা।

পরদুঃখ কাতরতা দীনবন্ধুর এক প্রধান গুণ। আর এরই ফল 'নীলদর্পণ'। বাংলার প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়েই তাঁর এ-গ্রন্থ লেখা। পরের দুঃখের কথা শুনেই তিনি এমন অভিভূত হতেন যে কখনো কখনো মূর্চ্ছা যেতেন। এ গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হয়ে ইংলণ্ডে গেলে লং সাহেব কারারুদ্ধ হন। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রচারক। সীটনকার সাহেবও অপদস্থ হন। সে যাই হোক, 'নীলদর্পণ' ইউরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মধুসূদনও তিরস্কৃত, অপমানিত হয়ে সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্যন্ত হারান ইংরাজিতে এর অনুবাদের জন্য।

ঢাকা থেকে নদীয়ায় এসে দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' লেখেন। এখান থেকে আবার ঢাকা ও সেখান থেকে উড়িষ্যায় ও পরে নদীয়ায় তিনি আসেন। কৃষ্ণনগরে একটি বাড়ীও কেনেন। ১৮৭০-এর প্রথম দিকে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৮৭১-এ তিনি লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্তের জন্য কাছাড় যান ও সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রে অল্পকালের মধ্যে ফিরে আসেন। কলকাতায় থাকার সময় তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সর্বত্র এবং বিহারের অনেক স্থান দেখার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। তাঁর মতো দক্ষ ব্যক্তির যতদূর উন্নতি হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি তিনি 'কৃষ্ণচর্ম'-এর মানুষ হওয়ার জন্য। শেষের দিকে তাঁর ভাগ্যে লাঞ্ছনা ঘটেছিল। তিনি রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তারপর হাওড়া ডিভিসনে নিযুক্ত হন। শেষের দিকে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল। পরে ১২৮০-এর আশ্বিনে বিস্ফোটকে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাগত হন এবং এতেই তাঁর প্রাণান্ত ঘটে।

নবীন তপস্বিনীর পর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র প্রচার। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের ঘটনা প্রকৃত এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁর চরিত্রে অনুকৃত। 'নীলদর্পণ'-এর অনেক ঘটনাই প্রকৃত। 'নবীন তপস্বিনী'র বড়রানী ও ছোটরানীর ঘটনা প্রকৃত। 'সধবার একাদশীর' প্রায় সকল নায়ক-নায়িকা জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি। জামাই বারিক-এর দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও জীবিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে লেখা। প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে দীনবন্ধুর নাটকগুলির সৃষ্টি। 'নবীন তপস্বিনী'তে এর উত্তম দৃষ্টান্ত মেলে। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক। জলধর, জগদম্বা, Merry Wives of Windsor থেকে নীত।

'সধবার একাদশী' পূর্বে লিখিত হলেও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নয় বলে 'সধবার একাদশী'র অসাধারণ গুণের সঙ্গে অসাধারণ দোষের কথা বঙ্কিম বলেছেন। 'লীলাবতী' তাঁর মতে অনেকখানি দোষমুক্ত নাটক। এর পরেই তাঁর কবিত্ব-সূর্য ম্লান হতে থাকে। কিছুদিন বিশ্রামের পর 'সুরধুনী কাব্য' 'জামাই

বারিক' ও 'দ্বাদশ কবিতা' দ্রুত বের হয়। 'সুরধুনী কাব্য' তাঁর যোগ্য হয় নি বলে এর প্রচার না হওয়ার কথা বঙ্কিম দীনবন্ধুকে বলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর মতো সরল, অকপট, স্নেহময় ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই বন্ধু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতো সুরসিক লোক বিরল। তাঁর সরস কথোপকথন সকলকে মুগ্ধ করত। তাঁর গ্রন্থগুলি হাস্যরসের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হলেও এগুলির থেকেও তিনি নিজে বড় হাস্যরসিক ছিলেন। তাঁকে মূর্তিমান হাস্যরস বলে মনে হত। হাস্যরসে তিনি ছিলেন ঐন্দ্রজালিক। নির্বোধ অথচ আত্মাভিমানী লোকেদের তিনি যম ছিলেন। এমন লোক তাঁর হাতে পড়লে আর নিষ্কৃতি ছিল না।

দীনবন্ধুর অহংকার বা রাগ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কোনোদিন এ-দু'টি ভাব তাঁর মধ্যে দেখেন নি। তাঁর যেটুকু ক্রোধের চিহ্ন তা 'জামাই বারিক' এর 'ভোঁতারাম ভাটে'র ওপরে। তিনি বহু লোকের উপকার করেছেন। তবুও তাঁর যশোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিন্দুকও ছিল। সতী সাধ্বী রমণীকে স্ত্রীরূপে লাভ ক'রে তিনি ছিলেন পরম সুখী। তিনি আটটি সন্তানের জনক ছিলেন।

এরপরেই দীনবন্ধুর 'কবিত্ব' সম্পর্কে বঙ্কিমের আলোচনা। বাংলা কাব্যের তৎকালীন অবস্থার কথা মনে রেখে বঙ্কিম দীনবন্ধুর ভূমিকা সম্পর্কে যে-মন্তব্যটি করেছেন, তা অত্যন্ত যথার্থ। তিনি লিখেছেন, "সেই ১৮৫৯/৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরান দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯/৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাংলা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।"

ঈশ্বর গুপ্তের সকল কাব্যশিষ্যের মধ্যে দীনবন্ধুর ওপর তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। দীনবন্ধুর হাস্যরস গুরুর অনুকারী, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর যোগও গুরুর অনুকারী। গুরুর রুচির দোষও দীনবন্ধুর। কিন্তু কবিত্বে দীনবন্ধুর স্থান গুরুর অনেক উর্ধ্বে। ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু দুজনেরই হাস্যরসে স্থূলত্বের প্রাধান্য—সাহিত্য সমাজে যেন তাঁরা লাঠিয়াল। "দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।"

কবির প্রধান গুণ যে সৃষ্টিকৌশল, তা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁর জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ প্রভৃতি এর উদাহরণ। তবে যা সূক্ষ্ম কোমল, মধুর অকৃত্রিম, করুণ,প্রশান্ত—সে সকলে তাঁর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁর লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরন্ধ্রী তেমন আদরণীয় নয়। বিনায়ক, রমণীমোহন ও অরবিন্দ সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু যা স্থূল, অসংলগ্ন, অসঙ্গত, বিপর্যস্ত তা তাঁর ইঙ্গিত-মাত্রেরই অধীন। তিনি নানা দেশ ঘুরেছিলেন। লোকের সঙ্গে মেশবারও তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। এইজন্য ক্ষেত্রমণি, আদুরী, তোরাপ, রাজীব, নসীরাম, রতা—প্রভৃতি গ্রাম্য মানুষও যেমন, তেমনি নিমচাঁদ, অটল, কাঞ্চন, নদের চাঁদ, হেমচাঁদ, ঘটীরাম, দেওয়ান, আমীন, উড়ে বেহারা, পেচোর মা প্রভৃতি শহরের মানুষও জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর

সাহিত্যে। বঙ্কিম বলেন, "সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ তিনি আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।" নিমচাঁদ, ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতির এই ভাবেই সৃষ্টি—বাস্তবের সঙ্গে আদর্শ বা কল্পনার সহযোগে।

একদিকে দীনবন্ধুর যেমন সামাজিক অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর, তেমনি তাঁর সহানুভূতিও অন্যদিকে অতিশয় তীব্র। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর তীব্র সহানুভূতি। এ সহানুভূতি সর্বব্যাপী। নিজে পবিত্রচরিত্র হয়েও দুশ্চরিত্রের দুঃখ তিনি বুঝতেন। তাঁর মতো পরদুঃখকাতর মানুষ বঙ্কিম আর দেখেন নি। নিমচাঁদের মতো শিক্ষিত 'ব্যর্থ' নৈরাশ্য-পীড়িত যুবকদের দুঃখ তিনি বুঝতেন, বিবাহে ভগ্নমনোরথ রাজীবের দুঃখ বুঝতেন, গোপীনাথের মতো দেওয়ানের দুঃখ বুঝতেন।

কিন্তু তাঁর এ সহানুভূতি শুধু দুঃখের সঙ্গেই নয়, সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ সকলের সঙ্গে সমান সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই—নইলে বড় কবি হওয়া যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে সহানুভূতি হল কল্পনাশক্তির ফল। কল্পনার দ্বারা অন্যের স্থানে আমাকে বসাতে পারলেই তার প্রতি আমার সহানুভূতি জন্মে। এমন হতে পারে যে কোনো নির্দয় বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি কল্পনার সাহায্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছেন। আবার কারো কারো মধ্যে দয়া মায়া এতো বেশী যে কল্পনাশক্তির সাহায্য তেমন দরকার করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে এখানেও কল্পনাশক্তি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। তবুও প্রথম শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁদের ইচ্ছার অধীন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সহানুভূতিরই অধীন। প্রথম শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি প্রবল, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে প্রীতি দয়াদি প্রবল। দীনবন্ধু ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি। তিনি নিজেই ছিলেন সহানুভূতির অধীন। তাঁর গ্রন্থে রুচির দোষের জন্য এই সহানুভূতিই দায়ী। জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি মিশ্রিত হয়ে তাঁর চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই জীবন্ত আদর্শের প্রভাব তাঁর ওপর এতো বেশী যে তিনি কিছু বাদসাদ দিয়ে অঙ্কন করতে পারতেন না। "তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে তাহা তিনি বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে তাহা তিনি বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। ·· সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম —সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা।" দীনবন্ধুর ক্ষমতা ছিল না সহানুভূতির আদেশ লঙ্ঘনের। তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ আস্ত আদুরী দেখতে পাই।

তীব্র সহানুভূতির জন্যেই দীনবন্ধুর মধ্যে রুচির দোষ দেখা দিয়েছে। প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি; তাঁহার গুণ-দোষের কারণ—এই তত্ত্বটি বোঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।" যেখানে এই দুয়ের মধ্যে একটির অভাব ঘটেছে সেখানেই তাঁর কবিত্ব নিষ্ফল হয়েছে। তাঁর প্রধান নায়ক-নায়িকা তেমন মনোহর না হওয়ার এটিই কারণ। আদুরী বা তোরাপ যেমন

জীবন্ত, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন তেমন নয়। আদুরী বা তোরাপের সৃষ্টিকালে সহানুভূতি তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষাকে পর্যন্ত দীনবন্ধুর কলমের অগ্রে এনে দিয়েছিল, কিন্তু কামিনী লীলাবতী, বিজয় ও ললিতমোহনের ক্ষেত্রে চরিত্র ও ভাষা বিকৃত। সহানুভূতি যদি সর্বব্যাপী হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সহানুভূতির আনুকূল্য নেই কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে এসব চরিত্র সেদিনের বাংলা সমাজে ছিল না। ইংরেজী গ্রন্থে বা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তেমন চরিত্র ছিল। তাই পুস্তকের উপর নির্ভর করে তিনি এসব চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জীবন্ত আদর্শ না থাকলে তাঁর সর্বব্যাপী সহানুভূতি কাজ করে না। জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি দুয়েব অভাবে এ সকল চরিত্র ব্যর্থ। তাঁর নায়কগুলি সর্বগুণান্বিত বাঙালী যুবক—কাজ কর্ম নেই, কাজকর্মের মধ্যে কারও Philanthrophy কারও Courtship. এমন চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাংলার সমাজে ছিল না—কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির অভাবে এসব চরিত্র নিষ্ফল।

জলধর, জগদম্বা বা নিমচাঁদ চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে সফল তার কারণ এসব ক্ষেত্রেও একাধারে জীবন্ত আদর্শ পান নি, কিন্তু বহু সংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশ বিশেষ গ্রহণ করে এদের সৃষ্টি বলে এরা সার্থক। এই রীতি অবলম্বন করলে পূর্বের চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে তিনি সফল হতেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য তাঁর চিত্তে বেশী বলে তিনি ঐসব ক্ষেত্রে এই পথ অবলম্বন করেননি। যদি তিনি অন্য শ্রেণীর কবি হতেন, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে যদি কল্পনাশক্তি প্রবল হত এবং তার অধীন যদি হত সহানুভূতি, তাহলে এসব ক্ষেত্রেও তিনি সফল হতেন। এই কারণেই "সেক্সপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন।"

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রথম নাটকে তাঁর অলৌকিক সমাজজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতি যোগ দিয়েছিল। যে সব স্থানে নীল প্রস্তুত হত, তা তিনি নিজে দেখেছিলেন। সে সব স্থানে প্রজাদের উপর পীড়নও তিনি দেখেছিলেন। স্বাভাবিক সহানুভূতিব ফলে প্রজাদের দুঃখ তাঁর নিজেদের দুঃখ বলে মনে হয়েছিল। আর তারই ফল এ নাটক। এ নাটক বাংলার 'Uncle Tom's Cabin'. টম কাকার কুটীর আমেরিকার কাফ্রীদিগের দাসত্ব ঘুচিয়েছে; নীলদর্পণ নীল দাসদের দাসত্ব অনেকখানি মোচন করেছে। নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়েছিল বলে এ নাটক তাঁর সকল নাটকের চেয়ে শক্তিশালী। তাঁর আর কোনো নাটকই পাঠককে তেমন বশীভূত করতে পারে না। সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন নিয়ে বাংলায় অনেক নাটক, নভেল বা অন্যরকম কাব্য লিখিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট। এ সমস্তে সমাজসংস্কার বড় হয়ে উঠেছে, সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়। অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। নীলদর্পণের মূল উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার হলেও কিন্তু কাব্যাংশে তা উৎকৃষ্ট। এর কারণ "গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে।"

গ্রন্থকারের কবিত্বের দোষ-গুণের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে বঙ্কিম যা বলেছেন তা গ্রন্থকারের হৃদয়েই তিনি পেয়েছেন। আবার তা গ্রন্থেও পেলেন। তাই তাঁর কথায় "গ্রন্থকারকে না জানিলে তাঁহার গ্রন্থ একরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না।"

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধুর জীবনী-পরিচয় ও কবিত্বের আলোচনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ—'a possession for ever' ১৮৫৯-৬০ সালকে বাংলা সাহিত্যের সন্ধিস্থল রূপে উল্লেখ সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম করেছেন। দীনবন্ধুকে তিনি সন্ধিস্থলের লেখক বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধিস্থলের চিন্তা পরবর্তী কালে ঈশ্বর গুপ্তকে সন্ধি-যুগের কবি বলার পথ প্রশস্ত করেছে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালী' মধুসূদনকে 'ডাহা ইংরেজ' বলেছেন। তিনি 'খাঁটি বাঙালী' বলে ঈশ্বর গুপ্তকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করেন নি, ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে তাঁর বাঙালীত্ব কোথায় তা যে ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর সংস্কৃতিতে যে রূপান্তর অতঃপর দেখা দিল, এবং বাঙালী লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ যে উদারতার ক্ষেত্রে পতিত হল তাতে কোনো কবিকে 'বাঙালী কবি' বলে অভিহিত করার গৌরব ম্লান হয়ে পড়ল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যে-কালের কবি তাঁর সম্পর্কে এই বিশেষণ সুপ্রযুক্ত বলেই মনে করি। মধুসূদনকে তিনি যে 'ডাহা ইংরেজ' বলেছেন, তা ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধুর সঙ্গে তুলনার জন্যেই এবং মধুকবি সম্বন্ধে এটিকে একটি স্থূল ও সাধারণ মন্তব্য হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। নইলে সূক্ষ্ম-বিচারে দেখা যাবে মধুসূদন 'ডাহা ইংরেজ' নন, দেশীয় ভাবধারার সঙ্গেও রয়েছে তাঁর অন্তরের যোগ এবং বিদেশী সংস্কৃতি বলতে শুধুমাত্র ইংরেজদের সংস্কৃতিকেই তিনি গ্রহণ করেন নি।

গুরু ঈশ্বর গুপ্তের স্থূল হাস্যরস, বাঙালী-জীবনের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক এবং রুচির দোষ দীনবন্ধুর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলেও তিনি যে সৃষ্টি কৌশলে গুরুকে অতিক্রম করেছেন—এই উক্তিটি অত্যন্ত সার কথা। খুব সূক্ষ্ম কোমল-মধুর, করুণ, অকৃত্রিম ভাবরাজিকে রূপ দেওয়ার শক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু স্থূল, অসংগত, বিপর্যস্তকে জীবন্ত ক'রে তোলার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আর এই ক্ষমতার মধ্যে তাঁর যে সৃষ্টি-শক্তি সেখানে realism তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল idealism। আবার এই আদর্শবাদের ক্ষেত্রেই এসেছে তাঁর কল্পনা। রোম্যান্টিক সমালোচনায় কল্পনার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান —কল্পনাই যে সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলে—এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের সচেতনতা ছিল। দীনবন্ধুর কবিত্ব বিচারে তিনি মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে কল্পনা ও সহানুভূতির মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন প্রত্যেক কবিই কল্পনাজীবী। আবার সহানুভূতির মূলেই আছে কল্পনা—কারো প্রতি সহানুভূতির অর্থই হল কল্পনার সাহায্যে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া। কিন্তু সকলের সহানুভূতি সমান নয়। যাঁদের সহানুভূতি কম, তাঁদের কল্পনার সাহায্য বেশী নিতে হয় এবং তাঁরা কল্পনার অধীন। কিন্তু যাঁদের সহানুভূতি বেশী তাঁদের কল্পনার সাহায্য কম নিতে হয় এবং তাঁরা সহানুভূতিরই অধীন। দীনবন্ধু এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাঁর এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত গভীর এবং মৌলিক। অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির

মূল ভাবের কথায় Pityর কথা বলেছিলেন। এই Pityকে বাংলাভাষায় সহানুভূতি বলা হয়। দর্শক যখন অভিনীয়মান কোনো চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতালাভ করে তখনই এই Pityর জাগরণ ঘটে। আর ঐ ঐকাত্মতার জন্যে কল্পনার সহায়তা প্রয়োজন। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে বিভাবের সঙ্গে সামাজিকের যে তন্ময়তা—সেখানেও কল্পনার সহায়তা চাই।

সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতি—এ দুটিই দীনবন্ধুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই তত্ত্বটি বঙ্কিমের দীনবন্ধু আলোচনার প্রধান সূত্র। দীনবন্ধুর দোষ-গুণ সব কিছুর মূলেই এই বৈশিষ্ট্য। যেখানে জীবন্ত চরিত্রের অভাব সেখানে সহানুভূতি কাজ করতে পারেনি—তাই ভদ্র চরিত্রগুলি তাঁর নাটকে অনেক সময় নিষ্ফল। দীনবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তারই আলোকে কাব্য-বিচার করতে গিয়ে ও সেই দুই বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পেলেন। জীবনের সঙ্গে কাব্যের যে-সম্পর্কের কথা তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় বলেছিলেন, এখানে তাও তিনি বিস্মৃত হন নি।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে সাহিত্য-সমালোচনায় অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, বক্তব্য-বিন্যাসে নৈয়ায়িকের পরিশীলিত চিন্তাবনিষ্ঠা, পাশ্চাত্যের ক্লাসিক-পন্থী সমালোচকদের সূত্রানুসরণের মধ্যেও মাঝে মাঝে রোম্যাণ্টিক-পন্থীদের বিচার-সূত্রের সহায়তা-গ্রহণ এবং সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা শুধু সে-যুগেই নয়, একালেও বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কৃষ্ণচরিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের সব্যসাচী আখ্যা দিয়ে বলেছেন—"রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকর্ম অর্থাৎ উপন্যাস, কমলাকান্তের দপ্তর, লোক রহস্য প্রভৃতি রস রচনার সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু তাঁর সমালোচনা কার্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ততখানি গভীর নয়। অথচ বঙ্কিম প্রতিভার সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে তাঁর সমালোচনা কর্মের আলোচনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাঁর অন্যান্য সমালোচনার কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনার কথাই যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে—মহাভারত পুরাণ মন্থন করে এমন গভীর গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ তিনি রচনা করলেন কিভাবে? বঙ্কিমের পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, যুক্তি নির্ভর বিচার শক্তি ও বিশ্লেষণী প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে।

কৃষ্ণচরিত্র সাত খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বঙ্কিম বলেছেন—'কৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। কিন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচনা করিব।'

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় বঙ্কিম নিজেও বিশ্বাসী ছিলেন, তবু তাঁর নিজের যা বিশ্বাস তা তিনি অপরকে গ্রহণ করতে বলেন নি—কৃষ্ণের মধ্যে তিনি মানুষকেই দেখতে চেয়েছেন—অবশ্য সেই মানুষ তাঁর অনুশীলন তত্ত্বের বাস্তবায়িত রূপ, একথা বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। ২। তাহাই মানুষের ধর্ম। ৩। সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। ৪। তাহাই সুখ।

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এরূপ আদর্শ কোথায়

পাইব ? এরূপ মনুষ্যও দেখি না···মনুষ্যে না দেখি ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। ····· এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

অবশ্য অনুশীলন তত্ত্বের দৃষ্টান্ত রচনায় বঙ্কিম সর্বপ্রকার অলৌকিকতা অনৈসর্গিতাকে বর্জন করেছেন এবং যুক্তি সঙ্গত আলোচনার মাধ্যমে মহাভারতের কর্মবীর কৃষ্ণের মধ্যে মানবতার পূর্ণ আদর্শ—বঙ্কিমের মনোগত আদর্শ—স্থাপনা করেছেন। বঙ্কিম মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে সেখানকার প্রক্ষিপ্ত রচনা ও মূল রচনার বিভেদের কথা বলেছেন। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করে তার সার ও অসার অংশ পৃথক করেছেন ; তার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণে এমন নিঃসঙ্কোচ বিচাব বুদ্ধি প্রয়োগ তুলনাহীন। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে যে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাও তুলনাহীন। তবু এই কাজ করে বঙ্কিম সমকালীন সমালোচকদের কাছে দুভাবে নিগৃহীত হন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

“একদিকে যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া, কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসারে দেবতা গঠন কার্যে বড়ো প্রসন্ন হন নাই।” একদল বললেন—“আমাদের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিমবাবুর হাতে পড়ে তোমার আমার মতো মানুষ হল। আর একদল বললেন শঠ প্রবঞ্চক পরদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু আদর্শ পুরুষ বললেন কি ভাবে ?” দু-দলই তাঁর উপর বীতরাগ হল।

কিন্তু সাহিত্য মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করে অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হয়েছেন—তাঁর নিজের প্রতিভা কেবল তাঁর একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন তা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যই একটি রহস্যজনক চরিত্র। এই চরিত্র ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের মনে যুক্তি ও ভাবাবেগ, বুদ্ধি ও বোধের যে দ্বন্দ্ব আছে, তার মীমাংসাতেই বঙ্কিম মণীষার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্কিমের মধ্যে ভক্তি ছিলনা তা নয় ; তবে বঙ্কিমের ভক্তি ছিল অন্তরে, তা সহসা বাইরে প্রকাশ পেত না। তাঁর ধর্মভাব প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে মাতা-পিতাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কলেজ ত্যাগ করিয়া যখন মাতা-পিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে কর্মস্থলে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি ইচ্ছামত আহার বিহার আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেইশ বৎসর বয়সে অনাচারী; ত্রিশ বৎসর বয়সে যখন কপালকুণ্ডলা লেখেন তখন নাস্তিক। ···তারপর চল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্মভাবের সূচনা হয়। সূচনার দুই তিন বৎসর পরে সহসা কোন অনৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হয়। ···বঙ্কিমচন্দ্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইতে যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আর নশ্বর প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—ভগবৎ প্রেম তখন লক্ষ্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা তখন তিনি "কৃষ্ণচরিত্র" লিখিলেন।[১]

কিন্তু হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হলেও "কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই।" রবীন্দ্রনাথ একথা যথার্থই বলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন,—

"বিষয়টি এমন যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালি লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরি হরি, মরি মরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গি করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনোই ছাড়িতেন না, সুবিচারিত তর্ক-দ্বারা সুকঠিন সত্য নির্ণয়ের স্পৃহা-দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না।"

---

[১] ১৮৭৭ খ্রীঃ "যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্ন-প্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তারপর দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে-কাঁদিতে নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্বাদলশ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হইল—ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।"

"বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত"
—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৪

কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় বঙ্কিম এই যে স্বাধীন বুদ্ধি ও সচেষ্ট চিত্তবৃত্তির সহায়তা নিয়েছেন—তাই এই গ্রন্থের গৌরব। কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস সমালোচনা করে বঙ্কিম কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এই কাজে মহাভারতকেই বঙ্কিম প্রধানত আশ্রয় করলেও অন্যান্য পুরাণেরও আলোচনা করেছেন এবং তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে মহাভারতের মধ্যে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে।

তিনি মহাভারতের তিনটি স্তর আবিষ্কার করেছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণ এবং রচয়িতা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করতেন না। বঙ্কিম এই স্তরের রচনাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় স্তরের রচনা বঙ্কিমের অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতি প্রাপ্ত মনে হয়েছে এবং তৃতীয় স্তর বহুকালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছাজাত রচনা বলে তিনি এই দুই স্তরের রচনাকেই অব্যবহার্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। প্রথম অংশেও যেখানে যেখানে কৃষ্ণচরিত্রে অনৈসর্গিকতা ও অনৈতিহাসিকতা আছে বলে তাঁর মনে হয়েছে তিনি তা বর্জন করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক কৃষ্ণকেই অবলম্বন করেছেন আবার এই কৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বিষ্ণু পুরাণের বল্লবীপ্রিয় কৃষ্ণ নন—মহাভারতের মহানাটকের সূত্রধার পার্থসারথি। এই কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তি ও মত যথেষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তিনি ঐতিহাসিক কৃষ্ণ চরিত্র গঠনে ব্রতী হয়েছেন। মহাভারতের আদি কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র কেমন ছিল বঙ্কিম নিজের আদর্শ অনুসারে তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের মধ্যে তিনি এরূপ মানুষকে খুঁজেছিলেন যাঁর কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা নেই—যাঁর সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত।

এই উদ্দেশ্যে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পরবর্তী দুটি খণ্ডে কৃষ্ণ জীবনের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এবং তাদের ঐতিহাসিকতা বিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণের জন্ম, শৈশব, কৈশোরলীলা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করে ব্রজগোপীদের কথা বলতে বলতে ভাগবতের রাসলীলার কথা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। দশম পরিচ্ছেদে রাধার কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে চৌরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সবই অমূলক ও অলীক বলেছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—'কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিনী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবের রূপলাবণ্যে এবং শিশু সুলভ গুণ সকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং

বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন।' ...ইত্যাদি। এই খণ্ডে বর্ণিত গোপীতত্ত্ব, রাসলীলা, বস্ত্র হরণ প্রভৃতির মাহাত্ম্য তিনি মনে মনে উপলব্ধি করেন নি তা নয়, কিন্তু যুক্তির বিচারে কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে এগুলি গ্রহণীয় নয় বলে তিনি এগুলিকে—উপন্যাস অংশ—ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলে বিবেচনা করেছেন।

তৃতীয় খণ্ডে মথুরা দ্বারকা পর্বে প্রথমেই কংস বধের কথা। কংসকে বধ করে ধর্মাত্মা কৃষ্ণ কংসপিতা উগ্রসেনকে যাদব রাজ্যের অধিপতি করেন। কংস বধেই বঙ্কিম প্রথম প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কৃষ্ণ যে পরম বলশালী পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর—তা তিনি দেখিয়েছেন এবং এই সকল গুণের জন্যই কৃষ্ণকে তাঁর মনে হয়েছে 'আদর্শ মানব'।

পরবর্তী অধ্যায় ও খণ্ডগুলিতে তিনি কৃষ্ণজীবনের নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে তার উপন্যাস অংশ পরিবর্জন পূর্বক ঐতিহাসিক অংশ উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। সীমিত রচনায় তাঁর সকল কথা উল্লেখ করে আলোচনার অবকাশ নেই—তাই অতঃপর তাঁর মূল বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি ফেরানো চলে।

'আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ তাঁহাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট' হয়েছে কিভাবে তার আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম প্রথমেই কৃষ্ণের বহুবিবাহ দোষের অলীকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে—'কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই' —একথা বলেছেন। চতুর্থ খণ্ডে কৃষ্ণের বুদ্ধির প্রশংসা করে তিনি দেখিয়েছেন "অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য" ছিলেন। "কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

কৃষ্ণের মানবিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন— 'কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই'। যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত—বঙ্কিম তাও যথাস্থানে দেখিয়েছেন। তবে কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যে তাঁকে "কাম ক্রোধবিবর্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্বদোষ রহিত, সর্ব লোকোত্তম, সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ" রূপে জানতেন বঙ্কিম তারও উল্লেখ করেছেন এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ে অথবা কথক ঠাকুরের বর্ণনা শুনে আমরা জানি তিনি লম্পট, ননীমাখন চোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপু বশীভূত, এবং অন্যান্য দোষ যুক্ত। আমাদের এধারণা যে

ভুল বঙ্কিম তা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। জরাসন্ধ বধে যুধিষ্ঠিরকে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন তা তাঁর নিজের হিতের জন্য নয়, জগতের হিতের জন্য। যিনি লোকের হিত সাধনের জন্য কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করেন তিনিই আদর্শ ধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধার্মিক।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রশংসা করেছেন আরও একটি কারণে—'কৃষ্ণ-চরিত্র অতি-মানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া বা কোন প্রকার বুজরুকি ভেল্কির দ্বারা ধর্ম প্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই'। প্রসঙ্গত বঙ্কিম যিশু, বুদ্ধ, নিমাই প্রভৃতি মনুষ্য শ্রেষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বিচারে রামচন্দ্র পর্যন্ত সেই আদর্শ হিন্দুর নিকটবর্তী কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। "তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মতত্ত্বে আলোচিত মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা উদ্ধার করে বলেছেন 'মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছি তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। তিনি আদর্শ মনুষ্যের ধারণা সম্পর্কে Christian Ideal অপেক্ষা Hindu Idealকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই হিন্দু আদর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য বিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের শাক্য সিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ধর্ম প্রচার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব হইয়াছে। "কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিক, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্ম প্রচারক, সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলে ভাবলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশের জন্যই তিনি অবতীর্ণ একথা ভাবলে, তাঁর সকল কাজই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণ চরিত্রস্বরূপ রত্নভাণ্ডার খোলার চাবিকাঠি এই আদর্শ মনুষ্যত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এই চাবির সাহায্যেই কৃষ্ণের জরাসন্দ বধ, শিশুপাল বধ প্রভৃতি কার্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের আলোচনায় এই পর্বের নায়কস্বরূপ কৃষ্ণচরিত্রে বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য কি ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণের বিষয়ীর বুদ্ধি প্রশংসা করতে

গিয়ে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন— "আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না— বিষয়ী হইতে হইবে।" বস্তুত সন্ন্যাস-ধর্মকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই জীবনের চরমাদর্শ বলে গ্রহণ করেন নি, তাঁর বিপুল উপন্যাসরাজিই তার প্রমাণ। উদ্যোগপর্বের সমালোচনা করে বঙ্কিম এই কটি কথা বোঝাতে চেয়েছেন— "প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য। তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না—জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে!"

তিনি সর্বদোষশূন্য এবং সর্বগুণান্বিত। আদর্শ পুরুষ রূপে তিনি যে অহঙ্কারশূন্যও ছিলেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতি হেয় কাজ সারথ্য গ্রহণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথী হলেও—যুদ্ধের মূল গ্রন্থিরজ্জু তাঁরই হাতে—প্রকাশ্যে তিনি কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্বময়-কর্তা। কেবল পাণ্ডবদের জয়ী করা তার অভীষ্ট নয়—ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁর উদ্দেশ্য। এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যায় ততই তাঁতে এই ক্রুরকর্মা দূরদর্শী রাজনীতি বিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেন নি, সব কিছুই করেছেন আসাধারণ মানসিক বলের দ্বারা। মহাভারতের মহান কর্ণধার এই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন—বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ তিনি উপন্যাস-বোধে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন অথবা সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোকে তার অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন ('কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধে, যা বঙ্গদর্শনে ১২৮১ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)।

মহাভারতের কৃষ্ণের মনুষ্য চরিত্রই বঙ্কিম সমালোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন সুতরাং কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের দিকেই তিনি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তবে কৃষ্ণ নিতান্ত সাধারণ মানুষ নন, তাঁর চরিত্র যে আদর্শ

মনুষ্যের চরিত্র—শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের চরিত্র তাও তিনি দেখিয়েছেন। কৃষ্ণের সমস্ত কাজের মধ্যে এই আদর্শ মনুষ্যের ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ খণ্ডে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভে ভীষ্মবধ পর্বাধ্যায়ের পূর্বে ভগবদগীতা পর্বাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের এক প্রধান পরিচয়। গীতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা ধর্মতত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাঙ্গালা টীকায় লক্ষ্য করি—এ সম্পর্কে তাঁর আত্যন্তিক প্রীতির পরিচয়ও আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহারে দিতে চেষ্টা করব, আপাতত গীতায় স্বধর্ম পালনের জন্য অর্জুনকে উপদেশ দানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা চলে। 'অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নামান্তর স্বধর্ম পালন।' কৃষ্ণ সারথি রূপে স্বয়ং যুদ্ধ করেন নি কিন্তু সারথির যা কর্তব্য তা যথাবিহিত পালন করেছেন। তিনি যখনই অর্জুনকে যুদ্ধে পারাঙ্মুখ দেখেছেন তখনই তাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন—এটাই সারথির ডিউটি এবং সেই উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে—গীতার উপদেশ শ্রবণে অর্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ঘটনাই তার প্রমাণ। অর্জুনের জয়দ্রথ বধের সময় স্বয়ং যুদ্ধের উদ্যোগ করে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি পরন্তু সখা, শিষ্য ও ভগিনীপতি অর্জুনের আত্মহত্যা নিবারণের চেষ্টা করে আপন অনুষ্ঠেয় কর্মই সম্পাদন করেছেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অর্জুনকে সত্যধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দান প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কর্তৃক ধর্মতত্ত্বের সর্বশেষ আলোচনায় কৃষ্ণ চরিত্রের মহিমা প্রকটিত হয়েছে। ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গাণ্ডীব শরাসন ত্যাগ করতে বলায় আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অর্জুন যুধিষ্ঠির বধে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাঁকে সত্যধর্ম রক্ষায়ও জ্যেষ্ঠাগ্রজ বধের পাপ থেকে বিরত হওয়ার যে পরামর্শ দিয়েছেন তাতেই কৃষ্ণের ধর্মজ্ঞান ও কূট বুদ্ধির পরিচয় পরিস্ফুট। বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় যুগপৎ কৃষ্ণ মহিমা ও ধর্মাদর্শ স্থাপকের কাজ এই অধ্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—"অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমান সূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে।" অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে অপমান সূচক বাক্যে ভর্ৎসিত করে আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। এবং কৃষ্ণের পরামর্শে আত্মশ্লাঘা করে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এই ভাবে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি রূপে কোথাও তাঁর নির্দেশে রথ চালিয়েছেন কখনও আবার স্বয়ং অর্জুনের নিয়ন্তা রূপে তাঁকে চালনা করেছেন দেখা যায়।

ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বঙ্কিম পাশ্চাত্য দর্শন—কোঁত, মিল, বেন্থাম প্রভৃতির হিতবাদ এবং প্রাচ্য গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের উপসংহারে কৃষ্ণ কথিত সত্য তত্ত্বের তাৎপর্য তিনি এইভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেছেন—

'১। যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত হিন্দু ধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু জাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না।'

বঙ্কিম এই প্রবন্ধে একাধিক স্থানে অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন এবং অন্য ধর্মাচার্য—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্যের তুলনায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বী আচার্যগণ—বঙ্কিমের দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ মানব। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মতে সুসম্পূর্ণ মানুষ তার কারণ একমাত্র তাঁর মধ্যেই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যে তা হয়নি। বঙ্কিম বলেছেন, "যীশুকে যদি রোমক সম্রাট য়িহুদার শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না। যদি ইহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কী করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না প্রবৃত্তিও ছিল না। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তি শূন্য কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধ হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যীশু অশিক্ষিত কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিদ্, আদর্শ মানুষ সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত।" শ্রীকৃষ্ণ তাই ছিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের আদর্শ স্বরূপ—এক কথায় তিনি দেশবাসীর আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তা যে পরস্পর অন্বিত ছিল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যাই তার প্রমাণ। বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—

"দেশবাসীকে আদর্শ আর্য জীবনে ফিরাইবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহাকে এরূপ কার্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে

পারুন আর নাই পারুন, তিনি যে তৎকালীন সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।"

আমরা বলি পরম বৈষ্ণব যাদবচন্দ্রের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি গৃহ দেবতা রাধানাথের পরম ভক্ত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তিনি ভালো করেই বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা মহাভারত বিশ্লেষণ করেছেন তখন যা যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় তা তাঁর প্রাণের যতই প্রিয় হোক—তাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। আদর্শ মানবরূপে বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যের প্রতি তাঁর ভক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে তিনি তাদের গ্রহণ করতে পারেন নি। এ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাঁর ভক্তি ও প্রীতি সমধিক ছিল কারণ কৃষ্ণ একাধারে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও অবতার। ধর্মতত্ত্বে যে অনুশীলন তত্ত্ব কথিত হয়েছে, দেবীচৌধুরাণীতে যার কাল্পনিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত—কৃষ্ণচরিত্রে তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপনা করতে পেরে বঙ্কিম তৃপ্ত হয়েছেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের উপসংহারে গীতার প্রসঙ্গ এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র পৃথক ভাবে ভাগবদগীতার ব্যাখ্যাও করতে শুরু করেন কিন্তু মাত্র ৪টি অধ্যায়ের পর তা অসমাপ্ত থেকে যায়—সমাপ্ত হলে গ্রন্থখানি গীতা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হতে পারতো বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। 'কৃষ্ণ চরিত্রে' গীতার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অনুগীতার কথা উল্লেখ করে, মূল গীতায় কৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামান্য বিশ্লষণ করেছেন।

বস্তুত গীতাই বঙ্কিমের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। তাঁর গীতাপ্রীতির যে কাহিনী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

শচীশচন্দ্র লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন শুদ্ধাচারে থাকিতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন।"

শেষ বয়সে একবার তাঁর দাঁতের নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। দন্তক্ষত থেকে রক্তপাত হতে থাকে—এক এক সময় অনেক পরিমানে রক্ত নির্গত হত। তাঁর অসুখের কথা শুনে, তাঁর বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার চন্দ্রা সাহেবকে ডাকা হল। শচীশচন্দ্র বলেছেন "চন্দ্রা সাহেব আসিয়া শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতাপাঠ করেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব আদেশ করিলেন, গীতাপাঠ বন্ধ রাখিতে হইবে, কথাবার্তাও কমাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটু হাসিলেন। তেমন হাসি তাঁহার ওষ্ঠে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই।

এ প্রতিভার হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, অহঙ্কারের হাসি নয়—এ নির্মল আনন্দের হাসি, স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।······

যথাসময়ে ঔষধ আসিল। বঙ্কিম ছিপি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকু পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিলেন এবং সহাস্যমুখে উচ্চৈস্বরে গীতাপাঠ আরম্ভ করিলেন। ···অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও গীতাপাঠ বন্ধ করেন নাই। অবশেষে তিনি শয্যাগত হইলেন। ···দন্তমূল হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়া ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক না করিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুহৃদ্বর ছাড়িলেন না। বলিলেন, 'তুমি আত্মহত্যা করিতেছ।' বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসে'? ডাক্তার সরকার—'যে ঔষধ না খায় সে আত্মঘাতক।' বঙ্কিম 'কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?' ডাক্তার—'খাও? কই তোমার ঔষধ?' বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।"

গীতার প্রতি—কৃষ্ণের বাণীর প্রতি—মহাভারতের মহান নেতার বাণীর প্রতি বঙ্কিমের এমনই ছিল অচলা ভক্তি। আর এই ভক্তি প্রভাবেই হয়ত সেযাত্রায় বঙ্কিম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বঙ্কিম তিরোভাব ঘটে আরও বছর তিনেক বাদে।

কিন্তু না, আমরা বলছিলাম বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের কথা অতঃপর সেই আলোচনাতে ফিরে এসে উপসংহার টানা উচিত।

কৃষ্ণচরিত্রের সপ্তম খণ্ড সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, এতে মাত্র দুটি ক্ষুদ্র আকৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ আছে প্রথম—যদুবংশ ধ্বংস, দ্বিতীয়—উপসংহার।

প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম কৃষ্ণের দেহ ত্যাগের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। মহামানব ও অবতারকল্প পুরুষ দেহধারীরূপে মর্ত্যে আসেন তখন তাঁর জন্মের মধ্যে রহস্য থাকতে পারে কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে না থাকাই উচিত। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, উভয়েরই মৃত্যু বাস্তব কারণে হয়েছিল। (ভক্তের দেওয়া মাংস খেয়ে ও ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে) কৃষ্ণও জরা নামক ব্যাধের বিষাক্ত তীরের ঘায়ে প্রাণ ত্যাগ করেন বলে বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এর সঙ্গে আরও তিনটি কারণ যুক্ত করেছেন—জরাকে তিনি শতাধিক বর্ষের মানব কৃষ্ণের দেহে জরা ব্যাধির আক্রমণ মনে করেছেন। তৃতীয়তঃ যোগাবলম্বনে তনুত্যাগের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন আর চতুর্থতঃ দ্বেষ বিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক হত্যার সম্ভাবনার

কথাও তিনি উড়িয়ে দেন নি। কারণ যাই হোক—কৃষ্ণকে তিনি মানুষ রূপেই যখন আঁকতে চেয়েছেন তখন মানবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল এমন কথাই তিনি আমাদের গ্রহণ করতে বলেছেন।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, যারা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না তাঁদের জন্য এই চারিটি কারণ নির্দেশ করেও তিনি বলেছেন 'আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ।"

কৃষ্ণকে আদর্শ মানব হিসাবে অঙ্কন করেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের ইঙ্গিত দিয়ে গ্রন্থের উপসংহার করেছেন। তিনি বলেছেন 'ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছি ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য; মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনার পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বোধ হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞান মার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে।' তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ ও গীতার কথা উল্লেখ করেছেন গীতায় বলা হয়েছে—'কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতি বিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মচরতি আর কোন প্রকারে বুঝিতে পারি না। অন্তত আমি বুঝিতে পারি না।'

বঙ্কিম পরমাত্মার আত্মারতি প্রসঙ্গের আর বিস্তার ঘটাতে চান নি। যুক্তির পথে যতদূর যাওয়া যায়, তিনি ততদূর অগ্রসর হয়েছেন—তার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, অন্তত কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় তিনি চান নি। বুদ্ধিনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী বঙ্কিমের মনীষার শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে।

বাঙলাভাষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

বাঙলা ভাষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে-সব ভাষা-সমালোচকেরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের প্রবন্ধ দু'টি উনিশ শতকের শেষপাদে রচিত হলেও প্রখর মননশীলতা, উচ্চাঙ্গ রসবোধ এবং ভাষাবিজ্ঞানীসুলভ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণশক্তির জন্য আজও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রচার' পত্রিকায় বাঙলা ১২৯১ সালে আর বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধটি উদ্বোধন পত্রিকার জন্য পত্রাকারে লিখিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত হলেও দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে, Communicative Value-র ভিন্নধর্মী আবেদন আছে, রচনাশৈলীর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য আছে; তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, প্রবন্ধ দু'টি পরস্পরের পরিপূরক।

মনে রাখা দরকার, ভাষাসম্পর্কীয় আলোচনার দু'টি দিক আছে। একটি তার তাত্ত্বিক দিক, অপরটি তার প্রায়োগিক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক। বর্তমান প্রবন্ধ দু'টিতে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের তাত্ত্বিক দিকটিই উন্মোচিত হয়েছে। অবশ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে তাঁরা তাঁদের তাত্ত্বিক মূল্যমানকে যে সবসময় বজায় রাখতে পেরেছেন, তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা-রীতির সঙ্গে 'সীতারাম' উপন্যাসের অথবা বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারতে'র সঙ্গে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' বা বাঙলা পত্রাবলীর ভাষা তুলনা করলেই বোঝা যায় যে ভাষারীতি সম্পর্কে তাঁরা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করলেও সাহিত্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ রাখেননি। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধদ্বয় তাঁদের সৃষ্ট মানদণ্ডের সার্থক প্রতিফলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটিতে মূল বক্তব্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এই ক্রমে: লিখিত ও কথিত (অর্থাৎ সাধু ও কথ্য) ভাষার পার্থক্য নির্ণয়, যে-কোনো একটি রীতির অতিরেক সম্বন্ধে নিষেধ-বাণী উচ্চারণ, বাঙলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধে সচেতনতা ও কৃতঋণ শব্দ (Loan Word) সম্বন্ধে ঔচিত্যবিচার এবং পরিশেষে ভাষা-সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা। অবশ্য বক্তব্য উপস্থাপনায় বঙ্কিম তাঁর

চিরাচরিত নিজস্ব 'ষ্টাইল' যথাযথ বজায় রেখেছেন—সেই সমকালীন পটভূমি নির্বাচন, তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি, উন্নত রসবোধ এবং সর্বোপরি চিন্তাশীলতার ভারসাম্য রক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্যের অনিবার্যতা স্বীকার করেছেন, লক্ষ্য করেছেন ইংরেজী সাহিত্যিক ভাষা এবং লণ্ডনী ককনী ভাষার অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য। কিন্তু বাঙলার ক্ষেত্রে "বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে।" বস্তুত, বঙ্কিমের অনতিপূর্বে "পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল" ব'লে বাঙলা রচনা "ফোঁটা-কাটা অনুস্বার-বাদীদের একচেটিয়া মহল ছিল"—যদিও মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্যে কথ্য বা চলিত ভাষাই বেশি ব্যবহৃত হতো। বঙ্কিম তাই আক্ষেপের সুরে বলেন যে এই 'সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা'র জন্যই বাঙলা ভাষা "অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত "রয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, টেকচাঁদ ঠাকুরই এই বিষবৃক্ষের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর মতে, 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনার "সেই দিন হইতেই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম তৎকালীন সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ রামগতি ন্যায়রত্নের যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে টেকচাঁদী ভাষার গুণকীর্তন করেছেন। অবশ্য টেকচাঁদী কথ্যরীতির অতিরেকও যে সাহিত্যে কাম্য নয়, তা তিনি 'নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত' শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতাদর্শকে খণ্ডন ক'রে দেখিয়েছেন। আধুনিক পরিভাষায় বলা যায়, শ্যামাচরণবাবু বাঙলা ভাষার শুদ্ধীকরণ চেয়েছেন তৎসম শব্দকে অথবা সংস্কৃতসুলভ পদগঠন-প্রক্রিয়াকে (যেমন, বহুবচনজ্ঞাপক 'গণ', সন্ধি, ত্ব/য প্রত্যয়, লিঙ্গ-শাসন) আমূল বর্জন ক'রে এবং তার স্থানে পুরোপুরি তদ্ভব শব্দের ও প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে। এ-বিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য হলো: প্রথমত, প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ উচ্ছেদে কোনো ফল নেই ; 'ভ্রাতা, মস্তক, ব্রাহ্মণ'-জাতীয় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙলা ভাষা থেকে বহিষ্কার করাও যায় না। দ্বিতীয়ত, বোধগম্য তৎসম শব্দগুলিকে বর্জন করলে বাঙলা ভাষা "কিয়দংশে ধনশূন্য" হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত, অর্ধতৎসম শব্দকে তৎসমরূপে রাখাই শ্রেয় ; যেমন, 'ক্ষৌরী' শব্দ, উচ্চারণে 'খেউরি' হলেও 'ক্ষৌরী' বোধগম্য ব'লে "আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে।" চতুর্থত, কতকগুলি যুগ্ম সমার্থক শব্দ বাঙলায় থাকলেও তাদের শব্দসাযুজ্যগত অথবা প্রয়োগগত পার্থক্য বজায় থাকে, যেমন—'ভ্রাতৃ' স্থলে 'ভাই' প্রয়োগ করা

গেলেও 'ভ্রাতৃভাব' বা 'ভ্রাতৃত্ব'-জাতীয় শব্দকে 'ভাই' দ্বারা স্থানচ্যুত করা যায় না। পঞ্চমত, কিছু কিছু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় প্রয়োজনে গৃহীত হলেও দোষের কিছু নেই (যেমন, মাধ্যাকর্ষণ)। কারণ, "বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণের জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হয়। কর্জ করিতে হইলে চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য।"

নিষ্প্রয়োজনে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে বঙ্কিমের যেমন আপত্তি, তেমন আপত্তি চলিত ভাষার নামে সাহিত্যে ইতর ভাষার (Slang) অপপ্রয়োগ সম্বন্ধেও। এই কারণেই তিনি "বাঙ্গালার লিখন পঠনে" হুতোমি ভাষার ব্যবহার অনুমোদন করেন না। কারণ, বঙ্কিম মনে করেন—"হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।" উন্নত রুচি, রসবোধ এবং শব্দসম্পদের ক্ষেত্রে "টেকচাঁদী ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর"—যদিও "গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদী ভাষায় কুলায় না। কেননা, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।"

পরিশেষে বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত: (১) বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। (২) রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা এবং সর্বোপরি সর্বজনগ্রাহ্যতা। (৩) যেহেতু রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, সেইহেতু 'সৌন্দর্যের অনুরোধে' এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কৃতবহুল ভাষা অথবা টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষা আশ্রয়ে আপত্তি থাকা উচিত নয়। (৪) অর্থগৌরব, স্পষ্টতা এবং বক্তব্য বিষয়ের ঋজু উপস্থাপনার জন্য "ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" মোট কথা, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলিত, সাধু, দেশী বা বিদেশী যে-কোনো উপাদানাশ্রিত ভাষাই, বঙ্কিমের মতে 'উৎকৃষ্ট রীতি।'

এখন বিবেকানন্দের প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত, পত্রাকারে লিখিত। পত্ররচনাই উদ্দেশ্য ব'লে রচনার ষ্টাইল intimate এবং informal, সংলাপধর্মী এবং আবেগপ্রধান। প্রবন্ধের ভাষা বঙ্কিমের মতো সাধু নয়, কথ্য; তবে বক্তব্য বঙ্কিমানুসারী—সেই সাধু ও কথ্যরীতি সম্পর্কিত ভাষা-ভাবনা। বাঙলা ভাষা সম্পর্কে উভয়ের তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার পার্থক্য সংক্ষেপে এই—

প্রথমত, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অযথা প্রয়োগ অথবা সংস্কৃত শব্দভারাক্রান্ত কৃত্রিম সাধু গদ্যের প্রতি অনীহা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বক্তব্যের সাধারণ লক্ষণ। বাঙলা রচনায় "ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদের একচেটিয়া" আধিপত্য অথবা "দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে"র দৌরাত্ম্য—এককথায় "সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা" বঙ্কিম অনুমোদন করেননি। বিবেকানন্দও "স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে অস্বাভাবিক ভাষা" গ্রহণে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তাই "অপ্রাকৃত, কল্পিত, কটমট ভাষায়" ব্যবহৃত "সংস্কৃতর গদাই লস্করী চাল" তিনি নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ এইজাতীয় কৃত্রিম সাধুরীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন এই ব'লে—"কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!—ওসব মড়ার লক্ষণ।" লক্ষণীয়, বঙ্কিম সংস্কৃতাশ্রিত রীতি সম্পর্কে এতটা আক্রমণাত্মক নন, তিনি ধীর স্থির সতর্ক যুক্তিবাদী এবং আপোষকামী। তাঁর কাছে সাধুরীতি গ্রাহ্য কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে নয়।

দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত লিখিত এবং চলিত অর্থাৎ সাধু ও কথ্যরীতির সম্পর্ক এবং সাহিত্যে এদের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করেছেন। অপর পক্ষে, বিবেকানন্দের উপজীব্য, বাঙলা ভাষায় কথ্যরীতির যে আঞ্চলিক ভেদ আছে, "বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা"-বৈচিত্র্য আছে, তার একটির প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, তাঁর নির্বাচিত উপভাষাটি হলো কলকাতার চলিত বাঙলা, কারণ "প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।" মোটকথা, কলকাতার কথ্য ভাষাকেই তিনি আদর্শ চলিত ভাষা ব'লে মনে করেন। সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগ বঙ্কিমের কাছে ছিল একটি সমস্যা, কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে তা সমাধান। তাঁর কাছে চলিত ভাষা বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু তা কলকাতার উপভাষা কেন্দ্রিক হওয়াই উচিত। সুতরাং দেখা গেল, চলিত ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার প্রসঙ্গে উভয়ের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন কিন্তু একটি অপরটির পরিপূরক।

তৃতীয়ত, চলিত ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্যও উভয়ের কাছে ভিন্নধর্মী। বঙ্কিমের কাছে "জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্মগ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা।" এই কারণেই মুখের ভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগ অপরিহার্য। অবশ্য এ-ব্যাপারে বঙ্কিম গোঁড়া নন। তাই প্রয়োজনবোধে সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় না নেওয়ার কোনো কারণ নেই। অপর দিকে বিবেকানন্দ মনে করেন, "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা

প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।" শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, চলতি বাঙলার যেমন আছে প্রাণশক্তি, তেমনই নমনীয়তা। ভাষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা: "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" মোট কথা, বঙ্কিমের কাছে ভাষার শিল্পনৈপুণ্য তার সহজ সরল সৃজন ক্ষমতায় আর বিবেকানন্দের কাছে তার শাণিত বলিষ্ঠ দৃঢ়তায়। বলা বাহুল্য, চলতি ভাষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও উভয় মতাদর্শ-ই সত্য, একে অন্যের পরিপূরক—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চতুর্থত, সাহিত্যে কথ্য ভাষার যথাযথ স্থান নির্ধারণে উভয় প্রাবন্ধিকের জীবনদর্শনের পার্থক্যও লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, চলতি ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যিক সৌন্দর্যসৃষ্টির অপরিহার্য আদর্শ। তাই প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ কারণেই স্কচ্ কবি বার্ণস্ হাস্য ও করুণ রসাত্মক কবিতায় স্কচ্ ভাষা কিন্তু গম্ভীর ও উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেছেন। বস্তুত, সাহিত্যিক প্রয়োজনের তাগিদেই কখনও সংস্কৃতবহুল ভাষা, কখনও বা সরল প্রচলিত কথ্য ভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বিবেকানন্দের কাছে কিন্তু সাহিত্যিক প্রয়োজনের চেয়েও জীবনের প্রয়োজন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। মুখের ভাষা গ্রহণীয়, কারণ তাতে আছে প্রগতিশীল জীবনধর্মিতা। এই কারণেই যুগে যুগে সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মাধ্যমও পাল্‌টে গেছে। বঙ্কিমের মতো তিনিও স্বীকার করেন, ভাষার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা আর তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত 'লোকহিতায়' সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যুগের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী সংস্কৃতেরও স্থানচ্যুতি ঘটেছে। ফলে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সংস্কৃত, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, আচার্য শঙ্করের ভাষ্য অথবা অর্বাচীনকালের সংস্কৃতের মধ্যে ভাষিক বিবর্তন দেখা গেছে। কাজেই ভাষা কেবল সাহিত্যিক সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায় নয়, তা 'উন্নতির প্রধান উপায়', এমনকি জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ারও বটে।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার, চিন্তানায়ক বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য রেখেছেন যথার্থ প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমসাময়িক সাহিত্যকর্মের পটভূমি রচনা করেছেন, সাধু ও চলিত উভয় মতাবলম্বীদের মতামত উপস্থাপনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের যুক্তি খণ্ডন ক'রে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। অপরপক্ষে যুগনায়ক বিবেকানন্দ যথার্থ

prophet-এর মতো তাঁর নির্দেশ-বাণী উচ্চারণ করেছেন নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণায়। সেখানে যুক্তির চেয়ে আবেগ, বঙ্কিমী humour অপেক্ষা satire বা শ্লেষধর্মিতা, নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপেক্ষা সহৃদয় পত্রলেখকের অন্তরঙ্গ মেজাজ-মর্জিই অধিক প্রকাশ পেয়েছে। তাই বক্তব্য উপস্থাপনায় বঙ্কিমের রচনা যতখানি প্রাঞ্জল ও বিশদ, বিবেকানন্দের রচনা ততখানি মন্ত্রধর্মী এবং সংক্ষিপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চিন্তার একদিক ঃ বাঙালীর দাম্পত্য জীবন

চিত্তরঞ্জন লাহা

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর রসস্রষ্টাগণ নিছক পুষ্পবিলাসী ছিলেন না, উদ্যান সংরক্ষণেও তাঁরা সক্রিয় এবং সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ বাবদে বঙ্কিমচন্দ্র একাই একশ। তিনি একাধারে ভাবসাধক ও কর্মযোগী, রসস্রষ্টা ও চিন্তানায়ক। তাঁর একচোখে কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা, অপর চোখে সজাগ ও সতর্ক তীক্ষ্ণ বাস্তব সামাজিক দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিপথে ধৃত এবং বিচারিত আমাদের সমাজ সংসার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষে নষ্ট হয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। পক্ষান্তরে পৃথক পরিবেশে তাঁর কোনো কোনো চিন্তাভাবনাব প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাঙালীর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ সানন্দে স্বীকার করেছেন যে. "বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।" কিন্তু শুধু বঙ্গভাষা নয়, আমাদের সমাজ সংসারের সর্ববিধ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তিনি এক ডাকে সাড়া দিয়েছেন। প্রয়োজনে তিনি সমাজ সংসারের দুষ্ট ক্ষতগুলিকে দূর করাব জন্য কিছুটা নিষ্ঠুরতা এবং নির্দয়তার সঙ্গেই অস্ত্রচালনা করেছেন, সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনে ও প্রার্থনায় শিল্পের দাবিকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছেন। তাঁর চিকিৎসাপ্রণালীব সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় এবং সমাজ হিতৈষায় সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাগুলির মধ্যে সমকালের ছাপ যেমন আছে তেমনি আছে অনাগতকালের অসংশয়িত আত্মপ্রকাশ। অন্ততঃ কয়েকটি বিষয়ে তিনি যে আধুনিক কালের অত্যন্ত কাছাকাছি সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ অল্প। পরাণ মণ্ডল থেকে পরিবার পরিকল্পনা সর্বত্রই তাঁর চিন্তাভাবনায় অনাগতকালের ভাব-পুষ্পের বীজ অনায়াস দৃষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ চিন্তার সার্বিক মূল্যায়ন আমাদের লক্ষ্য নয়। সমাজ জীবনের মূল আধার যে পরিবার যা মূলতঃ দুটি নরনারীর সামাজিক স্বীকৃতিধন্য যৌথ জীবনযাপনের আনন্দময় যুগল অঙ্গীকার—সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তার যে সময়কালীন রূপদর্শনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার স্বরূপদর্শনই আমাদের লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। স্বীকার্য যে, এ বাবদে অপব্যাখ্যা বা অপপ্রচার অল্প নয়। তাঁকে রক্ষণশীল দলের সাহিত্যিক মুখপাত্র রূপে উপস্থাপিত করার উৎসাহ অনেকেরই। সমাজ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক সম্ভ্রমবোধ এবং সামাজিক কল্যাণাদর্শে তাঁর শিল্পের দায়বদ্ধতা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু। কিন্তু যথার্থ বিচারে তিনি ছিলেন সামাজিক কল্যাণমনস্ক মানুষ। সেই সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনেই আমাদের পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে এই আগ্রহের ঐতিহাসিক মূল্য ও মহিমা অসামান্য।

বঙ্কিমচন্দ্র আর্থ-সামাজিক কারণেই বাল্য বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে যে অক্ষম তার পক্ষে বিবাহ যে অবিধেয় একথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন। 'রামধন পোদ' (বঙ্গদর্শন, ১২৮৮ ভাদ্র) প্রবন্ধে তিক্ত শ্লেষের সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন "......বাঙ্গালীর রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন ছেলেরও সর্বনাশ—নিজেরও সর্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাথর গলায় বাঁধিয়া দিয়া ছেলেকে এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে?"

এই কারণেই কি না জানিনা, তাঁর উপন্যাসে যেখানেই আদর্শ দাম্পত্য জীবনের আনন্দমধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেখানেই দেখি যে, পুরুষেরা কেউই পূর্ব পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি নিয়ে অনায়াস-জাবর কাটেন না, পক্ষান্তরে নিজেদের কর্মকুশল, পরিশ্রমী এবং উপার্জনশীল সক্ষম পুরুষ রূপে পরিচয় প্রদানের প্রশংসনীয় ক্ষমতা রাখেন। 'বিষবৃক্ষে'র শ্রীশবাবু অথবা 'ইন্দিরা'র রমণীবাবুর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে জীবিকা

অর্জনের কঠিন ও রূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি যাদের দাঁড়াতে হয় না, পূর্ব পুরুষের অর্জিত বিত্তের দৌলতে যারা অলস ভোগের একচ্ছত্র অধিকারী তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত বেশি এরকম একটা ইঙ্গিতও বোধ হয় বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসে বহু বিবাহের চিত্র আছে এবং সেখানে সাপত্নদ্বন্দ্বের কথা নেই বলে যাঁরা এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন প্রত্যাশী তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তাঁর সেই সুস্পষ্ট ঘোষণা : "বহু বিবাহ অতি কুপ্রথা, যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।" তবে শাস্ত্রের দোহাই বা আইনের সাহায্যে এই প্রথা দূরীকরণে তাঁর আস্থা বা উৎসাহ ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, "বহু বিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে ; অল্প দিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।" সুখের বিষয় এই যে, ইতিহাস তাঁর বিশ্বাসেব মর্যাদা রেখেছে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় যে, সমাজ সংস্কারে শিক্ষার সুমহান ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। শিক্ষার প্রয়োজন শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীশিক্ষারও প্রয়োজন এবং সমকালের মাটিতে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সোচ্চার ঘোষণা "......স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত...।" (সাম্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) এ শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রেও স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকারের কথা তিনি বলেছেন। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব সমাজচিন্তার বৈপ্লবিক চরিত্রটি অনুধাবন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ দূষণীয় নয়। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে লেখা হলেও এটা নগেন্দ্রনাথেরই কথা এবং পাঠক জানেন একথা বলার মাথাব্যথাও তারই। বঙ্কিমচন্দ্র এক পুরুষ ও এক পত্নীর সমাজ অনুমোদিত দাম্পত্য জীবনাদর্শেরই উদ্গাতা ও উপাসক এবং কুন্দ বা রোহিণীকে যে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যেতে হয় অনেক কারণের মধ্যে এই বিশিষ্ট জীবনাদর্শের প্রতি তাদের স্রষ্টার আত্যন্তিক আস্থা ও অনুরাগও তার একটি প্রধান কারণ। তাছাড়া এই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেই এমন একটি কথা শুনি যা ওজনে ও তাৎপর্যে নেপোলিয়ন কথিত তাঁর মায়ের সেই একবিন্দু অশ্রু জলের সমতুল্য যা বিরুদ্ধবাদী সেনাপতির শত সহস্র অভিযোগকে এক লহমায় মুছে দেবার ক্ষমতা রাখে। স্বামীর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহের পর সূর্যমুখীর

সেই জ্বলন্ত প্রশ্নটি—'কমল, কোন দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে ?' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবন একান্তরূপেই ব্যাকরণ এবং সামাজিক বিধি সম্মত—শুধু দুজনের, একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলিত সংসার। সেখানে স্বপ্নেও তৃতীয় জনের স্থানাভাব। ভুল বললাম। তৃতীয় জনের স্থান অবশ্যই আছে, তবে সে জন বহিরাগত নয়, অন্তরাগত। সে সুন্দর পুরুষ বা নারী নয়, একটি সুন্দর শিশু। কুমারসম্ভবেই দাম্পত্য জীবনের শ্রী, শান্তি ও কল্যাণ। তবে সে প্রসঙ্গ পরে।

তার পূর্বে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতটুকু জেনে নেওয়া প্রয়োজন কেননা তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার অভিযোগ উত্থাপনে প্রসঙ্গটিকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত অবিরল। বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিবাহের মতো বিধবা বিবাহের সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের বিপরীত মত পোষণ করতেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁর একাধিক রচনার সাক্ষ্য থেকে একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে, এ সব বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সংঘাত ততটা ছিল না যতটা ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত। নরনারীর অধিকার-সাম্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বিধবার চির বৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃত-ভার্য্য পুরুষদের চির পত্নীহীনতা বিধান কর না কেন ?" এ নিশ্চয়ই বিধবা বিবাহ বিরোধীর কথা নয়। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা "আমরা বলিব, বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।" এ সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা "ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য-মাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতি-বিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।" এই শেষ কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই কুন্দ বিধবা বলেই বিষবৃক্ষ, এ রকম ধারণার কোন অবকাশ নেই। এখানে ইন্দ্রিয়লালসার সঙ্গে অন্যের অনিষ্টের আশঙ্কাও সমভাবে বর্তমান। সূর্যমুখী কমলমণির কাছে লেখা চিঠিতে বিধবা বিবাহের বিধানদাতাকে মূর্খ বলেছে। এটা সূর্যমুখীর কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের নয়। যে কারণে নগেন্দ্রনাথ বহুবিবাহকে সমর্থন করেন ঠিক সেই কারণেই সূর্যমুখী বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

আসল কথা এই যে, নারীকে নিছক ভোগের সামগ্রী রূপে গ্রহণ করার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নারী পুরুষের বৈষম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এ

দেশের মেয়েদের করুণ অবস্থাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেছেন, "এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতা স্বরূপ ; দেবতা স্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থে সপত্নীগণেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন।" (সাম্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। নারীর এই অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল না পাতিব্রত্য-ধর্ম এবং দাসীত্ব যে এক বস্তু নয় তা তিনি জানতেন। গৃহধর্মে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমানাধিকারের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বহু বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর সমর্থন থাকার কথা নয়।

তবে তিনি এগুলিকে দাম্পত্য জীবনের প্রধানতম প্রতিবন্ধক বা গুরুতর কোন সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেন নি। আদর্শ দাম্পত্য জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ রূপে যে বস্তুটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল তা হল রূপজ মোহ এবং প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় আত্মপ্রকাশ। এই রূপজমোহকে অস্বীকার করা যায় না, অস্বাভাবিক বলা যায় না, এর কুলভাঙা খেলার বর্ণাভিরাম শক্তি ও সৌন্দর্যকে অবহেলাও করা যায় না। অথচ সমাজ জীবনে এর অকল্যাণকর ভূমিকাটিকেও ছোট করে দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মুস্কিলটা হয়েছিল এখানেই। জীবন পাত্রে যা স্বভাবজ শিল্পপাত্রে যা আকর্ষণীয়, লোকক্ষেত্রে তাই অমঙ্গলজনক। স্বাভাবিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সমাজ চিন্তার দ্বন্দ্বটা তুঙ্গে উঠেছে মানব মানবীর রূপতৃষ্ণার ক্ষেত্রে। কমলাকান্তের বকলমে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি— "জ্ঞান বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। ......রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।" কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ষড়বিংশতম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই শুনি—"রূপে মুগ্ধ ? কে কার নয় ? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি ? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন।"

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—"যে প্রেম উদ্দামবেগে নরনারীকে চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। যে প্রেমের বলে নরনারী মনে করে তাহারা

আপনাকেই আপনার। সম্পূর্ণ মনে করে সমস্ত সংসার বিমুখ হয় তবু তাহাদের ভয় নাই, অভাব নাই---যে প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা ঘূর্ণবেগে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত গ্রহের মতো তাহাদের চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়।" (কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা)

শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথার পরেই সমাজকল্যাণে দায়বদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।" এটা সমাজ কল্যাণের পথ নয় বলেই পাপের পথ। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ দাম্পত্য জীবনের প্রাণ ও পথের কাঁটা। সমাজকল্যাণে নিবেদিত লেখনী এই কাঁটাটিকে তুলে ফেলার অত্যুৎসাহে শিল্পের শর্ত খেলাপ করেছে কিনা সে প্রশ্ন বিবেচনার স্থান এটা নয়। আমাদের বলার কথা শুধু এই যে, এই রূপতৃষ্ণার অবাধ প্রশ্রয়ে আমাদের সমাজজীবনে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য এবং দায়িত্বশীল শিল্পীরূপে সমাজজীবনকে সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বঙ্কিমচন্দ্র দায়বদ্ধ। রূপজ মোহ এবং প্রকৃত প্রণয় যে একবস্তু নয় হরদেব ঘোষালের পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বিশদভাবেই বলেছেন— "যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্ত-চাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনদারজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ...কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মধিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়......। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণ গ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা ; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত-পক্ষে স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ। "(বিষবৃক্ষ)। এই সূত্রেই স্মরণীয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা ক্ষমাপ্রার্থিনী ভ্রমরের সঙ্গে রোহিণীর তুলনা করে গোবিন্দলাল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত— "এ কালো। রোহিণী কত সুন্দরী। এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।" বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই রূপজ মোহই আমাদের সংসার জীবনের তাবৎ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। রূপের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে যে বিযোদ্গার শুনি তার কারণটিও এখানেই। স্বাভাবিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের বাস যোগ্য গৃহ

নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি রূপ নয়, গুণ, দৈহিক সৌন্দর্য নয়, চারিত্রিক মাধুর্য। পারস্পরিক আস্থা, আশ্বাস, আনন্দ ভালোবাসায় মধুর ও মনোহর সেই বাসগৃহের দ্বারপ্রান্তের নামফলকে লেখা আছে 'বাঙ্গালীর সংসার'। এই সংসারের সুখশান্তি ভালোবাসা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—সূর্যের আলোর মতোই তা চতুর্দিক আলোকিত, আপ্যায়িত ও আনন্দিত করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব অনুশীলনের পথ প্রব্রজ্যা নয়, পরিবার। দুটি নরনারীর বিবাহিত, বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত জীবন এই পরিবারের ভিত্তি। অসামাজিক প্রণয়বন্ধন যে নিছক ইন্দ্রিয়চর্চা ছাড়া অন্য কিছু নয় সে কথা বারংবার উচ্চারণে বঙ্কিমলেখনী কদাচ ক্লান্তিবোধ করেনি। পরকীয়া প্রণয় তাঁর শিল্পের আশ্রয় পেয়েছে কিন্তু চিত্তের প্রশ্রয় পায়নি। যে প্রণয় বিবাহের মধ্যে দিয়ে পূত পবিত্র, পারস্পরিক আস্থা, আশ্বাস ও সুগভীর ভালবাসার শতদলে যার নিত্য পূজা এবং 'কুমার সম্ভব' যার রমণীয় পরিণাম বঙ্কিমের মননে এবং সৃষ্টিতে সেই দাম্পত্য প্রণয়েরই অনাবিল প্রশস্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই দাম্পত্যজীবনক্ষেত্রই স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জনের প্রীতিশিক্ষার এবং সামাজিক মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধান পাঠশালা। পিতা-মাতার আচার আচরণ যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ। কাজেই কুন্দ বিধবা বলেই বিষবৃক্ষ এ রকম ধারণার কোন অবকাশ নেই! এখানে ইন্দ্রিয় লালসার সঙ্গে অন্যের শিশুমনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে এ সম্পর্কে আধুনিক কালে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র মানব শিশুর এই প্রাচীনতম পাঠশালাটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়াসী ছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আদর্শ দাম্পত্য জীবনের আঙ্গিনায় একটি শিশু সন্তান আনন্দে বিরাজমান। বিষবৃক্ষের ছায়াতলে শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সুস্থ সুন্দর দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে সতীশচন্দ্রের উপস্থিতিতে। এই বস্তুটির অভাবে নারী জীবনের যে বুভুক্ষা তার দৃষ্টান্ত আনন্দমঠের নিমাই। বলা বাহুল্য যে, নিমাই সাধারণ বাঙালী পরিবারের এক রমণীয় গৃহলক্ষ্মীর শাশ্বত চিত্র। কিন্তু স্মরণীয় যে, এই গৃহলক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি 'সুকুমারী' মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই মহেন্দ্র-কল্যাণীর কন্যাকে কিছুদিনের জন্য তার কোলে তুলে দেওয়া। আসল কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিস্নাত এবং স্বীকৃতিধন্য আদর্শ দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতম

প্রকাশে একটি শিশুর কলকাকলি অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজন। সুভাষিণী বা কমলমণির সংসারে দুদণ্ড কাটিয়ে নিমাইয়ের দাওয়ায় পা রাখলেই সেই প্রয়োজনটির প্রার্থনা ও প্রাসঙ্গিকতার সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে বাধ্য হই। এ অনুমান অযথার্থ নয় যে, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সংসারে এই বস্তুটির অনুপস্থিতিতেই বিষবৃক্ষের এতো বাড়বাড়ন্ত। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে, কুন্দকে বিয়ে করার সপক্ষে নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের কাছে লেখা চিঠিতে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তার মধ্যে একথারও উল্লেখ ছিল যে তিনি নিঃসন্তান। পত্রটি আত্মপ্রবঞ্চনামূলক হলেও যুক্তিটি মূল্যবান। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমরের ক্রন্দনেও এই বস্তুটির প্রার্থনা ও প্রয়োজন সরবে উচ্চারিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভ্রমরের একটি পুত্র সন্তান সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্ত ভ্রমর সেই মৃত পুত্রের জন্য চোখের জল ফেলে বলেছে, "আমার ননীর পুতলী, আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে। আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত?"

এই আদর্শ দাম্পত্য জীবনের তিনটি প্রধান দাবি—চিত্ত সংযম, সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলির উপর জোর দিয়েছেন কারণ এগুলি একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সামাজিক গুণ। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবস্থাপত্রে আরো কিছু নিদান আছে। সে সব কিছু উল্লেখ করার স্থানাভাব। সংক্ষেপে বক্তব্য এইটুকুই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মননে এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টির সাক্ষ্যে আদর্শ সমাজের প্রথম সোপান পরিবার। সেই পরিবারেই স্নেহের শিক্ষা, ত্যাগের দীক্ষা। সেই পরিবার দুটি নরনারীর প্রণয় সম্পর্ক সঞ্জাত সুখ ও শান্তির সংসার। এই সংসারে নারী দাসী নয়, অর্ধাঙ্গিনী, রোহিণী কল্যাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পচিন্তা এবং সমাজচিন্তার মধ্যে যত বিরোধই থাক না কেন অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তাঁর উভয় চিন্তার মধ্যে মিলন সার্বিক এবং আন্তরিক। সেই ক্ষেত্রটি আদর্শ দাম্পত্য জীবন। এই ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সমালোচকের উচ্চ প্রশস্তি—"বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের কবি। দৈনন্দিন তুচ্ছতার বালুসজ্জা? অন্তরাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল শীতল পয়স্বিনী উদ্ধারে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব।" (প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সরণী, পৃ-২১৭-১৮) তার কারণ চিন্তানায়ক এবং রসস্রষ্টা এখানে এক এবং অভিন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ইংরেজি উপন্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং ক'টি প্রশ্ন

ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত

০.০ এই নিবন্ধিকার উপজীব্য : 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'-র ইংরেজী পাঠ, যা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা।

১.১ 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে শুরু করেছিলেন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, যখন তিনি খুলনা জেলার উপশাসক। এর পরের বছর 'ইণ্ডিআন ফীল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এটি বেরোয় এবং সম্পূর্ণও হয়; বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এটিকে বই হিসেবে কোনো দিন প্রকাশ করেন নি। অবশ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র লিখেছেন যে বঙ্কিম কোন এক সময়ে এই লেখাটিকে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিলেন। শচীশের বক্তব্যের এই তথ্যগত ভুলটি ধরা পড়ে ১৯৩৪ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে : ১৮৬৪-র 'হিন্দু প্যাট্রিঅট' পত্রিকার একটি বাঁধানো সেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি ঐ একই সঙ্গে সে-বছরের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এর অনেকগুলি সংখ্যা খুঁজে পান, যাদের মধ্যে ঐ বইটির ৪র্থ থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত মিলে গেল। অর্থাৎ, বইটি বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছিলেন।

১.২ উল্লেখযোগ্য যে, শেষ জীবনে 'বারিবাহিনী' নাম দিয়ে বঙ্কিম নিজেই 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'-এর অনুবাদ শুরু করেছিলেন : অসমাপ্ত ছিল এই ভাষান্তরিত পাঠটি, মূল বই নয়। এক থেকে নয় অধ্যায় পর্যন্ত বঙ্কিম ভাষান্তরিত করেন; বাকিটা শেষ করেন শচীশ (তাঁর নিজের ভাষায় "পুত্র ও শিষ্যে"-র কর্তব্য হিসেবে) যার সঙ্গে মূল কাহিনীর যথেষ্টই গরমিল আছে স্বাভাবিক কারণেই। অনুবাদের কাজটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেন-নি বলে শচীশ মনে করেছিলেন যে মূল উপন্যাসটিও বুঝি বা অসমাপ্ত ছিল।

১.৩ পরবর্তীকালে বাংলা পাঠের ৪র্থ থেকে ৯ম অধ্যায়ের সঙ্গে মূল বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি মিলিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ 'বারিবাহিনী'-র প্রথম তিনি অধ্যায়ের ইংরেজিতে অনুবাদ (নাকি, পুনরনুবাদ ?) করে এবং সেটিকে বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করে গ্রন্থাকারে সর্ব প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে।

১.৪ 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'-এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসগুলির অন্তর্গত বেশ কিছু কাহিনী রেণু (মোটিফ) এবং চরিত্র উপকরণ (ক্যারাক্টার ট্রেইট্স্) -এর পূর্ব প্রতিভাস (আর্কিটাইপ) খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে সেজন্য এই অবহেলিত বইটির যথেষ্টই গুরুত্ব রয়েছে। পরবর্তীকালে 'ইন্দিরা' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'-র মধ্যে গ্রাম্য ডাকাতদের দেখা গেছে; 'বিষবৃক্ষে' দেখেছি অবৈধ রূপমোহ এবং দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতিও আনুগত্য; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অবৈধ প্রণয় এবং উইল

ইত্যাদি সম্পৃক্ত আইনগত সমস্যার সঙ্গে জড়িত কাহিনী পেয়েছি। এর সবই পূর্ব প্রতিভাসিত 'রাজমোহন'স ওয়াইফে'। গ্রাম্য জমিদারবাড়ীর অন্দরমহল, উকিল-আদালত-উইল-মামলা, স্নথ চরিত্র জমিদার, অসূয়া-পরবশ জ্ঞাতি-কুটুম, পতিব্রতা সাধ্বী, দ্বিতীয় পক্ষের আহ্লাদী বউ, ধনী গৃহের বিচিত্র স্বভাবের পরিচারিকাবৃন্দ, গেঁয়ো ডাকাত—যাদের সবাইকে নিয়ে যে মিছিল চলেছে এ কাহিনীর মেঠোপথে, তারা নানাভাবেই, নানা সময়ে বঙ্কিমের বাংলা উপন্যাসগুলিতে বারংবার এসে হাজির হয়েছে। এমন কি সাধারণ ভাবে, নিম্নবিত্ত মানুষ বঙ্কিমের কাহিনীতে বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও, 'রজনী' বা 'রাধারাণী' ইত্যাদির মধ্যে তাঁদের কারুকে-কারুকে আমরা দেখেছি : আর দেখেছি কেবলমাত্র তাঁর এই প্রথম উপন্যাসটিতে। অবশ্য, বঙ্কিম উপন্যাসের নিজস্ব চরিত্রলক্ষণ অনুযায়ী এখানেও তারা নিষ্প্রভ।

১.৫ শুধু কাহিনীর উপকরণই নয়, তার বিন্যাসেও এই বইয়ের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্যতা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একশ পঁচিশ বছর আগে লেখা হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে একালীন উপন্যাসের মতো ঋজুতা এবং দ্রুত গতি আমরা অনুভব করি, যা বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে প্রায় অপ্রাপ্যই—তাঁর সমসাময়িক অন্য লেখকদের কথা তো উঠবেই না এখানে। মূলত সামাজিক উপন্যাস হলেও, রহস্য কাহিনীর-সুলভ একটি রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার মৃদু চাপ এটি পড়তে গেলে সইতে হয়, যা উত্তরকালের সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যেই একটি অনাস্বাদিত রস।

১.৬ এ তো অমিলের কথা গেল! 'টেক্‌নিক' এবং 'ফর্ম'-এর ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের সঙ্গে পরবর্তী কাহিনীগুলির মিলের ব্যাপারটাও বড় কম নয়। পরিহাস-বিকল্পিত বৈঠকী ভঙ্গীতে গল্প বলাটা বঙ্কিম-উপন্যাসের অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ বলে ধার্য হয় : এ-বইতে তারও মুখপাত ঘটেছে। কায়দা করা গজেন্দ্রগামিনী ভাষার সঙ্গে লঘু-তরল বাচনমর্জি মেশানোর টেকনিক বঙ্কিমী ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট। ইংরেজিতে লেখা হওয়া সত্ত্বেও এই বইতে তারও যথেষ্ট উদাহরণ মিলছে। তাঁর কিছু কিছু বর্ণনার ভাবগত (রূপগতও) ঐক্য পরবর্তী কোনো কোনো বাংলা উপন্যাসের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

১.৭ চরিত্র-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও মিলের ব্যাপারটি আসছে। সমস্ত বঙ্কিম-উপন্যাসেরই যা অনিবার্য নিদান—অদৃঢ় এবং অসম্পূর্ণ-থাকা পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি স্বাভাবিক এবং বহুমাত্রিক (পলি-ডাইমেনশনাল) নারী চরিত্র—তাও এই প্রথম বইতে পাচ্ছি আমরা। এ উপন্যাসের কাহিনী অবশ্যই প্রত্যেকের পরিচিত। সুতরাং নাম উল্লেখ করে চরিত্রের মাত্রা নির্ধারণ অনায়াসেই করতে পারি। ধরুন : মথুর এবং রাজমোহন—প্রথম থেকে শেষ'তক এরা নিরঙ্কুশ খল এবং দুষ্টস্বভাব। অতএব এদেরকে আবর্তন করে চরিত্র সৃষ্টির মুন্সিয়ানা দেখানোর অবকাশ প্রায় নেই-ই। আবার মাধব নায়ক হলেও, নায়িকা মাতঙ্গিনীর পাশে অত্যন্তই নিষ্প্রভ। দস্যু এবং অত্যাচারী স্বামীর প্রতি মমতা আর ঘৃণার টানাপোড়েনে জর্জর মাতঙ্গিনীর চরিত্রে তৃতীয় একটি মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে মাধবের জন্য নতুন করে অন্তরে প্রণয় সঞ্চারিত হবার ফলশ্রুতিতে। এখানে সে শৈবলিনীর অগ্রজা, জেবুন্নিসার মতো জটিল। তার মতো তারার চরিত্রও অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ। তার চরিত্রে দুই

প্রেমের দ্বন্দ্ব না থাকলেও ভ্রষ্টচরিত্র স্বামীর জন্ত লালিত-যন্ত্রণাটুকু সঞ্চিত করে রাখার ব্যাপারে ভ্রমর এবং সূর্যমুখীর সে আদি-প্রতিমা (আর্কিটাইপ) ; দরিয়া তারই আরো অনেক বেশি কঠিন প্রত্যয়ী সংস্করণ।

১.৮ ভাষার ক্ষেত্রে যে-কথা এখনি বলেছি, দুয়েকটি নমুনার মাধ্যমে তাকে স্পষ্ট করা যাক এবারে। গম্ভীর-শব্দ-বিন্যাসেব সঙ্গে লঘু-পরিহাস-মন্থনের সুপরিচিত বঙ্কিমী টেকনিক এখানেও দেখি :

ক. "The anathematizing scourer of the brass vessels was cut short in the midst of a sonorous curse; and both her tongue & her arm were suspended in the middle of half-performed evolutions. The destroyer of the finny tribe also, experienced a momentary interruption....The presiding divinity of the kitchen abruptly terminated her vocal exertions...."

(ch. v/RMW)

খ "যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল। যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছের চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল; যে স্নান করিতেছিল সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল, যে খাইতেছিল, তার আধপেটা বই খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল শত্রুপক্ষের সঙ্গে তার হঠাৎ মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল মার কোলে উঠিয়া খেড়ে বউ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারি পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না।" (৩।১২, দে-চৌ)

এরকম উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যায়। আপাতত তার প্রয়োজন নেই।

১.৯ নানা দিক থেকে বিচার করলে, বিষয় এবং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মূল বঙ্কিমী রীতি-প্রকরণ ইত্যাদির প্রাথমিক ছক এই উপন্যাস থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করে।

১.১০ এই সমস্ত কারণেই এই বইয়ের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে ॥

২.১ কথিত আছে বঙ্কিম স্বয়ং নাকি 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'বিষবৃক্ষ' অনুবাদ করেছিলেন। প্রথমটির পাণ্ডুলিপি অনেকখানি পাওয়া গেলেও, দ্বিতীয়টি ('বেন অব লাইফ') ছোট লাট-পত্নী শ্রীমতী এলিয়টকে উপহার দেবার পর হারিয়ে যায় বলেই প্রচলিত।

২.২ বাংলা এবং ইংরেজি 'দেবী চৌধুরাণী'-র মধ্যে কোন্‌টি যে কার অনুবাদ সে ব্যাপারে কৃত নিশ্চয় হওয়া কিন্তু কঠিন। যে ইংরেজি পাণ্ডুলিপি পরে গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে, সেটি মন দিয়ে পড়লে, এ-সংশয় জাগে। বাংলার বহু বিস্তীর্ণ বর্ণনা, ইংরেজিতে খুব সংক্ষেপে প্রতিবেদিত, যাকে বাংলার পাশে রেখে পড়লে খসড়া বলেই মনে হয়। ইংরেজি পাঠের প্রাপ্ত অংশের শুরু যেখানে তা হল বাংলা-পাঠের ৩য় খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদ। বাংলা পাঠের ৭ম পরিচ্ছেদেই ব্রজেশ্বরের সঙ্গে হরবল্লভের দেখা হয়েছে দেবীর বজরায় এবং ৮ম পরিচ্ছেদে তার অসাক্ষাতে নিশি হরবল্লভকে বাগে পেয়ে ব্রজর সঙ্গে প্রফুল্লর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থায় রত। কিন্তু ইংরেজি পাঠে, হরবল্লভ বজরায় ছেলের উপস্থিতির খবর রাখেন না। অর্থাৎ, বাংলা পাঠে ইংরেজ সেনানী ব্রেনানের সঙ্গে ব্রজর যে হাতাহাতি এবং মিটমাটের

বিস্তৃত বিবরণ আছে, ইংরেজি পাঠে তা নেই একেবারেই! বাংলার পরবর্তী ৯ম+১০ম এই দুটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তু সংক্ষিপ্ত একটি খসড়া-ধর্মী অধ্যায়ের মধ্যেই ইংরেজি পাঠে সমাহৃত। প্রসঙ্গত, ইংরেজি-পাঠের কোনো অধ্যায়েরই পরিচ্ছেদ সংখ্যার নির্দেশ নেই; এতেও লেখাটির খসড়া-জাতীয় চরিত্রই ফুটে ওঠে।

২.৩ বাংলা এবং ইংরেজি দুই পাঠের সমান্তরাল অংশ পাশাপাশি রেখে বিচার করা দরকার এরপর:

(ক) "Rangaraj however did not lead St. Brenan to the gallows. He accompanied him to the nearest village, purchased a horse for him with Devi's money, provided him with funds for his journey, deliverd him Devi's messege, & then courteously bade him farewell. The St. doubted very much in his mind whether these were robbers at all."

(খ) "রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, 'আমরা কাহাকেও ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পেছনে আর লেগো না। তোমায় ছাড়িয়া দিলাম।'

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপরে ভাবিল, 'ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙালীর এত কি ভরসা?'

তারপরে রঙ্গরাজ বলিল, 'সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে?'

সাহেব। যে প্রকাবে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া মোহর কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী একশত মোহর পথ-খরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গুনিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ খান মোহর লইল আর লইল না। বলিল, 'ইহাতে যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ লইলাম।'

রঙ্গরাজ। আচ্ছা আমরা যদি তোমাদের কাছে আদায় করতে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে ত তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাহাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভাল মন্দ না বলিয়া চলিয়া গেল।"

২.৪ ইংরেজি পাঠের ৫৬টি শব্দের জায়গায় বাংলা পাঠে শুধু ১৪৪টি শব্দই বসেছে এমনটি নয়; বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেক উপকরণ বৃদ্ধি ঘটেছে সেখানে। সর্বত্রই এই একই ব্যাপার ঘটেছে। কোন্‌টা ঘটেছে বাংলা ইংরেজি- সার সংক্ষেপ? না, ইংরেজি বাংলা—ভাব সম্প্রসারণ?

২.৫ খতিয়ে দেখলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই ওজনে ভারী। শব্দ, পদাংশ, বর্ণনীয় বিবরণ সবই বাংলা পাঠে অনেক বেশি। অনুবাদেরও একটা বিজ্ঞান আছে, যার মাধ্যমে বলা যায়, অনুবাদ করলে সচরাচর মূলের থেকে তাতে পদ/পদাংশ ইত্যাদির সংখ্যা বেড়েই যায়। সংক্ষেপীকরণ করে অনুবাদ লেখকের পক্ষে খুবই দুরূহ, কেন না মূলের শিল্পসমৃদ্ধ বর্ণনাকে

অনুবাদে নিছক সংক্ষিপ্তসার রূপে দেখানো অন্তত লেখকের কাছে স্বহস্তে সন্তানবধের তুল্য ব্যাপার! পক্ষান্তরে বর্ণনা ছোট হলে, লেখক অনুবাদকরূপে তার মধ্যে সংযোজন-পরিবর্ধন করবেনই যে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমের অনুবাদ-কৃতিও এই সর্বজনীন অভ্যাসের বন্দী যে, তাব প্রমাণ 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' এবং বারিবাহিনীর সেই সব অংশ, যা তাঁর স্বানূদিত। যেমন:

"The abler general of the two did not fell to fire a retiring shot in the shape of a hearty kick at the shins of his antagonist" —এই ২৭টি শব্দে গাঁথা বর্ণনাটি বাংলায় ৪৬টি শব্দেই শুধু পরিণতি পায়নি, বর্ণনার মধ্যে উপকরণ এবং রস দুই ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের বিদগ্ধ পরিহাস-মর্জি বিকশিত। যথা:

"যে শিশু মল্ল যোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরত্বের এমন নূতনতর পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকোচ মৃত্যুকালে পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনি পলায়ন কালে বিপক্ষের উরুদেশে একটি পদাঘাত করিয়া গেলেন।"

২.৬ এই রকম আনুপাতিক তুলনা আরও করা যায় অনায়াসেই যার মাধ্যমে একটি বিতর্ককে খুব জোরালো ভাবে তোলা যায়: 'দেবী চৌধুরাণী' প্রাথমিকভাবে ইংরেজিতে লিখেছিলেন বঙ্কিম, বাংলায় লেখা যে পাঠটি পরবর্তীকালে আমরা পাচ্ছি, সেটি মূল ইংরেজি খসড়াটির পুনর্বিন্যস্ত রূপায়ণ। পক্ষান্তরে, বাংলা থেকে ইংরেজিতে যদি অনুবাদ করা হতো, তাহলে নিজের লেখার পুষ্পলাবী-কথনভঙ্গীকে অনুবাদের সময়ে সংক্ষিপ্ত করে নিছক বক্তব্যের প্রতিবেদন করা বঙ্কিমের পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (১০৪ সংখ্যা, ১৮৭১) সমকালীন বাংলা সাহিত্য সমালোচনার সূত্রে 'কপাল-কুণ্ডলা'-র কিছুটা অংশ অনুবাদ করেছিলেন তিনি, যেখানে মূলের প্রতিটি বর্ণনা, চিত্রকল্প এবং শব্দ-সংযোজনও নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মূলের ১১৪টি শব্দে সাজানো বর্ণনাকে যথাযথ ভাবে প্রতিবিম্বিত করতে তিনি সেখানে ২০৪টি শব্দ ব্যবহার করেছেন অনুবাদে।

২৭. পুনর্লিখনের সময়ে, প্রথম পাঠটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি বাড়িয়ে নিতেন, তার চমৎকার উদাহরণ 'রাজসিংহ': ১৮৮২-র ১ম সংস্করণে, চার খণ্ডে বই শেষ; ১৮৯৩-র সংস্করণে সংযুক্ত হয়েছে 'দরিয়া-মবারক-জেবুন্নিসা' ত্রিভুজ, যা এই ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীকে নূতন একটি মাত্রায় ভূষিত করেছে, বইটির শিল্প সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

২৮. ঠিক এভাবেই 'ইন্দিরা' আটটি থেকে বাইশটি পরিচ্ছেদে বেড়ে গেছে পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ, পুনর্লিখনের সময়ে মূল পাঠকে বিস্তৃত করাই ছিল বঙ্কিমের মানসিকতার একটি মৌল প্রবণতা। অনুবাদও তো এক অর্থে পুনর্লিখন: সেখানে এর হেরফের কেনই বা হবে? 'মৃণালিনী' এবং 'আনন্দমঠ'-এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কিছু-কিছু অংশ যেমন বাদও গেছে, আবার বেড়েছেও কিছু অংশ। তা ছাড়া, বাদ-যাওয়া অংশ-গুলি মূল পাঠকে প্রভাবিত করেনি।

২.৯. 'বিষবৃক্ষ' বইটি ইংরেজিতে লিখে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের লাট-গৃহিনীকে উপহার দেবার মানে বোঝা যায়। কিন্তু অকারণে 'দেবী' রাণীর গল্পের ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার লেখার উপলক্ষ কি হতে পারে? তাঁর মতো বহুব্যস্ত মানুষের পক্ষে এর উপযুক্ত অবসর খুঁজে পাওয়াও কি সম্ভব ছিল?

২.১০. শেষ কথা। 'অ্যাডভেঞ্চার্স অব এ ইঅং হিন্দু' বলে তাঁর যে ইংরেজি উপন্যাসের প্রসঙ্গ লিখেছেন শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিম-জীবনী' বইতে, সেটি কি সত্যিই হারিয়ে যায়? না-কি পরবর্তীকালে, সেটি পুনর্বিন্যস্ত হয়ে একটি পরিচিত বাংলা নভেলে পরিণতি পেয়েছে? বঙ্কিমের মতো গোছানো-স্বভাবের লেখক কি একটি লেখা এভাবে নষ্ট হতে দিয়েছেন? তাঁর প্রবণতা তো বরং এর বিপরীতই। তাহলে, ঐ 'ইঅং হিন্দু' কে? ব্রজেশ্বর? না প্রফুল্ল? দ্বিতীয়টাই সম্ভব, কেন না নায়িকা-প্রধান উপন্যাস তিনি লিখেছেন বরাবর—নায়ক প্রধান নয়। খসড়া-কাহিনীর 'ইঅং অ্যাডভেঞ্চারিস্ট' নায়িকার মাধ্যমে অনুশীলন তত্ত্বের প্রচার কুশলতর ভাবে করা যাবে বলেই কি পরবর্তীকালে এই প্রয়াস? এ প্রশ্নের নিরসন প্রয়োজন॥

বঙ্কিম-উপন্যাসের পশ্চাৎপট

প্রণয় কুমার কুণ্ডু

প্রস্তাবনা

উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে ডি, এইচ লরেন্স বলছেন, 'ঔপন্যাসিক হিসাবে আমি নিজেকে সাধু বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং কবির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করি। কেননা, জীবিত মানুষ সম্পর্কে এঁরা পারদর্শী হলেও জীবনের সার্বিক পরিচয় এঁরা কখনো পান না। একমাত্র ঔপন্যাসিকই এই দাবী করতে পারেন। এবং উপন্যাস হচ্ছে জীবনের এক উজ্জ্বল গ্রন্থ—ব্রাইট বুক অফ্ লাইফ।' ১

লরেন্সের এই মন্তব্য ভেবে দেখার মত এবং তাঁর অভিমত হয়তবা সাধারণভাবে সব ঔপন্যাসিক সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবু, লরেন্স যখন ঔপন্যাসিককে মানবজীবনের এক বৃহত্তর রূপকারের ভূমিকায় দাঁড় করাতে চান, তখন বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকিয়ে বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে। সংখ্যার দিক থেকে বঙ্কিম কথাসাহিত্য খুব একটা বড় মাপের নয়, মাত্র ১৪টি, তাঁর তুলনায় মাঝারি মাপের লেখকের লেখার সংখ্যাও অনেক বেশি। কিন্তু পরিসীমা ও সময়ের ব্যাপকতায়, যা তাঁর উপন্যাসের পশ্চাৎপট রচনা করেছে, বঙ্কিম-উপন্যাসের আর কোন তুলনা আছে কিনা জানা নেই। একথা গলস্ওয়ার্দির ফর সাইট সাগা বা তারাশংকরের কীর্তিহাটের কড়চার কথা মনে রেখেই বলছি, এমনকি টলষ্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্-এর কথাও মনে পড়তে পারে। একক ভাবে নিঃসন্দেহে এইসব উপন্যাসের পশ্চাৎপট বিশাল, দেশকাল জোড়া। কিন্তু সমগ্রিকভাবে তাঁদের রচনার বৃত্ত সীমায়িত। অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসধারাকে যদি একটি সূত্রে গাঁথা যায়, তাহলে দেখা যাবে—আমাদের সামনে প্রসারিত রয়েছে বিশাল একটি ক্যানভাস যার পরিসীমা সমগ্র বাংলা এবং যা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী প্রসারিত বাহু মেলে দিয়েছে। এবং তার ভিতর দিয়ে, লরেন্স যাকে বলেছেন, 'দি হোল হগ্', সেই রকম এক বিস্তৃত অখণ্ড সার্বিক জীবনধারাকে বিধৃত করেছেন।

এবং এই কাজ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিশেষ এক ধরণের ব্যাকড্রপ বা পশ্চাৎপট ব্যবহার করেছেন, সেই পশ্চাৎপট হচ্ছে বাংলার ইতিহাস। বাংলা উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকেই তাকিয়েছে সাধারণ সামাজিক জীবনের দিকে এবং তা এমন কিছু অসাধারণ বিষয়বস্তু দিয়েও তৈরি নয়। হয়ত বা সেই ভাবেই বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক

১। "And being a novelist, I consider myself superior to the saint, the scientist, the philosopher, and the poet, who are all great masters of different bits of man alive, but never get the whole hog.
The novel is the one bright book of life."

ধারাটি প্রবাহিত হ'তে পারতো। কিন্তু দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সামনে নয়, তাকালেন অনেকটা দূরে—বিস্মৃত ইতিহাসের দিকে চোখ রেখে লিখে গেলেন একটির পর একটি, এই ভাবেই গড়ে উঠল তাঁর উপন্যাসধারা। ইতিহাসকে তিনি কাজে লাগালেন পশ্চাৎপট হিসেবে, কয়েকটি রচনার কথা বাদ দিলে, এই হচ্ছে বঙ্কিম উপন্যাসের মৌল পরিচয়। মৃণালিনী, রাজসিংহ, এমনকি আনন্দমঠ-এর মতো উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিহাসকে টেনে আনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর বা এই ধরণের অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসকে ব্যবহার করা কি খুব একটা জরুরী ছিল? মনে হয় ছিল না। অথচ তাই হয়েছে।

কেন এমন ঘটেছে, বঙ্কিম-উপন্যাসের এই বিশিষ্ট পশ্চাৎপটের পর্যালোচনা করাই এই আলোচনার লক্ষ্য।

পরিসীমা ও সময়সীমা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে: ঐতিহাসিক, সামাজিক ও জাতীয়তামূলক।[২] ব্যাপক অর্থে ঐতিহাসিক ও সামাজিক, এই ভাবেও ভাগ করা যেতে পারে। তাঁর ১৪টি উপন্যাস ও ছোট উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র রাজসিংহকেই যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়, একথা সকলেরই জানা। সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে ৬টি উপন্যাস। বাকী যে ৭টি উপন্যাস রয়েছে, আচার্য যদুনাথ সরকারের আলোচনার কথা মনে রেখে বলা যায়, এগুলিও ঐতিহাসিক উপন্যাস।[৩] বস্তুত, বঙ্কিম-উপন্যাসের যে বিশিষ্ট পশ্চাৎপটের কথা বলা হচ্ছে, তা এই পর্যায়ের উপন্যাস-গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই উপন্যাসগুলির আখ্যান ভাগের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ একটি পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত করেছেন এগুলির ভিতর

২। যোগেশ চন্দ্র বাগল এই ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছেন বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ) সম্পাদনার সময়।

৩। এই ৭টি উপন্যাস যথাক্রমে: দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার মূল কথা হ'ল—"লক্ষ লক্ষ পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাস লইয়া ইতিহাসের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা অন্য কোন উপায়ে পাইতে পারিত না।" তাছাড়া, 'আনন্দ মঠ'-এর সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ-এর 'ঐতিহাসিক ভূমিকা'য় বলেছেন—"এই দ্বিতীয় কথাটা যদি আমরা স্বীকার করি, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'মৃণালিনী'র প্রথম দু'টি সংস্করণের আখ্যাপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছিলেন, পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য তা বর্জিত হয়।

দিয়ে। এই পরিকল্পনার দুটি দিক—ভৌগোলিক পরিসীমা ও সময়সীমা। ভৌগোলিক দিক থেকে উপন্যাসগুলির পরিসীমা দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ। অর্থাৎ বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। সময়সীমার দিক থেকে দেখলে—ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ অর্থাৎ সেন রাজত্বের অবসানে পাঠান আমল থেকে ব্রিটিশ যুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬০০ বছরের ইতিবৃত্ত এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বিধৃত। এক কথায়, বাংলায় ইসলামী যুগ বলতে যা বুঝি, তারই একটি অখণ্ড ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়ে।

এখন, এই ভৌগোলিক পরিসীমা ও সময়সীমার বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে ভৌগোলিক পরিসীমার কথা ধরা যাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, বা যদি বলা যায় রোমান্স, 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) ঘটনাস্থান গড় মান্দারণ। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই পটভূমির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'র (১৮৬৬) পটভূমি সপ্তগ্রাম। উপন্যাসটি যদিচ শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর, মেদিনীপুরের অদূরবর্তী সমুদ্র সৈকতকে কেন্দ্র ক'রে, কিন্তু মূল ঘটনা-প্রবাহ আবর্তিত হয়েছে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রাচীন সপ্তগ্রাম নগরীকে কেন্দ্র ক'রে। "মৃণালিনী'র (১৮৬৯) ঘটনাস্থান নবদ্বীপ বা লক্ষ্মণাবতী, যা একদা সেন রাজাদের রাজধানী ছিল।[৪] উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদে, তার পরেও টুকরো টুকরোভাবে এই নগরীর পারিপার্শ্বিকতার ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে। এর পরে, পর পর তিনটি সামাজিক উপন্যাস লেখার পর, বঙ্কিমচন্দ্র ফিরে গেছেন 'চন্দ্রশেখরে' (১৮৭৫)। এই উপন্যাসের পটভূমি মূলত মুর্শিদাবাদের অদূরবর্তী বেদগ্রাম, কিন্তু মুঙ্গের দুর্গকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 'চন্দ্রশেখরে'র পর আবার তিনটি সামাজিক উপন্যাসের ব্যবধান। রচিত হয়েছে 'রাজসিংহ', প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২, পরে ১৮৯৩-তে চতুর্থ সংস্করণ, পরিবর্তিত আকারে। বঙ্কিম-উপন্যাসধারায় এই উপন্যাসটির আবির্ভাব একান্তই আকস্মিক, পূর্বাপরতাসূত্রে গ্রথিত নয়। কিন্তু অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র শেষের তিনটি উপন্যাসে আবার এই পূর্বাপরতা ফিরিয়ে এনেছেন। বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তথা ছিয়াত্তরের পটভূমিকায় রচিত 'আনন্দ মঠে'র (১৮৮২) পটভূমি বাংলার প্রান্তবর্তী পূর্ণিয়া, অবশ্য মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার প্রসঙ্গও এসেছে। 'দেবী চৌধুরাণী'র (১৮৮৪) আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে বরেন্দ্রভূমির ভূতনাথ গ্রাম তথা তিস্তাবিধৌত বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ উপন্যাসটির পটভূমি উত্তরবঙ্গ। সব শেষে, 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন পূর্ব বাংলার ভূষণা গ্রাম ও তার সংলগ্ন

৪। স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The History of Bengal, Vol. II-র (May 1943), 'Muslim Perid' (1200-1757)-এর অন্তর্গত বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ বিজয় সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—"There is no evidence that Nabadwip was ever the permanent capital of the Sena Kings." (P.5.)

অঞ্চলের পারিপার্শ্বিকতা। এই ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের ভিতর দিয়ে এক একটি যুগের আবহ সৃষ্টি করে 'বাংলার মুখ' দেখেছেন।

পাশাপাশি, সময়সীমার দিক থেকে এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির দিকে এবার তাকানো যেতে পারে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটির যে সময়সীমা উল্লেখ করেছেন, সেদিক থেকে উপন্যাসটি ৯৯৭ বঙ্গাব্দ বা আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের সমকালীন ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে রচিত। 'কপালকুণ্ডলার' সময়সীমা তার অব্যবহিত পরের অর্থাৎ সেলিমের শাসনকালের। এদিক থেকে বিচার করলে, 'মৃণালিনী'র কালসীমা সেন রাজত্বের অন্তিমকাল, সেই ত্রয়োদশ শতক, যখন বখতিয়ার খিলজী বিতর্কিত মাত্র সতের জন অশ্বসেনা নিয়ে নবদ্বীপ বা লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুসারে ১২০২ খৃষ্টাব্দে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।[৫] চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জ ঘটেছে মীরকাসেমের সময়ে, তিনি ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতি, তখন কলকাতায় ইংরেজরা স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করেছে। তিনি নবাব হন ১৭৬০ সালে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময় অবলম্বনে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। না বললেও চলে, ছিয়াত্তরের পটভূমিকায় অর্থাৎ ১৭৭০ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে আনন্দমঠ-এর সময়সীমা বিধৃত। 'দেবীচৌধুরাণী'র সময়কাল এরই কাছাকাছি, যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার। এদিক থেকে 'সীতারামে'র সময়সীমা ১৭১২ থেকে ১৭২৫-এর মধ্যে, এই সময় বাংলার নবাব মুরশিদ্ কুলি খাঁ।

বলা বাহুল্য, কালানুক্রমের দিক থেকে 'মৃণালিনী'র স্থান প্রথমে হ'তে পারতো। কার্যত দেখা যাচ্ছে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে 'দুর্গেশনন্দিনী'। অনুমান করা যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টত ঐতিহাসিক কালানুক্রমের কথা ভাবেন নি। সম্ভবত, তার পরে, তিনি এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন।

তাহলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পাঠান আমল থেকে ইংরেজ আমলের সূচনা পর্যন্ত দু'শ বছরের সময়সীমাকে ধরে রেখেছেন। বস্তুত, পূর্বোক্ত ভৌগোলিক পরিসীমা ও এই সময়সীমার সমাহারে বঙ্কিমচন্দ্রের এই পর্যায়ের উপন্যাসের এক বিশিষ্ট পশ্চাৎপট সৃষ্টি হয়েছে—এবং তার ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়।

পর্যালোচনা

প্রথাগতভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যা বুঝি, যে অর্থে 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়, সেই অর্থে আলোচ্য উপন্যাসগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করবেন। সে প্রশ্ন আপাতত সরিয়ে রেখেও বলা যায়, স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এইসব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপাদানকে বিশেষ উদ্দেশ্য ও মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। 'প্রস্তাবনা'য় যেমন বলেছি,

৫। তদেব।

এই সব উপন্যাসের মূল কাহিনী ব্যক্তি বা সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করেই রচিত, সেক্ষেত্রে, এইসব ব্যক্তি জীবনাশ্রয়ী বা সমাজ জীবনভিত্তিক কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসকে জড়িত করা জরুরী ছিল কি? আমরা ছাত্র জীবনে আমাদের অধ্যাপকদের বক্তৃতায় শুনতাম, এই ভাবেই নাকি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি ও সমাজকে বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। এই রকম ব্যাখ্যায় আজ আর মন সাড়া দেয় না। 'মৃণালিনী'র মতো উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনকি 'আনন্দ মঠে'র ক্ষেত্রেও ইতিহাসের একটা স্বাভাবিক স্থান হতে পারে। এমনকি, 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবহ বা milieu সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইতিহাসকে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', বা 'দেবী চৌধুরাণী'র ক্ষেত্রে ইতিহাসের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, ভাবা দরকার। এইসব উপন্যাসের পরিণতিগুলি লক্ষ্য করার মতো। কোনো ঐতিহাসিক সংঘটন নয়, প্রত্যেকটি পরিণতি ব্যক্তিগত ট্রাজেডী অথবা তার বিপরীত। আয়েষার অবরুদ্ধ বেদনা, কপালকুণ্ডলার জীবনাবসান, শৈবলিনীর ঘরে ফিরে আসা, প্রফুল্লর খিড়কি ঘাটে বাসনমাজা ও সতীনের ছেলেপুলে নিয়ে জীবনযাপন, ইত্যাদি পরিণতির জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সত্যিই কি আবশ্যক ছিল? ভূগোল ও ইতিহাসের নামকরা ছাত্র ছিলেন তিনি একথা আমরা জানি। কর্মজীবনে কর্মসূত্রে যেখানেই গেছেন, সেখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস ও কিংবদন্তী সংগ্রহে তাঁর অত্যাগ্রহিক প্রবণতার কথাও আমাদের অজানা নয়।[৬] কিন্তু, হাজার হোক, তিনি তো ঐতিহাসিক নন, ঔপন্যাসিক হিসেবে ইতিহাসের ভার ও ঐতিহাসিকের দায় বহন করারও কথা ছিল না। তবু দেখা যাচ্ছে, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে নয়, স্পষ্টত সুপরিকল্পিতভাবে এবং সম্ভবত একটি আদর্শ সামনে রেখে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং তাঁর উপন্যাসের বিশিষ্ট এক পশ্চাৎপট গড়ে তুলেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় এই, এইসব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন, তা কল্পনা নির্ভর নয়। বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান-মোঘল যুগের ইতিহাসকে চিত্রিত করেছেন এবং সেই সূত্রে যে সব যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলিও ঐতিহাসিক তথ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আনন্দমঠ'-এর ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে বিবরণ পাই, তার সঙ্গে হান্টারের বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে। তাছাড়া, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ইংরেজের সঙ্গে তাদের যে সংঘাতের বর্ণনা

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৫৮, ৭ই আগষ্ট তারিখে, শেষ হয় ১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল তারিখে। কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ১৮৯১, ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রথম কর্মজীবন শুরু যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হিসেবে, শেষ হয় ঐ পদে বৃত অবস্থায় ২৪ পরগণার আলিপুর-এ। তাঁর কর্মজীবনে তিনি ১৪টি জায়গায় ছিলেন এবং সেই সূত্রেই তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ও উড়িষ্যার ভদ্রক ও জজপুর-এ বাস করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এইসব অঞ্চলের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁর রচনায় বিশেষভাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে।

পাই এই উপন্যাসে; তাও সর্বৈব সত্য ঘটনা। এইসব ঘটনাকে রূপায়িত করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে আদৌ কোন কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। তাছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেসব চরিত্রকে এনেছেন, তারাও বাস্তব চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎ সিংহ, মানসিংহ, কপালকুণ্ডলার মতিবিবি, মৃণালিনীর বখতিয়ার খিলজী, চন্দ্রশেখরের মীর কাশেম খাঁ, গুরগণ খাঁ, তকি খাঁ, গলষ্টন, আমিয়েট, ওয়ারেন হেষ্টিংস, আনন্দ মঠের মহম্মদ রেজা খাঁ, ডনিওয়ার্থ, ক্যাপ্টেন টমাস, মেজর এডওয়ার্ডস, কিংবা দেবী চৌধুরাণীর দেবী সিংহ, ভবানী পাঠক, এমনকি হররবল্লভ রায়, এবং সীতারামের সীতারাম, মুরসিদকুলি খাঁ, তোরাব খাঁ ইত্যাদি চরিত্র ইতিহাস থেকেই উঠে এসেছে। ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্ঠার নিদর্শন শুধুমাত্র 'রাজ সিংহ' উপন্যাসেই নেই, এইসব উপন্যাসেও রয়েছে, তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে এই প্রসঙ্গ তুলতে হল। বস্তুত, ইতিহাসের বিশ্বস্ত ছাত্র হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসকে তাঁর উপন্যাসের ফ্রেমে বেঁধেছেন।

এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইতিহাসনিষ্ঠা ও ইতিহাসবোধের পিছনে একটি Perspective রয়েছে। সেই উনিশ শতকের শুরু থেকেই, ঠিকমতো বলতে গেলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ইংরেজরা যে বিস্তায়তনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেছিল, তার ফলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও শুরু হয়। একাজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে ভূমিকা ছিল, ভাষা চর্চার পাশাপাশি, তা আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা নেই। সাহিত্যচর্চার ছলে উইলিয়ম কেরী যে কাজ শুরু করেন, উইলিয়ম জোন্‌স্ যে কাজে আত্মনিয়োগ করেন গভীরভাবে এবং তার পরে হান্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা ইতিহাস চর্চায় যে আগ্রহ দেখান, সেই আগ্রহ বঙ্কিমের মধ্যেও ছিল। ইতিহাস সম্পর্কিত, বিশেষত বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আলোচনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একাজে তাঁর সময়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, অবশ্য কিছু পরে, 'বঙ্গদর্শনে' ক্রমান্বয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে।[৭] ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তখন মূলত নির্ভর করা হত ইসলামী আমলের লেখকদের ওপর। এবং সেই সূত্রেই তখন মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকৎ-ই-নাসিরি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এই ধরনের আরো কিছু গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সঙ্গে। মিনহাজই বলেছেন, বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭জন অশ্বসেনা নিয়ে লক্ষ্মণাবতী বা নবদ্বীপ জয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল; এই তথ্য যথার্থ নয়। তৎকালীন ইতিহাসচর্চায় যে ইতিহাসের অনেক বিকৃতি ঘটে যাচ্ছে, এও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এবং সম্ভবত ইতিহাসের সত্য সন্ধানে তিনি নিজেই ইতিহাস রচনার কথা ভেবেছিলেন। স্মৃতিকথায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সংকলিত হয়। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে : ১) বাঙ্গালীর বাহুবল, ২) বাঙ্গালী শাসনের কল, ৩) বাঙ্গালার ইতিহাস, ৪) বাঙ্গালার কলঙ্ক, ৫) বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ৬) বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, ৭) বাঙ্গালীর উৎপত্তি।

এবং অন্যান্যরা যাই বলুন না কেন।[৮] ইতিহাসকে ঠিকমতো রূপ দেবার জন্যই তিনি এই পর্যায়ের উপন্যাস লিখেছেন।

বস্তুত, ইতিহাসবোধ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না", "বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই; নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।" এবং এই প্রেরণাই তাঁকে আলোচ্য পর্যায়ের উপন্যাস সৃষ্টিতে এবং তার উপযোগী একটি পশ্চাৎপট সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

অনেক সময় বঙ্কিমের এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির আলোচনা সূত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই অভিযোগ যে তথ্যবিরুদ্ধ, তার প্রমাণ হিসেবে সীতারামের দুই ফকিরের চরিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গঙ্গারামকে বিনা দোষে শাস্তিপ্রদানকারী ফকিরের ঘৃণ্য চরিত্রের পাশেই আছে চাঁদ ফকিরের মহান চরিত্র চিত্রণ। হরবল্লভকেও তো বঙ্কিমচন্দ্র ঘৃণ্য রূপে দেখাতে ছাড়েননি। আসলে, ইতিহাসের প্রয়োজনেই ইতিহাস বদলায়। 'মধ্যযুগের প্রাক্ রেনেসাঁস আমলকে য়ুরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার মধ্যযুগ সম্পর্কেও হয়ত এই রকম একটা ধারণা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে। পরবর্তীকালে আচার্য যদুনাথ সরকার পলাশীর যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে যে 'new world' এর[৯] কথা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেই নতুন যুগেই ভিতর দিয়ে অন্ধকার যুগের অবসানের ছবিটি বারংবার প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তারই জন্য তিনি মধ্যযুগের অবসানে 'ইংরেজ রাজা'কে স্বাগত জানিয়েছেন।[১০] এটা কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, এই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস।

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ঘটনার কথা বলেছেন।

৯। "In June 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal."

১০। দৃষ্টান্ত হিসেবে, 'আনন্দ মঠ'-এর 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন '......ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'।
জনৈক 'বিজ্ঞ সমালোচক' ১৮৮২, ৮ এপ্রিলের সংখ্যায় 'The Liberal' সাপ্তাহিকে এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— "...The immediate object is thus briefly described in the preface—to put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal,....

প্রসঙ্গত প্রসন্ন ঠাকুরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"If we are to be asked, what government we would prefer, English or any other, we would, one and all reply, English by all means, even in preference to a Hindoo Government."

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, রাজ সিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়, 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে।' আচার্য সরকারও আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুচ্-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে। আলোচ্য উপন্যাসগুলিও নিছক উপন্যাস নয়, এই উপন্যাসধারার বিশিষ্ট-পশ্চাৎপটও বাংলার প্রকৃত ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। ১৩৮০।
২। রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা দেশের ইতিহাস। ১ম, জেনারেল প্রিণ্টার্স। ৩য় সং। ১৩৭৪।
৩। তদেব। ২য় খণ্ড। ২য় সং। ১৩৮০।
৪। প্রিয়নাথ জানা। বঙ্গীয় জীবনী কোষ। ১ম।
৫। ভারতকোষ।
৬। The History of Bengal. Ed. by Sir Jadunath Sarkar, Vol. II, The University of Dacca, 1943.
৭। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক)। বঙ্কিম প্রসঙ্গ। নবপত্র। ১৯৮২।

কপালকুণ্ডলা : শব্দ ও পাঠান্তর

সুমিতা চক্রবর্তী

উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখার মধ্য দিয়ে লোকহিত-চেতনা, নীতি-কথা বা ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার স্বেচ্ছারোপিত দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। 'কপালকুণ্ডলা'য় নির্মাণ করেছিলেন একটি বিশুদ্ধ শিল্পরূপ। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার আটটি সংস্করণেই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করলেও দেখা যায়, সেইসব যোগ-বিয়োগ এই উপন্যাসের শিল্পশুদ্ধ রূপটির ওপর তেমন নীতি-উপদেশের ভার চাপাতে পারে নি। বরং ব্যাখ্যামূলক ও উপদেশাত্মক বাক্যাবলি কিছু কিছু বর্জনই করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

উপন্যাস লিখতে শুরু করার আগে লেখক কাহিনী ও চরিত্রগুলির কাঠামো কিছুটা মনে মনে গড়ে নেন—বাকিটা গড়ে উঠতে থাকে তাঁর লেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। শব্দের প্রয়োগে, বাক্যের অবয়বে, শব্দের সন্নিবেশে এবং অনুচ্ছেদের অবয়বে বাক্যের সন্নিবেশের বিশিষ্টতার মধ্যে দিয়েই আকার নিতে থাকে তাঁর অভিপ্রায়। কখনো সেই শব্দ ও বাক্য সংযোজনা একান্ত সচেতন, কখনো বা তার ভিতর থেকে আভাসিত হতে থাকে কোনো ভিন্ন অর্থ,—যার সবটাই হয়ত লেখকের পূর্ব-পরিকল্পনায় ছিল না।

বিশুদ্ধ বিবরণাত্মক দিক থেকে উপন্যাসের রূপরীতির আলোচনা চলতে পারে। রূপরীতি-বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎরা অনেক সময়ে সেরকমও করেছেন। কিন্তু উপন্যাস বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়, এমন কী লেখকের ব্যক্তিত্ব থেকেও উপন্যাসের ভাষার আলোচনাকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দেখা সম্ভব নয়।

Roger Fowler তার 'Linguistics and the Novel' গ্রন্থে বিশিষ্ট রূপরীতি আলোচক Wayne C. Booth-এর Rhetoric of fiction (1961) গ্রন্থে উল্লেখিত অভিমত প্রসঙ্গে বলেছেন যে, লেখকের জীবনী ও ব্যক্তিত্বকে চিন্তাভুক্ত করায় Booth-এর আপত্তি সর্বত্র মেনে নেওয়া যায় না—"But this absolute dissociation from biography is hard to accept." (Methuen & Co. Ltd, Ed. 1977, P 79)।

লেখকের জীবন সম্পর্কে বেশি আগ্রহ না দেখালেও Booth কিন্তু শিল্প-ভাষা আলোচনায় শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "Sooner or later every formal critic must therefore struggle with the problem of how to deal with the scandal of what is often called content". আরো বলেছিলেন—"All actual works of art are loaded with ideology." প্রখ্যাত রুশ শিল্পরীতি-সমালোচক Mikhail Bakhtin-এর রচনার ইংরেজী অনুবাদ Problems of Dostoevsky's Poetics গ্রন্থের (Caryl Emerson কৃত অনুবাদ Manchester University Press, 1984) ভূমিকায় Booth এই কথাগুলি বলেন

১৯৮৪-তে। উপন্যাসের রূপরীতি আলোচনায় ভাববস্তু ও ভাষার সম্পর্ক নির্ণয়নের দিকেই সাম্প্রতিক ঝোঁক পড়েছে বলে মনে হয়।

৫ একটি ছোট উপন্যাসও কমপক্ষে যত শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি তার পূর্ণ বিশ্লেষণী আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয় বলেই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের দুটি প্রসঙ্গ ও সেই সূত্রে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে কিছু ভাবনা এখানে উপস্থাপিত হবে।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এক সামাজিক যুবক ও এক অ-সামাজিক রমণীর সম্পর্ক-জটিলতার কাহিনী। মাঝখানে লুৎফন্নিসা বা মতিবিবির মত চোখ-ঝলসানো এক নাগরিকার উপস্থিতি এই দুটি প্রধান চরিত্রকে প্রায় কিছুই প্রভাবিত করতে পারেনি। মতিবিবির আসল প্রয়োজনটা একটি চিঠি লেখাতেই শেষ হয়—যে-চিঠি কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত হয়ে নবকুমারের হাতে পড়েছিল। এ-ছাড়া বিপরীত চরিত্র-ধর্মে কপালকুণ্ডলাকে উজ্জ্বলতর করা মাত্রই তার কাজ। এই উপন্যাস বহুজনকে নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক-জটিলতার কাহিনী নয়, ত্রিভুজ প্রেমের গল্পও নয়, 'কপালকুণ্ডলা' নবকুমারের ঘরে কপালকুণ্ডলার আসা এবং চলে যাওয়ার একটি একরৈখিক উপন্যাস।

নবকুমার চরিত্রের মূল ভাববৃত্তটি কী? অধিকাংশ সমালোচক বলেছেন নিয়তি। কেউ কেউ বলেছেন রূপমোহ। নিয়তি-প্রসঙ্গটি আমরা একেবারেই আলোচনায় আনব না। জীবনে যা কিছু ঘটে তার সবই নিয়তি বলে চালানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ক্রিয়াশীল বা ফলবান কিনা তা বিচার করবার কোনো পদ্ধতি নেই। গ্রিক ট্র্যাজেডির যুগে নাট্যরূপের নিয়ামক ছিল গ্রিক নিয়তিবাদ। আধুনিক কালের উপন্যাস আলোচনায় নিয়তিবাদী দৃষ্টি বর্জন করাই ভাল। অবশ্য যদি লেখক প্রসঙ্গটির ওপর জোর দেন তাহলে তা মনে রাখতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে নিয়তি বা অদৃষ্টের কথা বলেছেন কিন্তু একান্ত করে, প্রধান করে বলেছেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। 'কপালকুণ্ডলা'র অনেকগুলি সংস্করণ পর্যন্ত চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে অদৃষ্টের গতি ও অনিবার্যতা সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যামূলক অংশ সংযোজিত ছিল। খণ্ডটি শেষ হত দশটি পরিচ্ছেদে। ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটিকে প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য করেন ও পূর্বের প্রথম পরিচ্ছেদটি বর্জন করেন। নিয়তি-প্রসঙ্গটির ওপর খুব বেশি জোর দেবার অভিপ্রায় তিনি সম্ভবত প্রশমিত করেছিলেন।

রূপমুগ্ধতাকে নবকুমারের চরিত্র লক্ষণ বলা যেতে পারে। কিন্তু নবকুমারে রূপাবিষ্টতা নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দলালের রূপমোহের চেয়ে আলাদা। বঙ্কিমের সব নায়িকাই সুন্দরী। কিন্তু অপরাপর রমণীর ক্ষেত্রে তিনি চুল, কপাল, নাক, চোখ, গ্রীবা ও গঠনের রেখা বর্ণনা করেছেন। কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম করেননি। এই উপন্যাসেই মতিবিবির বর্ণনা—"শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ," "অধরোষ্ঠ কিছু চাপা," "চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে"—বাগ্‌ভঙ্গিতে যেন আলোকচিত্র সুলভ যথার্থ। মতিবিবির রূপ যেন সম্পূর্ণ বর্ণনযোগ্য বাস্তব। কিছুই অস্পষ্ট নয়, ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। অথচ কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনার ধরণটি একেবারে আলাদা—(নবকুমার গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি। সেই

গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি।" (১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ) সমগ্র অনুচ্ছেদটিতে অস্পষ্টতা জ্ঞাপক অভিব্যক্তির আধিক্য —"মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল না। ......কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ......মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। ......সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" 'অপূর্ব' ও 'মোহিনী' শব্দ দুটির প্রয়োগ ঘটেছে দুবার করে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে-রূপের প্রতিষ্ঠা ঘটে তা-ই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক রূপের প্রথম অসংশয় প্রকাশ।

ইংরোপের রোমান্টিক যুগের উপলব্ধিজাত সৌন্দর্যবোধের প্রতিফলনে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অমর্ত্য-অতৃপ্তিময় এক রূপচেতনা অস্ফুটভাবে গড়ে উঠেছিল বাঙালীর মনে। বাঙালী নতুন চোখে দেখেছিল পরিবেশকে, নারীকে। তার প্রথম ছায়া মধুসূদনের সীতা ও প্রমীলায়, রাবণের অনুভবে প্রতিফলিত স্বর্ণলঙ্কায়, সীতার স্মৃতিধৃত গোদাবরী তীরের বর্ণনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের তিলোত্তমা; আয়েষায় তার সামান্য প্রকাশ। কপালকুণ্ডলায় তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই রমণীর মূর্তিতে প্রকৃতি ও নারীরূপের এক বিপুল, অ-পার্থিব বিস্তার দ্যোতিত হয়েছে একই আধারে। নবকুমারের নায়কত্বের ভিত্তি হল এই সৌন্দর্যসৃষ্টির অধিকার।

কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গে নবকুমারের মনে একাধিকবার ফিরে আসে 'রূপ' শব্দটি। মতিবিবির মত সুন্দরী আর দেখেছেন কী না—এ প্রশ্নের উত্তরে—"নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল।" উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রতি হৃদয়ের গভীর আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করে বলেছে—"তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।" প্রেম, প্রীতি, স্নেহ নয়—রূপ। এক বছর সংসার করার পরও স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর এই রূপবিহ্বল আর্তি এবং কেবলই রূপের প্রসঙ্গ মনে হওয়া বাস্তবের দিক থেকে স্বাভাবিক নয়। এই শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য সেই দিক থেকে যেখানে নবকুমার নতুন যুগের রোমান্টিক রূপচেতনায় নিমজ্জিত বাঙালী। নবকুমার চরিত্রের সেই দিকটির প্রতিষ্ঠাই লেখকের কাম্য।

রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বিস্তারে, বন্ধনহীনতার ও কিছু পরিমাণে অলৌকিকতায়। পরিবেশ নির্মাণে ও উপমাচয়নে এই উপন্যাসে বার বার সমুদ্রের কথা এসেছে। যে সুন্দরের একটি মূর্তি কপালকুণ্ডলা—সেই সুন্দরেরই অপর মূর্তি সমুদ্র। উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত বলেই সমুদ্র-প্রাসঙ্গিক শব্দাবলিতে উপন্যাসটি আকীর্ণ।

David Lodge তাঁর Language of Fiction গ্রন্থে (Alen Press Ltd, Oxford, 1967) বলেছেন যে Jane Austen-এর Mansfield Park-এ 'Judgement' শব্দটি ও তৎপ্রাসঙ্গিক শব্দাবলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত কারণ উপন্যাসটি 'Code of Conduct novel', তেমনি Cherlotte Bronte-র Jane Eyre তাঁর মতে 'pussion novel'—তাই

Fire ও সেই জাতীয় শব্দের প্রয়োগ অনেকবার। এই দুটি উপন্যাসের তুলনায় 'কপালকুণ্ডলা'য় সমুদ্রের উপস্থাপনা ঘটেছে অনেক ব্যাপকভাবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই নবকুমারের চরিত্র বিচ্ছুরিত হয়েছে যে বাক্যটিতে—তা হল, "সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি।" তারপরে তার মুগ্ধতা—"আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।" তারপর রঘুবংশধৃত সমুদ্রবর্ণনা। তখনও কপালকুণ্ডলা দেখা দেয়নি।

প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ঘটনাবলী নদীর মোহনাতেই ঘটেছে তাই জলস্রোত ও জলের বিস্তারজ্ঞাপক বহু শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে এই দুটি পরিচ্ছেদে। যেমন বার দরিয়া, বাহির সমুদ্র, অকূল স্রোতের বেগ, তরঙ্গান্দোলন কম্প, সমুদ্র, মহাসমুদ্র, অনন্ত জলরাশি, দুরন্ত বারিরাশি, জলরাশি মধ্যে ভৈরবকল্লোল, জলোচ্ছ্বাস, প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত, সৈকতভূমি জলপ্লাবিত ইত্যাদি।

প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'সমুদ্রতটে'। তখনও কপালকুণ্ডলার দেখা পাওয়া যায় নি। নবকুমার ক্লান্ত, শঙ্কিত, গৃহব্যাকুল। সেই সময়েও সে সমুদ্রের রূপে মুগ্ধ হয়।—"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনীল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমলকুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে; তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোনো ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।" দীর্ঘ এই বর্ণনায় সমুদ্রের রূপকে আলৌকিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেখাব একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সে চেষ্টা যদিও খুব সার্থক হয়নি। 'উৎকটানন্দ' শব্দটি এখানে শ্রুতি পীড়ক। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরের বস্তুরূপ অতিক্রম করে সৌন্দর্যবোধের প্লাবিত বিস্তার অনুভব করছে নবকুমার—এই ভাবটিই তখন বাংলা সাহিত্যে নতুন। ১৮৬৬-তে এই হৃদয় ভাবের ভাষাও ঠিকমত তৈরী হয় নি। বঙ্কিমের ভাষার কাঠামোটি ছিল ক্ল্যাসিকাল। একান্ত রোমান্টিক অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একটু অসুবিধে হবারই কথা। বঙ্কিমেরও কখনো কখনো তা হয়েছে। যে অ-পার্থিব সৌন্দর্যের কথা তিনি বলতে চাইছিলেন তা প্রকাশের ভাষাও আবিষ্কার করতে হচ্ছিল তাঁকেই। সেই নির্মাণ—প্রযত্নে একটি দুর্বলতার চিহ্ন 'উৎকট' বিশেষণটি। প্রাক্—রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এমন দুর্বলতা মাঝে মাঝেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষাকে রোমান্টিক ভাব প্রকাশের সর্ববিস্তার ও সর্বসূক্ষ্মতা একত্রে দান করেছিলেন। এই সমুদ্রবর্ণনাময় অনুচ্ছেদের পরেই—"গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে অপূর্ব রমণীমূর্তি!"

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে 'জলোচ্ছ্বাস', 'চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ', 'নদীপ্রবাহ', 'তীরভঙ্গ' ইত্যাদি শব্দের পর শেষ ছত্র—"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্তবায়ুনিক্ষিপ্ত, বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?"

বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো উপন্যাস জিজ্ঞাসার চিহ্ন-য় শেষ হয় নি। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল একটি শেষ কথা বলে দেবার প্রবণতা। কিন্তু এই উপন্যাসের এই জিজ্ঞাসা—চিহ্নিত অ-শেষ কথাটি লেখকের বহুদিনের চিন্তার ফল। প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল অন্যরকম। সেখানে কপালকুণ্ডলা ভেসে গেলেও কাপালিকের সাহায্যে নবকুমার তীরে ওঠে এবং নবকুমারের শোক-উচ্ছ্বসিত "মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী!" বাক্যে উপন্যাসের সমাপ্তি। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' শোকোচ্ছ্বাসের কাহিনী নয় বলেই বঙ্কিম চতুর্থ সংস্করণে সমাপ্তি অংশটি বদলে দিয়ে করেছিলেন—"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বাক্যটিই উপন্যাসের শেষ বাক্য ছিল চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণে। এই পরিসমাপ্তি বঙ্কিম-স্বভাবের উপযুক্ত। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম যে কয়েকটি জায়গায় নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছেন তারই একটি কপালকুণ্ডলার এই প্রশ্নবোধক পরিশেষ। অপ্রাকৃত সৌন্দর্য-লোকের প্রতি মর্ত্যমানুষের আকর্ষণের 'চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা'র রহস্য ঐ জিজ্ঞাসায়। 'কোথায় গেল' ? সম্পূর্ণ ভুল উত্তরে পৌঁছেছিলেন দামোদর মুখোপাধ্যায়। এই প্রশ্নের একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হতে পারত রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে'—সে ভাষাও তখনও তৈরী হয় নি।

সমুদ্র প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটু সংযোজন এই— ভিন্ন প্রসঙ্গেও উপমা ও চিত্রকল্প হিসেবে উপন্যাসটিতে এসেছে সমুদ্র ও জলের কথা। মতিবিবির মুখে এসে পড়া প্রদীপের আলোকে বঙ্কিম বলেছেন, 'দীপরশ্মি স্রোত'. কপালকুণ্ডলার খোলা চুলকে একাধিকবার বলা হয়েছে 'কেশতরঙ্গ'। গৃহে আনার পর কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের মনোভাব—"জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দম স্রোতাবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।" (২/৫) চিন্তাভারক্লিষ্ট কপালকুণ্ডলার মনের বর্ণনায়—"মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে ?" (৪/৩) কপালকুণ্ডলার স্বপ্নে সমুদ্র এবং জাগ্রত কপালকুণ্ডলার নৈশচারণে—"অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল।" (৪/১)

কপালকুণ্ডলার চরিত্রটি দুটি স্তরে গ্রহণীয়। এক রূপে সে চির-অপ্রাপ্ত, চির-কাঙ্ক্ষিত সুন্দরের কল্পমূর্তি, অন্যরূপে সে বাস্তব রমণী। উপন্যাসের আরম্ভ অংশে লেখক তাকে জগৎ-সৌন্দর্য-ধ্যানের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন। এ বিষয়ে একটি বিচিত্র শব্দ-প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যায়। এই উপন্যাসে সাধারণভাবে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলির সম্মানবাচক রূপ ব্যবহার করেছেন—'বলিলেন', 'দাঁড়াইলেন' ইত্যাদি। কাপালিক বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষেত্রে 'বলিল', 'চলিল' ব্যবহৃত।

সম্মানবোধের তারতম্য থেকেই এই রীতি। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গে একবার ব্যতিক্রম ঘটেছে প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে।—"অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?···এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল।···ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল। রমণী কোনো উত্তর না পাইয়া কহিলেন 'আইস', এই বলিয়া তরুণী চলিল, পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।" এই অংশের সর্বত্র কপালকুণ্ডলা সম্পর্কিত ক্রিয়াপদের যে সম্মানবাচক রূপ তার একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ দুবার 'চলিল' ক্রিয়াপদে। এই ক্রিয়াপদে যেন অস্বীকৃত হয়েছে তরুণীর ব্যক্তিরূপ। সে যেন কোনো মানবী নয়—পবন, পত্রমর্মর, সাগরনাদ, শুভ্র মেঘের সঙ্গে সেই মুহূর্তে সে অভিন্ন। পবন, বৃক্ষপত্র, সমুদ্র, মেঘখণ্ডের জন্য যে ক্রিয়াপদ তার ক্ষেত্রেও তাই।

উপন্যাসের অন্তিম শব্দটিও একটি ক্রিয়াপদ। এবং সেখানেও 'গেলেন' না বলে বলা হয়েছে 'গেল'। অথচ ঠিক তার আগের সূত্রগুলিতে এবং সমস্ত পরিচ্ছেদটিতেই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার—দুজনের সম্পর্কে ক্রিয়াপদের সম্মানবাচক রূপ ব্যবহৃত। শেষ বাক্যে যেন কপালকুণ্ডলা আর নবকুমার উভয়েই সেই অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের কল্পলোকের দিকে যাত্রা করে এবং পার্থিব ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দেয়। তারা হয়ে ওঠে একটি আইডিয়ার সঙ্গে অভিন্ন।

কপালকুণ্ডলার নারীব্যক্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সাধারণত মনে করা হয়, অরণ্য-প্রকৃতি সুলভ স্বাধীনতাস্পৃহা এবং ভবানীভক্তি তার চরিত্রলক্ষণ। ভবানীভক্তির নিদর্শন তার চরিত্রে বঙ্কিম অবশ্যই সন্নিবেশিত করেছেন কিন্তু তার ধরনটি একটু লক্ষ্য করা যেতে পারে।

নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার যখন কোনো পরিচয়ই ঘটে নি তখনই সে দয়াপরবশ হয়ে দেবীর কাছে বলিদানের জন্য আনীত নবকুমারকে পালাতে সাহায্য করেছে। সেই উদ্দেশ্যে খড়্গ লুকিয়ে রেখে বিঘ্ন ঘটিয়েছে দেবীর পূজায়। কাপালিকপালিতার প্রথাসিদ্ধ ভবানীভক্তি তাকে এসব কাজ করতে বিরত করে নি। অধিকারীর গৃহে দেবীমূর্তির চরণ থেকে বিল্বপত্র চ্যুত হলেও সে নবকুমারের সঙ্গিনী হতে দ্বিধা করে নি। সংসারবাসিনী কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গে ভক্তির কথাটি প্রথম যেখানে উত্থাপিত হয়েছে সেখানে বাক্যগুলি এরকম, "কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশি দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তি ভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জলন্ত বহ্নিশিখার পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।" (৪।৪) ভবানীভক্তিকে এখানে পতঙ্গের অগ্নি-আকর্ষণ ও বিজ্ঞতার অভাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তারপর চতুর্থ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদেই ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির মুখে কাপালিক ও পদ্মাবতীর বৃত্তান্ত শুনে কপালকুণ্ডলা

নবকুমারের ঘর ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোন দেবীর নির্দেশবশত নয়, নিতান্তই নিজের সংসার-ঔদাসীন্যে। "অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?" এই অংশে তার কোনো প্রাণ বিসর্জন বাসনাও দেখা দেয় নি—"আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" এই সংকল্প গৃহীত হবার পর অষ্টম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম নিয়ে আসেন "আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি।" অর্থাৎ কপালকুণ্ডলা ভবানী-নির্দেশে চালিত হয়েছে—সর্বাংশে এমন না দেখিয়ে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার সংসার ত্যাগের নিজস্ব অভিপ্রায়ের সঙ্গে দেবীর নির্দেশের প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন পরের পরিচ্ছেদে।

কেবলমাত্র সংসার উদাসীনতাই নারীর আত্মবিসর্জনের কারণ হবে—এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া বঙ্কিমের যুগেও মানসিকতায় সম্ভব ছিল না। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সংসার বন্ধন—বিরাগ হয়ত বা তার স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ কিছু শিথিল করে দিয়েছিল। কপালকুণ্ডলার স্বাধীনতা স্পৃহায় মুক্ত প্রকৃতির প্রভাব অবশ্যই ছিল কিন্তু কপালকুণ্ডলা যেন সামাজিকভাবেও স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আসে পাঠকদের কাছে। উপন্যাসটির ভাষা থেকে তার কিছু পরিচয় আমরা পেতে পারি।

মিখাইল বাখতিন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে লেখকের স্বর উপন্যাসে প্রধান হতে পারে, আবার কোনো কোনো চরিত্র নিজস্ব স্বর অর্জন করে লেখকের স্বরকে ছাপিয়ে যেতে পারে। তাঁর মতে ইউরোপীয় উপন্যাস প্রায়ই monologic অর্থাৎ লেখকের একক স্বরেরই প্রাধান্য সেখানে—"Oral speech of an individual narrator" কিন্তু তাঁর মতে ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস সে রকম নয়—"Dostoevsky's voice is simply drowned by all those other voices,....as if the character were not an object of authorial discourse, but rather a fully valid autonomous carrier of his own individual word." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) লুনাচারস্কিও 'Distoevsky's Plurality of Voice' প্রবন্ধে (Progress Publishers, 1973) একই কথা বলেছেন এবং বলেছেন, শেকস্‌পিয়র যত স্বাধীন চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন তত আর কেউই পারেন নি।

শেকস্‌পিয়র বা ডস্টয়েভস্কির সামাজিক পরিবেশ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অনেক আলাদা। বঙ্কিম শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নবজাগ্রত জাতির সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কিছু আদর্শ যা তাঁর মনে হয়েছিল সমুচিত। ফলে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে তিনি স্রষ্টার স্বরেই কথা বলাতে চেয়েছিলেন সচেতনভাবে। তবু কখনো কখনো তাঁর কোনো কোনো চরিত্র, বিশেষ করে নারীচরিত্রগুলি শিল্পের রহস্যময় নিয়মে অর্জন করে নেয় নিজস্ব স্বরগ্রাম। শৈবলিনীকে দিয়ে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করালেও উপন্যাসের দুই পুরুষ চরিত্রকে ভুলে গিয়ে পাঠক শৈবালিনীকেই হৃদয়ে রাখে। রোহিনীর মৃত্যু যদি অসঙ্গত মনে না-ও করি, মৃত্যুর কারণ হিসেবে রোহিনীর নিশাকর-সম্ভাষণ আমরা বিশ্বাস করি না—বঙ্কিম লিখলেও। কপালকুণ্ডলাও তেমনি একটি চরিত্র। একান্ত বাস্তব সংসারে নারীর স্থান

বিষয়ে এই প্রকৃতি-দুহিতার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে এক স্বাধীন স্বরায়ণ। হয়ত কিছুটা লেখকের অজ্ঞানতেই।

'কপালকুণ্ডলা' নামটির অর্থ কী? দেবীর অভিধা হিসেবে মেনে নিতে পারি কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' শাস্ত্রোক্ত কোনো নাম নয়। ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকের কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহকারিণী কপালকুণ্ডলার নামটি হয়তো বঙ্কিম নিয়েছিলেন কিন্তু দুই কপালকুণ্ডলার চরিত্রের কোন মিল নেই। ভবভূতিও নামটির কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। হয়তো বঙ্কিম নামের অর্থ নিয়ে কিছু ভাবেন নি—হয়ত নিজ ভাগ্যই যার একমাত্র ভূষণ—এরকম কোনো অর্থের কথা ভেবেছিলেন। দেখা যায়, কপালকুণ্ডলার আভরণহীনতার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। নবকুমারের প্রথম দেখায় "রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ।" মতিবিবির মুখের 'নিষ্কুণ্ডলা' শব্দটি তাৎপর্যময়। অলঙ্কার না থাকলে মতিবিবি নিষ্কুণ্ডলা হয় কিন্তু কপালকুণ্ডলা কখনই নিষ্কুণ্ডলা হয় না—অলঙ্কার না থাকলেও। তারপর নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার আগে মতিবিবির সর্বাঙ্গে অলঙ্কারধারণ। —"যেখানে যাহা ধরে কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে বাহুযুগে, সর্বত্র স্বুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে।" (২,৩) কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার প্রসঙ্গে নবকুমার বলে——"সেজন্য অলঙ্কাব পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোনো গহনাই নাই।" মতির উত্তর—"গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইয়া বাঁচে না।" গহনা-সংক্রান্ত এই বাক্যালাপ কিন্তু ছিল না পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত। পঞ্চম সংস্করণে আছে "মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন, 'মহাশয়, চলুন আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।' নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন।" বর্তমান সংস্করণের এই অংশটিতে বিশেষভাবে মতিবিবির চরিত্রের সঙ্গে আভরণ-সচেতনতার যোগ দেখানো হয়েছে কপালকুণ্ডলার আভরণ-ঔদাসীন্য স্পষ্ট করবার জন্যই। ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে হয় এই সংযোজন। তারপর মতিবিবির কপালকুণ্ডলাকে অলঙ্কার প্রদান ও অল্পকাল পরেই কপালকুণ্ডলার ভিক্ষুককে অলঙ্কার দান। সেখানে "অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।" শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্যে খোঁপার ফুল, চন্দ্রহার, কানের দুলের উল্লেখ কপালকুণ্ডলাকে খুশি করে না—"তাহা হইলেই বা কি সুখ?" (২।৬) গৃহবাসিনী কপালকুণ্ডলার অঙ্গে একবার মাত্র দু-একটি অলঙ্কারের উল্লেখ আছে চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। সেই পরিচ্ছেদেই কপালকুণ্ডলা একা রাত্রে বনে প্রবেশ করে। তারপর আর একবারও তার গহনার কোনো উল্লেখ নেই। কপালকুণ্ডলা গহনা পরতে চায় না। সমাজ নারীকে যে অলঙ্কারবন্ধনে অভ্যস্ত করেছে—সে তার প্রতিবাদ। অলঙ্কার বিমুখতা তার চরিত্রের ভাষা।

কপালকুণ্ডলাই বঙ্কিমের একমাত্র নায়িকা যার কাছে বিবাহ-সম্পর্কের কোনো মহৎ তাৎপর্য নেই। তার বিবাহ-প্রসঙ্গের সূত্রপাতে অধিকারীর সঙ্গে তার কথোপকথন স্মরণীয়—"বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি; কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে? অধিকারী ঈষণ্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন—'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র

ধর্মের সোপান ; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলে, জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' অধিকারী মনে করিলেন সকলি বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন সকলি বুঝিলেন।" (১, ৮)

বিবাহ প্রসঙ্গে এই পরিহাসময় দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোন উপন্যাসে নেই। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বুঝিয়েছিলেন 'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান' এবং এখন 'পতিমাত্র তোমার ধর্ম' (১।৯) কিন্তু পরে কপালকুণ্ডলা অবহেলায় সেই 'ধর্ম' ত্যাগ করে চলে যেতে প্রস্তুত হয়। "গোধুলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।" (১।৯) কপালকুণ্ডলা সংসারে প্রবিষ্ট হবে না—তারই ইঙ্গিত ঐ 'সন্ন্যাসিনী' শব্দে। মৃণ্ময়ী ও শ্যামাসুন্দরীর সংলাপে একাধিকবার কপালকুণ্ডলাকে 'তপস্বিনী' ও 'যোগিনী' বলা হয়েছে।

সংসারে প্রবেশ করার পর থেকেই কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেন এক প্রতিবাদিনীর আবির্ভাব হতে থাকে। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার ওষুধ তুলে আনতে চায় কপালকুণ্ডলা। শ্যামাসুন্দরী তাকে নিষেধ করে। তাদের বাক্যালাপে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের স্পষ্টতা, যুক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের দিকটা বোঝা যায়।

শ্যামা : একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির পক্ষে ভাল ?
মৃণ্ময়ী : ক্ষতিই কি ? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব ?
শ্যামা : মন্দ লোকে মন্দ বলবে।
মৃণ্ময়ী : বলুক আমি তাতে মন্দ হব না।
শ্যামা : আমাদিগের ক্লেশ হবে।
মৃণ্ময়ী : এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।
শ্যামা : ...দাদাকে কেন অসুখী করিবে ?
মৃণ্ময়ী : ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব ? যদি জানিতাম স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না। (৪।১)

এখানে কপালকুণ্ডলার ভাষা সন্ন্যাসিনীর ভাষা নয়। ভবানী ভক্তি-ভাব-বিমোহিতার ভাষাও নয়। ধর্মভাবের রেশও নেই এখানে। সামাজিক রমণীর সচেতন অধিকারবোধ এখানে প্রকাশিত। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'দাসী' শব্দটি বঙ্কিমের বহু নায়িকা ভেবেছে, বলেছে ও লিখেছে। ইন্দিরা বা ভ্রমরই শুধু নয় ; সূর্যমুখী, দেবী চৌধুরাণীও স্বামীপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের দাসী মনে করতে দ্বিধা করে নি। এই শব্দটিতে বঙ্কিম দাম্পত্য-সম্পর্কের মাধুর্য ও যাথার্থ্যই' দেখেছিলেন। একা কপালকুণ্ডলার উচ্চারিত 'দাসীত্ব' শব্দটি সেই সম্পর্ককে মান্য করে না।

কপালকুণ্ডলার ব্যবহৃত বাক্যগুলির সংহতি, ঋজুতা ও দ্বিধাহীনতা লক্ষণীয়। তার ভাষা একেবারেই মেয়েলি ভাষা নয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্যে বঙ্কিমের 'পুরুষালি বাচনভঙ্গি সংবরিত' হয়েছে। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার ব্যবহৃত বাক্যগুলির গঠন লক্ষণীয়ভাবে আলাদা এবং কপালকুণ্ডলার ভাষায়

পুরুষালি ভঙ্গির বেশ ছাপ আছে। সেকারণেই বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে শ্যামাসুন্দরীর মুখে 'ভট্টাচার্য মহাশয়' শব্দটি বসিয়েছেন।

নবকুমারের সঙ্গে আলাপেও কপালকুণ্ডলার বাক্যগুলি একই রকম। —'ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।' 'দিবসে ও ঔষধ ফলে না।' 'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।' 'আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' —প্রতিটি বাক্যই যেন সংশয়হীন শেষ কথা। বঙ্কিম লিখেছেন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে 'অপ্রসন্নতার সহিত' কথা বলেছে (৪।১)। মনে পড়ে না—বঙ্কিমের আর কোনো বিবাহিতা রমণী স্বামী সম্পর্কে 'অপ্রসন্ন' হয়েছে কখনো।

যেখানে কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পেয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয় সেখানে তার ভাবনা—"পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী-পুরুষে সাক্ষাতে উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল।" (৪।৪) এই অংশে কপালকুণ্ডলা সমাজবিধি সম্পর্কিত কোনো অজ্ঞতার বোধ দ্বারা চালিত নয় কারণ বৎসরকাল তার সংসারে থাকা হয়ে গেছে। ভক্তিভাব বা দেবীর নির্দেশও এখানে নেই। ইচ্ছে করলেই বঙ্কিম তা দিতে পারতেন। এখানে সে নারীপুরুষের সমানাধিকারের বোধ দ্বারা চালিত।

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সংলাপ অংশে সাতটি সংস্করণ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার মুখে দুবার 'স্বামিন্' শব্দের উপস্থিতি ছিল। "স্বামিন্, ভয় পাইতেছ ?" এবং "স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও! আমি মরিব।" সমস্ত উপন্যাসে এই একবারই ছিল কপালকুণ্ডলার স্বেচ্ছায় স্বামী-সম্বোধন। বঙ্কিম শেষ সংস্করণে সম্বোধনটি বর্জন করেন! 'এই ব্রাহ্মণ সন্তান' কখনই কপালকুণ্ডলার মনে স্বামীর অধিকার প্রাপ্ত হয় নি —এই বর্জন তারই ইঙ্গিত। বাখতিন ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাসকে 'polyphonic novel' (Caryl Emerson—পূর্বোক্ত অনুবাদ) নামে অভিহিত করে বলেছিলেন—"The essence of this genre is the liberation of the hour to the position of a subject with his own independent viewpoint,........" বঙ্কিমের কোনো উপন্যাসই Polyphonic novel নয়। একমাত্র কপালকুণ্ডলাই যেন সেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কিছুটা অর্জন করেছে।

অনেক সমালোচকের মতে নবকুমারের চরিত্রটি দুই ব্যক্তিত্বময়ী রমণীর মধ্যে থাকায় সুপরিস্ফুট হয় নি। কিন্তু নবকুমারের চরিত্রের শৈল্পিক অভিপ্রায় সম্পর্কে বঙ্কিম সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "নবকুমারই প্রথম বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সৌন্দর্য-পীড়িত, সৌন্দর্য-তাড়িত, সৌন্দর্য-লাঞ্ছিত নায়ক, যে সৌন্দর্যের সম্মুখে অসহায়, বিমূঢ়।" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৬২, পৃ. ১০৪) নবকুমারের এই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট রাখার জন্য বঙ্কিম তার সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ বর্জন করেছিলেন পরবর্তী সংস্করণগুলিতে। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করে নবকুমার যখন অধিকারীর গৃহ-অভিমুখে যাচ্ছে তখন পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত কিছু বাড়তি বর্ণনা ছল। যেমন—"কিন্তু অন্ধকারে বনমধ্যে রমণীকে সকল সময়ে দেখা যায় না; যুবতী

একদিকে ধাবমানা হইলে, নবকুমার অন্যদিকে যান ; রমণী কহিলেন, 'আমার অঞ্চল ধর', নবকুমার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া চলিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'এও কপালে ছিল!" কিন্তু ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে পূর্বোক্ত পংক্তিগুলির জায়গায় এসেছে—"বন্যপথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত ; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তৎপশ্চাদ্বর্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, 'এও কপালে ছিল'।" এই বর্জন কিসের জন্য? মনে হয় সৌন্দর্যতাড়িত নায়কের ভূমিকায় নবকুমারের মর্যাদা রক্ষার জন্যই। আঁচল ধরার ছবিতে এসে যায় বড় বেশী গার্হস্থ্য ভাব। নবকুমার সেরকম ছিল না। নবকুমার সম্পর্কে আরও বেশ কিছু কথা ছিল প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে, তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে নবকুমার। তারপরে ছিল পাঠকের প্রতি বঙ্কিমের উক্তি—"আপনি যদি কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে একদিনে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হইতেন কিনা, বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কি না বলিতে পারি না। বোধ করি নহে, কেন না, কপালকুণ্ডলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন ;—এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ারা সন্ন্যাসিনীদিগের মর্ম বুঝে।"—এই অংশ বর্জিত হয়েছে চতুর্থ সংস্করণ থেকে। হয়ত পাঠককে সম্বোধন করার এই রীতির আধিক্যও তিনি শিল্পের অনুরোধে সংযত করতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নবকুমারের পরোপকারী চরিত্রের দিকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাঁর হয়ত অভিপ্রেত ছিল না। নবকুমারের রূপাকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্যান্য চারিত্রিক দিকগুলিকে তাই বঙ্কিম বর্জন করেছিলেন যতদূর সম্ভব।

নবকুমার চরিত্রের বিবর্তন ও পরিণাম সুসঙ্গত। কপালকুণ্ডলার রহস্যদীপ্তিময় যে সৌন্দর্য তাকে আকর্ষণ করেছিল তার স্বরূপ সে সম্পূর্ণ বোঝে নি। রূপার্ত রোমান্টিক সবসময়ে তা বোঝে না বলেই সেই সৌন্দর্যকে করতলগত করতে চায়—যা বস্তুত অসম্ভব।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে গৃহবাসিনী করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'মৃণ্ময়ী' নামকরণে ব্যক্ত হয় যে, স্বনিয়ন্ত্রিত সেই নারীকে সমাজ সংসারের নিয়মাধীন রাখতে চাইলে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উপন্যাসের শেষে নবকুমার মৃণ্ময়ীকে একবার 'কপালকুণ্ডলা' সম্বোধন করেছে কাপালিকের প্রভাবে। কিন্তু শেষবার তার চেতনার গভীর থেকে স্বতঃউৎসারিত হয়েছে এই সম্বোধন সবকিছু শেষ হয়ে যাবার মুহূর্তে—"মৃণ্ময়ী!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর।"......'মৃণ্ময়ী' থেকে 'কপালকুণ্ডলা'য় সরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, নবকুমারের জীবনের সাংসারিক আওতা থেকে সেই রমণী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গৃহাঙ্গনের মৃণ্ময়ী পরিণত হয়েছে গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে অপূর্ব রমণীমূর্তিতে।

কপালকুণ্ডলাকে গৃহে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। রূপ-আবেগ-তাড়িত নবকুমারের পক্ষেও সম্ভব নয় তাকে বিসর্জন দিয়ে গৃহে ফিরে আসা। যথাযথ পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসটির শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু কিছু দিক উঠে আসে। দু'তিনটি দিকের কথা বলা হল। হয়ত এমন মনে করার কারণ কেউ কেউ পাবেন—নিয়তি, ভবানীভক্তি বা মতিবিবি প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে কিছুটা আরোপিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি মানসে নবজাগ্রত রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা ও নারীপ্রগতি-ভাবনার মিলিত বাণীশিল্পরূপ এই উপন্যাস।

বঙ্কিম সাহিত্যে পাশ্চাত্য-প্রভাব ঃ ভাষা-পরিচর্যার প্রেক্ষিত

ডঃ মনসুর মুসা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর মনন-চর্চায় ও সাহিত্য-ভাবনায় পাশ্চাত্য-জ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়, তাঁর দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে, তাঁর সমাজচিন্তামূলক নিবন্ধে তাঁর পাশ্চাত্য মনস্কতা সহজেই ধরা পড়ে। সাহিত্য-সর্জন ও সাহিত্য-সমালোচনায়ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পাশ্চাত্য ধাঁচটি চোখে পড়বার মতো। এতে অবাক হবার কারণ ঘটে না এই জন্য যে বঙ্কিম ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম গ্রাজুয়েট'। 'প্রথম গ্রাজুয়েট' আরো কেউ কেউ ছিলেন কিন্তু বঙ্কিম ছিলেন 'বেষ্ট অব দি লট'—দঙ্গলের সেরা।

বঙ্কিমের জন্মের কয়েক বছর আগেই মেকলের শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল। সেই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিলো এমন কিছু কালা আদমী পয়দা করা যারা চেহারা-সুরুতে ভারতীয় হলেও মনন-রুচিতে হবে ইউরোপীয়। বঙ্কিম সেই উদ্দেশ্যের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া প্রথম মানুষ, প্রথম ভারতীয়, প্রথম বাঙালী।

মেকলের শিক্ষানীতির বলি হতে গিয়েই বঙ্কিম জন ষ্টুয়ার্ট মিল, অগাষ্ট কোঁমৎ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিক ও মনীষীদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি পরিচিত হন জন বীমসের ভাষা-চিন্তার সঙ্গে; হার্বার্ট স্পেনসরের দার্শনিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে। ইউরোপীয় আইন কানুনাদির পড়াশোনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় চিন্তার অন্তঃপুরটিও জরিপ করার সুযোগ লাভ করেন বঙ্কিম। বঙ্কিম ইউরোপীয় চিন্তার বলি না হয়ে সে চিন্তায় বলীয়ান হয়েছেন। সেজন্য বঙ্কিম 'লোকরহস্যে' বলেছেন—'হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।' বঙ্কিম কেন ইংরাজকে প্রণাম করেছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দিয়েছেন 'ইংরাজ স্তোত্র' শীর্ষক রচনায়। সেই অসাধারণ কৌতুকোজ্জ্বল রচনাটির ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র এটি নয়। আমরা তা করতে চাই না। শুধু মাতৃভাষা ত্যাগ করে ইংরাজী 'কহিবার' শপথ বাক্যটি উদ্ধৃত করবো।

বঙ্কিম লিখেছেন—'হে মিষ্টভাষিণ্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

বঙ্কিম 'লোক রহস্যে' ইংরাজকে প্রণাম জানিয়েছেন, কিন্তু বেরহামপুর ক্যান্টনমেন্টের লেফটেনান্ট কর্নেল ডাফিনকে খেলার মাঠে দেখে পাল্কী থেকে নামেন নি। ডাফিনের সঙ্গে তাই নিয়ে ঘুষাঘুষি করেছেন। আরো 'বেআব্রুবী' করে ডাফিনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে জিতেছেন। বঙ্কিম সোজা লোক ছিলেন না।

তাই বলছিলাম বঙ্কিম মেকলের শিক্ষানীতিতে 'বলি' না হয়ে সত্যিকারের বলীয়ান হয়েছিলেন। ইংরাজদের যুক্তির অস্ত্রগুলো ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। ইংরাজী-শিক্ষাকে বাঙলা শিক্ষার কাজে লাগিয়েছেন। বঙ্কিমের বাঙলা ভাষা পরিচর্যার ধারণাও মনে হয় পাশ্চাত্যের ভাষা-পরিচর্যার ধারণার সদর্থক বাস্তবায়ন। বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভাষা-পরিচর্যা বা Language Cultivation বলতে ভাষার অবয়ব উন্নয়ন, তার কর্মক্ষমতা সম্প্রসারণ তার ভার ও ধার বাড়ানোর কর্ম-ধারাকে বোঝানো হয়। ভাষা অনুশীলন যেমন ভাষা-পরিচর্যার অংশ, তেমনি ভাষার ব্যাকরণীকরণও ভাষা-পরিচর্যার অংশ। ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, চিন্তার মাধ্যমে ভাষা-প্রয়োগে যুক্তিযুক্ততা আনয়ণ করা এ-সবকেও ভাষা-পরিচর্যার অঙ্গ বলা যায়। ভাষার বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, অসমতাকে সাম্য দান করা এ-সবকেও ভাষা-পরিচর্যার বিষয় বলে গণ্য করা যায়। ভাষা-পরিচর্যার এ ঐতিহ্য ইউরোপ থেকে এ-দেশে এসেছে। সে কারণে ইউরোপীয়দের আগমনের আগে আমরা বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দকোষ কিংবা পূর্ণাঙ্গ অভিধান কিছুই পাই নি। যদিও বা কবিতা রচিত হয়েছে অজস্র, ভাষা-চর্চাও হয়েছে ধর্মপ্রচারের জন্য, বিনোদনের জন্য কিংবা জ্ঞান প্রসারের জন্য, তবু বঙ্কিমের 'বাঙ্গালা ভাষা'র মতো চিন্তামূলক প্রবন্ধ পূর্বে রচিত হয় নি। অন্ততঃ দেশীয়রা এ কাজে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন নি। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে আসসুমানসাও মন্তব্য করেছেন, হ্যালহেড মন্তব্য করেছেন; মন্তব্য করেছেন ফরষ্টার ও কেরী। এদের সকলেই বিদেশী। দেশীয়দের মধ্যে রামমোহনই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভাষার ব্যাকরণীকরণে অংশ গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভাষা-পরিচর্যায় সচেতন-ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯ বর্জন করেছেন, ড়, ঢ় ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। বিদ্যাসাগর যে ভাষা-পরিচর্যায় অংশ গ্রহণ করেছেন তা বর্ণসংস্কার ও বর্ণপরিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভাষা-রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিস্তারিত ছিল। বিদ্যাসাগর মূলতঃ কর্মী তাই তাত্ত্বিক ভাবনা তাঁকে পীড়িত করে নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙলা ভাষার শৈলীগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমের ভাষাসংক্রান্ত চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে মুখ্যত তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে, অংশত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', "বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা" "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" লোক রহস্যের "গ্রাম্যকথা" ও "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র" ইত্যাদি রচনায়।

এ পর্যন্ত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বহু সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। (দ্রঃ মুসা, ১৯৭১, ইসলাম : ১৯৮৪ আজাদ : ১৯৮৫) বিভিন্ন ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের মধ্যেও স্থান লাভ করেছে। বঙ্কিমের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির আগে বাঙ্গালীর ভাষা-চিন্তার, বিশেষ করে বঙ্গভাষা সম্পর্কিত চিন্তার বাহন হয়েছে কবিতা। সৈয়দ সুলতানের বাঙলা ভাষার কাব্য লেখার কৈফিয়ৎ, আব্দুল হাকিমের নূর নামার (সপ্তদশ শতাব্দী) তিরস্কার, রামনিধি গুপ্তের 'স্বদেশী ভাষা' সংক্রান্ত কতিপয় পংক্তি, ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' কাব্য লেখার কারণ-দর্শানো পংক্তি কয়টি। এই তো মধ্যযুগে বাঙলা ভাষা সম্পর্কে কবি-ভাবনার পরিমাণ। মধ্যযুগ ছেড়ে এলে আমরা পাই ঈশ্বর গুপ্তের 'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।'

নামের উপদেশাত্মক কবিতা আর মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' নামের অনুশোচনা ও স্তুতিবাচক সনেটটি।

বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি একটি অনন্য সাধারণ স্থান দখল করে আছে। তারই প্রমাণ প্রবন্ধটির একাধিক সংকলনে অন্তর্ভুক্তি। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির উপশিরোনাম 'লিখিবার ভাষা'। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় ১২৮৫-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। তার আগে ১২৭৯ আষাঢ় সংখ্যায় বঙ্কিম জন বীম্‌সের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও অনুশীলনের জন্য প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সম্বলিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' প্রকাশিত হয়। জন বীম্‌সের প্রস্তাবটিতে একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বাঙলা ভাষার সমকালীন পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেন। বীম্‌স (১৮৩৭-১৯০২) বলেন—

"ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, বাঙালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্য্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গদ্যকাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছে। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" (কুমার : ১৩৮১ : ১০) বীম্‌স এই প্রস্তাব উত্থাপন করার আগেই তার Outlines of Indian Philology (১৮৬৭) ও A Comparative Grammer of the Modern Aryan languages of India (১৮৭২-১৮৭৯) প্রকাশ করেন।

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণের একটি আলোচনা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বীম্‌স সাহেব চেষ্টা করে বাংলা শিখেছেন। বাংলাদেশেই তার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়স যাপন করেছেন। বহু বছর ধরে তিনি বাঙালী সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালী মোক্তারের আবেদন শুনেছেন। শুনা যায় তিনি রীতিমত বাংলা সাহিত্যের চর্চাও করেন। বীম্‌স বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য অনুশীলন করেছেন বলেই বাঙলা শৈলীর চর্চায় যে একাধিক দল আছে তাও তার জানা। তিনি বলেছেন—

"এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। একদল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।" (কুমার ১৩৮১-৯১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন—"বাঙ্গালার লিখিত ও কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে, বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিমরূপের সঙ্গে সংযুক্ত

হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়ে, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।" উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটোর বক্তব্য তুলনা করলে বীম্‌সের বক্তব্য কীভাবে বঙ্কিমে রূপান্তরিত হয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে। শুধু তাই নয় বীম্‌সের প্রবন্ধে যা ছিল মাত্র ইঙ্গিত, তাকেই বঙ্কিম তার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বাঙলা ভাষা সংস্কৃত প্রধান রীতি ও কথ্যরীতি, রামগতি ন্যায়রত্নের দল ও হুতোমের দল যে ভাষা ব্যবহার করে তার গুণাগুণ বিবেচনা করা হয়েছে। সে সূত্রে বাঙলা শব্দের শ্রেণীকরণ না বর্গীকরণ করা হয়েছে এবং বর্গীকৃত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিম ভাষা-প্রয়োগে বিষয়ানুগতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। বঙ্কিম বলেছেন তার উপসংহারে—"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিৎ। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলেও তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।" (রচনাবলী : ৩৭৩)

বাঙলা ভাষার রীতিগত দ্বৈধতার সংকট হঠাৎ করে বঙ্কিমের কালে দেখা দেয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হ্যালহেড যখন বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন তখনও উপলব্ধি করেছেন। উইলিয়ম কেরী যখন বাঙলার রীতিগত দ্বৈধতার ধারণাপ্রাপ্ত হন তখন দুই রীতিতে দক্ষ হওয়ার জন্য একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও একজন মুসলমান মৌলভীকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। গবেষকেরা আমাদের জানিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত বিশুদ্ধতার দাপটে পূর্ববঙ্গীয় মুন্সী চাকুরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সংস্কৃত শব্দ প্রধান রীতি ও ফারসী শব্দ প্রধান রীতির মুখোমুখি বিদ্যাসাগরও হয়েছেন। তার 'সীতার বনবাস' আর আবার 'অতি অল্প হইল' দুই রীতির সফল ব্যবহারের নিদর্শন। দুই রীতির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম যে সমাধান নির্দেশ করেছেন তাই পরবর্তীকালে রীতিগত বিরোধের সমাধান হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। বঙ্কিমের সমাধানকে এককথায় বলা যায় 'প্রয়োজনবাদ'। তিনি বলেছেন—"প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তার তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয় তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" (রচনাবলী ৩৭৩) বঙ্কিম তার 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তৎকালীন ভাষাপরিস্থিতির মূল্যায়ন করে একটি বাস্তবধর্মী

সমাধান দিয়েছেন। বঙ্কিমের উক্তির ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যায় তখন বাঙলাভাষার Sexical Selection Restriction বা শব্দ নির্বাচনের কড়াকড়ি ছিল। সে কড়াকড়ি অনেকক্ষেত্রে বর্জনশীল প্রবণতা হিসেবে কাজ করছিল। বঙ্কিম জোরালো যুক্তি প্রয়োগ করে সে বর্জনশীল সমাজভাষাতাত্ত্বিক মনোভঙ্গীতে পরিবর্তন এনে তাকে গ্রহণশীল মানসিকতায় রূপান্তর করতে চেয়েছেন। বঙ্কিম সংস্কৃত শব্দ নির্বাচনের একমুখীণতাকে পরিহার্য বিবেচনা করেছেন তিনি বাঙ্গালীকে ইংরেজী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য বন্য সবই গ্রহণ করতে বলেছেন। বঙ্কিম বাঙলাভাষাকে সম্পদবান করাব জন্য দশ দুয়ার খুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ; শব্দ নির্বাচন কড়াকড়ির রুদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত করে খোলা হাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

জন বীম্‌সের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনে ১৮৭২ সালে। প্রস্তাবের ভূমিকা হিসেবে জন বীম্‌স্ ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভাষা পরিচর্যার জন্য যে সব সংস্থা গঠিত হয়েছে তাদের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত উপস্থাপন করেছেন। ইউরোপের পাঁচটি ভাষা-ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয় ও স্পানীয়কে তিনি বলেছেন 'সংস্কার-বিশিষ্ট'। এই পাঁচটি ভাষা কীভাবে বিভিন্নতা পরিহার করে সুনির্নীত সাধুভাষা অর্জন করলো তার বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে হাজির করেছেন।

বীম্‌স্ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক হইতে আল্প পর্য্যন্ত সকল জরমানজাতি, সাবয় হইতে পালামো পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা, এবং কাটালান গালিসিয়ান আন্তালুসিয়ান কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্নীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্নীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।' (পূর্বোক্ত) বীম্‌স্ বলছেন এ-সব ভাষায় এই ঐক্য অর্জিত হয়েছে, পূর্বে এই ঐক্য ছিল না। এই ঐক্য অর্জনের পেছনে যে কারণ সব চেয়ে প্রধান তা হচ্ছে একাডেমী প্রতিষ্ঠা।

বীম্‌স্ বলেছেন ১৫৫৯ সালে এলিয়ট এবং ১৫৮০ সালে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন। আর ১৬৩৫ সালে কার্দিনাল রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় ভাষা সংশোধন ও একতা দৃঢ়মূল করেন। ইটালীতেও ভাষার একতা সম্পাদনের জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভাষা উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য প্রথম যে একাডেমী ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হচ্ছে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত 'একাদামি দেলা ক্রুসকা'। ১৫৪০ এ স্থাপিত হয় এই সংস্থা। চালুনির মত দোষ ছেকে ফেলে ভাষা পরিশুদ্ধ করার জন্য 'ক্রুসকা' নাম দেওয়া হয়েছে। ১৫৯০ সালে এই একাডেমী থেকে 'বকেবলেরিয়া ডিলা ক্রুসকা' নামক প্রথম শুদ্ধ উইরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

ইউরোপীয় ভাষা-পরিচর্যার বৃত্তান্ত প্রদানের পর বীম্‌স বলছেন—"বাঙ্গালায় এমত কোন সর্ব্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম, দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্যপুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসন সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।"

বীম্‌স্‌ উপসংহার করছেন এই বলে—"অতএব বাঙ্গালাসাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভাস্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক সন্দেহ নাই।"

একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' লেখাটির শেষে বঙ্কিম সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে দেন তাতে একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রতি বঙ্কিমের সমর্থক মনোভঙ্গি স্পষ্ট। বঙ্কিম লিখেছেন—বীম্‌স্‌ সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত এই প্রস্তাব যে, পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপব অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গ পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব।" (কুমার : : ২০)

বঙ্কিমের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাঙলাভাষার উন্নতিকল্পে তখন-তখন একাডেমী গঠন সম্ভব হয়নি বহুবিধ কারণে। দশ বছর পরে একটি ক্ষীণ প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সত্যিকারের একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ 'দি বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার' নামে। এই সংস্থাটিই পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে পরিচিত হয়। ভাষার একতা সম্পাদনের জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হলেও, বঙ্কিম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভাষার উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখেন। বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের অনুরোধে যে বাঙলা সংকলন করেন তার ভূমিকায় বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে যে 'Bengali Grammer is still in some respects in an unsettled state.' ভাষায় বিশুদ্ধতাবাদী প্রবণতা আছে তা তিনি অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেছেন,—"Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible." (রচনাবলী, পৃ. ৮৬০) বঙ্কিম যে ভাষা-পরিচর্যায় আগ্রহীছিলেন তার প্রমাণ রেখেছেন ছাত্র-পাঠ্য পাঠ্যপুস্তক 'সহজ রচনা শিক্ষা' পুস্তিকায়। উপক্রমণিকায় বঙ্কিম ভাষার কথ্য ও লেখ্যরূপের ভিন্নতা ও অভিন্নতা, ভাষা-প্রয়োগে, চেতনার আরোপন, নিয়মের মান্যতা ও নিয়ম শিথিলতার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপন করেছেন। উপক্রমণিকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"আমরা যাহা মনে করি, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করিতে হইলে, হয় মুখে মুখে বলি, নয় লিখিয়া প্রকাশ করি। মুখে মুখে বলিলে, লোকে তাহাকে কথোপকথন, বা অবস্থাবিশেষে বক্তৃতা বলে। লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে, চিঠি সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদিতে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু মুখেই বলি, আর লিখিয়াই বলি, বলিবার সময়ে কথাগুলি একটু সাজাইয়া লইতে হয়। সাজাইয়া না বলিলে, হয়ত তুমি যাহাকে বলিতেছ, সে তোমার সকল কথা

বুঝিতে পারিবে না, নয়ত সে কথাগুলি গ্রাহ্য করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে।" (রচনাবলী—পৃ. ৯২৮)

বঙ্কিম যাকে সাজান বলেছেন, আমরা তাকে পরিচর্যা বলছি। ভাষা-পরিচর্যা স্বভাব-রহিরাগত কোনো প্রয়াস নয়, স্বভাবকেই সচেতনভাবে অনুসরণ। বঙ্কিম আরো খোলামেলা করে ছাত্রদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন—

"রচনা অতি সহজ। মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে সকল কাজই অভ্যাসাধীন। মৌখিক রচনায় সকলেরই অভ্যাস আছে। লিখিত রচনায় যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইবে। (রচনাবলী : ৯২৮)

লেখ্যরীতি ও কথ্যরীতির মধ্যে প্রতিসাম্য থাকলেও, সে প্রতিসাম্য হুবহু এক রকম নয়। বঙ্কিম এ ব্যাপারে ছাত্রদের সচেতন রাখতে আগ্রহী। তিনি বলেছেন—

আর মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একটু প্রভেদ এই আছে যে, লিখিত রচনার কতকগুলি নিয়ম আছে, সে নিয়মগুলি মৌখিক রচনায় বড় মানা যায় না—না মানিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু লিখিত রচনায় না মানিলেই নয়।" (রচনাবলী পৃ ৯২৮) এই পাঠ্য পুস্তকেই বঙ্কিম ভাল রচনা লেখার জন্য অপরিহার্য ৪টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে ১: বিশুদ্ধি, ২. অর্থব্যক্তি, ৩. প্রাঞ্জলতা ও ৪ অলঙ্কার। বিশুদ্ধি কাকে বলা হয় তার সংজ্ঞা দিয়েছেন বঙ্কিম, সে সংজ্ঞা আজকের দিনে যাই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন তখনকার দিনে কার্যকর বলে ধারণা করা হয়েছিল।

বঙ্কিমের মত হচ্ছে—"লিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়। অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লিখিত রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধি হইল। (রচনাবলী পৃ ৯৩৩) চারটি দোষের উল্লেখ পাই। সেগুলো হচ্ছে ১ বর্ণাশুদ্ধি, ২. সংক্ষিপ্তি, ৩. প্রাদেশিকতা ও ৪. গ্রাম্যতা ৫ ব্যাকরণ দোষ। উদাহরণ সহযোগে বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন :

১. বর্ণাশুদ্ধির ব্যাপারে লিখেছেন—মুখে সকলেই বলে "পষ্ট" "মেগ" "শপত" শট, "বাঁদ" "দুব্বল" "নেত্য" কিন্তু লিখিতে হইবে "স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ দুর্ব্বল, নৃত্য।"

২. সংক্ষিপ্তি বলতে বুঝিয়েছেন কথ্য রিকারকে। মুখে বলি "কোরে" "কচ্চি" "করব" "কল্লুম" "কচ্ছিলুম" কিন্তু লিখিতে হইবে "করিয়া" করিতেছি "করিব" "করিলাম" "করিতেছিলাম ইত্যাদি।

৩. প্রাদেশিকতা অপর নাম বলা যায় আঞ্চলিক বিকার।

"বাঙ্গালায় কোন প্রদেশের লোক বলে "কল্লুম" কোন প্রদেশে "কল্লেম" কোথাও কোথাও "কল্লু"। কোন প্রদেশ বিশেষের ভাষা ব্যবহার করা হইবে না—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বঙ্কিম বলেছেন—অন্যান্য স্থানের চেয়ে যেহেতু রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। তাই রাজধানীর ভদ্র সমাজে যে ভাষা চলিত তাই লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হতে পারে। কোন দেশে বলে 'ছড়ি' কোনো দেশে বলে 'নড়ি' 'ছড়ি' কলকাতার ভদ্র সমাজে প্রচলিত। তাই সেটাই ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনি 'লগি', 'লগা' ও 'চৈড়' শব্দগুলোর মধ্যে 'লগি' কলকাতায় প্রচলিত। তাই তার পরামর্শ হচ্ছে 'লগি'কে প্রমিতরূপ হিসেবে গ্রহণ করবার। গ্রাম্য ও ইতর লোকের ভাষা ব্যবহার না করার কথা বলেছেন বঙ্কিম। গ্রাম্যতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—"কৌশল্যার বেটা রাম" আর "দশরথের বেটা লক্ষ্মণ"। বঙ্কিম ব্যাকরণগত ত্রুটি পরিহার করার জন্যও শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়েছেন। বঙ্কিম বাংলা সন্ধি, সমাস ও স্ত্রীলিঙ্গরূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর আলোচনা করেছেন। বাংলা ব্যকরণের প্রাঞ্জল ও সহজ এই আলোচনা বঙ্কিমের ভাষা-পরিচর্যার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বঙ্কিমের বাঙলাভাষা-চিন্তার নিদর্শন যেমন তার 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধটি, তেমনি সাধারণ ভাষাচিন্তার নিদর্শন হলো বাঙ্গালীর উৎপত্তি 'প্রবন্ধটি। (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ পৌষ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিম ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। তখনকার দিনে অগস্ত শ্লেচর, ম্যাক্সমুলার, শ্লেগেল, লাসেন, বেনফী, স্পিজেল, বেনা, পিক্তা, মুর ইত্যাদি ঐতিহাসিক—তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রসার ঘটান। তখন ভারতবর্ষে অবস্থানকারী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা এদের মতামত নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতেন। বঙ্কিম এদের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ভাষাব বর্গীকরণের নীতি-মালা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। সেই পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করেছিলেন 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে। এই জ্ঞান প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগানো। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখি বাঙালীর উৎপত্তিকে তিনি গ্রীকজাতির উৎপত্তির সঙ্গে, ইতালীয়দের উৎপত্তির সঙ্গে, জার্মাণজাতির উৎপত্তির সঙ্গে সমসূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন—আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্ত-মহিমাময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোনিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।" (বঙ্কিমরচনাবলী পৃঃ ৩৪৬-৪৭) বঙ্কিম ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা আবিষ্কারের তত্ত্বকে বাঙালীর উৎপত্তি বিচারের কাজে লাগিয়েছেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ইউরোপীয় ধ্যান-ধারনাকে তিনি বাঙ্গালীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাজে ব্যবহার করেছেন। এখন আমরা হয়ত সমালোচনা করতে পারি যে বঙ্কিম অজান্তে উনবিংশ শতকীয় ধনবাদী নৃতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বের ফাঁদে পড়েছেন কিন্তু সে ফাঁদে না পড়ার বিদ্যা তখনকার বিদ্যা-জগতে ছিল না।

বঙ্কিম বাঙলা ও ইংরেজী ভাষা সন্নিকর্ষের স্বর্ণযুগে জন্মেছিলেন। ইংরেজ বণিকেরা প্রথম যখন কলকাতায় আসেন তখন কথাবার্তা বলার জন্য দোভাষী অনুসন্ধান করছিলেন। কারণ মাদ্রাজ কালিকট প্রভৃতি বন্দরে দোভাষী সহজলভ্য ছিল। কিন্তু কলকাতায় তখন ইংরেজী-জানা দোভাষীর অস্তিত্ব ছিল না। সে-কারণে যাকে দোভাষী আনতে বলা

হয়েছিল সে দোভাষীর পরিবর্তে ধোপাকে ধরে নিয়ে এসেছিল। সে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। কিন্তু উনবিংশ শতকের যে সময়টিতে বঙ্কিম "এই জীবন নিয়ে কি করিব" ভাবছিলেন তখন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইংরেজী বঙ্গদেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছিল। বঙ্কিমের কাছে ইউরোপীয় জ্ঞানের বদ্ধদুয়ার খুলে গিয়েছিল। ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি যা যা ইউরোপ থেকে এসেছিল বঙ্কিম 'তৃষিত' চাতকের ন্যায় সেই জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। শুধু সঞ্চয় নয় নিজের চিন্তদিগন্তকে ও একইসঙ্গে বাঙালীর চিন্তদিগন্তকে প্রসারিত করার জন্য বঙ্গভাষায় রূপান্তর করেছিলেন। মাইকেলের ভাষা-পরিচর্যা বাঙালীকে স্বদেশমুখো করেছিল। আর মাইকেলে উত্তরসূরী বঙ্কিমের ভাষা-পরিচর্যা বাঙালাভাষাকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠাদান করেছিল।

বঙ্কিমকে অনেকেই কেবল জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অবশ্যই বঙ্কিম জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসন—কাঠামোর সেই উনবিংশ শতকীয় পরিমণ্ডলে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ধ্যানধারনার স্বীকরণে, চিন্তাভাবনার উপযোগ বিশ্লেষণে, ও মানব জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বঙ্কিম আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করেছেন একথা আদৌ বলা যাবে না। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে বঙ্কিমের জ্ঞানবৃত্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে কিন্তু বঙ্কিমের ভুলগুলো আমরা আমাদের নির্ভুল পথের আলোর মশাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। বঙ্কিমের গৌরব প্রথম হওয়ার, নির্ভুল হওয়ার নয়—একথাটা আমাদের সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে।

নীল-আন্দোলন ও বঙ্কিমচন্দ্র

তপোবিজয় ঘোষ

উনিশশতকের প্রথমার্ধে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নীলকর বা নীলচাষ সমর্থন করেন নি। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ঈশ্বর গুপ্ত, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানগণ, এমন কি শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ—সকলেই অত্যাচারী নীলকরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সকল বুদ্ধিজীবী, কবি ও ঔপন্যাসিক, সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, এমন কি বঙ্গীয় জমিদারগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ নীলচাষ ও নীলকরের সক্রিয় বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৯-৬০ সালের নীলবিদ্রোহের কালে, নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ ও মামলার মাধ্যমে এ সত্য অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই প্রতিবাদের ধারা চলেছে।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ?

বঙ্কিমের কোনো উপন্যাসে নীলচাষ বা নীলকরের প্রসঙ্গ নেই। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে (১৮৭৫) রেশমকুঠির কুঠিয়াল লরেন্স ফস্টরের কথা আছে। তার সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন তা নীলকর সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। লরেন্স ফস্টর একাধারে অর্থ লোভী ও নারী লোভী। চন্দ্রশেখরের গৃহ থেকে শৈবলিনীকে সে অপহরণ করেছিল। শৈবলিনী যখন পুষ্করিণী থেকে জল সংগ্রহ করতে যেত—ফস্টর তখনই তার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে অপহরণের সঙ্কল্প করেছিল। নদীয়ার কুখ্যাত নীলকর আর্চিবল্ড হিলস্ পুকুর ঘাট থেকেই হরমণিকে হরণ করেছিল। ঘটনাটি ঘটে ১৮৬০ সালে। তা নিয়ে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র তা প্রকাশ করে মামলায় জড়িয়ে পড়েন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে হরমণি ক্ষেত্রমণিতে রূপান্তরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কর্মজীবনে প্রবিষ্ট ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হরমণি-হরণ সংক্রান্ত উত্তেজক ঘটনাবলী তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। শৈবলিনী-ও-লরেন্স ফস্টরের পূর্বোক্ত অপহরণ কাহিনী রচনার কালে, তার মগ্নচৈতন্য থেকে, সে-সব স্মৃতি উঠে আসতেই পারে।

বঙ্কিমের জীবনী থেকে জানা যায়—নীলবিদ্রোহের কালে নীল প্রধান অঞ্চল যশোহর ও খুলনায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কর্মরত ছিলেন [১৮৫৮-৬৪]। ঐ দুই জেলায় কর্মরত থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। নীলবিদ্রোহের পরেও নীলকর অত্যাচার একেবারে প্রশমিত হয় নি। প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা দিত। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে নীলকর অত্যাচার প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বঙ্কিম-জীবনী ও 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' সতীশচন্দ্র মিত্র রচিত গ্রন্থে তার উদাহরণ আছে। দু'একটি উল্লেখ করি—

খুলনায় কার্যকালে তিনি দেখেন যে একজন দুর্বৃত্ত নীলকর হাতির শুঁড়ে মশাল বেঁধে একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঐ গ্রামের রায়তেরা নীলচাষে অনিচ্ছুক ছিল। শচীশচন্দ্র লিখেছেন—"তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিশ কাজ করিত। দারগাগণ ঐ নীলকর সাহেবটিকে কোনোমতে ধরিতে পারিল না—কেন না তাঁহার নিকট সর্বদা গুলি ভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন।"

অনুরূপ আরো একটি ঘটনার উল্লেখ পাই পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থেই। সুন্দরবন অঞ্চলের মরেলগঞ্জ এলাকার জমিদারও নীলকর রবার্ট মরেলকে শায়েস্তা করার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। সে কাহিনী রোমাঞ্চকর ও দীর্ঘ—এখানে বিস্তৃতভাবে তা উল্লেখ করার অবসর নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন যে কর্মনিষ্ঠা, চারিত্রিক সততা ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে নীলকর অত্যাচারের প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার জন্য বাংলার নীলচাষীদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে। সেদিন মরেল—সাহেবরা তাঁকে উৎকোচে বশীভূত করতে চেয়েছিল—না পেরে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু তরুণ যুবক বঙ্কিমচন্দ্র সমস্তই নিঃশব্দে ও নির্ভয়ে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর চরিত্র থেকে উনিশ শতকের নীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাই আমাদের ইতিবাচক উপার্জন।

দ্বিতীয় উপার্জন তাঁর দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। নীলদর্পণকে আমরা বাংলা গণসাহিত্যের অগ্রদূত বলে অভিহিত করি। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এই নাটকটিকে বাংলার Uncle Tom's Cabin বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সূত্রে বঙ্কিমের অপর একটি উক্তি বিভ্রান্তিকর বলেই একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। তিনি একটি গ্রন্থ-সমালোচনায় লিখেছেন—'নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার নিবারণার্থ নাটক প্রণয়ন করেন; আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন।' এই উক্তিকে আশ্রয় করে বঙ্কিমবিদ্বেষী কেউ কেউ বঙ্কিমকে নীলচাষ নীলকর সমর্থক করে তুলেছেন।

বিষয়টি বিচার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন?

১২৮০ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি কদর্য নাটক 'গ্রেট বারবারস্ ড্রামা— নাপিতেশ্বর নাটক' সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমের শিল্পরুচি এই নাটকটির দ্বারা রীতিমত আহত হয়। এরই নিন্দার সূত্রে অকস্মাৎ উত্তেজনার বশে তিনি নীলদর্পণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ও তাকেও 'নাটকের অবমাননা' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কয়েকছত্র পরেই তিনি মন্তব্য করেন—"নীলদর্পণ প্রভৃতি সময়োপযোগী ও সুফলোৎপাদক, এবং কবিত্বগুণবিশিষ্টও বটে বলিয়া আমরা সে সকলের আদর করি।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমের চিন্তায় স্ব-বিরোধিতা সুস্পষ্ট। নীলদর্পণ সম্পর্কে এখানে তিনি মনঃস্থির করতে পারেন নি। 'নাটকের অবমাননা, এবং 'সুফলোৎপাদক' 'কবিত্বগুণে বিশিষ্ট' আদরণীয় নাটকরূপে নীলদর্পণকে একই সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসায় ভূষিত করেছেন। বঙ্কিমের সামঞ্জস্যহীন অস্থির-চিত্ততার প্রকাশ আর কোন লেখায় এমন

গুরুতর আকার ধারণ করে নি! এর কারণ কি? আমাদের অনুমান—একদিকে 'নাপিতেশ্বর নাটকে'র কদর্যতা' অন্যদিকে 'জমিদার দর্পণ' নাটকের রাজনৈতিক উত্তেজনা—বঙ্কিমের মনের ভারসাম্য নষ্ট করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদর্শনের ঐ একই সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র মীর মোশারফ হোসেনের জমিদারদর্পণ নাটকটির সমালোচনা করেন এবং রীতিমত উত্তেজিত ভঙ্গীতে লেখেন—'পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ-সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।' —এই নাটকের সমালোচনা-সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় নীলদর্পণের প্রসঙ্গ টেনে এনে লিখেছেন—'জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।'

সকলেই জানেন ১৮৭৩ সালে পাবনার কৃষকবিদ্রোহ কালে জমিদারদর্পণ নাটক লেখা হয়। এই নাটকে প্রজাবিদ্রোহের কোন চিত্র নেই—একটি বিদ্রোহী প্রজারও ছায়ামাত্র এই নাটকে দেখা যায় না। একজন মুসলমান জমিদারের নারী লালসা ও সেই সূত্রে একটি কৃষকরমণীকে ধর্ষণের দ্বারা হত্যা ও তার কৃষক-স্বামীর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করার কাহিনী হল এই নাটক। তবু বঙ্কিমের পক্ষে এই নাটকটি অসহ্য মনে হয়েছিল। এর কারণ ততটা এই নাটকের মধ্যে নেই—যতটা আছে পাবনা প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে। এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে। জমিদারের খাজনা বন্ধ করা, জমিদারবাড়ি আক্রমণ করা, স্থানবিশেষে সরকারী থানা ও ডাকঘর বিধ্বস্ত করা—এই বিদ্রোহের রণকৌশল ছিল। এ কারণেই নীলবিদ্রোহের সঙ্গে এর চরিত্রগত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। নীলবিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল শুধুমাত্র নীলকরশ্রেণীর বিরুদ্ধে। গ্রাম্য জমিদারশ্রেণী নিজেদের জমিজমা ও রায়তশোষণের স্বার্থেই নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষীর সহায়ক-শক্তি হয়েছিল অথবা নিষ্ক্রিয় থেকেছিল। সরকারী থানা-আদালত-ডাকঘর নীলচাষীর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। অর্থাৎ নীলবিদ্রোহ বৃটিশবিরোধী বা জমিদারবিরোধী ছিল না। এ-কারণেই রাধাকান্তদেব বাহাদুর থেকে শুরু করে কালিপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত বাংলার সকল ভূস্বামী নীলচাষীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এ কারণেই নীল কমিশনে জমিদারগণ নীলকরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু পাবনা প্রজা-বিদ্রোহ জমিদারবিরোধী ও কিছু পরিমাণে বৃটিশবিরোধী হয়ে ওঠে। এ কারণেই বাংলার তাবৎ ভূস্বামী-বুদ্ধিজীবী এর বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হয়। এ সময়ের হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল এক সময় নীলচাষীর পক্ষ সমর্থন করে পুস্তিকা লিখেছিলেন—তিনিই পাবনা প্রজাবিদ্রোহকে পেট্রিয়টে কদর্যভাষায় গালাগাল করেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রসিদ্ধ 'সোমপ্রকাশ' নীলচাষীর ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী বন্ধু ছিল···কিন্তু পাবনা-বিদ্রোহে ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন—'চাষারা পশুপালনের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই।···আমরা অনুরোধ করি, লেপ্টনান্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করুন।'

বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ একই অভিমতের শরিক ছিলেন। কৃষকেরা অস্ত্র হাতে জমিদার-

বাড়ি আক্রমণ করাকে অথবা ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছায় প্রেরিত বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হয়ে উঠুক—এটা কখনোই তাঁর কাম্য ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও তিনি সমর্থক ছিলেন কিন্তু পাবনায় বিদ্রোহী প্রজারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ দাবি করেছিল। এসব কারণেই পাবনার প্রজাবিদ্রোহ বঙ্কিমকে বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত করেছিল। যখন জমিদারদের উপর আক্রমণ চলছে তখন মীর মশাররফ হোসেন জমিদারদের উদারতা দানশীলতা মহানুভবতা ইত্যাদি না দেখিয়ে তাদের একজনকে কেন অত্যাচারী লম্পট দুশ্চরিত্র করে আঁকলেন—সম্ভবত এটাই বঙ্কিমের মনোগত জিজ্ঞাসা ছিল। এ-কারণেই জমিদারদর্পণ নাটককে 'জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' মনে করেছিলেন কেননা এর প্রচারে প্রজাবৃন্দ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে—বঙ্কিমের মনে এরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

এবং এসবের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তারই অনিবার্য প্রভাবে নীলদর্পণ নাটকটিও সাময়িকভাবে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নীলদর্পণকে তিনি যথার্থই 'নাটকের অবমাননা' মনে করতেন না—তার প্রমাণ যেমন ঐ সমালোচনাতে আছে 'সময়োপযোগী' 'সুফলোৎপাদক' 'কবিত্বগুণবিশিষ্ট' প্রভৃতি বিশেষণের মধ্যে তেমনি অন্যত্রও আছে। আবার, সমাজ-সংস্কার সাহিত্যের উদ্দেশ্য কিনা এ সম্পর্কে বঙ্কিম নিজেই নব্য-লেখকদের প্রতি উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন—তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

—এখানে বঙ্কিম লোকহিত অথবা সমাজ-কল্যাণ এবং অন্যনিরপেক্ষ সৌন্দর্যসৃষ্টি উভয়কেই তুল্যমূল্য দান করেছেন। তাঁর বিচারেই নীলদর্পণ তাহলে সমাজ বা সমষ্টির কল্যাণের প্রশ্নে 'সুফলোৎপাদক' এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রশ্নে 'কবিত্বগুণ বিশিষ্ট'—অর্থাৎ উভয় ধর্মই এ-নাটকে বর্তমান ; তাহলে এটি 'নাটকের অবমাননা' হয় কিরূপে ?

দীনবন্ধুর মৃত্যুর [১৮৭৩] অনেক পরে ১৮৭৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' প্রবন্ধ রচনা করেন। এরপর ১৮৮৬ সালে 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিম রচনাবলীতে ঐ দুটি রচনা 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' নামে একত্রে প্রকাশিত হয়। এই দুটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নীলদর্পণ সম্পর্কে যে-সকল মন্তব্য করেছেন তা থেকেই উনিশ শতকের নীলকর, নীলচাষ, নীলচাষী ও তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমের সুস্পষ্ট মনোভাব জানা যায়। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'দীনবন্ধুর স্নেহঋণে আমি ঋণী'। বলেছেন—'দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।' তাঁর সিদ্ধান্ত—'দীনবন্ধু নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গীয় প্রজাদিগকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।' দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নীলদর্পণের তোরাপ-আদুরী প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির অকৃপণ প্রশংসা করেছেন। উনিশ শতকের নীল আন্দোলনে নীলদর্পণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন—"নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে,—নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।

নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন'-এর সঙ্গে নীলদর্পণের তুলনা করেন। 'টমকাকার কুটীর' একটি দীর্ঘায়ত উপন্যাস—ইংরেজী ভাষায় লেখা। আমেরিকার Harriet Beecher Stowe এর লেখিকা। উপন্যাসটির সম্পূর্ণ নাম—'Uncle Tom's Cabin or The Life Among The Lowly'. ১৮৫২ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের প্রথম দিনেই ৩০০০ কপি বিক্রয় হয়, এক বছরের মধ্যে এর ১২০টি সংস্করণ হয় ও তিন লক্ষ কপি বিক্রি হয়। উপন্যাসটি ২/৩ বছরের মধ্যে ৪০/৫০ টি ভাষায় অনূদিত হয়, অসংখ্য নাট্যরূপ দেওয়া হয় ও নানাদেশে অভিনীত হয়। ১৮৬০ সালের মধ্যেই এটি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেরও পঠন-পাঠনের বিষয় হয়। মধুসূদন দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটি যে ঐ সময়ের মধ্যেই পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। সম্ভবত দীনবন্ধুও নীলদর্পণ রচনার পূর্বে উপন্যাসটি পড়েছিলেন। উপন্যাসটি সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে উত্তর-আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর পরিণামে আমেরিকায় দাসপ্রথা বন্ধের আইন পাশ হয়। অন্যান্য দেশেও আন্দোলন তীব্র আকার নেয়। বিশ্বখ্যাত এই মহৎ উপন্যাসটির সঙ্গে নীলদর্পণের তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র নীলদর্পণের গৌরব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে নীলদর্পণ অত গৌরবের অধিকারী ছিল না।

নীলকরদের দৌরাত্ম্য, নীলকরের কৃষকনির্যাতন, নীলচাষের ভূমিতে চাষীর ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া—এ সব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং ১৮৬০ সালের নীলবিদ্রোহের পর নীলরায়তের দাসত্বমুক্তিতে তিনি যে 'বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত' হওয়ার পরিবর্তে যথার্থ আনন্দিত হয়েছিলেন—তা উপরোক্ত রচনা থেকে প্রতীয়মান হয়। নীলদর্পণকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা-ও বোঝা যায়। বঙ্কিম প্রত্যক্ষভাবে নীলকরের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন নি সত্য—কিন্তু কর্মজীবনে সক্রিয়ভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং সাহিত্যজীবনে অপ্রত্যক্ষভাবে নানা মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি নীলচাষীর পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন।

এই সূত্রে আরো একটি ছোট বিষয়ের উল্লেখ করি।

আমরা আগেই বলেছি বঙ্কিমের সৃজনশীল-সাহিত্যে নীলকর চরিত্র বা নীলকর অত্যাচারের প্রসঙ্গ নেই। শুধু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে এই ক'টি ছত্র পাওয়া যায়—'নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় একক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্য সমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলেই উপযুক্ত স্থানে স্বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন।'

এই পরিত্যক্ত নীলকুঠি ক্রয়পূর্বক সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করে গোবিন্দলাল রোহিনীকে নিয়ে ভোগবিলাসময় পাপ জীবন অতিবাহিত করতে এসেছিল। এরূপ জীবন যাপনের উপযুক্ত গৃহই বটে! নীলবিদ্রোহের পরবর্তী কালে গ্রাম-বাংলার নানাস্থানে বহু নীলকুঠি ঐরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল—তার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করেন [১২৮২-৮৪] তখন বাংলাদেশে নীলবিদ্রোহের পরিনামে নীলচাষের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে। বঙ্কিম কিছুটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন—লোকালয় থেকে দূরে নির্জনস্থানে সুদৃশ্য কুঠি নির্মাণ করে একদা এক অত্যাচারী নীলকর 'নিঃশব্দে পাপাচরণ' করার জন্য সেখানে বসবাস করত। 'পাপাচরণ' শব্দটির মধ্যে যেন বিশেষভাবেই নারীলোলুপতা ও নারীনির্যাতন ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। তার পাপকর্মের নিত্যসঙ্গী ছিল দেশী নায়েব গোমস্তা ও তাগাদগীরের দল। তারা এখন "স্বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন।"

বঙ্কিমের উপরোক্ত বর্ণনায় নীলকরদের প্রতি ঘৃণার ভাবটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এবং—

গোবিন্দলাল ও রোহিণীর নীতিভ্রষ্ট ক্লেদাক্ত জীবনকে ঐ পাপপুরীর মধ্যে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।

ইতিহাসের যুক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব

ডঃ প্রণব মিত্র

আজ আমরা এখানে যে-মানুষের আলোচনায় আগ্রহী, এবং ইতিমধ্যেই যে-মানুষটির সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট আলোক-সম্পাত ঘটেছে বলে মনে করা যায়; তাঁর সম্পর্কে এখানে নতুন যে কিছু বলা যাবে, এমন আশা অল্পই। তাছাড়া বঙ্কিমের কোন একটি বিশেষ দিক নিয়ে পার্শ্বিক আলোচনাও আমার উদ্দিষ্ট নয়। অপিচ উনবিংশ শতকের বহু আলোচিত নব-জাগৃতির স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের আবির্ভাব বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত খতিয়ানে আসতে গিয়েই আমার একটা স্পষ্টই ধারণা হয় যে এখানে ইতিহাসের একটি নিয়ম যেন ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এবং সে সম্পর্কেই কিছু ধারণা পরিবেশনই আমার আপাত লক্ষ্য।

'ইতিহাস' শব্দের মূল ব্যুৎপত্তি সকলেরই জানা; সেই বিস্তার অনুসারে ধারণাটি আজকের নতুন ইতিহাসের ধারণার সমান্তরাল নয়; পরন্তু ইতিহাস কেবল পূর্ব ঘটনার বিবরণ মাত্রও নয়। আধুনিক ইতিহাসে বৃত্তান্ত ও বর্ণনার ওপর জোর না দিয়ে কার্য-কারণ ও ব্যাখ্যা নিয়েই বেশী চিন্তা করে। সেই হিসাবে ইতিহাসের যুক্তি তথা ইতিহাসের দর্শন আধুনিক মননেরই স্বাক্ষর বহন করে। বিশ্ব ইতিহাসকেও যে-ভাবে সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার চেষ্টা দেখা যায় তা অবশ্যই প্রশংসার্হ। অবশ্য ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টা যাঁদের, তাঁরা কখন কখন ইতিহাসকে যে ভবিষ্যৎ বক্তার আসনে বসিয়ে থাকেন সে-ভাবনা সর্বার্থে স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ বছর আগে এইচ, এ, এল, ফিসার বলেছিলেন ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় কোন ছন্দ তিনি খুঁজে পাননা এবং তার জন্যেই ইতিহাসের সূত্র কখনো কোন সামান্যীকরণও সম্ভব নয়। সুতরাং—

"..Progress is not a law of nature"

তিনি দেখেন ইতিহাসের প্রবাহ কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গের আন্দোলন আনে যা শুধু-পতন-অভ্যুদয়ের ঋজু-কুটিল পথের বিস্ময় সঞ্চারিত করে দেয় আমাদের মনে। কিন্তু এ-মত যে অন্যান্য অনেক মতের মতই পার্শ্বিক তা বলা বাহুল্য। এমন কথা মানি যে দৈবজ্ঞের মত ইতিহাস কোন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসের ধারার মধ্যে যে কোন ছন্দ-লয়ের তরঙ্গ বিস্তার নেই এমন কথা ভাবারও কোন যুক্তি নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকালে, সমাজজীবনে তথা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে যে নবতার সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কিন্তু সেই অসাধারণ আবির্ভাব কি সত্যই অপ্রত্যাশিত ছিল? অথবা অন্যভাবে কথাটিকে রাখলে এ-কথা কি বলতে পারবোনা যে সেই মহা আবির্ভাবের মধ্যে এক ধরণের অবশ্যম্ভাবীতা ছিল?

বাঙ্গালীর ইতিহাস বড় বেশী দিনের নয় এবং তার আদি যুগ এখনো প্রাগুষা-ধূসর। প্রাক-আর্য বাংলাদেশের ইতিহাস যখন আর্য-সভ্যতার হিন্দু, বৌদ্ধ ধারার সংঘর্ষে এলো তার পরবর্তী স্তর থেকে এদেশে ইতিহাস কিছুটা স্পষ্টতা পায়, এবং বলা বাহুল্য সে-ইতিহাস বলতে আমরা কোন রাজতন্ত্রের রোজনামচা বুঝিনা, সে-ইতিহাস হোলো বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সেই মননের ঐতিহ্য অনুসরণ করে গেলে যেন স্পষ্টতঃ কতকগুলি শিখর ও গ্রস্ত উপত্যকার সন্ধান মেলে। পাল-সেন আমলে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা যে উন্নত শিখরকে ছুঁয়ে যায়, তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে পাই সেকালের বাঙ্গালী কবি ও মণীষিগণের স্বারস্বত অবদানের প্রাচুর্য। তারপর লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের শেষ থেকেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সেই তুঙ্গগতি অধোমুখী হতে হতে শেষে এক চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পরিমণ্ডল রচনা করে। এরপর আবার ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সংস্কৃতির গতি উর্ধ্বমুখী হতে সুরু করে। নতুন কাব্য, নতুন ধর্ম ভাবনা এবং মানবতার নবমূল্য সৃষ্টি তখন বাঙ্গালীকে নতুন করে আত্মস্থ হতে শিক্ষা দেয়। তারপর আবার নামতে থাকে সংস্কৃতির রেখা। কবিরা শেষ পর্যন্ত পরিণত কবিওয়ালায়। পূর্বযুগেব বিভিন্ন কাব্যধারার অন্ধ অনুকরণ কেবল পুচ্ছগ্রাহিতার আবর্জনাই সঞ্চিত করে। তখন প্রকৃত সৃজনশীলতা গিয়েছে হারিয়ে, শুধু ওপর থেকে রং পড়ছে মাত্র। তখন পূর্বযুগের ধর্মীয় সমন্বয় ভাবনা এসে ঠেকেছে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি-দ্বন্দ্বে। কবিতার মধ্যে হৃদয়ের গভীর অনুভূতির সন্ধান মিলছে কচিৎ; পরিবর্তে প্রধান হয়ে উঠছে বাক্‌চাতুর্য ও শব্দরতি। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র তাই সাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও শুধু পুরাতনের জের টেনে যেতেই বাধ্য হন। মানুষ গড়ার বদলে তিনি শুধু রচনা করলেন রাজদরবারের অসাধারণ মণিমুক্তারচিত পাঞ্চালিকা। এরপর আবার সংস্কৃতির ইতিহাস উর্ধ্বমুখী হতে সুরু করে এবং ১৭৭২ সালে জন্মাতে হয় রামমোহনকে। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার এই নতুন কালের প্রবর্তকের কথা বলতে গিয়ে লেখেন—

> "The easiest starting point is of course, the date 1814, when Rammohan Ray settled down in Calcutta and took up seriously his life's work." (Notes on the Bengal Renaissance)

ঐতিহাসিককে এই ধরণের একটা সাল তারিখ খুঁজে নিতে হয় শুধু কাজের তাগিদে কিন্তু আসল কথা হোলো রামমোহনও তো হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব নন। যেমন নন শ্রীচৈতন্য।

এইখানেই মনে হয় প্রবাহিত ইতিহাসের একটি গতির নিরিখকে দেখতে পাচ্ছি। বোধ হয় সমস্ত দেশ ও জাতির ইতিহাসের মধ্যেই এইভাবে কয়েকটি শিখর এবং তার অব্যবহিত পরের গ্রস্তউপত্যকাগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই উত্থান ও পতন কোন আকাশচারী গ্রহ বা নক্ষত্রের নির্দেশে জোয়ার-ভাঁটার ওঠা পড়া নয়। বৃন্দাবনদাসেরা চৈতন্য আবির্ভাব বর্ণনায় স্বর্গের নির্দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন কিন্তু সেই সহজ-বিশ্বাস এ যুগে অচল।

বরং একথাই মনে করি বিশেষ সন্ধিতে ইতিহাস ব্যক্তির আন্তর মানসে যে-দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলে তারই ফল এইসব আবির্ভাব। ব্যক্তি, সমাজের আনবিক মৌল; অথবা সমাজদেহের কোষের মত। সমাজে বহু ব্যক্তির সমবায়। সুতরাং ব্যক্তি-মানসের সক্রিয়তা একদিক থেকে ইতিহাসের গতি সৃষ্টিকারী আবার সেই সৃজ্যমান ইতিহাসের প্রবেশও ব্যক্তিতে বর্তায়।

ব্যক্তি-মানুষ, তথা জাতি এক একটি ঘটনার সামনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় স্পন্দিত হতে থাকে। এবং সেই প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব তথা সংগ্রামই ব্যক্তিকে তথা ইতিহাসকে সামনের দিকে চালায়। এই যে ঘটনার কথা বলা হোলো তা কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর স্তর থেকেই উৎসারিত হয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী সভ্যতার উৎপত্তি, অগ্রগতি ও ধ্বংসের সূত্র লিখতে গিয়ে ঠিক এইভাবেই ইতিহাসের Challenge-এর কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি যে, কোন সুসম সচ্ছন্দ পবিবেশে সভ্যতার জন্ম হতে পারে বরং একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে—

> "Man achieves civilization not as a result of superior biological endowment or geographical environment, but as a response to a challenge in a situation of special difficulty which rouses him to make a hitherto unprecedented effort."
>
> (Study of History : A. Toynbee)

টয়েনবী অভ্রান্ত নন, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপাব তাঁর দর্শন শেষ পর্যন্ত হয়ত ব্যক্তিবাদে আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই Challenge and Response-এর সূত্রটিকে অন্যভাবে কাজে লাগানো যায়।

সময় কম বলেই সমগ্র বাংলার ঐতিহাসিক প্রবাহকে বিশ্লেষণ করছিনা। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এক উন্নত শিখর যুগের মানস আহবণ ক্রমে সহজ অভ্যস্ততায় যখন সংগ্রামী মনোভাব হারিয়ে ফেলে তখন কয়েক শতাব্দী ধরে বড়ার জল গড়িয়ে নিঃশেষ হতে হতে যে শূন্যতা জাগে তার পরেই পরবর্তী যুগের মনীষী মানসে একটি দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর অভ্যস্ত শান্তিতে থাকা নয়; পরন্তু নিরন্তর এই চিন্তায় পীড়িত হওয়া যে "কি ছিলাম এবং কি হয়েছি"। পতন পূর্বের ঋদ্ধি এবং পতন-পরবর্তী অবক্ষয়ের বোধ স্বাভাবিকভাবে দ্বন্দ্বে আসতে পারলে তবেই ইতিহাসের মোড় ঘোরে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করে বলেছিলেন —"এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়" —এই অনুভূতির বেদনা যে-দ্বন্দ্ব নিয়ে আসবে তার থেকেই সবচেয়ে স্পন্দনশীল, সবচেয়ে সংবেদনময় বলিষ্ঠ মনে একটি challenge জাগে। সে তখন সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পূর্বযুগের ঋদ্ধির পরিমাপ আবিষ্কার করে তাকে বর্তমানের অবক্ষয়ের অসহ্যতায় আত্মসন্ধানী হতে হয়। অথচ সেই পূর্বযুগের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকেও বড় সহজে চেনা যায় না, কারণ ইতিমধ্যেই অবক্ষয়ের মরু প্রসারে অনেক কিছুই অপরিচ্ছন্ন, বিকৃত এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই অষ্টাদশের টোলের পণ্ডিতরা কিংবা মক্তবের মুনসীরা যখন গতানুগতিক অধ্যাপনায় এবং ব্যাখ্যায় নিযুক্ত

তখন রামমোহনকে নতুন করে উপনিষদের চর্চা ও অনুবাদ করতে হয়। অন্য ধর্মের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের তুলনামূলক বিচারে আসতে হয়। এর ফলে সমাজ ও রাজনীতির ক্লেদ ও ব্যর্থতার অভিভব থেকে নতুন পরিসরের মুক্তি ঘটে। বলাবাহুল্য রামমোহন আমাদের আলোচ্য নন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে হলে যদি উনবিংশের নবজাগরণের পরিমাপ অবশ্যকর্তব্য হয় তবে সেই নবজাগৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনেও আমাদের রামমোহনের কথা বলতে হয়। রামমোহন তাঁর 'কেন' উপনিষদের ভূমিকায় লেখেন—

> "When we look to the traditions of ancient nations we often find them at variance with each other ; and when..we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone to conduct us to object of our pursuit.....The best method perhaps is neither to give ourselves up to the guidance of the one or the others ; but by a proper use of the light furnished by both."

যুগের challenge-কে গ্রহণ করে যুগমণীষাকে যখন নতুন করে সংস্কার ও সৃজনের কাজে নামতে হয় তখন তার প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী অস্ত্রের। ষোড়শ শতকে সেই অস্ত্রটি যদি হয় আবেগাশ্রয়ী ভক্তিবাদ তথা মানবতাবাদী বিশ্বাসী মনন; তাহলে উনবিংশে সেই অস্ত্র হোলো যুক্তি আশ্রয়ী বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান। এই নতুন চিন্তার আলোয় যখন পুরাতনকে বিচার করা যায় তখনই নবজাগৃতি সম্ভব। তখনই যুগসঞ্চিত অবক্ষয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির নিশানা বেরিয়ে আসে।

এই আলোকেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকে বিচার করতে হবে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন—

> "আমি কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি।"

এই মাতৃমূর্তিকে এককথায় দেশ বললে সবটুকু বলা হয় না—তা হোলো সমৃদ্ধ অতীতের এক সম্পূর্ণ ভাবমূর্তি। বঙ্কিম তাঁর সারা জীবন ধরে এই ভাবমূর্তির সন্ধান করেছেন! এই ভাবমূর্তির ভগ্নদশা তাঁকে কাঁদিয়েছে। নবদ্বীপের শ্মশানভূমির দিকে তাকিয়ে তাঁর যে কান্না তা শুধু বাংলার স্বাধীনতা হারানোর জন্য নয় পরন্তু তা একটি সার্বিক সঙ্কটের অনুভব। কমলাকান্তের প্রসঙ্গে সমালোচক বলছেন—

> "বুদ্ধির আদর্শের এবং বাস্তব জীবনের এই যে সঙ্কট চতুর্দিক হইতে জীবনের স্বাদ অপহরণ করিয়া চলিয়াছে, এবং সমস্ত সম্ভাবনাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহা সুতীব্র বেদনায় ও দুঃসহ তীব্রতা বলিয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ আত্মপ্রকাশ করে।" (বঙ্কিমমানস—অরবিন্দ পোদ্দার)

রামমোহনকেও যুগসন্ধির এই সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও জন্মেছেন ইতিহাসের সেই সঙ্কটের উপলব্ধিতে। কিন্তু রামমোহন যেভাবে নির্জলা যুক্তি ও মননের অনুসারী সদর্থে বঙ্কিম তা নন। মূলতঃ কবি ও রোমান্টিক বলেই তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তির সাথে আবেগের মিশ্রণ অনেকখানি। তাই অতীত রামমোহনকে শিক্ষিত করে অথচ মোহগ্রস্ত করে না। অন্যদিকে বঙ্কিম চিরকালই হারানো

অতীতের একটি মোহময় ভাবমূর্তিকে পূজা করে গেছেন। এর থেকেই তাঁর মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরী হয়।—

> 'বঙ্কিমের মন ছিল পশ্চাতে কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিকদের নির্মোহ তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী তাঁর বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি স্বদেশী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশী শাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষম্যের উৎস ইত্যাদি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার রাষ্ট্র-চিন্তায় যুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাঁর মন ছিল অতীতের মোহময় স্বপ্নপুরীতে; তাই বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ

দেখা দেয়।" এ হোলো উনবিংশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর স্বাভাবিক স্ববিরোধ।

(বঙ্কিমমানস : ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার)

বঙ্কিমচন্দ্র কতটা প্রগতিশীল, কতটা নন; কিংবা তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা কি পরিমাণে সোচ্চার, ইত্যাদি যান্ত্রিক বিচারে আস্থা রাখা যায় না, কারণ তা আমাদের কোন সত্যকার মূল্যায়নে সাহায্য করে না। ইতিহাসের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিচারকে স্বীকার করে নিয়েই দেখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে সেই ইতিহাসের সৃষ্টি, এবং কিভাবে তাঁর প্রভাব পরবর্তী ইতিহাসে বর্তায়।

গবেষকরা অনেকেই দেখিয়েছেন কিভাবে বৃটিশ শাসনে আমাদের দেশের পূর্বগত সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। মুসলমানী যুগের জমিদার এবং বণিকদের বদলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে নতুন ভূস্বামীসম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এদের অনেকেরই খানদান পলাশীর যুদ্ধের পূর্বগামী নয়। এছাড়া কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সাহায্যকারী মুৎসুদ্দিশ্রেণী নতুন বণিকশ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই হোলো আধুনিক বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের আদিপর্ব। বৃটিশের প্রয়োজনে পুষ্ট এই শ্রেণী কালে ইংরাজী শেখে এবং ইংরাজী সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করতে চায়। নতুনের মোহ প্রথমে আত্মবিধংসী ইয়ংবেঙ্গলদের জন্ম দেয় কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই পরে বেরিয়ে আসেন আত্মস্থ বুদ্ধিজীবীর দল। বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য মনে করা চলে। আমরা অনেকেই বাংলার নবজাগৃতি এবং বঙ্কিম প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণকে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব-পুষ্ট মনে করি। একথা একদিক থেকে পরোক্ষ সত্য। কেবল পশ্চিমকে গ্রহণ করার মধ্যে যে দীনতা ও অনুকরণপ্রিয়তা থাকে তার মধ্যে আমাদের পূর্বকথিত সেই উভয় মেরুর দ্বন্দ্ব জাগতে পারেনা। তাই ইয়ংবেঙ্গলরা চিরকাল ইতিহাসের ভাঁড় হয়েই রইলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমী সংস্কৃতির পাঠ গ্রহণ করে তাকেই হাতিয়ার করে একদিকে তার সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে সেই একই যত্নে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন সত্যকার বাংলাকে তথা বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সব্যসাচীর মত একদিকে তিনি সৃজনশীল শিল্পী, অন্যদিকে ইতিহাস-ধর্ম-পুরাণের আবরণ উন্মোচনকারী। এইভাবে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে রোমান্টিক মুক্তপ্রেমের স্বাপ্নিক, আবার অন্যদিকে তার নৈতিক সীমায়তি সম্পর্কে চিন্তিত। একদিকে জনহিতের নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র—সাম্যচিন্তায় অগ্রণী বঙ্কিমচন্দ্র—অন্যদিকে ধর্মতাত্ত্বিক নীতিবিদ ও ঐতিহ্য-

বাদী বঙ্কিমচন্দ্র—এই দ্বৈধ তাঁর মধ্যে যে স্বাভাবিকভাবেই থাকতে বাধ্য, তা মানতে হবে।

"The duality of Bankim was virtually the duality of the educated middle class intellectuals of nineteenth century India." *

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই প্রথম ইংরাজের ও ফরাসীর ইতিহাস পড়েছেন এবং স্বাধীনতার নতুন মূল্যবোধ আবিষ্কার করেছেন। অষ্টাদশ শতকে এই স্বাধীনতাবোধের জন্ম হয়নি। বিদেশী ইতিহাসের শিক্ষা নিয়েই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের প্রতিবাদ করেছেন বঙ্কিম। তাই তিনি বন্দেমাতরমের স্রষ্টা। কিন্তু বঙ্কিমের আরো প্রয়োজন ছিল একটি সার্বিক আদর্শ সন্ধানের। তাই তিনি মানুষ খুঁজতে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তুলে ধরেন। আদর্শ এবং তার সাধন ব্যাখ্যার জন্য তাকে লিখতে হোলো 'ধর্মতত্ত্ব', 'দেবী চৌধুরাণী' কিংবা 'আনন্দমঠ'। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক সঙ্কটের প্রেরণায় যে আদর্শ তিনি গড়লেন তার সঙ্গে কি সমগ্র দেশের সংযোগ ছিল? মনে হয়, স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, কারণ সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন না।

ক্ষুদ্র পরিসরে আমার অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান নিয়ে এই বিচার রাখা গেল। আমি জানি আমার সব কথা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেনা, কিন্তু এইভাবে একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক নিরিখে উনবিংশের সূচনা ও বঙ্কিমের আবির্ভাবকে দেখার চেষ্টা হয়ত একেবারে নিরর্থক না হতেও পারে।

---

*The Bengali intellectual Tradition : Article on Bankim Chandra By Bhola Chatterjee

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিকসত্তা ও প্রকাশভঙ্গী

ডঃ আসাদুজ্জামান

(ক) সাহিত্যিকসত্তা ঃ

একথা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসত্তায় প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁর বিশেষ মতাদর্শ। এই মতাদর্শের স্বরূপ-অনুধাবনের ব্যর্থতার ফলে কোন কোন মহলে তিনি রক্ষণশীল এমন কি সাম্প্রদায়িকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। অথচ একথা এখন ভাবার সময় এসেছে উনিশ শতকীয় মানবতাবাদের মহান রূপকার, আধুনিক উপন্যাসের বন্দীত্বমোচনের বিপ্লবী পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ মতাদর্শ কোন ধর্মীয় 'পথ্যপ্রদান' নয়, বরং সাহিত্যবোধ ও শিল্পপ্রকরণের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এক প্রয়োজনীয় সহায়ক শক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা তাঁর সমাজচিন্তার পরিপূরক। তাঁর সমাজচিন্তায় চিত্ত-শুদ্ধির ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার জানিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে।' (বিবিধ প্রবন্ধ, চিত্তশুদ্ধি, পৃ—১১৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তায় প্রতিফলিত এই বিশেষ অনুশীলন নির্ভর উৎকর্ষটি, কমলাকান্তের নিভৃত কথনে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুষমা লাভ করেছে, 'পরের জন্যে তোমার হৃদয়-কুসুম প্রস্ফুটিত করিও।' (কমলাকান্তের দপ্তর, একা, পৃঃ ৩)

লক্ষণীয়, এই চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে কোন বিশেষ ধর্মীয় চেতনা, যা পরলৌকিক মুক্তি কামনার পথ, তার কোন যোগ নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ ইহলৌকিক, কল্যাণ-চেতনা প্রসূত, এবং চিত্তবৃত্তির সার্বিক অনুশীলনের ফল। তাই বঙ্কিম একজন বৈজ্ঞানিকের মত চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন, 'চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয়-সংযম ইতি-বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে।' (ধর্মতত্ত্ব, চিত্তশুদ্ধি, পৃঃ ১১৩)

অবশ্য এই চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে ধর্মরক্ষার্থ শব্দটি সংযোজিত হলেও এ ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, বরং 'ঐশিক নিয়ম'। বঙ্কিমচন্দ্র তাই নেতিবাচক লক্ষণ নির্ধারণ করে বলেছেন, 'আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহার ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই।'—(চিত্তশুদ্ধি, পৃঃ ১১৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা সমার্থক, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম হলো মানবধর্ম। তাঁর মতে মানবধর্ম অর্জিত হতে পারে নিষ্কামকর্ম সাধনায়।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা, পৃঃ ৫৪)

সুতরাং চিত্তশুদ্ধির বিষয়টি একান্তভাবে ইহলৌকিক, এবং ক্রম উৎকর্ষের নীতি অনুসারী—'সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি, সেই আদর্শ, সেই কামনা, কবির সামগ্রী।' (ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব, পৃঃ ৩)

সুতরাং, চিত্তশুদ্ধি অনাবশ্যক নৈতিকতা না হয়ে সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যেতে পারে কীভাবে এই চিত্তশুদ্ধির তাৎপর্যটি প্রতিটি পর্যায়ে একটি অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে। প্রথম পর্যায়টি সম্পন্ন হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী রচনাসমূহ, অর্থাৎ, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী'তে।

দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম দৃশ্যটি পরীক্ষা করা যাক্। এখানে শুরুতে যাকে দেখা যায়, তিনি দুর্গম পথের অভিযাত্রী এক অশ্বারোহী তরুণ। অসামান্য সমরনৈপুণ্য এবং সাহস তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, স্বেচ্ছাচারিতায় নয়, বরং ইন্দ্রিয়-দমন এবং পরহিত কামনায়।

অন্ধকার মন্দিরে নারীকণ্ঠের কথোপকথনে, তরুণ জগৎসিংহের প্রতিক্রিয়া, তাই যেমন বীরত্বব্যঞ্জক তেমনি নারীর প্রতি সম্ভ্রমময়। "এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না, বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও তবে ফলভোগ করিবে আর যদি স্ত্রীলোক হও তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।' (দুর্গেশনন্দিনী, পৃঃ ৪) এবং এই উক্তির পশ্চাতে যে-চিত্তবৃত্তির অনুশীলন রয়েছে, তার স্বভাব সৌন্দর্য্য জগৎসিংহের দৈহিক গঠণকে দিয়েছে এক অলৌকিক শ্রী। সুতরাং নায়িকা কর্তৃক নায়কের প্রথম দর্শনে গুণমুগ্ধতার সঙ্গে মিশেছে রূপমুগ্ধতা; 'কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে-দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রী-সম্পাদক হইয়াছে।' (পৃঃ ৪).

'মৃণালিনীতে'ও হেমচন্দ্রের পরার্থপরতা, তার দেহরূপকে সুষমা দান করেছে। শত্রু সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি হস্তী পদতলে পিষ্ট হওয়ার মুহূর্তে অভাবিত তৎপরতায় হেমচন্দ্র তাকে বধ করলে, শত্রু-সেনাপতির কাছেও তার দেহরূপ অসামান্য সুষমা লাভ করে। 'শরীর ঈষৎমাত্র দীর্ঘ এবং অনতিস্থূল এবং বলব্যঞ্জক। মস্তক যেমন পরিমিত হইলে শরীরের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়।'

(পূর্বসংস্করণে মৃণালিনী পৃঃ ১৯)

লক্ষণীয় চিত্তশুদ্ধির বিষয়টি এসব ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত শ্রী সম্পাদক হয়ে উঠে অনেক সময় দেহ-কাঠামোর অসঙ্গতি দূর করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় রোমান্সধর্মী রচনা 'কপালকুণ্ডলা'তেও চিত্তশুদ্ধির সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। সূচনায় দেখা যায়, একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে যুবক নবকুমার তীর্থ থেকে ফিরে আসছেন, তীর্থদর্শনের পারলৌকিক পুণ্যে আশ্বস্ত হয়ে নয়, বরং নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের তাৎক্ষণিক উপলব্ধির সম্পদে আস্থাবান হয়ে। তীর্থদর্শন যে নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়

আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, তা তিনি প্রাচীনপন্থী তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বচসায় প্রকাশ করেছেন। 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।' (কপালকুণ্ডলা, পৃঃ ২)

নবকুমারের এই বোধ যে আদৌ অহমিকাপ্রসূত নয়, বরং পরার্থপরতায় দীক্ষিত চিত্তশুদ্ধির প্রকাশ তার একাকা কাষ্ঠাহরণ এবং সঙ্গীকর্তৃক নির্জন সৈকতে পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ফলতঃ শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' (ঐ পৃঃ ৫) লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে 'চিত্তশুদ্ধি' যে নেহাৎ ব্যক্তিগত অনুশীলন এবং আদৌ সমাজ-সাপেক্ষ নয় সে অভিমত দান করেছেন, এবং নায়কের এ ধরণের চিত্তশুদ্ধির উৎসে তার সৌন্দর্যবোধকে স্থাপন করে', চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যের সংযোগসাধন করেছেন।

প্রথম পর্বে চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যের এই যোগটি দ্বিতীয় পর্বে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে এসেছে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর এবং রজনী। বঙ্কিমচন্দ্রের পদচারণা ঘটেছে রোমান্সের রহস্যময় জগৎ থেকে নির্গত হয়ে, নিকটতর সময়ের বাস্তবতায়। সমাজ পরিবেশে ইন্দ্রিয় অসংযমের সর্বনাশা যে রূপটি তিনি অবলোকন করেছেন এসময় তিনি তার উচ্ছেদের পথ অনুসন্ধান করছেন। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি বলেছেন, 'যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয় পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়া চেষ্টা প্রবল। অনুশীলনের দোষে হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে। দাহ নিবারণের জন্যে তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু জানেনা যে অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।' (ধর্মতত্ত্ব, পৃঃ ১৯) লক্ষণীয়, এই পর্যায়ে অঙ্কিত ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলিতে এই যন্ত্রনাকাতর আর্তনাদ বারবার শোনা গেছে। তারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে জল সন্ধান করেছে, তা তাদের যন্ত্রনা বর্ধিত করেছে মাত্র। এইজন্যে 'বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রের পুনর্মিলন কিংবা কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কোন কিছুই তাদের চিত্তজ্বালা নিবারণে সহায়ক হয়নি। অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে, 'চন্দ্রশেখরের' প্রতাপের দেশের জন্যে আত্মবিসর্জন কিংবা রজনীর অমরনাথের জ্ঞানান্বেষণে এই ব্যর্থতা তাদের চিত্তের অসংযম জনিত ব্যর্থতা, যা তাদের 'শ্রান্তি ক্লান্তি মনস্তাপ'কে অনিবার্য করে তুলেছে। অন্যদিকে চিত্ত শুদ্ধির বিরল সার্থকতা এসেছে যেসব চরিত্রে তারা প্রতিকূলতা প্রতিরোধক শক্তি লাভে সমর্থ হয়েছে।

'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে স্বহস্তে আপন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে, কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর স্বামীর অধঃপতনকে মার্জনা না করে, তার আত্মবিনাশকে অনিবার্য করে তুলেছে। আবার দাম্পত্য প্রেমে নিষ্ঠাবান চন্দ্রশেখর পত্নীর প্রতি অনুরাগে প্রিয় গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত করেছেন এবং রজনীর লবঙ্গলতা ঋষিতুল্য নায়ক অমরনাথকে প্রত্যাখ্যান করেছে! এ সবই ঘটেছে যে চিত্তশুদ্ধির কারণে, তার অসম্ভাবে শক্তিহীনতা এবং সদ্ভাবে শক্তির বিকাশ প্রামাণিক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় চিত্তশুদ্ধি তার পরম পরিণতি, আধ্যাত্মিক মহিমার সার্থকতা লাভ করেছে। এই পর্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'।

'আনন্দমঠ'-এ অনুশীলন-নির্ভর মানবধর্মকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছেন। 'আনন্দমঠ' এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যবৃন্দ সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। তারা সবাই যে আনন্দ অন্বেষী তা শুধু নির্বিকার নামগান লব্ধ নয়, বরং সুপরিকল্পিত কর্মযজ্ঞের সার্থক ফলশ্রুতি। এই কর্মযজ্ঞের আহ্বানে তারা কখনো অহিংস, কখনো সহিংস। কখনো বৈষ্ণব, কখনো শাক্ত ,কখনো নামাবলী সজ্জিত, কখনো বা লাঠি তলোয়ারধারী। তাদের কর্মযজ্ঞের মহিমা সার্থক হয়ে উঠেছে সত্যানন্দ চরিত্রে। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বিমোহিত কল্যাণী তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তায় আস্থাবান হয়ে উঠেছে প্রথম সাক্ষাতেই। 'কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, আপনি ইহাতে পদরেণু দিন। ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জলস্পর্শ করিলে, কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন আমি অমৃত পান করিয়াছি, আর কিছু খাইতে বলিবেন না।' (—আনন্দমঠ, পৃঃ ১০)

লক্ষনীয়, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে-পটভূমিটি গৃহীত হয়েছে, সেখানে ক্ষুধার কবলে মানুষ প্রায়শঃই পরিণত হয়েছে পশুতে, এমনকি তারা কেউ কেউ যখন মানুষের মাংস ভক্ষণে দ্বিধাহীন, তখন একজন অভুক্ত নারী সামান্য পদরজ পান করে ভুলে যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা অমৃতের উপলব্ধিতে। এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে চিত্তশুদ্ধির আধ্যাত্মিক বিকাশে। কল্যাণীর দাম্পত্য প্রেম তার স্বামীর কল্যাণ কামনায় সদা উন্মুখ, এই অনুশীলিত আদর্শ তাকে দান করেছে যে ইন্দ্রিয় সংযম তা তার যেমন ক্ষুধা দূর করেছে, তেমনি সাধক-সান্নিধ্যের মহিমা উপলব্ধির সামর্থ্যদান করেছে। অথচ, এই কল্যাণীই অপর সন্তান ভবানন্দকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই চিত্তশুদ্ধির অক্ষমতার জন্যে। 'ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিলেন দিব। আমি মরিয়া গেলে আমাকে মনে রাখিবে কি? কল্যাণী বলিলেন, রাখিব ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া মনে রাখিব।' (আনন্দমঠ, পৃঃ ৪৭)

ভবানন্দের ব্যর্থতা যে-ব্রতচ্যুতিতে, সত্যানন্দের সার্থকতা সে-ব্রতের সার্থক উদযাপনে। তাই, দেশোদ্ধারের ব্রত আমৃত্যু পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ সত্যানন্দের শেষ উক্তি—'মা থাক এইখানে এই মাতৃ প্রতিমা সম্মুখে দেহ ত্যাগ করিব। (—পৃঃ ৬৯) এই স্বেচ্ছামৃত্যু তাঁর যে অভিমান প্রসূত তার পিছনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি আমৃত্যু সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি সক্রিয় থেকেছে। সে সংগ্রামে বিদেশী মুসলিম শাসক এবং ইংরেজ সমানমূল্য লাভ করেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর প্রতি এই সমদর্শিতা শুধু ভবানন্দের নয়, তার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রেরও। উল্লেখ্য এই সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগটিকে সার্থক ভাবে খণ্ডন করে।

'দেবী চৌধুরাণী'তে চিত্তশুদ্ধির মহিমা নবরূপ লাভ করে। এর উৎসারণ ঘটেছে অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশে, স্বামী পরিত্যক্তা একটি অসহায় কিশোরীর কুটিরে। "মা বলিল, 'যা না ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।' প্রফুল্লমুখী বলিল,

'আমি পারিব না, আমার চাইতে লজ্জা করে।' মা: 'তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছুই নেই।' প্রফুল্ল—'তা শুধু ভাত খাব, রোজ রোজ চেয়ে চেয়ে খাব কেন গো।' ব্যক্তিত্বের বিকাশের যে রূপটি বঙ্কিমচন্দ্র কিশোরী প্রফুল্লের পরানুগ্রহ বর্জনের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন, তার পরিণামী মূর্তি এসেছে দেবী চৌধুরাণী কর্তৃক দরিদ্র জনসাধারণকে সম্পদ বিতরণে। 'এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একপ্রহর রাত্রি হইল, তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ অন্য ডাকাইতি নহে।' (পৃ ৪৯) এ মূর্তি সম্ভব হয়েছে, যে অনুশীলনে তা তার চিত্তসংযমকে সাধকজনোচিত মহিমা দান করেছে। অন্যদিকে ব্রতপালনের সার্থকতায় মহিমাময়ী হয়ে উঠেছে সীতারামের শ্রী এবং জয়ন্তী। তাদের বীরত্বে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সীতারাম শেষযুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছে, কিন্তু তারা পরাজিত সীতারামের পাশে থেকে পুরুষের শোভা বর্ধনের চিরাচরিত মানসিকতা পরিত্যাগ করেছে। উপন্যাসের উপসংহার এসেছে এভাবে 'জয়ন্তী ও শ্রী সীতারামের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল কেউ জানিল না।' (পৃঃ ৮০) এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধির যে মহিমা বিকীর্ণ করেছেন; তা সন্ন্যাস-ধর্ম পালনের সার্থকতাকে নবরূপ দান করেছে। এ সন্ন্যাস নিছক সংসার ত্যাগ নয়, বরং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে প্রভুত্বে উপনীত হওয়া। বিংশ শতকীয় রমণীর জন্মলগ্ন এই চেতনার দ্বারাই সূচিত হয়েছে।

এ ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র যে নবনৈতিকতাকে তার সাহিত্য-সত্তার মূলে ধারণ করেছেন, তা চিত্তশুদ্ধিরূপে, সৌন্দর্যে, শক্তিতে ও অধ্যাত্মমহিমায় ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়ে তাঁর সাহিত্যসত্তাকে জীবনমুখী বিবর্তন দানে সমর্থ হয়েছে।

(খ) প্রকাশভঙ্গী ঃ

যে কোন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায় প্রকাশভঙ্গী তার সাহিত্যসত্তার অনুসারী হয়। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যসত্তার বিবর্তন তাঁর প্রকরণকেও অবলম্বন করে। সেদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রকরণ তাঁর সাহিত্যসত্তার, তথা বিশিষ্ট মতাদর্শের দ্বারা সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তশুদ্ধি-চেতনা যখন সৌন্দর্যমূল তখন তাঁর শিল্পপ্রকরণে এসেছে অতিঅলঙ্কৃত, সংস্কৃত-অনুসারী সমাসবহুল দীর্ঘ বাক্যের ঐশ্বর্য।

'দুর্গেশনন্দিনী'র সূচনায় নায়ক জগৎসিংহের আচরণ এবং সংলাপ যে গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা সমাসবহুল অলঙ্কৃত এবং পল্লবিত। 'পথিক তখন বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা এবং ঝটিকা প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্বার কহিলেন, ...আর যদি নারী হও তবে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাও, রাজপুত হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। (পৃঃ ৪) লক্ষণীয়, চিত্তশুদ্ধিজনিত যে সৌন্দর্য এখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করতে চান, তাকে রূপ দিয়েছে ভগ্নার্গল, আত্মশরীর, নিশ্চিন্ত, রাজপুত, অসিচর্ম ও কুশাঙ্কুর প্রভৃতি ধ্বনিময় সমাসবদ্ধ পদ: পথিক, ঝটিকা, যোজনা, বিশ্রাম প্রভৃতি সমমাত্রিক শব্দ-সমাবেশ পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। 'পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়া'

এই সাদৃশ্যটি যে উপমেয়কে গ্রাস করে স্থান পেয়েছে তা হলো সামান্যতম শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ। এক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারটি সুপ্রযুক্ত হয়ে পরিস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

উল্লেখ্য পরিস্থিতি রূপায়ক শব্দবিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে সঠিকভাবে রূপ দিয়েছে। নায়ক যখন কংকণ ঝংকার শুনে অনুমান করেছে মন্দিরে নারীর উপস্থিতি, তখন ভগ্নঅর্গলের অনিরাপত্তায় সে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে তার তৎপরতা প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি স্তরে। (ক) ঝটিকা প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্ম দুয়ার রুদ্ধ করার প্রয়োজন উপলব্ধি। (খ) অর্গল ভগ্ন থাকায় সেক্ষেত্রে নিজের শরীর ব্যবহার। (গ) বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করেও নীরব না থাকা এবং মন্দিরের ভিতর রমণীদের আশ্বস্ত করায় জন্যে আত্মপরিচয় দান। এবং (ঘ) সর্বোপরি পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাটি উল্লেখ করে। অপরের স্বস্তি বিধানের যে প্রেমময় উৎসুকতা সৃষ্টি করেছে তা শুধু নায়ককে নয়, নায়িকাকেও স্পর্শকাতর আন্তরসত্তার উদ্ভাসনে শ্রীমতী করে তুলেছে।

'কপালকুণ্ডলায়' দেখা যায়, বনদুহিতা সমুদ্রকন্যা কপালকুণ্ডলা বিপুল হৃদয়ের একজন মানবী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির মত নিস্পৃহ এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে নির্বিকার। এই নির্বিকার উদাসীনতার সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে এই বিবরণে 'কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন, তুমি আমার উপকার করিয়াছ কিনা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা ধনসম্পত্তি দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। তোমার মানস সিদ্ধ হউক। কালি হইতে বিঘ্নকারীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম আবার বনচর হইব। (কপালকুণ্ডলা, পৃঃ ৪৫) লক্ষণীয়, কপালকুণ্ডলার স্বভাবসৌন্দর্য তার মিত আচরণ এবং স্বল্পভাষণে উন্মোচিত হয়েছে। স্মরণীয় যে, সমুদ্রদুহিতা কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে এক বছরেরও বেশী দাম্পত্য সম্পর্ক পালন করেছে! তার সমুদ্রহৃদয় অপরের দুঃখে কাতর হলেও ভালোবাসার স্পর্শ বঞ্চিত। লেখক কপালকুণ্ডলা কর্তৃক অন্তরে দৃষ্টিপাত এবং সেখানে নবকুমারের অস্বাভাবিক অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে তার আভাস দিয়েছেন। এই আভাসমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বিধৃত হয়েছে। স্বল্পভাষী কপালকুণ্ডলার স্বভাবের সঙ্গে এই স্বল্পভাষণ সঙ্গতিপূর্ণ। এমনকি কপালকুণ্ডলার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সংলাপটি এখানে উপস্থিত হলেও মাত্র চারটি বাক্যে তা সম্পন্ন। এই বাক্যসমূহে স্তরে স্তরে কপালকুণ্ডলার স্বভাব সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। প্রথম বাক্যে কৃতজ্ঞতার দাবী নিয়ে উপস্থিত অনুচিত কাজের প্ররোচনাদানকারী লুৎফউন্নিসাকে কপালকুণ্ডলা তার সংশয়ের কথাটি বলেছে, মাত্র দশটি শব্দে। দ্বিতীয় বাক্যে আর সংশয় নেই, আছে ঔদাসীন্য। সে ঔদাসীন্য অধিকাংশ মানুষের পার্থিব বিষয়-চেতনার প্রতি। এই পার্থিবতার প্রতিনিধি হয়ে এসেছে, অট্টালিকা ধনসম্পত্তি দাসদাসী প্রভৃতি সুপ্রযুক্ত শব্দাবলী।

তৃতীয় বাক্যটি কপালকুণ্ডলার পরার্থচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার আত্মস্বার্থ বিসর্জনের সংকল্পকে রূপ দিয়ে। এক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলা নিজেকে 'বিঘ্নকারী' শব্দে-চিহ্নিত করায় তাঁর সমাজচেতনার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। চতুর্থ বাক্যে দুবার 'বনচর' শব্দের প্রয়োগে কপালকুণ্ডলার প্রাক্তন জীবনের মাধুর্য এবং বর্তমান জীবনের আশ্রয়-অন্বেষার কাঙ্ক্ষিত পরিণামটি পরিকল্পিত হয়েছে। এবং সর্বত্রই সক্রিয় থেকেছে কপালকুণ্ডলার নৈতিক সৌন্দর্য, যা সুনির্বাচিত শব্দাবলীর দ্বারা রূপায়িত হয়েছে।

মৃণালিনীর গদ্যে সৌন্দর্য যেন লাবণ্যে পরিণত হয়েছে। এ গদ্য অপল্লবিত অথচ পুষ্পিত, অনলঙ্কৃত অথচ হৃদয়াবেগ উদ্বেল কথকতায় পূর্ণ।

"মনোরমা : পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালোবাসিবে। প্রণয় জন্মিলেই তাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য। তাই, যে ভালো তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালোবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। (পৃঃ ৩৯) মনোরমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রেক্ষাপট বিচার করলে এই উক্তির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনোরমা হেমচন্দ্রকে নয়, পশুপতিকে ভালোবাসে। পশুপতি নীতিভ্রষ্ট এবং পাপী। তবুও সে মনোরমার স্বামী। নারীর জন্যে স্বামীকে ভালোবাসায় রয়েছে সুনীতির সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য পাপী স্বামীর ক্ষেত্রেও বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ নয়।

'মৃণালিনী'র গদ্যে লক্ষণীয় হয় সমাসবদ্ধ পদের পরিবর্তে সন্ধিযুক্ত পদের প্রাচুর্য। এই শব্দসমূহ মূলতঃ বক্তব্যের চালিকাশক্তি প্রণয়ের আদ্যাক্ষর অনুগামী। অনুপ্রাসের এই নিয়ন্ত্রণটি এখানে চমকপ্রদ। যেমন, প্রণয়ের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পাপাসক্ত পাত্রপাত্রী প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ যেমন আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি প্রণয়মূল আচরণের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। লক্ষণীয়, এখানে একটি অলঙ্কার না থাকলেও হৃদয়বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সমাজ-সংগঠক শক্তিরূপে চিত্তশুদ্ধির প্রশ্নটি বিশেষ বিকাশ লাভ করেছে, তখন প্রকরণের অনুসারী রূপটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, 'সূর্যমুখী হাসিয়া বলিলেন আমি কে? মৃদু ক্ষীণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্ন মেঘ যেমন বিদ্যুৎ হয়, তেমনি হাসিয়া উত্তর করিলেন আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস, সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস। তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাহার সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন সুখের আশায় তাহাকে অসুখী রাখিব?' (বিষবৃক্ষ, পৃঃ ৪৬)

লক্ষণীয়, এই বিবরণে প্রশ্নাত্মক বাক্যে প্রথমতঃ সূর্যমুখীর আত্মপরিচয় অন্বেষা ও আত্মজিজ্ঞাসা থাকলেও তা তার আত্মতৃপ্ত মনের শক্তি প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। অলঙ্কৃত বাক্য একটি মাত্র। সেক্ষেত্রে অলঙ্কার প্রয়োগ অপূর্ব কুশলতার স্বাক্ষরবাহী। সূর্যমুখীর হাসির উপমা 'ছিন্নমেঘে বিদ্যুৎ'। এই সাঙ্গ রূপকটি সুপ্রযুক্ত যেহেতু তা সূর্যমুখীর দেহ ও মনের তাৎক্ষণিক রূপ প্রকাশ করেছে। সূর্যমুখী পত্নীর একাধিপত্য হারিয়ে ছিন্নমেঘের মত নিঃস্ব হয়ে গেলেও আনন্দের অধিকার হারায়নি,

যেমন হারায় না ছিন্নমেঘ বিদ্যুতের সম্পদ। সুতরাং আনন্দের বহিঃপ্রকাশে যে-হাসি, তা এসেছে বিদ্যুতের মত। তা অস্থায়ী হলেও বিষাদের অন্ধকার অপসারণ করে মুহূর্তেই। এক্ষেত্রেও সূর্যমুখীর কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি যে-আত্মতৃপ্তি, তার বিবরণে, আপাত রিক্ত সূর্যমুখীর গোপন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারটি উন্মোচিত হয়েছে। সুপ্রযুক্ত গদ্যে এবং চমকপ্রদ অলঙ্কারে উপস্থাপিত এই রূপটি চিত্তশুদ্ধির যে-মানসিক শক্তি সম্ভব করে তোলে, তাকে বাঙময় করে তুলেছে।

গদ্যের এই শানিত প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ। ভ্রমরের মৃত্যু-দৃশ্যের বর্ণনাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "দুইজনই কাঁদিতেছিল, একজনও কথা কহিতে পারিল না। ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল, গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু মাথায় দিল। বলিল, আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই। (কৃষ্ণকান্তের উইল, পৃঃ ৬১)

ভ্রমর সতী নারী। অভিমান সত্ত্বেও আমৃত্যু দাম্পত্য প্রেমে সে অবিচল। তার চিত্তশুদ্ধির সাফল্য দূরাগত এবং পাপিষ্ঠ স্বামীকেও শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত করেছে। স্বামীর কাছে তার প্রত্যাশা ইহজীবনের অচরিতার্থ সুখ। একটি জীবন তার নষ্ট হয়ে গেলেও আরেকটি জীবন যেন তার সফল হয়। পাপিষ্ঠ স্বামীকেও সে দেবতা মনে করে। তাই তার আশীর্বাদ তার আন্তরিক প্রত্যাশা। স্তরে স্তরে বিকশিত গদ্যে এই শেষ কামনাটি পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। এ গদ্যে প্রথমে নীরব রোদন, তারপর ভাষাহীন ইঙ্গিতে, এসেছে নৈকট্যের আহ্বান। নৈকট্য ঘটেছে তাও দ্রুত নয়, বিলম্বিত এবং পর্যায় ক্রমিক। এই দ্বিধান্বিত আচরণ যেমন গোবিন্দলালের মত পাপিষ্ঠ স্বামীর অপরাধ বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যময় তেমনি তার চিত্রময় প্রকাশে বঙ্কিম প্রকরণ এখানে শীর্ষস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের সংক্ষিপ্ত সংলাপে তার ইহজীবনের মরুতৃষ্ণা এবং প্রাণান্তকর অতৃপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এবং সমস্ত প্রকরণের প্রাণমূলে কাজ করেছে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের চালিকা শক্তি, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির অন্তর্নিহিত শক্তি।

'চন্দ্রশেখর'-এর শেষদৃশ্যে গদ্য হয়ে উঠেছে এমনই তীব্র প্রবহমান এবং শীর্ষমুখী। 'যাও প্রতাপ, অনন্তধামে যাও। যেখানে ইন্দ্রিয়-জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্যে পরকে মরিতে হয় না সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও। শত শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালোবাসিতে চাহিবে না।' (চন্দ্রশেখর, পৃঃ ৭২)

লক্ষণীয়, হ্রস্বতর বাক্যাংশের সমন্বয় রূপায়িত হয়েছে এখানে মূল বাক্যটি। বক্তার আবেগকে শীর্ষস্পর্শী করার জন্যে এই খণ্ডিত অংশ সমূহ সিঁড়ির মত সংযোজন করা হয়েছে। স্মরণীয়, প্রতাপের জিতেন্দ্রিয়তা এবং দেশপ্রেম যে চিত্ত শুদ্ধির শক্তিকে সার্থক করে তুলেছে, তার পুরস্কার ইহলোকে নিয়তির চক্রান্তে সে লাভ করতে সমর্থ হয়নি। ইহলোকের এই প্রবঞ্চনার যন্ত্রনা পরলোকে নেই। তাই স্বর্গের যে গুণগুলি এখানে চিহ্নিত হয়েছে,

তার মূলে রয়েছে প্রবঞ্চনাহীনতা। বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে স্বর্গের এই বিশেষ রূপটি উদ্ভাসিত করেছেন; এবং 'মহৈশ্বর্যময়' এই দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদটি অকস্মাৎ ব্যবহার করে' স্বর্গের অদ্বিতীয় ও অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে আদ্যক্ষরে 'ম' এসেছে, সম্ভবতঃ মমতারূপিনী প্রেমের বিকল্প হিসেবে। সুতরাং শত শৈবলিনীর প্রতি মমতা স্বর্গে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চিত্ত শুদ্ধিজাত শক্তির প্রেক্ষিতটি যেমন ইহলোকে নির্ধারিত হয়েছে, তেমনি পরলোকেও তার অক্ষুণ্ণ শক্তির রূপটি এই গদ্যে নিশ্চিত রূপ লাভ করেছে।

তৃতীয়স্তরে যখন সকল নদী হয়ে গেছে সমুদ্র, তখন সৌন্দর্য ও শক্তি পেয়েছে আধ্যাত্মিকতার অমল মহিমা। সুতরাং ভক্তি এসে মিশেছে জ্ঞানের প্রবাহে। মোহনায় তরঙ্গ তীক্ষ্ণ, অথচ সংহত, আভাসিত অথচ প্রমূর্ত। বঙ্কিমের গদ্য শৈলী এখানে তাই, প্রখর অথচ ঋজু, নিরাভরণ অথচ অলঙ্কৃত। 'আনন্দমঠের' উপসংহারে যখন সত্যানন্দ দেশোদ্ধারের ব্রত সম্পন্ন করে পরলোক যাত্রী হয়েছেন, তখন মহাপুরুষের সঙ্গে তার মিলন দৃশ্যটি এখানে প্রকরণের পরিণতিকে চিহ্নিত করে। যেমন, 'সেই গম্ভীর বিষ্ণু মন্দিরে, প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে ক্ষীণালোকে সেই মহা প্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে। ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে। কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি, এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।' (আনন্দমঠ পৃঃ ৬৯)

স্মরণীয়, সত্যানন্দের আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠার পিছনে যে অনুশীলন ব্রত কাজ করেছে, সত্যানন্দের ব্যক্তিগত জীবনে তার সিদ্ধি ঘটেছে। এই সিদ্ধির চিত্রায়ণে, চিত্ত শুদ্ধির আধ্যাত্মিক মহিমাটি অপ্রাকৃত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, প্রকরণের চূড়ান্ত সাফল্যে। গদ্য এখানে অলঙ্কৃত অথচ নিরাভরণ, সংহত অথচ তীক্ষ্ণ, এই বৈপরীত্য জাত সমন্বয় সৃষ্টি করেছে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দাবলী ও কাব্যরীতি এবং বাকরীতির সামঞ্জস্যময়তা।

অলঙ্কার প্রয়োগেও সক্রিয় থেকেছে বৈপরীত্য উৎসারিত এই বিশেষ নীতিটির সাফল্য। গম্ভীর বিষ্ণু মন্দিরে নীরব চতুর্ভুজ মূর্তির পরিবর্তে এখন দৃশ্যমান দুই সরস রক্তমাংসের মূর্তি, মহাপুরুষ এবং সত্যানন্দ। উভয়েই চরিত্রের বিকাশে এবং অনুষ্ঠেয় কর্মে দেবদুর্লভ সার্থকতার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মানব অন্বেষা এখানে এই দুই মূর্তির মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। এ সার্থকতায় জ্ঞান এসে মিশেছে ভক্তির সঙ্গে, সম্পন্ন করেছে একটি পূর্ণ প্রবাহ, যেখানে উপন্যাসের দুই রমনীমূর্তি প্রতীকি রূপ লাভ করেছে। এতে তাদের চরিত্রের বিশেষত্ব যেমন নব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, তেমনি বঙ্কিম-অন্বিষ্ট মহামানবের স্বরূপ নির্ধারণ করেছে। এই আদর্শ মানব যখন তার অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পন্ন করে, তখনই প্রয়োজন হয় বিসর্জনের। 'তাই প্রতিষ্ঠার পরিণাম বিসর্জন' প্রতিষ্ঠার পরে বিসর্জন শব্দটি প্রয়োগ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারণার সার্থক রূপ দিয়েছেন। এছাড়া, মহাপ্রতিভা পূর্ণ, ক্ষীণালোক, পুরুষমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, চতুর্ভুজ, প্রভৃতি সমাসবদ্ধ এবং

সন্ধিযুক্ত শব্দ সমূহ একত্রে উপস্থিত করে এবং পূর্বাপর উপকরণগুলির সমন্বয় সাধন করে, বঙ্কিমচন্দ্র এই গদ্য প্রকরণকে পরিণতি দান করেছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'তে স্বামী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাতের পর দেবী চৌধুরাণীর পরিণামী রূপান্তর ঘটে প্রফুল্লে। গৃহিনী ব্রতপালন করে সন্ন্যাসী হলেও, সন্নাসী ব্রতপালন শেষে গৃহিনী হয়ে একটি চক্র পূর্ণ করেছে। এই চক্রের পূর্ণতায়, গৃহিনীর নিরাভরণ সুষমার যে অবদান, তা ব্যঞ্জিত হয়েছে সমুন্নত শৈলীতে। 'স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মোটা শাড়ি। কপাল ও বুক গঙ্গা মৃত্তিকায় চর্চিত করিল রুক্ষ ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে-সৌন্দর্য বাহির হইল, গতরাত্রের বেশভূষা, জাকজমক, হীরামতি, চাঁদনী বা রাণীগিরিতে তা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল, আজ গঙ্গা মৃত্তিকা শয্যায় দেবতার মত দেখাইতেছে।

('দেবী চৌধুরাণী', পৃঃ ১৭)

লক্ষণীয়, রাজরাণী-র পর দেবী নয়, দেবতা শব্দটি গৃহীত হয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির দেবী চৌধুরাণীর উপমা হিসেবে। দেবী চৌধুরাণী হিসেবে তিনি ঐশ্বর্যময়ী, প্রজাপালক সেজন্যে তার উপমান রাজরাণী অন্যদিকে গৃহিনী হিসেবে তার ভূমিকা প্রজাপালিকা না হলেও, গৌরবে এবং মর্যাদায় তা দেবতার মত। দেবীর মত নয়, কারণ ইতিমধ্যে তিনি দেবী চৌধুরাণীতে যে-ব্যক্তিত্ব ধারণ করেছেন তা পুরুষ সুলভ, তাই দেবী চৌধুরাণী পর্যায়ের আগের প্রফুল্ল এবং পরবর্তী প্রফুল্লের সূক্ষ্ম ভিন্নতার জন্যে এই লিঙ্গান্তর ঘটেছে। অন্যদিকে নারী জীবনের সার্থকতা নির্ধারিত হয়েছে, শুধু রাজকার্যে নয় সংসার কর্মে। এই আবহমান সত্যটিকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যে 'রাজরাণী'র চেয়ে অধিকতর উৎকর্ষতা ব্যঞ্জক 'দেবতা' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। এই সংসার ধর্ম পালনের রূপক হিসেবে কিছু ব্রতমূলক কার্যাবলী শব্দ-বিধৃত হয়েছে; যেমন—স্নান করা, ভিজা কাপড়ে থাকা, কপাল ও বুক গঙ্গা মৃত্তিকায় লেপন করা ইত্যাদি। এসব ব্রত যে নিজস্ব উজ্জ্বলতায় হীরা চাঁদনীকে অতিক্রম করতে পারে, শব্দ প্রয়োগের সার্থকতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে, যে কথাটি অনুল্লেখ থাকলে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হল বঙ্কিম-প্রকাশভঙ্গীর এই চূড়ান্ত রূপটি আর যে-উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে, তার নাম 'রাজসিংহ'। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজনন্দিনী জেবউন্নিসার মর্মদাহের চিত্রটি সার্থক শিল্প সুষমা লাভ করেছে। ইতিহাসের রথচক্রতলে পিষ্ট মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন, এখানে যে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে তা বিপরীত প্রতিভাসে চিত্তশুদ্ধির সৌন্দর্য শক্তি ও মহিমাকে গুরুত্ব দান করেছে। গদ্য এখানে যেমন প্রবহমান তেমনি শীর্ষস্পর্শী। "সম্মুখে দুই নক্ষত্রখচিত গগনস্পর্শী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয় সাগরের জল—তাহাতে দীপমালা প্রভাসিত পটনির্মিতা মহানগরীর মনমোহিনী ছায়া —দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার, দুইজনে বড অন্ধকার দেখিল। (রাজসিংহ, পৃঃ ৯৫)

লক্ষণীয়, এই প্রকরণে প্রথম স্তরের তৎসম বহুল সমাসবদ্ধ পদের যেমন পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি এসেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সহজতা ও সাবলীলতা। সৌন্দর্যের সঙ্গে

এখানে সম্মিলিত হয়েছে শক্তি এবং দার্শনিকতা। অনেক রূঢ়তা এবং বঞ্চনার অভিজ্ঞতার পর নায়ক এসে মিলেছে নায়িকার সঙ্গে। তাদের প্রাথমিক মোহাঞ্জন খসে গেলেও, দুর্মর মন-মোহিনী ছায়া এখনও বর্তমান। 'প্রলম্বিত এই ছায়া' অনিবার্য বিনাশের সংকেতবাহী। আশাহীন, ভরসাহীন এই ভবিষ্যৎ তাদের সম্মুখস্থ দীপাবলীর আলোকের অধিকারকে তাই বাধা দেয়। তারা যা দেখে, তা শুধুই 'অন্ধকার'। লক্ষণীয়, অন্ধকার শব্দটি তিনবার ভিন্ন তাৎপর্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমবার তার অবস্থান সমতলে প্রবাহিত উদয় সাগরের জলের কৃষ্ণবর্ণ বোঝানোর জন্যে 'অন্ধকার' এর আবির্ভাব। অতঃপর মুক্তিকামী মন যখন স্বভাবতঃ ঊর্ধ্বমুখী তখন পর্বত চূড়ার ক্রমোন্নত রূপের মধ্যেও তার স্থিতি, অপর লোকের অনন্ত শূন্যতাকে পরিস্ফুট করে। অতঃপর ইহলোক পরলোকে ভরসাহীন দুটি নরনারীর কাছে 'অন্ধকার' শব্দটি পরিণামী বিভীষিকার নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনৈতিক কর্ম কাণ্ডের পরিণামী বিভীষিকাকে নিশ্চিত করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বাংলা গদ্যকে বিস্ময়কর এক উৎকৃষ্ট কাব্যোপম প্রখরতা দান করেছেন।

পরিশেষে, একথা বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবন সাধনার অনুসারী। অন্বিষ্ট জীবননীতিতে যে চিত্তশুদ্ধি, সৌন্দর্যশক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় প্রোজ্জ্বল, তাকে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্যরূপ দান করেছেন। তাঁর আশ্চর্য শিল্প প্রকরণ এই সত্যরূপ দানে বিশ্বস্ত সহকারী হয়ে উঠেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি সবই বসুমতী প্রকাশিত বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন ভাগ থেকে এবং প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যদর্শন

—ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

বাঙলা গদ্যভাষা তখনও গভীরভাব সহজে প্রকাশ করার মত কোন রীতিমাধ্যম খুঁজে পায় নি। একদিকে লঘু চপল ভঙ্গীতে জীবনের উপরিতলের রঙ্গরহস্যকে প্রকাশ, মৌখিক ভাষার সঙ্গে আরবি-ফারসীর বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত গদ্য; অন্যদিকে দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের পণ্ডিতি প্রকাশ; মন্থরগতির সংস্কৃতানুসারী গদ্য। সুতরাং 'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয়কার্যের ভার একাকী বহনে সক্ষম, এমন গদ্য বঙ্কিমকেই গঠন করে নিতে হয়েছিল। তাঁর আগে অন্য কেউ একথা বলতে পারেন নি 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত'; ইংরেজিতে যাকে 'Literary Criticism' বলে বাঙলায় তার পদ্ধতিগত তাত্ত্বিক আলোচনা এবং প্রয়োগগত চমৎকারিত্ব বঙ্কিমের রচনাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই Criticism-এর ভাষাও বঙ্কিমকেই প্রস্তুত করে নিতে হয়েছিল। টীকা-ভাষ্যের জগৎ থেকে সমালোচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পথ যেমন তাঁকেই প্রস্তুত করে নিতে হয়েছিল তেমনি দেশী-বিদেশী-বর্তমান-অতীত থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল পাথেয়। বাঙালীজাতি ও বাঙলা সাহিত্যের নবচেতনার উন্মেষ লগ্নে সমালোচক বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটল ইংরেজি সাহিত্যের 'An Apologie for Poetrie'র লেখক স্যার ফিলিপ সিডনি-র মত। সিড্‌নি ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যকে নীতিবেত্তাদের ক্ষীণদৃষ্টি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর বঙ্কিম তাঁর যাত্রারম্ভেই আলংকারিকদের উদ্দেশে বললেন, 'আলংকারিকদিগকে প্রণাম করি'। বিনম্রভঙ্গীতে স্পষ্ট সত্যটি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, টীকাকার এবং সমালোচকদের সত্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'বিবিধ সমালোচন'-এর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের একজায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।' তারপর 'উত্তরচরিত'র প্রতিটি অংশ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জানালেন, 'আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভালো লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি।' 'প্রকৃত সমালোচনা'র অর্থ-তাৎপর্য তাঁর কাছে কী ছিল তা এখানে স্পষ্ট হয় নি। তবে সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে একটি Organic whole রূপে বিবেচনা করতেন। সৃষ্টির সমগ্রতার মধ্যে যে-সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যকে অন্বেষণ করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় আলঙ্কারিকদের পন্থা বর্জন করলেন এবং সরে এলেন য়ুরোপীয় Analytical Criticism-এর জগৎ থেকেও। মধুসূদন দত্ত তাঁর বন্ধু কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে 'সুভদ্রা'র দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠিয়ে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'In reading over my poem, you must look 1st to the imagery, 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the

individual flow of each verse. Do not care for the general effect.' মধুসূদন বলছেন 'Do not care for the general effect আর 'উত্তরচরিত'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কিছু উপমা ব্যবহার করে অবশেষে জানালেন, 'যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ'। মধুসূদন ও বঙ্কিম সমালোচনা সম্পর্কে যে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন উদ্ধৃতি দুটি তার প্রমাণ।

॥ ২ ॥

অ্যারিস্টফেনসের (Aristophanes) পাঠকেরা জানেন, কোনো রচয়িতার উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ অতিপ্রাচীন প্রথা। কিন্তু যে-ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ গড়ে ওঠে নি, তাকে আশ্রয় করে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের মিরন্দা এবং দেসদিমোনা-র তুলনামূলক বিচার নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কর্ম। এই তুলনায় দুঃসাহসী বিচারকের প্রত্যয়বলিষ্ঠ মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র। দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

Comparative Criticism-এর পন্থায় দুটি চরিত্রের মাধ্যমে দু'জন স্রষ্টার পার্থক্য নিরূপণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় 'সমগঠনের আন্বয়িক উপাদানের' বারংবার ব্যবহারের দ্বারা বাক্যের মধ্যে সৌষম্য সৃষ্টি করে যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন নিঃসন্দেহে তা কৌতূহলোদ্দীপক। এর শুরু 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধেই। যেমন :

> কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অত্যন্ত বিরল··· ইত্যাদি।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধেও এই ধরণের বাক্যগঠনপদ্ধতি চোখে পড়ে :

> জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।

বাঙলা গদ্যের যে-পর্বে যুক্তির গদ্য বিপক্ষকে আক্রমণের হাতিয়ার মাত্র, সেই সময় ছোট ছোট বাক্যাংশে তরঙ্গিত বাক্যপ্রবাহ সৃষ্টি করে মননের সঙ্গে রসানুভবের এই জাতীয় মিশ্রণ সমালোচক বঙ্কিমের অনন্যতা প্রমাণ করে। সমালোচনার আদর্শভাষা অদ্যাপি অনির্ণীত। হয়ত ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কিন্তু পাঠকের যুক্তিকে শাণিত করতে করতে তাঁকে আনন্দ দান এবং বাহ্যাড়ম্বর বা Megaloprepeia বর্জন করে আপন সিদ্ধান্তে পাঠককে আকর্ষণ করার সামর্থ্য বঙ্কিমের তুলনামূলক পদ্ধতির রচনাগুলিকে একালেও অলঙ্ঘ্য মাহাত্ম্য দান করেছে।

॥ ৩ ॥

Comparative Criticism-এর পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়াও বঙ্কিম সমালোচনার ক্ষেত্রে লেখকের Biography-র যে মূল্য দিয়েছিলেন আজও তা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসীয় সাহিত্যবিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সঁং ব্যুভ (Sainte-Beuve), হিপোলাইত তেইন, লিওনেল ট্রিলিং অথবা মার্কসীয় পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিচারসূত্রের পার্থক্য-নির্ণয়ে অক্ষম এডমণ্ড উইলসন-এর বক্তব্য তেমন আর গুরুত্ব পায় না। কিন্তু যে-দেশে সাহিত্যের বিচার মানে ছিল 'বিশ্লেষণ' এবং যে-বিশ্লেষণ নিতান্তই 'Dissection' এবং 'Disintegration' মাত্র, সেই দেশে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—ভূমিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে গুরু ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা নীতির খাতিরে 'Bowdlerize' না করে সাহিত্যের মাধ্যমে সুনীতি প্রতিষ্ঠার দায়ে অভিযুক্ত শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চমকসৃষ্টি করেছিলেন একথা বলে :

> কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র —তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।

বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কবিরে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে' এই মন্তব্যের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। 'কবিজীবনী' (১৩০৮ : বঙ্গদর্শন) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না।

এ সবের অনেক পরে (১৯৫৬) কবি-সমালোচক টি. এস. এলিঅট তাঁর বিখ্যাত 'The Frontiers of Criticism' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন :

> আমি অন্ততঃ আমার নিজের সম্পর্কে বলতে পারি যে, কোন্ উৎস থেকে একটি কবিতার জন্ম হয়েছে সে সংবাদ আমার কাছে কাব্যোপলব্ধির সময় অপ্রাসঙ্গিক ; এমন কি মনে করি এবিষয়ে সুপ্রচুর তথ্য পেলে মূল কবিতার সঙ্গে অনেক সময় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। লুসি কবিতাগুলি আমার কাছে 'কবিতা হিসেবে যতটুকু সার্থক তাই যথেষ্ট, তা ভিন্ন আমি অন্য কোন আলো প্রত্যাশা করি না।

'কবিতা দর্পণ মাত্র-তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে'—বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই অনেকে মানেন নি এবং মানেন না এখনও। বঙ্কিম, শিল্পীর Individuality'র সঙ্গে 'Artistic personality'র পার্থক্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। এমন কি বিদেশেও কীটস-এর 'সাঙ্কেতিক আত্মহত্যা বা Negative Capability'র কথাই বা কতজন সমালোচকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল ? এলিঅটের 'depersonalization' কথাটি তো মাত্র সেদিনের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের বাঙলাদেশের নাগরিক হয়েও সাহিত্যে শুধু স্রষ্টার 'অবিকল ছায়া' দেখেন নি, দেশ-কালেরও প্রতিবিম্ব সন্ধান করেছিলেন। 'সাহিত্য' লেখক নামক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কের ফসল নয়—'a literary work is not

a mere individual play of imagination'—একথা উনিশ শতকের ষাটের দশকে তেইন বলেছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তিনটি উপাদান—'রেস', 'মিলিউ' এবং 'মোমেণ্ট'। তেইন স্বীকার করেছেন সাহিত্যকে এভাবে দেখার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন স্তাঁদালের কাছ থেকে। তেইন ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ্য। তিনি সঁং ব্যুভ, যিনি বলেছিলেন 'যেমন বৃক্ষ তেমনি ফল'। তেইন বা ব্যুভের রচনার সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয়ের কথা জানা নেই, কিন্তু বঙ্কিমের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের কিছু উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে আসে :

> 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্য নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।'
>
> অথবা 'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।'

বঙ্কিম তেইন বা ব্যুভের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেন নি, করেছেন ধ্রুববাদী কোঁৎ, এবং হিতবাদী বক্‌ল-এর কথা। কিন্তু কোঁৎ, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সমাজ বা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করলেও সাহিত্য প্রসঙ্গে তেমন কিছু করেন নি ; এবং বক্‌লের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ক্ষীণ। যুরোপীয় সমাজতন্ত্রী সঁং সিমোঁ-র ভক্ত কোঁৎ সাহিত্যে সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে এমন কিছু বলেন নি যা বঙ্কিমকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিমের দার্শনিক মনটি যে এঁদের প্রভাবেই একসময় বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাতে কি সংশয় আছে। দর্শন একটা 'টোট্যাল' ব্যাপার। ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের ভিন্নত্বের জন্য তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে মাত্র। যে-বঙ্কিম 'সীতারাম'এ অতি দুঃখে লিখেছিলেন যে, একালে আমরা 'কুমারসম্ভব' ছাড়িয়া সুইনবার্ণ পড়ি; গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন'-এ বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের দিকে কটাক্ষ করেছিলেন সেই বঙ্কিমই কিন্তু 'প্রচার' পত্রিকায় 'সীতারাম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ মুহূর্তে 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রতিবেদনে (১২৯১ মাঘ) বলেছিলেন :

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল-সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

এখানে হিতবাদী দর্শন বঙ্কিমকে চালিত করেছিল কি-না সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সন্দেহ নেই যে, বঙ্কিম সমাজের হিতসাধনকে যে-কোন কর্মের এবং সেই হেতু সাহিত্যকর্মেরও উদ্দেশ্য বলে মানতেন। হিতবাদী বেন্থাম-কে বিস্মৃত হলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না (উত্তরচরিত) 'যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কের দোষ কি ?' প্রশ্নচ্ছলে এই সিদ্ধান্তের পর বললেন :

> কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন।

'চিত্তোৎকর্ষসাধন', 'চিত্তশুদ্ধিজনন' যদি গৌণ উদ্দেশ্যহয়, তাহলে মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? উত্তরে বঙ্কিম জানালেন 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'। 'কাব্য' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যসহ মোট ছ'টি শিল্প-কে বুঝিয়েছেন, যে-গুলিকে ইংরাজীতে 'Fine Arts'

বলে এবং বঙ্কিম যাকে 'সূক্ষ্ম শিল্প' বলেছেন। বঙ্কিম 'বিশুদ্ধ আনন্দ' কথাটিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কান্টের 'নিষ্কাম আনন্দ', শিলার-এর 'প্লে' বা লীলায় তিনি আস্থা রাখেননি। য়ুরোপীয় পন্থায় Aesthetic Faculty'কে অন্য অনুভূতি নিরপেক্ষ বলে বঙ্কিম ঘোষণা করেননি। 'ধর্মতত্ত্ব'এ গুরু বলেছিলেনমানুষের (ক) শারীরিকী (খ) জ্ঞানার্জনী (গ) কার্যকারিণী এবং (ঘ) চিত্তরঞ্জিনী সবকটি Faculty একত্র হলেই সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়, নান্দনিক বৃত্তি পূর্ণতা পায়। Aesthetic faculty স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু নয়, 'টোট্যালিটি'র একটি অংশ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব'এর গুরু পুনরায় কোঁৎ-এর কথা স্মরণ করলেন :

> সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া অগুস্ত কোম্‌ৎ 'মানবদেবী'র পূজা বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

ধ্রুববাদী দার্শনিকেরা মানুষকে তথা মানবতাকে স্থাপন করেছিলেন বৃন্ত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে। বঙ্কিমের সমাজহিতবাদী বুদ্ধির কাছে নান্দনিকবোধ বলিপ্রদত্ত হয়েছিল—এই অভিযোগ যিনিই করুন, তিনি অন্ততঃ একথা স্বীকার করবেন যে বঙ্কিম সাহিত্যের প্রাথমিক দাবিকে উপেক্ষা করে প্লেটোনিক হিতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। ধ্রুববাদীদের অনুসরণ করে অথবা না করে বঙ্কিম মানুষকেই স্থাপন করেছিলেন যাবতীয় প্রত্যয়ের কেন্দ্রে। 'কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যহৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে'—একথা ঘোষণা করেই বঙ্কিম 'ধর্ম ও সাহিত্য' শীর্ষক রচনায় বলেছিলেন, 'সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।' 'ধর্ম' বলতে এখানে তিনি Religion বোঝাননি, 'ধর্ম' জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির সুসমঞ্জস রূপ মাত্র। সুতরাং সাহিত্যের সঙ্গে তার বিরোধ কোথায়? 'ধর্ম' অর্থে Ritualistic or Ethical কিছু বোঝালে দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও নাট্যসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনাকালে বলতেন না 'কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়।' বঙ্কিম 'সৃষ্টিকৌশল', 'রসোদ্ভাবন', 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' প্রভৃতি কথাগুলির কোন বিকল্প মানতেন না। বাণীশিল্প সাহিত্যে গীতিকবি অথবা নাট্যকার সকলকেই 'বাক্য সহায়' করে 'রসোদ্ভাবন করিতে হইবে।' পারিভাষিক অর্থ তাৎপর্য বাদ দিয়ে 'রস' শব্দের যে মাত্রা বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন উত্তরকালে কেউই তা অতিক্রম করতে পারেননি; এমন কি একালের বস্তুবাদী কোন সাহিত্যরসিকও নন। একথা অবশ্য মান্য যে, মধুসূদনের মত চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচনা শাস্ত্রের কিছু উল্লেখ করে যেতেন, অথবা রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য সম্পর্কে লিখতেন অজস্র; তাহলে সাহিত্য-তাত্ত্বিক বঙ্কিম সম্পর্কে উত্তরকালের গবেষকদের কার্যোদ্ধার সহজসাধ্য হত। কিন্তু তা না করলেও স্রষ্টার মত সমালোচক বঙ্কিমের প্রতিভাও এই কারণে বিস্ময় সৃষ্টি করে যে :

১। তিনিই বাঙলাভাষায় প্রথম সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার এনে দিলেন।

২। 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' এবং 'রসোদ্বোধন' কথা দুটির উপর যথার্থ গুরুত্ব তিনিই দিয়েছিলেন।

৩। সাহিত্যের সঙ্গে স্রষ্টার এবং দেশ-কাল তথা পরিপার্শ্বের সম্পর্কে আলোচনায় তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক।

৪। সাহিত্যকে 'বিশুদ্ধ আনন্দ' এবং 'বিশুদ্ধ নীতি' থেকে সমদূরত্বে স্থাপন করেছিলেন সাহিত্যকে একটি সামাজিক কর্মরূপে গণ্য করে।

৫। সাহিত্যের মূল নীতি বিস্মৃত না হয়েই তিনি সমাজহিতবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে।

৬। সামাজিক মানুষের নীতির পথ থেকে স্খলনকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলে বঙ্কিম Aestheticsকে ছাপিয়ে Ethis-এর সর্বব্যাপী আধিপত্য মেনে নিতে সম্মত ছিলেন না। Ethics এবং Aestheticsএর ভারসাম্য রক্ষার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী।

৭। সর্বোপরি বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পথ বঙ্কিমই রচনা করে দিয়েছিলেন। পূর্বসূরীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন 'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ-সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনন ও চিন্তা

ড. ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সৃষ্টির মহত্ত্ব যেমন সর্বস্বীকৃত, তাঁর মননপ্রতিভার মহত্ত্বও তেমনি সর্বস্বীকৃত। বঙ্কিমের উপন্যাস কল্পনার যে-গরিমা আছে, বঙ্কিমের চিন্তার সূক্ষ্মতা, বিচার বিশ্লেষণের গরিমা তার চেয়ে কম নয়। বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি নিছক তথ্য বা সংবাদ দেবার জন্য লেখা হয় নি। এর ভিতর দিয়ে ভারতীয় বিশেষত বাঙালি সমাজ ও সভ্যতার কতকগুলি মূল সূত্র তৈরি হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের জীবন-ভাবনায় এই সূত্রগুলি প্রয়োগ করে থাকি।

চিন্তা বিচারের একটা বিশেষ ভঙ্গি বঙ্কিম তৈরি করে দিয়েছিলেন যা একমাত্র অক্ষয়কুমার দত্ত ছাড়া ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। আমাদের পূর্বতন মনন-রীতি ছিল আপ্তবাক্যনির্ভর, শাস্ত্র পুরাণের নির্দেশ বা উক্তিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে পরবর্তী বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করে চলা। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মতো প্রখর ব্যক্তিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এঁরা উভয়েই শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে সতীদাহের অনৈতিকতা এবং বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েছেন। এরকম বিচারের নিরর্থকতা এখানেই যে, শাস্ত্রে অনুকূল এবং প্রতিকূল কোনো প্রমাণেরই অভাব নেই। সবশেষে আসে শ্রুতি প্রমাণ অর্থাৎ অলৌকিক উপলব্ধির প্রমাণ। হিন্দু ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই বলে যুগে যুগে বহু বিচিত্র বিরোধী সত্য ও তত্ত্ব এতে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহু বিবাহ রোধে শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করতে দেখে বলেছিলেন, এ ভাবে যুক্তি দেওয়ার বিপদ আছে। কারণ শাস্ত্রে বিরোধী যুক্তির অভাব নেই।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। কিন্তু অক্ষয়কুমার শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করে যুক্তি রচনা করতেন না। অক্ষয়কুমার ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট—ব্যবহারিক জগতের অতীত কোনো কিছুর চিন্তা করেন নি। তাঁর নির্ভর ছিল প্রাকৃতিক নিয়মে। নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত সত্য ছাড়া অন্য কোনোও প্রমাণে তাঁর আস্থা ছিল না। এই কারণেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতবিরোধ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের চিন্তার এই প্রণালীতে সাদৃশ্য ছিল। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিসহ করবার জন্য নয়, সমর্থন করবার জন্য। যুক্তিপরম্পরা তিনি রচনা করেছেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানুষ যে সুখ খোঁজে, এটা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। জগতের দৃশ্য প্রকৃতির যে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত—এটা অতীন্দ্রিয় সত্য। অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই অভিজ্ঞতার সত্যের সাহায্য নিয়ে রচনা করেছেন। এই মননভঙ্গি অভিনব সেকালের দিনে তো বটেই—একালের

দিয়েও। এখনও আমরা আপ্তপ্রমাণ বর্জিত ভাবে চিন্তা করতে পারি না, পারি না বলেই নানা অলৌকিক বিশ্বাস পরনির্ভর অথবা ঋষিবাক্যের আশ্রয় নিয়ে বিচার করতে প্রবৃত্ত হই।

প্রবন্ধকে আমরা সৃষ্টিমূলক রচনার মধ্যে ধরি না। কিন্তু প্রবন্ধেও সৃষ্টিধর্মিতা আছে। যখন বক্তব্য মৌলিক হয়ে ওঠে, একটা গঠনমূলক চিন্তা তাতে প্রকাশ পায়—নিছক কোনো কিছুর ব্যখ্যা বা বিবৃতি নয়—তখন সেই চিন্তার সুবিন্যাসেই প্রবন্ধ সৃষ্টিধর্মী। অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বইটি বেরিয়েছিল ১৮৫২ তে। তখনও বাংলার কেউ এমন করে স্বাধীন বক্তব্যকে প্রকাশ করে বলে নি। এই বইয়ের মধ্যেই প্রকাশ পেল এমন এক দুঃসাহসিক চিন্তাভঙ্গী যা আমাদের প্রচলিত রীতিপদ্ধতির বিপরীত। তিনি প্রথমেই স্বীকার করে নিলেন প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্বকে। এই স্বীকৃতি আসলে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই স্বীকৃতি। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বইয়ের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "প্রাকৃতিক নিয়ম"। আঠারো এবং উনিশ শতকের চিন্তা জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্র, সাহিত্য শিল্প—সব কিছুরই ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম। অক্ষয়কুমার নির্দেশ করেছিলেন—

'মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তুবিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্বক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া সৎপথ প্রবর্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্তব্য।'

যখন শাস্ত্রের নির্দেশে আমাদের কর্তব্য নির্ধারিত হত, সেই পটভূমিতেই অক্ষয়কুমার দত্তের এই মননরীতির অভিনবত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কুড়ি বছর পর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, তাদের বিচার রীতি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বঙ্কিমেরও অটল আস্থা প্রাকৃতিক নিয়মেই। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের নামই 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গেও তার উক্তি—'সকলই নিয়মের ফল'। উত্তরচরিতে রাম চরিত্রের ব্যাখ্যায় জয়দেবের কাব্য রচনায় সর্বত্রই বঙ্কিম প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। ভারত কলঙ্ক প্রবন্ধে ভারতীয় জাতির উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়েও দেখা গেছে এ দেশের জলবায়ু পরিবেশের প্রভাবে এখানকার ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে আস্থার কারণ য়ুরোপে ক্রমবিবর্ধিত যুক্তিবাদ। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারই এর কারণ। যুক্তিবাদের প্রসারের ফলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাও সংশয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ঈশ্বরে বিশ্বাস চলে যায় নি, কিংবা খ্রীষ্টের মহিমাও ম্লান হয় নি, তবে খ্রীষ্টকে অলৌকিকতা বর্জিত হতে হল Christianity was held to exist not to be lived but like a proposition in Euclid only to be proved খ্রীষ্ট ঈশ্বরপুত্র নয, তিনি হলেন মানুষ। রবার্ট সীলি খ্রীষ্টের যে-জীবনী লিখেছিলেন তার নাম Ecce Homo-Behold this man. উনিশ শতকে ফ্রান্সে অগুস্ত কোমতের কল্পিত তত্ত্বের নাম ছিল Religion of Humanity তার কেন্দ্রে

ছিল মানুষ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দিয়ে কোমৎ এই প্রত্যক্ষ জগৎ এবং মানুষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি এই যুক্তিবাদ দিয়ে বেনথাম এবং জেমস মিল মানুষের কর্তব্যনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। কোমতের তত্ত্বের নাম প্রত্যক্ষতাবাদ Positovisom এবং বেনথামের তত্ত্বের নাম হিতবাদ Utilitarianism। আমাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে বঙ্কিম কোমৎ এবং বেনথামের মতের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু বলা দরকার এ বিষয়ে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। কেননা কোমতের প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যন্ত অটুট থাকলেও কোমতের মতের অন্ধ অনুসরণ তিনি করেন নি। হিতবাদও যে তিনি পুরোপুরি নিয়েছিলেন তা নয়। উত্তরচরিত প্রবন্ধের শেষে স্পষ্টতই তিনি বলেছেন হিতবাদের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্পর্ক অল্প। কমলাকান্তের দপ্তরে ইউটিলিটারিয়ান দর্শনকে বলেছেন উদর দর্শন। কোমৎ এবং বেনথামের মত বঙ্কিমচন্দ্র যতটুকু গ্রহণ এবং প্রয়োগ করেছেন সে-বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। অবশ্য এ-কথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই যে বেনথাম এবং কোমৎ যে-যুক্তিধর্মকে অবলম্বন করে তাঁদের তত্ত্বকে রচনা করেছিলেন, সেই যুক্তিধর্মের প্রতি নিষ্ঠাই বঙ্কিমের মানসিকতার প্রধান লক্ষণ। বেনথাম বা কোমৎ কেউই আর য়ুরোপে প্রথম শ্রেণীর ভাবুক বলে গণ্য নন, তথাপি এরা সমাজের একটা পরিবর্তিত এবং পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি—সেটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। কোমতের পজিটিভিজমের মূল্য আর যাই থাকুক না কেন, এর প্রধান দান হচ্ছে সমাজের চিন্তাকে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত করা। কোমৎ এবং মিলের প্রায়-সমকালে কিংবা অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডারউইনের যুগান্তকারী তত্ত্বের প্রকাশ। জৈব বিবর্তনের যে সূত্র ডারউইন বের করেছিলেন, সে-সূত্র পজিটিভিস্ট বাকল ও টেইনের ইতিহাস রচনার মতোই যুক্তিবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থলে বাকল এবং টেইনের উল্লেখ করেছেন। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের তত্ত্বকে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনে তিনি লিখেছিলেন তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধ 'মিল ডারবিন এবং হিন্দু-ধর্ম'। এই প্রবন্ধে যে স্পষ্ট নির্দিষ্ট যুক্তি পরম্পরা ক্রমে খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্ব এবং হিন্দু-ধর্মের তুলনা করা হয়েছে, সেকালে আর কারো লেখায় তা পাওয়া যায় নি। বঙ্কিম যে-ধর্মালোচনা করেছেন, সে-ধর্মকে কখনও তিনি অলৌকিক বা অনির্বচনীয় বলে বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেন নি। এই কারণেই যে তিনি অবতারবাদের প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তাও মনে হয়। ঈশ্বর যদি অনির্বচনীয় বা ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা হন, তবে তাকে যুক্তির এবং মানব-বুদ্ধির মধ্যে আনা যাবে না। তাই ঈশ্বরকে তিনি মানবরূপে কল্পনা করে মানুষের অনুকরণযোগ্য আদর্শে পরিণত করেছেন। ধর্মতত্ত্বে ও গুরু আলোচনা শুরু করেছিলেন ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে—এ কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেই নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন এই যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ তিনি আনলেনই বা কেন। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শুধু মানুষের কথা ভেবে কী ধর্মতত্ত্ব রচনা করতে পারতেন না? এর উত্তর সম্ভবত দুর্মর ভারতীয় সংস্কার। তিনি তার চিন্তাকে নিবেদন করেছিলেন সেই সমাজের উদ্দেশ্যে যে-সমাজ বহুশত বছর ঈশ্বর এবং মোক্ষকেই পরম অভীষ্ট বলেই ভেবে এসেছে। ঈশ্বরকে বর্জন করে কোনো যুক্তিই আর তাদের কাছে স্বীকার্য হবে না। অবশ্য আমি মনে করি না বঙ্কিম সচেতনভাবে এই কথা ভেবেই ধর্মতত্ত্ব

রচনা করেছিলেন। অন্তরে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি যুক্তি দিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যে-রকম যুক্তিধর্মের তিনি পক্ষপাতী সে-রকম যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না বলেই ঈশ্বরকে মানবতার কৃষ্ণরূপে দেখে তার চরিত্রাদর্শ ক্রিয়াকলাপ আচরণ যুক্তিবদ্ধ মানব হিতসাধনে রূপ দিয়েছিলেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল আদর্শান্বিত মানুষ—যিনি জ্ঞানে কর্মে সৌন্দর্য-বোধে দেহধর্মের সর্ববৃত্তির সামঞ্জস্য পূর্ণ, যিনি মানুষকে প্রেরিত করবেন সামাজিক হিতসাধনে সর্বমানুষের কল্যাণে—নির্বাণ বা মোক্ষ নয়। মনের যে-অবস্থায় এই কর্তব্যবোধে ব্যক্তি উদ্দীপিত হবে, সেই অবস্থার নাম তিনি দিয়েছেন ভক্তি।

কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্ব রচনার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের নৈতিক জীবনের পুনর্গঠন। যে-সব নৈতিক সংস্কার আমাদের হিন্দু সমাজকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে সব সংস্কারের পুনর্বিচার এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। আমাদের জীবন এখন বিশ্বসমাজের সম্মুখীন। ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্মের একটা সার্বভৌম আদর্শ বঙ্কিম দিতে চেয়েছিলেন। য়ুরোপের চিন্তা সঙ্কট তিনি দেখেছিলেন। রেনেশাঁসের পর এবং ফরাসী বিপ্লবের পর মানবমুক্তির যে বিজয়া-ভিযান তিনি দেখেছেন, আমাদের দেশও তার সহযাত্রী হবে। অন্ধ ধর্মাচার মানুষকে বদ্ধ করে, অলৌকিক মুক্তির চিন্তা লৌকিক জীবনকে মিথ্যা করে দেয়, অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মচিন্তা মানব জীবনকে স্বপ্নপ্রভ করে। এর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের সমাজের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে দমিত করতে হবে। তারই নাম মানবধর্ম।

এর থেকে বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের মননধর্ম নিয়োজিত হয়েছিল একটি আদর্শে। শুধু তর্কের জন্য তর্ক নয়, চিন্তার জন্য চিন্তা নয়, তর্ক যুক্তি চিন্তা এদের প্রয়োজন কয়েকটি আদর্শ ও মূল্যবান সৃষ্টির জন্য। বঙ্গদর্শনে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ভারত সংস্কৃতি বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ, শিল্প সঙ্গীত অর্থ-নৈতিক এবং দার্শনিক বিষয় তার অন্তর্গত, তা ছাড়া কমলাকান্তের রচনাগুলি লঘু ভঙ্গিতে লেখা হলেও তাদের মধ্যে গভীর জীবনধ্যান আছে, সে কথা জানেন সকলেই। বঙ্কিমের এই লেখাগুলির মূল্য অসামান্য। এ লেখাতো কেবল তথ্য বিশ্লেষণ বা তথ্য সমাহার নয়, এ লেখার পশ্চাদপটে বঙ্কিমের একটি গূঢ়তর জীবন আদর্শ ছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলার ইতিহাসের প্রসঙ্গই ধরা যাক। বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কিত বঙ্কিমের লেখা বেশ কয়েকটি। বস্তুত বাংলার ইতিহাসের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখেছেন। উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ আজও আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'বাংলার ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই'—এমন কথা বঙ্কিম কেন বলেছিলেন? এ রকম কথা কোনো ইতিহাস পণ্ডিত বলেন না। ষ্টুয়ার্ট লেথব্রীজ মার্সম্যান এঁরা বাংলার ইতিহাস লিখেছেন, বঙ্কিম সে-সব বইয়ের খবর খুব ভালোই রাখতেন, তবু তাঁর ব্যাকুলতা বাংলার ইতিহাস না হলে বাঙালির ভরসা নাই--এর কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে জাতির আত্মসচেতনতার প্রত্যাশা করতেন। বাঙালির দীর্ঘকালীন বিদ্যাচর্চার মধ্যে কোথাও কি ইতিহাস লেখার উল্লেখ আছে? চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতকে যদি ইতিহাস ব'লে গণ্যও করি তবুও এ-ইতিহাস একটা গোষ্ঠি এবং সম্প্রদায়ের জাগরণের ইতিহাস হতে পারে—একটা দেশ বা জাতির নয়।

ইতিহাসবোধ আমাদের পার্থিব জীবনে সচেতন ক'রে, আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করে। মার্সম্যান লেথব্রীজের ইতিহাস সে বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। সে বইতে বাঙালি জাতির সামগ্রিক ছবি ফোটে নি, ফুটেছে কয়েকটি ঘটনার ইতিবৃত্ত। তারই ফলে সতেরো জন অশ্বারোহী এসে লক্ষ্মণসেনকে পরাস্ত করে সমগ্র জাতিকে পদানত করল, এ-রকম কাহিনী প্রচলিত হয়ে এসেছে। সুতরাং বঙ্কিমের নিজস্ব একটা আদর্শ অবশ্যই ছিল—সে-আদর্শটিকে তিনি সহজ ও স্বাভাবিক বলেই মনে করতেন। এ রকম একটি আদর্শ ছিল তাঁর জাতিপ্রেম। অন্তরের এমনি একটি মূল্যবোধ না থাকলে নিছক যুক্তিতর্কের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তাতে ব্যক্তির বুদ্ধি শাণিত হয়, কিন্তু সে বুদ্ধি হয় নিষ্ফলা। দেশ এবং জাতিকে ভালোবাসা একটা মূল্যবোধ। ধর্মতত্ত্বে অবশ্য কোন দেশকে ভালোবাসতে হবে, তারও যুক্তি তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। তা হলেও বঙ্কিমের দেশপ্রেমে যুক্তিটাই বড়ো নয়, আবেগটাই বড়ো। মৃণালিনী রচনার সময় থেকেই দেখা যায়, সতেরো জন অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছে, এ ব্যাপারটাকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না। এ মনোভাব বঙ্কিমের স্বাভাবিক দেশপ্রেমজাত। প্রায় ছয় বছর পর কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত' লেখার সময় বঙ্কিমের দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এতখানি খোলা মনের মানুষ, তাঁর মনে দেশপ্রেম একটা সহজাত সংস্কারের মতোই ছিল।

বঙ্কিমের পরে দেশপ্রেম আমাদের মনে ক্রিয়াশীল থাকলেও পরবর্তী নানা ভাবে ও প্রভাবে তাকে শোধিত করে নিতে হয়েছে। বিশ্বপ্রেম দেশপ্রেমের চেয়ে পবিত্রতর হয়েছে। দেশপ্রেমকে নানাভাবে সংকীর্ণতামুক্ত করে নতুন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা হয়েছে। আজকাল আমরা বলি বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম উগ্র হলে তাকে বলি অন্ধতা। এভাবে বঙ্কিমের দেশপ্রেমকে চিহ্নিত করার কারণ বুঝি। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যে দেশপ্রেমের উগ্র অন্ধতা দেখেছি—উপনিবেশবাদে যার পরিণতি ঘটেছিল। তা ছাড়া আমাদের দেশের সামনে অন্য সমস্যাও ছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে যে একশাসন এনে দিল, তাতে দেশ এবং জাতির চেহারা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল—এ-কথা অস্বীকার করব কী করে। ভারতবর্ষ একটা সমগ্র দেশ, ভারতবাসী একটা জাতি—এই ধারণা গড়ে উঠতে এক শাসন সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ঐতিহাসিক সত্যটা কি? ভালোবাসবো কাকে? হিন্দুকে, না বাঙালিকে না মাদ্রাজীকে না শিখকে। এখনকার উত্তর খুব সহজ। দেশ সবাইকে নিয়ে, জাতি সব ধর্ম সব গোষ্ঠীকে নিয়ে। কিন্তু এই সরল সমীকরণে বঙ্কিমের মতো মনীষী সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি এর উত্তর খুঁজেছেন ইতিহাসে। বিভিন্ন যুগে বহুজাতির সমাবেশ হয়েছে। তাদের গোষ্ঠী ও সংস্কৃতি পৃথক চিহ্নাঙ্কিত। প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচয় আছে; তেমনি এদেশে আসার ফলে একটি সামগ্রিক রূপও তারা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন এর তাত্ত্বিক বিচার করেছিলেন এবং প্রায় উপনিষদের ভাষাতেই বলেছিলেন "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করে স্বাধীনতা-পরাধীনতার অর্থ খুঁজতে চেয়েছিলেন। তখনও আমাদের দেশে দেশ জাতি স্বাধীনতা পরাধীনতা স্বদেশী বিদেশী ইত্যাদি শব্দের অর্থ

সুনির্দিষ্ট হয় নি। ফলে আমরা এসব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেকের লেখাতেই আজকালের পক্ষে অনুপযোগী কিছু কথা পাই। আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার সূচনাতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেই এই প্রসঙ্গ এসেছে এবং তার ফলে পরবর্তী বাঙালি ভাবতে শিখেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ শাসন চেয়েছিলেন আবার বঙ্কিমচন্দ্রই পরশাসনমুক্ত দেশের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, মনে হয় যেন ভারতবর্ষের বাইরে বাঙালির একটা স্বতন্ত্র স্বত্তা কল্পনা করতে চেয়েছেন। তিনিই আবার বলেছিলেন ইংরেজি ভাষার সাহায্যে ভারতীয় ঐক্যর গ্রন্থিবন্ধন করতে হবে। তিনি কমলাকান্তের দপ্তরে তুর্কিবিজয়ের সঙ্গে বঙ্গের গৌরবরবি অস্তমিত হল বলে শোকার্ত হয়েছিলেন। আবার অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন পাঠান রাজত্বে বাঙালি ছিল স্বাধীন।

আমরা আজকাল এগুলিকে বঙ্কিমের স্ববিরোধিতা বলতে ভালোবাসি। তা নিয়ে এখানে তর্ক করব না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রখর যুক্তিপরায়ণ এবং আদর্শ-বাদী মনীষীও যে নানা বিপরীতের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, এর কারণটা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিকায় ভেবে দেখা দরকার। মূল কথা এই যে উনিশ শতকে সমাজ-নীতিতে রাষ্ট্রনীতিতে সাহিত্যনীতিতে আমাদের দেশে মূল্যবোধ তৈরি হয়ে উঠেছিল এই মূল্যবোধগুলিকে যাঁরা তৈরি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম। নানা প্রবন্ধে নানা রচনায় তিনি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে-সব আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু তর্ক করা নয়, কিংবা তথ্য সংগ্রহ নয়। এর ভিতর দিয়ে তিনি নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন ধ্রুব আদর্শটিকে। পুরোনো আদর্শটিকে যথাযথ ও নূতন করে প্রমাণিত তিনি কখনও করতে চান নি। সাহিত্য নিয়ে বিচার করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন নতুন সাহিত্য তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। ইতিহাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমাজসভ্যতা ও সময়ের সহযোগে জাতিপ্রকৃতি বোঝাতে গেছেন। বাংলার কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলের নতুন পরিস্থিতিতে নানা সমস্যার উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টির লক্ষ্য কৃষকই, জমিদার নয়। বঙ্কিমের লক্ষ্য আমাদের জীবন এবং সমাজ। মানুষকে তিনি তাঁর মনীষার উপজীব্য করেছিলেন। ব্যক্তি এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক যে নতুন করে স্থির করে দেওয়া আধুনিক জীবনে একটা বড়ো সমস্যা। অবশ্য সমাজকে তিনি ভেবেছেন ব্যক্তির আশ্রয়। সমাজ ছাড়া ব্যক্তি বাঁচতে পারবে না। আবার সমাজের প্রাধান্য ছিল আমাদের প্রাচীন সমাজেও। সমাজের নিয়ন্তারূপে ছিল ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রবচনকে ব্যখ্যা করত ব্রাহ্মণ। ব্যক্তিকে চলতে হত শাস্ত্রবচনকে মেনে। বলতে গেলে আমাদের জীবনের প্রতি পর্যায়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উত্তরাধিকার নির্ণয়, জীবিকা দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ছিল স্মৃতি অর্থাৎ সমাজের শাসন।

সে সমাজ যে আর নেই, সে কথা তত্ত্বদৃষ্টিতে বঙ্কিমের মনীষা যত ভালো করে বুঝেছিল আর কেউ বোঝে নি। বঙ্কিমের তৈরি আইডিয়া নতুন যুগের সঙ্গে সংঘাতে তৈরি হয়েছে। বঙ্কিম যে সমাজের কথা বলেছেন—ধর্মতত্ত্বে তিনি বলছেন 'সমাজকে ভক্তি করিবে'—সে-সমাজ শাস্ত্রচালিত পুরনো সমাজ নয়। বৃহত্তর জনসমাজ তার নীতি তার ধর্ম ভিন্ন। এই নতুন জীবন, নতুন সমাজ

এবং নতুন মূল্যবোধকে জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দেওয়ার আগ্রহে প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকা। বঙ্কিমের মনীষা নেহাৎ পুঁথির মধ্যে বদ্ধ থাকার জন্য নয়। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বঙ্কিমের চিন্তা ছিল অনেকটা থিয়োরেটিক্যাল বা তাত্ত্বিক. তথাপি তাঁর চিন্তার যে একটা প্রবল বাস্তবপ্রকৃতি ছিল, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতো তিনি বাস্তবজীবনবর্জিত বুদ্ধির চর্চা করেন নি। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের কল্যাণে তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন নতুন মূল্যবোধ। বাংলার জাগরণে নতুন চিন্তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সাদরে বরণ করেছিলেন, কিন্তু জাগরণ শহরের শিক্ষিতদের মধ্যে বদ্ধ থাকলে দেশের লাভ কি! এই বৃহত্তর চিন্তা বঙ্কিমকে তাড়িত করেছে। তিনি যেমন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেছেন, তেমনি লোকশিক্ষার উপরেও সমান জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিক্ষার হেরফের'। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমের মিল ছিল সম্পূর্ণই। এই সূত্র ধরে বিচার করলে বঙ্কিমের উত্তরাধিকার কতখানি সার্থক হয়েছে তা বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দুই অসমীয়া সাহিত্যিক

রজনীকান্ত বরদলৈ, পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

"সজীব পদাৰ্থমাত্ৰই যেনেকৈ তাৰ চাৰিও কাষৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰভাব এৰাব নোৱাৰে, কবি সাহিত্যিকো তেনেকৈ মানসিক বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰভাবমুক্ত নহয়। অসমীয়া কবি সাহিত্যিকৰ যে মানসিক বায়ুমণ্ডলটো থাইকৈ বঙ্গীয় কবি সাহিত্যিক বঙ্কিম, মধুসূদন, ৰবীন্দ্ৰনাথ, শৰৎ চাটাৰ্জীৰ পৰা ধৰি আজিৰ বুদ্ধদেব বসুলৈকে জুৰিপৰা এটা বায়ুমণ্ডল, তাক নুই কৰাৰ উপায় নাই।" ১

। এক ।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত অসমীয়া যুবকদের উদ্যোগে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা', সংক্ষেপে অ: ভা: উ: সা. সভার জন্ম হয়। একদল যুবকের স্বপ্ন, সদিচ্ছা ও প্রাণশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে সভার মুখপত্র 'জোনাকী' প্রকাশিত হলো ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, এর ক'মাস পরেই প্রকাশ পেলো 'বিজুলী' পত্রিকা (১৮৯০)—প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী লেন থেকে। 'জোনাকী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ধনবান যুবক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার কলমে অসমীয়া যুবকদের 'আত্মকথা' ব্যক্ত হলো সেদিন—

"এই পাছ পৰি থকা অন্ধাৰ দেশলৈ অলপ জোনাক স্নুমুৱাব নোৱাৰিলেও, যদি নিজে নিজেও যন্ত্ৰৰ ফিৰিঙতিৰ পোহৰত বাট পাওঁ তেনে আমাৰ শক্তিৰ মিছা ব্যয় হোৱা নাই বুলি ভাবিম।——আসি যুজিবলৈ ওলাইছোঁ অন্ধাৰৰ বিপক্ষে। উদ্দেশ্য—দেশৰ উন্নতি, জোনাক।" ২

নবীন লেখকদের চেতনায় ঢেউ তুলেছিল পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও বাংলার রেনেসাঁস। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে নিহিত জীবনদর্শন বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী এঁদের প্রতিভায় অনুকূল শক্তি সঞ্চার করেছিল। এঁরা অবসিত করলেন অসমীয়া সাহিত্যের 'অরুণোদয়' যুগকে, জন্ম দিলেন 'জোনাকী' যুগের। এঁদের যৌবন

১। ৰত্নকান্ত বৰকাকতী, 'সভাপতিৰ অভিভাষণ', ৰত্নকান্ত বৰকাকতীৰ গদ্যসম্ভাৰ, পৃষ্ঠা ৩৯৫।

২। 'জোনাকী' ১১

শক্তি, সাহস ও উদ্যম অসমীয়া জাতির জীবনে প্রাণবেগ সঞ্চারিত করলো।[৩] ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব প্রতিষ্ঠার কঠিন কর্মে নিয়োজিত এই যুবকদল অসমীয়া জাতিকে সর্বতোভাবে গৌরবান্বিত করলেন।

এঁরা যাঁরা সৃষ্টির সূত্রে সংবর্ধিত করলেন অসমীয়া সাহিত্যকে, এঁদের কারো কারো সাহিত্যিক প্রয়াস প্রতিবাসী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও প্রভাবজাত বলে মনে হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় নি, তাই এই সুধীসমাবেশে অনুক্ত সেই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে 'অসমীয়া সাহিত্য সম্রাট' রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাস 'মনোমতী'; ও 'অসমীয়া সাহিত্যের দ্রোণাচার্য' পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়াৰ গুরুপ্রবন্ধ 'শ্রীকৃষ্ণ'— এই দুই বাক্‌প্রতিমার কায়, মন ও বাক্যে অগ্রগামী সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

। দুই ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত উভয়েই নিজ নিজ ভাষায় উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃত। সরকারী কর্মক্ষেত্রে দু'জনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (বঙ্কিমচন্দ্র: ১৮৫৮–১৮৯১ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ; কালেক্টর। রজনীকান্ত: ১৮৯১–১৯১৮ এস্, ডি, সি ; ই, এ ,সি,)। দু'জনেই 'ইতিহাস অনুসন্ধানী' ও 'সমাজ-নিরীক্ষা-পটু' ঔপন্যাসিক। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় রজনীকান্তের মনে স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে প্রেরণার বীজ বপন করেছিল—সেই প্রেরণা সাহিত্যরূপ ধারণ করে রজনীকান্তের আসামে ফেরার পর। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যৌবনের স্বপ্ন ও উত্তরকালের সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। রজনীকান্ত মোট ন'খানি উপন্যাস লিখেছিলেন— 'মিরি জিয়রী' (১৮৯৫), 'মনোমতী' (১৯০০), 'দন্দুৱা দ্রোহ' (১৯০৯), 'রাধা-রুক্মিনীর রণ' (ধারাক্রমে প্রকাশিত ১৯২৫), 'রঙ্গিলী' (১৯২৫), 'নির্মল ভকত' (১৯২৬), 'রহদৈ লিগিরী' (১৯৩০), 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' (১৯৩৬), 'খাম্বা আরু থোইবী' ধারাক্রমে প্রকাশিত ১৯৩০-৩১)। এর মধ্যে 'মিরিজিয়রী' ও 'খাম্বা আরু থোইবী' বাদে বাকি সাতটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। সতীর্থদের মতো রজনীকান্তও প্রতিজ্ঞ ছিলেন অসম ও অসমীয়ার গৌরবগাথার প্রকাশ ও প্রচারে—সেই প্রতিজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেছিল বঙ্কিম প্রদর্শিত পথে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত লিখেছেন:—

৩। ডি. এন বেজবরুয়া, 'যুদ্ধোত্তর কালের অসমীয়া সাহিত্য', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৬ অনুবাদ, আনন্দ বাগচী সেই সময়ে "সাধারণ বাঙালী অসমীয়াকে পৃথক একটি ভাষা হিসেবে মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। উঁরা একে বাংলার উপভাষা হিসেবেই ভাবতেন। তাঁদের সহজ যুক্তি এই ছিল যে, যেহেতু এই দুই ভাষার বর্ণমালা বা হরফ এক সেহেতু এরা একই ভাষা। কথাটা যেন এইরকম, ফরাসী, ইতালীয়, স্পানিশ, জার্মান ও ইংরেজীর অক্ষরগুলি যেহেতু পরস্পর সদৃশ সেহেতু তাদের একই ভাষা হতে হবে। কিংবা, মারাঠী আর হিন্দীর মধ্যে কোন ফারাক নেই কারণ তারা একই দেবনাগরী হরফের অংশীদার।"

"কলেজত থাকোঁতে চাৰ ৱাল্টাৰ স্কটৰ নভেলশ্ৰেণী আৰু বঙ্কিম চাটুৰ্জ্জিৰ উপন্যাস-শ্ৰেণী পঢ়িছিলোঁ। এই ঠাইৰ সিকালে পাহাৰ দেখি আৰু অসমত সকলো ঠাইতে নদী, নলা, নিজৰা, বিল, পুখুৰী, পাহাৰ, জাবনি এই সকলো বিলাকলৈ মনত পৰিচাৰ ৱাল্টাৰ স্কটৰ সেই *high land* আৰু *low land* বিলাকলৈ মনত পৰিছিল। ভাব হৈছিল—"হায়, মোৰ অসম জননী; তুমি কেনে প্ৰকৃতিৰ কাম্য কানন। ——তোমাৰ অতীতকালৰ বুৰঞ্জী নানা ঘটনাৰে পৰিপূৰ্ণ। কিন্তু তোমাৰ এই সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দৰ্য বৰ্ণাবলৈ, অতীত বুৰঞ্জীৰ উপন্যাস লেখবলৈ, চাৰ ৱাল্টাৰ স্কটৰ নিচিনা বা বংকিম চাটুৰ্জ্জিৰ দৰে উপন্যাস কাৰক, প্ৰতিভা-শালী সাহিত্যিক ক'ত?" [৪] কলকাতায় বসেই রজনীকান্ত সংকল্প নিয়েছিলেন: "অসমতে বংকিমচন্দ্ৰ বা সাৰ ৱাল্টাৰ স্কটৰ দৰে এক চিৰিজ উপন্যাস লিখিম।"[৫] "কলিকাতাত থাকোঁতে ছাত্ৰ অবস্থাত বৰদলৈদেৱে নিশ্চয় বঙ্কিম-ৰমেশচন্দ্ৰই বঙ্গালী জীবনত সৃষ্টিকৰা ভাবোচ্ছাসৰ তড়িৎ-প্ৰৱাহ লক্ষ্য কৰিছিল। নিজ মাতৃভূমিতো সাহিত্যৰ যোগেদি তেনে ভাবোচ্ছাসৰ প্ৰৱাহ সৃষ্টি কৰিবলৈ বৰদলৈয়ে গুপুত অভিলাষ নিশ্চয় পোষণ কৰিছিল।"[৬] বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: রজনীকান্ত এক সিরিজ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন এবং এগুলো লেখার সময় তাঁর বঙ্কিমাশ্রয় সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য যে শুদ্ধ অনুমানভিত্তিক নয় এ কথা অতঃপর স্পষ্ট হবে। রজনীকান্ত তাঁর রচনায় রোমান্সের আবহ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, প্রণয়ের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রণয়মূলক কাহিনী ও উপকাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসকে রোমান্সধর্মী করে তোলার দিকে রজনীকান্তের ঝোঁক। 'মনোমতী'তে লক্ষীকান্ত ও মনোমতী; 'নির্মল ভকত'এ নির্মল ও রূপহী; 'রঙ্গিলী'তে সংৰাম ও রঙ্গিলী; 'ৰহদৈ লিগিৰী'তে দয়ারাম ও রহদৈ; 'তাম্রেশ্বৰীৰ মন্দিৰ'-এ ধনেশ্বর ও আয়োনী-র প্রণয় ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলিতে রোমান্সরস পরিবেষণে সাহায্য করেছে। প্রণয়ের আবর্তে পড়েছেন আরো কয়েকজন, যেমন শান্তিরাম, পমীলা, পদুমী, ('মনোমতী'); মহীরাম, পদুম-কুমারী ('দন্দুরাদ্রোহ'), জয়রাম কেতেকী, বিচিত্রী, মনাই—('রঙ্গিলী') রাঘব ও ও রুক্মিনী (ৰাধা—রুক্মিনীৰ ৰণ'); নির্মল ও রূপহী ('নির্মল ভকত') প্রভৃতি। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের, তেমনি রজনীকান্তের উপন্যাসে নারীর ভূমিকা উজ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন স্থলে পুরুষ চরিত্রকে ম্লান করেছে নারীচরিত্র ('মনোমতী'র পমীলা, রঙ্গিলী'র রঙ্গিলী, 'ৰহদৈ লিগিৰী'র রহদৈ)। যুদ্ধবর্ণনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের এক প্রধান অঙ্গ। রজনীকান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও নিবিড়তা ততটা ফোটাতে না পারলেও ঐতিহাসিক রসাবেদন সৃষ্টিতে তার যুদ্ধবর্ণনা অনেকাংশে কার্যকর হয়েছে। দুর্গ, শিবির ইত্যাদির বর্ণনার ক্ষেত্রেও রজনীকান্ত সময়ে সময়ে ('মনোমতী'তে চণ্ডী বরুয়ার ও হলকান্ত বরুয়ার গড়ের বর্ণনা) বঙ্কিমমুখী হয়েছেন। নায়িকা ও অন্য অন্য নারী চরিত্রের বয়স নির্দেশ ও বিশদ রূপ বর্ণনায় বঙ্কিম

৪। 'দন্দুৱা দ্ৰোহ' উপন্যাসৰ 'পাতনি' (মুখবন্ধ)
৫। 'মোৰ সাহিত্য জীৱনৰ অতীত কাহিনী', 'স্মৃতিগ্ৰন্থ', পৃষ্ঠা ১২৪
৬। 'বৰদলৈৰ উপন্যাসৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য', 'ঔপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ', পৃষ্ঠা ১০৫

প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ধর্মচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ উভয়ের উপন্যাসেই বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। সন্ন্যাসী-চরিত্র, জ্যোতিষগণনা ('মনোমতী', 'রহদৈ লিগিৰী', তাম্ৰেশ্বৰীৰ মন্দিৰ'); স্বপ্নদর্শন ও ইঙ্গিত ('মনোমতী', 'ৰহদৈ লিগিৰী', 'ৰঙিলী', 'নির্মল ভকত', 'তাম্ৰেশ্বৰীৰ মন্দিৰ'); যোগবলের আশ্চর্য শক্তি (ৰহদৈ লিগিৰী', 'নির্মল ভকত', তাম্ৰেশ্বৰীৰ মন্দিৰ') ও অন্যান্য অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও পরিবেশ রচনায় রজনীকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে 'পত্ররচনা'র স্থান গুরুত্বপূর্ণ। পত্রের মাধ্যমে অজানা তথ্যের পরিবেষন ইত্যাদিতে উভয়ের উপন্যাসে অতিরিক্ত স্বাদের সৃষ্টি হয়েছে। পত্র-রচনা উপন্যাসের আঙ্গিকের একটি বিশেষ দিক। রজনীকান্তও পত্র-মাধ্যমকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সঙ্গে কখনো আলাপচারিতে মগ্ন হয়ে পড়েন, কখনো উত্তমপুরুষে তাঁর আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসে—এ সব প্রকরণগত বিশিষ্টতা রজনীকান্তেও দেখা যায়। সামাজিক চিত্র রচনায় দুজনেরই উৎসাহ থাকলেও পরগামী রজনীকান্তের রচনায় সমাজ অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক স্তরে বৈষ্ণবধর্ম, সত্র, নামঘর, বিহু, দুর্গোৎসব, ভাওনা, পুজার্চনা, সামাজিক রীতিনীতি, আচার, বিশ্বাস, লোকসংস্কার, বিবাহ, ইত্যাদি রজনীকান্তের উপন্যাসে সুচিত্রিত। সেদিনের অসমীয়া সমাজ রজনী-কান্তের কলমের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনাশক্তির গুণে তৎসহ তৎসম শব্দ ব্যবহারের নিপুনতায় রহস্যঘেরা গাম্ভীর্যময় অতীত চিত্র ফুটে উঠে পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। রজনীকান্ত সেভাবে সম্মোহিত করতে পারেন নি। অসমীয়া গদ্যের স্বভাবসূত্রে তিনি তৎসম শব্দের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, তাঁর "ৰচনাৰীতি পোৰপটিয়া, সহজ সৰল"[৭]। বঙ্কিমের সরল গদ্য ও ভঙ্গী রজনীকান্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ সামাজিক উপন্যাস 'মিৰিজিয়ৰীৰ' শেষতম বাক্য কয়টি উদ্ধার করি :

রজনীকান্ত : "(পানেই-জঙ্কিৰ) প্ৰণয়ৰ বিষময় ফল ফলিল। —আমাৰ হতভাগিনী মিৰিজিয়ৰীৰ দুখলগা কাহিনী খতম কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ, ইয়াতে এতিয়াৰ পৰা মিৰিৰ ঘৰে ঘৰে সুফল ফলিব।"

—'মিৰিজিয়ৰী'।

বঙ্কিমচন্দ্র : "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

—'বিষবৃক্ষ'।

অতঃপর আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্তের দু'টি উপন্যাসের ('দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মনোমতী') সদৃশধর্মের আলোচনায় প্রবেশ করি। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিম-চন্দ্রের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৬২-৬৪র

৭। ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী, 'ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাস', 'ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বৰদলৈ', পৃষ্ঠা ১১

মধ্যে লেখা, প্রকাশকাল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। 'মনোমতী'ও রজনীকান্তের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৯৭-র ভূমিকম্পের ঠিক আগেই লেখা, প্রকাশকাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। 'দুর্গেশনন্দিনী' যেমন বাংলা উপন্যাসের 'মাইলস্টোন', 'মনোমতী'ও তেমনি অসমীয়া উপন্যাসের 'মাইলস্টোন'। "দুর্গেশনন্দিনী" ও "মনোমতী" উপন্যাস দুটিতে যথাক্রমে বাংলা ও অসম দেশের পুরাবৃত্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্তের আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত এই দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে নিজ নিজ ভূমির যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি-অশান্তির কাহিনী ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে প্রকাশিত করেছেন। আসামে তৃতীয়বার খান-আক্রমণের ভিত্তিতে লেখা উপন্যাসে রজনীকান্ত সেই দুঃস্বপ্নের আসামের চিত্র এঁকেছেন।

"আমাৰ অসমকো এইদৰে 'মান' নামধাৰী কেতথিনি মানুহে কাটি-ছিঙি জুকলা-জুপুৰা কৰে। আমাৰ এই কাহিনীত এই মানৰ শেষ আক্রমণৰ এটি চিত্র বর্ণনা কৰিবলৈ ওলালোঁ।[৮]

বিবাদ বিসম্বাদ, পরশ্রীকাতরতা জাতির কী পরিমাণ সর্বনাশ সাধন করে দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামে তার চিত্র আছে। রজনীকান্তও 'মনোমতী' উপন্যাসে স্বজাতিদ্রোহের (চণ্ডী বরুয়া ও হলকান্ত বরুয়া) মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক সত্যকেই তুলে ধরেছেন। দুই ঔপন্যাসিকের একই অভিপ্রায়। প্রণয়মুখ্য কাহিনীর পরিকল্পনা, নারীরূপের বর্ণনা, স্বপ্নের ব্যবহার, সন্ন্যাসী চরিত্রের উপস্থাপনা, জ্যোতিষচর্চা, পত্র রচনা, দুর্গচিত্র ইত্যাদি সূত্রে উপন্যাস দুটিতে যে সাদৃশ্য ফুটে ওঠে তাতে 'দুর্গেশনন্দিনী'কে 'মনোমতী'র আদর্শরূপ বললে-বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না।

উপন্যাস দু'টির প্রত্যেকটির দু'টি করে ভাগ, নাটকের মতো। এই ভাগকে দুজনেই 'খণ্ড' নাম দিয়েছেন। খণ্ডের অন্তর্গত উপ-বিভাগগুলোকে (নাটকে যেমন 'দৃশ্য') বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'পরিচ্ছেদ', রজনীকান্ত বলেছেন 'অধ্যায়'। দুই খণ্ডে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২১+২২=৪৩, 'মনোমতী'র ১৯+২৬=৪৫। উপন্যাসের অন্তিম পরিচ্ছেদ/অধ্যায়কে একজন বলেছেন 'সমাপ্তি', অন্যজন 'সামৰণি' অর্থাৎ সমাপন। পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় শিরোনামেও সাদৃশ্য আছে, যেমন, 'দুর্গেশনন্দিনী' ১।৬ 'অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা', 'মনোমতী' ১।৭ 'জটীয়া বাবাজীর মন্ত্রণা'; 'দুর্গেশনন্দিনী' ২।১ 'প্রতিমা বিসর্জন', 'মনোমতী' ২।৪ মানহঁতৰ দেৱপূজা--প্রতিমা বিসর্জন'।

এবার উপন্যাসদুটির সদৃশ চরিত্রগুলির মাত্র নামোল্লেখ করি। এদের রূপ স্বভাব ও ঘটনাগতিতে ভূমিকার মিল পরে দেখাবো।

'দুর্গেশনন্দিনী'	'মনোমতী'
জগৎসিংহ	লক্ষ্মীকান্ত
বীরেন্দ্রসিংহ	চণ্ডীবরুয়া
মানসিংহ	হলকান্ত বরুয়া (আংশিক)

৮। 'মনোমতী', আৱম্ভন, পৃষ্ঠা ০৮

'দুর্গেশনন্দিনী'	'মনোমতী'
কতলু খাঁ	মিঙ্গিমাহা
অভিরাম স্বামী	ভটীয়া বাবাজী
দিগ্‌গজ	শাস্তিরাম ভকত
তিলোত্তমা	মনোমতী
বিমলা	পমীলা
আয়েষা	পনুমী (আংশিক)

বিমলা ('দুর্গেশনন্দিনী') ও পমীলা ('মনোমতী') ছাড়া অন্যান্য চরিত্র মোটামুটিভাবে জটিলতাবর্জিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ওসমান বা আশমানির সঙ্গে তুলনীয় চরিত্র 'মনোমতী'তে নেই। তবে, আশমানির ক্ষীণ প্রভাব পমীলা চরিত্রে পড়ে থাকতে পারে। 'মনোমতী'তে দু'একটি গৌণচরিত্র গল্পের শেষের দিকে এসেছে।

এবার ঘটনাবর্গের পরিচয় নিই।

'দুর্গেশনন্দিনী'	'মনোমতী'
১।১ দেবমন্দির। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনজনিত পূর্বরাগ। নায়কের বাহন ঘোড়া।	১।১ বরপেটার কীর্তন ঘর। নায়কনায়িকার প্রথম দর্শনজনিত পূর্বরাগ। নায়কের বাহন নৌকো।
১।৩ বীরেন্দ্রসিংহের পারিবারিক ইতিহাস।	১।৩ চণ্ডী বরুয়ার পারিবারিক ইতিহাস।
১।৫ নবীন তিলোত্তমা ও যুবতী বিমলার প্রাথমিক পরিচিতি ; উভয়ের সখীত্ব।	১।৪ নবীনা মনোমতী ও যুবতী পমীলার প্রাথমিক পরিচিতি।
	১।৬ উভয়ের সখীত্ব।
১।৬ অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা।	১।৭ ভটীয়া বাবাজীর মন্ত্রণা।
১।১০ বিমলার সাজের ঘটা ; দৌত্যের প্রস্তুতি।	১।১০ পমীলার সাজের ঘটা ; দৌত্যের প্রস্তুতি।
১।১২-১৫ দিগ্‌গজ প্রসঙ্গ।	১।১০-১১ শাস্তিরাম প্রসঙ্গ।
১।১৬ বিমলার দৌত্য।	১।১৩ পমীলার দৌত্য।
১।১৮-২১ পাঠান সৈন্যের বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ; দুর্গাধিপতিসহ তিলোত্তমা, বিমলা ও জগৎসিংহের বন্দীত্ব।	১।১৯ মান সেনার চণ্ডীবরুয়ার গড় আক্রমণ, অধিপতি বরুয়াসহ মনোমতী, পমীলা ও লক্ষ্মীকান্তের বন্দীত্ব।

উল্লেখযোগ্য : জগৎসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত যথাক্রমে বীরেন্দ্রসিংহ ও চণ্ডীবরুয়ার বৈরীপুত্র।

দু'টি উপন্যাসেরই প্রথম খণ্ডের এখানে সমাপ্তি। দ্বিতীয় খণ্ডের পটভূমি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় সমুদয় ঘটনা পাঠান সেনাপতি কতলু

খাঁর প্রাসাদে ঘটিত, 'মনোমতী'র দ্বিতীয়খণ্ডের অধিকাংশ ঘটনাই মানসেনাপতি মিঙ্গিমাহার শিবিরে সংঘটিত। নির্বাচিত কিছু সাদৃশ্য দেখানো হলো।

২।৪ পাঠান সেনাপতির সমক্ষে বীরেন্দ্রসিংহ। কতলু খাঁর ক্রোধ, বীরেন্দ্রসিংহের দৃপ্ত উত্তর, নৃশংস মৃত্যু।

২।১৪ মানসেনাপতির সমক্ষে চণ্ডীবরুয়া। মিঙ্গিমাহার ক্রোধ, চণ্ডী বরুয়ার গর্বিত উত্তর, নৃশংস মৃত্যু।

২।৯ জগৎসিংহের তিলোত্তমার পবিত্রতায় সন্দেহ, শারীরিক সন্তাপ।

২।৪ লক্ষ্মীকান্তের মনোমতীর পবিত্রতায় সন্দেহ, অসুস্থতা।

২।২২ জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ (জটায়াবাবাজী ও অভ্যাগতজনের উপস্থিতি)

২।২৫ লক্ষ্মীকান্ত ও মনোমতীর বিবাহ (জটায়াবাবাজী ও সামাজিকদের উপস্থিতি)

অতঃপর দু' একটি চরিত্র, দু-চারটে দৃশ্য বা ঘটনা ধরে আলোচনা করি।

(ক) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানসিংহ ও বীরেন্দ্রসিংহ শত্রুভাবাপন্ন। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ (বয়স "পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে" অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ) এবং বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমার মধ্যে প্রণয়াসক্তি ঘটেছে। 'মনোমতী'তে চণ্ডী বরুয়া ও হলকান্ত বরুয়া—দুই জমিদার শত্রুভাবাপন্ন। হলকান্ত বরুয়ার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত (বয়স "একুৰি দুবছৰমান অথাৎ বাইশ) ও চণ্ডী বরুয়ার পালিতা পুত্রী মনোমতী পরস্পর প্রণয়াসক্ত।

(খ) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলার ব্যবস্থা অনুসারে জগৎসিংহ বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে রাত্রিযোগে গোপনে তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিত হন। ঐ রাত্রিতেই পাঠানেরা বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ করে (১।১৮-২১)। 'মনোমতী' উপন্যাসে পমীলার ব্যবস্থা অনুসারে লক্ষ্মীকান্ত রাত্রিযোগে গোপনে চণ্ডী বরুয়ার গড়ে মনোমতীর সঙ্গে মিলিত হন। ঐ রাত্রিশেষে মানসেনা চণ্ডী বরুয়ার গড় আক্রমণ করে (১।১৯)। 'দুর্গেশনন্দিনী'র যুদ্ধে বন্দী হলেন বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ; মনোমতী'র যুদ্ধে চণ্ডী বরুয়া, পমীলা, মনোমতী ও লক্ষ্মীকান্ত। যুদ্ধরত জগৎসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত দুজনেই অচৈতন্য হয়ে পড়লে পাঠান সেনা ('দুর্গেশনন্দিনী') ও মানসেনা ('মনোমতী') এই দুই বীরের প্রতি সদৃশ আচরণ করেন।

দুর্গেশনন্দিনী (১।২১)। "----জগৎসিংহের অসি একজন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ----আত্মরক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না; কেবল অজস্র আঘাত করিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন, —প্রতি আঘাতেই হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী, নচেৎ কাহারো অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দিক হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। আর হস্ত চলে না,---বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল; মস্তক ঘুরিতে লাগিল;-------)"

জগৎসিংহ অচৈতন্য। পাঠান সেনা ওসমানের উক্তি—

"রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে।"

'মনোমতী' (১।১৯)। "ডেকাবরুৱাই সময় বুজি পোনেই আঠিৰে এটা মানক খোচ্ মাৰি বগৰালে; এনেতে সিফালৰ পৰা দহ-বাৰটা বনুৱা আহি সোমাল। ডেকা

বকুৱাই মানৱ ওপৰত জাঠি আৰু তৰোৱাল মাৰিবলৈ ধৰিলে। সানইঁতেও ওপৰা-উপৰি কৰি তৰোৱাল মাৰিবলৈ ধৰিলে। অস্ত্রে অস্ত্রে ঠনঠনাবলৈ ধৰিলে। চাৰি পাঁচটা মানক মাৰি ডেকাবৰুৱা অৱশ হল।"

লক্ষ্মীকান্ত অচৈতন্য। মানসেনা টৈঙ্গুলার উক্তি—

"------টৈঙ্গুলাই------বাধা দি কলে—"এই বীৰনৌক মাৰিব নালাগে, জীয়াই জীয়াই ধৰ।"

নায়ক-নায়িকার মিলনের প্রথম পর্বেই গুরুতর বাধা রচিত হল 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মনোমতী' দুটি উপন্যাসেই।

(গ) জগৎসিংহ যেমন তিলোত্তমার, লক্ষ্মীকান্ত তেমনি মনোমতীর পবিত্রতায় সন্দীহান হয়েছিলেন। পাঠান অন্তঃপুরে তিলোত্তমা "নবাবের উপপত্নী" (২।৯), দিগ্‌গজের মুখে এ সংবাদ শুনে জগৎসিংহের শয্যা "অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে।" 'মনোমতী'তে অসুস্থ লক্ষ্মীকান্তের প্রলাপ, "মানইঁতে নো মনোমতীক ভালে ৰাখিছে নে? "(২।৪)। সন্তপ্তা "তিলোত্তমা তখন ধূলিশয্যায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিল? এ ঘোর অন্ধকারে যে এক নক্ষত্র প্রতি সে চাহিয়াছিল, সেও তাহাকে আর কর বিতরণ করিবে না। এ ঘোর ঝটিকায় যে লতার প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; ----।" (২।১০)। অশ্রুমুখী মনোমতীর উক্তি—"আমাৰ সুখৰ ঘৰবাৰী কলৈ গ'ল? ঈশ্বৰে নো মোক জীয়াই ৰাখিলে কেলেই? —তেঁও মোৰ চৰিত্ৰত সন্দেহ কৰে। মোৰ নো তেন্তে আৰু জীয়াই থকাৰ সকাম কি?" (২।২৪)।

(ঙ) 'দুর্গেশনন্দিনী' ১।৬—'অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা'। 'মনোমতী' ১।৭—'জটীয়া বাবাজীৰ মন্ত্ৰণা'। স্বামীজী ও বাবাজী দু'য়ের উপদেশে মিল আছে—(১) শত্রু মানসিংহের (মোগলের) সঙ্গে মিত্রতা; (২) শত্রু চণ্ডী বৰুয়ার সঙ্গে মিত্রতা। প্রতিক্রিয়ার মিলটুকুও লক্ষণীয়:

"কোন যোদ্ধার সাহায্য লইতে হইবে? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের! গুরুদেব। এ দেহ বর্তমানে এ কার্য বীরেন্দ্র সিংহ হইতে হইবে না।" (১।৬)।

"বাবা! সংসাৰত সকলো কামকে কৰিব পাৰিম কিন্তু মোৰ পিতৃবৈৰী ঢেকেৰিৰ ঘৰে সৈতে লগ লাগিব নোৱাৰিম। (১।৭)।

(চ) 'মনোমতী' উপন্যাসে শান্তিরাম ও পমীলার সৃষ্ট রঙ্গরস (বিশেষভাবে ১।১০) 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বিমলা-আশমানি-দিগ্‌গজের রঙ্গরসের মার্জিত সংস্করণ। উপন্যাস দু'টিতে দিগ্‌গজ ও শান্তিরামের ভূমিকায় মিল আছে। দু'জনের গীতেই কৃষ্ণপ্রেম লৌকিক আধারে স্থাপিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দিগ্‌গজ 'রিলিফের' নামে স্থূলতায় মোড়া, 'মনোমতী'র শান্তিরাম পাঠককে আনন্দ দেয়, কখনো বিব্রত করে না। দিগ্‌গজের তুলনায় শান্তিরাম সুপ্রযুক্ত ও সুঅঙ্কিত।

নারীরূপের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত ব্যক্তিস্বভাব ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। বর্ণনার দৌলতে উভয়ক্ষেত্রে রোমান্সরস জমে উঠেছে। যেখানে রূপের বর্ণনায় নিজেদের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছেন, পাঠককে ডাক দিয়ে তাঁর ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন দু'জনেই।

তিলোত্তমার বয়স "ষোড়শ বৎসর" (১।৭), মনোমতীর "পোন্ধৰ কি ষোল" (১।৪) এঁরা নীরব, কিন্তু এঁদের বুকভরা ব্যাকুলতা। বিমলা, আশমানির রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমের

যে উল্লাসভাব লক্ষ্য করা যায়, এ উল্লাস স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয় আয়েষা, বিশেষকরে তিলোত্তমার রূপ বর্ণনায়। রজনীকান্তও পমীলা ও পদুমীকে রূপের বাজারে দাঁড় করিয়ে তাঁদের সৌন্দর্য প্রচার করেছেন, মনোমতীকে রেখেছেন যত্নে, স্নেহে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রেখেছেন তিলোত্তমাকে। তিলোত্তমা ও মনোমতীর মুখমণ্ডল প্রাধান্য পেয়েছে রূপ পরিচিতির ক্ষেত্রে। চোখ, ভুরু, সাধারণ গড়ন ও স্বভাবের মিল দেখে এঁদের মনে হয় 'এক বৃন্তের দুই কুসুম'। তিলোত্তমার রূপ দেখে "চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না" (১৭), মনোমতীর রূপ দেখেও পুরুষের পাপ চিন্তার সুযোগ নেই, "পুরুষৰ মনত তেওঁলৈ পাপ চিন্তা কৰাৰ পৰা একো নাছিল" (১৪)। এমন দুটি নবীন যুবতীকে অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যেষ্ঠা যে দুই পূর্ণযুবতী স্নেহে ও সতর্কতায় ঢেকে রেখেছিলেন, তাঁরা—'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা, 'মনোমতী'র পমীলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিমলা অভিনব সৃষ্টি, রজনীকান্তের পমীলাও তাই। এঁরা দুজনেই চতুরা, দুঃসাহসী, বাক্‌পটু, মনোমোহিনী। শত্রুপক্ষের প্রতি এঁদের সদৃশ আচরণ। কখনো রঙ্গের অস্ত্র শত্রুবশে কখনো যথার্থ অস্ত্র শত্রুনাশে ব্যবহার করেন। বিমলার হাতে ঝলসে ওঠে ছুরি (২।১৬), পমীলার হাতে ক্ষুর (২।৪)। তিলোত্তমার প্রতি বিমলার, মনোমতীর প্রতি পমীলার সস্নেহ আচরণও দু'জনের চারিত্রিক সাদৃশ্য নির্দেশ করে।

> ১। "বিমলা গৃহমধ্যে বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। তিলোত্তমাকে বিমলা আন্তরিক স্নেহ করিতেন---- । তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন।" (১।৫)
>
> "মনোমতীযে সৰুৰে পৰা অৰ্থাৎ দুবছৰ বয়সৰে পৰা পমীলাৰ লগত থাকি লগত খাই তেঁওক নিজৰ বৰ বায়েক যেন দেখে আৰু এইদৰে পমীলা মনোমতী দুয়ো একপ্ৰাণ হোৱাৰ দৰে হয়।" (১।৫)
>
> ২। "আকারেঙ্গিত ব্যতীত বিমলার সভ্যতা বা বৈদগ্ধ্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে তাহা সামান্য পরিচারিকায় সম্ভবে না।" (১।৫)
>
> "পমীলা বংচালী আৰু চতুৰালি কথা কব পৰা।" (১।৫)

বিমলা ও পমীলার বয়সের ব্যবধান থাকলেও (বিমলার পঁয়ত্রিশ "পঞ্চত্রিংশৎ", পমীলার বাইশ "একুৰি দুই বছৰ") তা বিশেষ ধরা পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢল ঢল করিতেছে, রসে মন টলমল করিতেছে। ——কে বলিবে যে, এ চতুর্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে? (১।১০)। "বিমলা প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিশালিনী" (১।৮ 'চতুরে চতুরে'), পমীল চতুরা (১।৩ চতুৰী পমীলা)। ওসমান বলেছিলেন, "বিমলার কটাক্ষকেই ভয়", 'মনোমতী'র পমীলার চোখ দুটি বিধাতা মানুষকে বশ করার জন্যই রচনা করেছিলেন ("পমীলাৰ চকু যেন ঈশ্বৰে তেঁওক বিশেষকৈ মানুহ বশ কৰিবৰ নিমিত্তে দিছিল" (১।৫)।

আয়েষা ও পদুমীর রূপের বর্ণনায় দুই ঔপন্যাসিকের চিন্তার আংশিক মিল দেখা যায়। এদের রূপের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত পাঠককেও জড়িয়েছেন।

> "পাঠক মহাশয়, 'রূপের আলো' কখনো দেখিয়াছেন ? না দেখিয়া থাকেন শুনিয়া থাকিবেন। --- আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত, প্রভাময় ; অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে। যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকামধ্যে তেমনই আয়েষা ; এজন্য তাহার অবয়ব ধ্যানপ্রাপ্য করিতে চাহি।" (২।১)।

> "পাঠক। আপোনা সকলে পদুমীৰ ৰূপৰ বিষয়ে যি ভাবে ভাবক। কিন্তু আমি শুনিছিলোঁ পদুমী হেনো এজনী অসমীয়া গাভৰু আছিল আৰু তেওঁ সৰুতে পাট গাভৰু থাকোঁতে হেনো তেঁওক তেওঁৰ লগৰ ছোৱালী বিলাকে—
>
> 'হাতো পদুমী ভৰিও পদুমী
> ৰুক্মিণীৰ পদুমী নাম।'
>
> ইত্যাদি বিধৰ নাম গাই জোকাইছিল।" (২।৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত দু'জনেই অন্যান্য নারীর রূপ বর্ণনার তুলনায় এদের রূপ বর্ণনায় সময় ও গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। আয়েষার বয়স বাইশ ("আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক" ২।১), পদুমীর বয়স উনিশ-কুড়ি ("বয়স উনৈশ কি কুৰি বছৰ হৈছিল" ২।৩)। এরা সমবয়সী। আয়েষা পাঠান সেনাপতির কন্যা, পদুমী মান সেনাপতির বলার্জিত রমণী। পদুমী 'মনোমতী' উপন্যাসে প্রেমের তৃতীয় ভুজের সৃষ্টি না করলেও দেহসৌষ্ঠবে, স্বভাব সৌন্দর্যে ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বলতায় আয়েষার প্রভাবপুষ্ট বলে মনে হতে পারে। তবে এ মিলটুকু সত্ত্বেও এরা দুজনেই স্বতন্ত্র এবং জীবন্ত। রূপেরজন্যও গুণগ্রাহী পাঠক সহজে ভুলতে পারেন না এদের, না আয়েষাকে, না পদুমীকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনীকান্ত দু'জনেই পাঠককে বার বার জড়িয়েছেন তাঁদের উপন্যাসে, কখনো পূর্বকথাব স্মরণসূত্রে, কখনো রূপবর্ণনাব সময়ে। কল্পিত পাঠককে উদ্দেশ করে কখনো দীর্ঘ অনুচ্ছেদও রচিত হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ১।৩, ১।৭, ১।১০,) ২।১, ২।৮, ও ২।১৬ পরিচ্ছেদ এবং 'মনোমতী'র ১।৬, ১।১৯, ২।৩, ২।১৫, ২।২২, ও ২।২৩ অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকদের পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মনোমতী' উভয় উপন্যাসেই নিপুণতার সঙ্গে পত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বেশি মাত্রায়, 'মনোমতী'তে পত্রের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ১।৯, ১।১৭, ২।৪, ২।৬-৭, ২।১০, ২।১১, ২।১৯ (দু'টি) ২।২০ পরিচ্ছেদে পত্রের ব্যবহার আছে। 'মনোমতী'র ২।৭ ও ২।২৫ অধ্যায়ে পত্র ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তিরামকে লেখা পদুমীর পত্রে (অতীত ইতিহাস উন্মোচনে ও পত্র লেখিকার আত্মত্যাগে) বিমলা ও আয়েষার পত্রের ছাপ আছে। আয়েষা লিখেছেন, "আয়েষার কথা মনে করিয়া দুঃখিত হইও না ;" পদুমী লিখেছেন, "পাপিনীলৈ শোক

কৰি অসুখী ন হব।" আয়েষা লিখেছেন, "যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব (২।১৯); পদুমী লিখেছেন, "যি ভাগ্যৱতীক আপুনি বিয়া কৰায়, সেই ভাগ্যৱতীকে মোৰ এই অলঙ্কাৰ কেইডাল দিব।" (২।১৫)।

পদুমীৰ পত্র জনসমক্ষে পাঠ করা হয়। সামাজিকবৃন্দ সাধুবাদ দিলেন ("ধন্য পদুমী! ধন্য।"), জগৎসিংহ পত্র পাঠ করে বিমুগ্ধ অন্তরে বলেছিলেন, "আয়েষা তুমি রমণীরত্ন।"

আমরা সমান্তরাল সূত্রগুলোর উল্লেখ করলাম, প্রতিভার মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখযোগ্য যে, সদৃশধর্মসত্ত্বেও রচনা দুটির রসাবেদনে তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।

। তিন ।

'কৃষ্ণচরিত্র' যেমন বঙ্কিমচন্দ্রেব 'ম্যাগনাম ওপাস'- শেষ জীবনে বচিত নিবিড় সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল, তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণ' পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়াব "মেগ্নাম ওপাছ, শেষ আৰু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ"।[৯] ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রচারিত হয়। 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব 'অনুশীলন ধর্ম' এবং 'প্রচারে' 'দেবতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাক্রমে প্রকাশিত হয়। তিনটি প্রবন্ধই হিন্দুধর্ম বিষয়ক। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। অনুশীলন ধর্মবিষয়ে আলোচনাটি "ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন" এই নামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: "আগে 'অনুশীলন ধর্ম' পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে 'কৃষ্ণচরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, 'অনুশীলন' ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"[১০] 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থ দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের শক্তি বা বৃত্তিগুলির সার্থক অনুশীলনের কথা বলেছেন। এগুলোর অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায়ই মনুষ্যত্ব। এই চরিতার্থতায় মানুষ ঈশ্বরমুখী হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ।"[১১] পদ্মনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আদি, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মধ্য ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এর অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হয়। পদ্মনাথ লিখেছেন, "ৰামকৃষ্ণাখ্যান মোৰ আজন্ম শ্রুতি-স্মৃতি।"[১২] এই বিপুলায়তন গ্রন্থ অসমীয়া সাহিত্যে কৃষ্ণজীবন বিষয়ে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র যুক্তিবাদী আলোচনা। "'শ্রীকৃষ্ণ' নতুন ধৰণৰ পুথি"।[১৩]

৯। মহেশ্বৰ নেওগ, 'ভূমিকা', 'গোহাঞিবৰুৱা ৰচনাৱলী', পৃষ্ঠা ১৪
১০। 'কৃষ্ণচরিত্র', প্রথম বারের বিজ্ঞাপন
১১। তদেব, দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন
১২। 'মোৰ সোঁৱৰণী', পৃষ্ঠা ৩০০
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও পদ্মনাথ উভয়ের অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা নয়; উচ্চতম আদর্শসম্পন্ন মানব চরিত্রের অভিব্যক্তিই যে কৃষ্ণচরিত্রে ফুটে উঠেছে, তারই প্রকাশ ও প্রচার। দু'জনেই কৃষ্ণকে "সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ" বলে মেনেছিলেন।

পদ্মনাথকে অসমীয়া সাহিত্যের দ্রোণাচার্য বলে উল্লেখ করে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক লিখেছেন, "তেখেতৰ (পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ) ক্লান্তিহীন পৰিশ্ৰমৰ ক্ষমতা অনন্যসাধাৰণ। - কেৱল আকাৰ দেখিয়েই এই ৰচনাৰ ('শ্ৰীকৃষ্ণ' গ্ৰন্থ) অন্তৰালত কিমান বিনিদ্ৰ নিশাৰ অভিনিৱেশপূৰ্ণ পৰিশ্ৰম নিহিত আছে তাক অনুমান কৰিব পাৰি। খনে খনে পাঠ্যপুথি. নাটক, উপন্যাস, বুৰঞ্জী, কৱিতা, একো একোখন/ বৰ বৰ সভাৰ অভিভাষণ লিখিও, এখন সাদিনীয়া বাতৰি কাকতৰ সম্পাদনা, পৰিচালনা আৰু বিতৰণ সকলো জপটিয়াই লৈযো. বৃদ্ধ বয়সত বিজন পুৰুষে এনে এখন লিখিবলৈ অদম্য বল পাইছিল, বাৰ্দ্ধক্যোচিত জিৰনিৰ হেপাত কাতি কৰি যি সময় উলিয়াব পাৰিছিল, সেইজন নিশ্চয় দুহাতেৰে দহ হাতৰ কাম কৰিব পৰা ভীমকৰ্মা পুৰুষ আছিল।"[১৪] 'শ্রীকৃষ্ণ' আদ্যলীলাখণ্ড প্রকাশের আগে পদ্মনাথ তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্বান বন্ধুকে পাণ্ডুলিপিটি পড়িয়েছিলেন এবং "আদ্যলীলাখণ্ডৰ প্ৰতি নবীন আৰু প্ৰবীণ সাহিত্যিক সকলৰ আদৰ আৰু অনুকূল অভিমত"[১৫] ও পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পদ্মনাথের পরমশ্রদ্ধাভাজন প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক হেমচন্দ্র গোস্বামী। হেমচন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থকে পদ্মনাথের "কীর্তিস্তম্ভ (monumental work)" বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পদ্মনাথকে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন: "...... কৃষ্ণকাহিনীৰ গাৰ-পৰা আপুনি যি দৰে অলৌকিকত্বতাৰ অলঙ্কাৰ খহাই লৌকিকতাৰ সাজ-পাৰ পিন্ধাইছে, সেইদৰে সেই অসম সাহসিক কাৰ্যত হাত দিবলৈ অদ্যাপি কোনো ভাষাত আন কোনো সাহিত্যিক শিল্পীয়ে সাহ কৰিব পৰা নাই ।"[১৬] শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'কে কেন যে বিস্মৃত হলেন, বুঝতে পারি নি। পদ্মনাথও চিঠির সঙ্গে কোন মন্তব্য যোগ করেন নি অথচ 'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁরও অজ্ঞাত ছিল না। কৃষ্ণ বিশেষজ্ঞরূপে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে যে আটজন য়ুরোপীয় ও দু'জন ভারতীয়ের নাম উল্লেখ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম।[১৭]

গ্রন্থ দু'টি নিয়ে পাশাপাশি আলোচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'কে পদ্মনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের আদর্শরূপে প্রতিভাত হয়। দু'জন বিশিষ্ট সমালোচকের লেখায়ও

১৪। তীর্থনাথ শর্মা, 'বস্তু সঞ্চয়', পৃষ্ঠা ১৫

১৫। 'মোৰ সোঁৱৰণী', পৃষ্ঠা ৩০৪

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০৪। হেমচন্দ্র গোস্বামীর চিঠি ১৮৫২ শকে লেখা। এর তিন যুগের আগে বঙ্কিচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০২

এ ধরণের ইঙ্গিত রয়েছে।[১৮] 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ দু'টি রচনার উদ্দেশ্য, আকরগ্রন্থের পর্যালোচনা, কৃষ্ণচরিত্র পরিক্রমা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলি ধরে এগোলেই আমাদের ধারণার সত্যতা প্রতীয়মান হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও পদ্মনাথ—উভয়ের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য দিয়েই সূত্রপাত করা যাক। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'পাতনি' (উপক্রমণিকা)তে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য স্থাপিত হয়েছে।

'কৃষ্ণচরিত্র' : "ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাংলা দেশের সকল হিন্দুর (বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—) ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ---এ গ্রন্থে আমি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।
(প্রথম পরিচেছদ/'গ্রন্থের উদ্দেশ্য')

'শ্রীকৃষ্ণ' : "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণক বুৰঞ্জীৰ ভেটিত আগন দিয়াটো এই "শ্রীকৃষ্ণৰ" প্রথম উদ্দেশ্য।"
('পাতনি')

'কৃষ্ণচরিত্রে'র ৭ম খণ্ড—২য় পরিচেছদ 'উপসংহার' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, "সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ; —এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরসন, অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান ; ····কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার ; কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রাকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যতদূর সাধ্য, ততদূর আমি গড়িলাম।"[১৯] পদ্মনাথ তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন : "এই পুথিৰ ('শ্রীকৃষ্ণ') আলোচ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণ চৰিত জগতৰ, বিশেষকৈ বৈষ্ণৱ জগতৰ উমৈহতীয়া সমল ; ইয়াৰ প্রতি নানা পণ্ডিতে নানাভাবে চায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত নানা ঋষিৰ নানা মত। ময়ো গোবৰ্দ্ধন গিৰিত প্রক্ষিপ্ত একো একো চপৰা প্রকাণ্ড অলৌকিক পাথৰ ভাঙ্গি গুৰি কৰি নিজৰ মনোমতকৈ পিহি মোৰ ধাৰণা অনুযায়ীকৈ লৌকিকতাত যিভাৱে পৰিণত কৰা হৈছে,

১৮। "The book Srikrisna discloses the influence of Bankimchandra Chatterji's 'Krisnacaritra' both in unfolding and in interpreting the Krisna legend from a rational and human point of view." Birinchi Kumar Barua, 'History of Assamese Literature', Sahitya Akademi, p. 185.

'শ্রীকৃষ্ণ'ত কৃষ্ণক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ৰ 'কৃষ্ণচৰিত্ৰ'ৰ দৰে ঐতিহাসিক ব্যক্তিৰূপে চাবৰ যত্ন কৰা হৈছে।" মহেশ্বৰ নেওগ, 'অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা', পৃষ্ঠা ৩০৯।

১৯। 'কৃষ্ণচরিত্র', ৭/২ 'উপসংহার'

হ্তাত নিশ্চয় ভালেমান হীন-ডেটি ঘটাব সম্ভব।"[২০] পদ্মনাথ তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ চৰিত্রত প্রোথিত অলৌকিকতা উচ্ছেদ কৰি তাৰ ঠাই লৌকিকতাৰে সৈতে পূর্ণ কৰাটোও মোৰ "শ্রীকৃষ্ণ" ৰচনাৰ অন্যতম লক্ষ্য।"[২১]

আকরগ্রন্থের উল্লেখ ও সংক্রান্ত মতামত পরিবেষণে সাদৃশ্য দেখি।

'কৃষ্ণচরিত্র' : "কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়—(১) মহাভারত (২) হরিবংশ ও (৩) পুরাণ। ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। মহাভারত আর উপরিলিখিত অন্যগ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-জীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণগুলিতে আছে, তাহা মহাভারতে নাই।" (১।২)

'শ্রীকৃষ্ণ' : পৌৰাণিক হিন্দুসাহিত্যেৰ ৰাশি ৰাশি মূলগ্রন্থৰ ভিতৰত থাইকৈ মহাভাৰত, হৰিবংশ আৰু ৯খন পুৰাণত কৃষ্ণ আখ্যান আৰু কৃষ্ণ-উপাখ্যানৰ বিপুল তথ্য পোৱা যায়, যদ্যপি কোনো এখনত ধাৰাবাহিকৰূপে কৃষ্ণকাহিনী লিপিবদ্ধ হোৱা নাই। অর্থাৎ মহাভাৰতত যি ছোৱা বিস্তাৰিতকৈ আছে হৰিবংশ আৰু পুৰাণত সি সেইদৰে নাই; আৰু হৰিবংশ আৰু পুৰাণত যি ছোৱা সুবিস্তাৰিতভাবে আছে, মহাভাৰতত সেই ছোৱা সমূলঞ্চে নাই।" ('উপক্রমণিকা')

তবে 'শ্রীকৃষ্ণে' বলা হয়েছে "মহাভাৰত মুঠেই এখন। মূল-মহাভাৰত ২৪০০০ শ্লোকেৰে পূর্ণ। ...মূল-মহাভাৰত সেই কালৰ বিচক্ষণীয় পুৰাতত্ত্ববিদ্ বিদগ্ধ পণ্ডিত মহামুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসৰ দ্বাৰাই প্রণীত।" ('উপক্রমণিকা')। বঙ্কিম-চন্দ্রের দৃষ্টি সূক্ষ্মতর। তিনি মহাভারত রচনার তিনটি স্তরের সম্ভাব্যতার উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন (১।১১)। তিনি বলেছেন যে, প্রচলিত মহাভারতের তিনভাগই প্রক্ষিপ্ত, একভাগ মৌলিক। সেই একভাগের কিছুটা ঐতিহাসিকতা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন (১।১২)।

বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের কড়া সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন,

"স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।" (১।৪)।

২০। 'মোৰ সোঁৱৰণী', পৃষ্ঠা ৩০৩

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৫

পদ্মনাথ লিখলেন,

> "মহাভাৰত হেন আখ্যানপূর্ণ ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থকো মহাকাব্য (Epic poem) বুলিহে জর্মানী আৰু আমেৰিকাৰ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সকলে সাব্যস্ত কৰিব খোজে।" (উপক্রমণিকা)।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথমখণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে ('কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল') বঙ্কিমচন্দ্র ভীষ্মস্থিতিকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও জ্যোতিষগণনার যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করে লিখেছেন যে বিষ্ণুপুরাণ থেকে যে ১৪৩০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের হিসেব পাওয়া গেছে, ওটিই বোধহয় ঠিক। এর থেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্দেশিত হয়। পদ্মনাথও কৃষ্ণস্থিতির জন্য ভীষ্মের শরশয্যার কালকে মূল অবলম্বন করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় লিখেছেন :

> "জ্যোতিষী গণনাৰে গণি লিলে ভীষ্মস্থিতি ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দত নির্দ্ধাৰিত হৈ ৰয়গৈ। ——তাৰ লগত আদহীয়া শ্রীকৃষ্ণৰ বয়স ৭০ বছৰমান যোগ দিলে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দত কৃষ্ণ-জন্মৰ কাল নিণয় কৰা যায়। ইয়াৰ লগত যুধিষ্ঠিৰৰ স্থিতি আৰু কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ কালো মিলে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে কোন "মারাত্মক মতভেদ" নেই। কোল-ব্রুকের গণনা অনুসারে এই যুদ্ধ হয়েছিল খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে। উইলসনও অনুকূল মত পোষণ করেন, এলফিনষ্টোনও তাই গ্রহণ করেছেন ,। উইলফোর্ডের অভিমত, খৃঃ পূঃ ১৩৭০ অব্দ। বুকাননের অভিমত, খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী। প্রাট্টের অভিমত, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখি না।" (১১৬)। পদ্মনাথও একমত,

> "পণ্ডিত কোলব্রুক, উইলচন আৰু এল্‌ফিনষ্টোনৰ মতে চতুর্দশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হয়, (যি যুদ্ধত শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রধান নায়ক আছিল) ; এতেকে আমাৰ নির্দ্ধাৰণৰে সৈতে সেই সিদ্ধান্ত লগালগি।" ('উপক্রমণিকা')

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের মানবত্বে অবিশ্বাসী। বঙ্কিমচন্দ্র ও পদ্মনাথ উভয়েই সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর। কৃষ্ণচরিত্রকে উভয়েই অলৌকিকতা বিমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করেছেন গ্রন্থারম্ভে, কৃষ্ণের বিভিন্ন সংলাপ ও জীবনের বিচিত্র ঘটনার ভিত্তিতে কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা

প্রমাণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। পদ্মনাথ তাঁর প্রায় ২৫০০ শব্দবিশিষ্ট 'উপক্রমণিকা' অংশে সংক্ষেপে পাণ্ডবগণ, কুরুক্ষেত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর মোহমুক্ত বক্তব্য রেখেছেন (তখনো 'শ্রীকৃষ্ণ' ২য় বা ৩য় খণ্ড রচিত বা প্রকাশিত হয় নি)। তিনি লিখেছেন :

> "ইয়াদতে শ্রীকৃষ্ণৰ মানবত্ব প্ৰতিপন্ন হল বুলি ধৰিব পাৰি। কিন্তু মানৱ বুলিও, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানৱ। আদৰ্শ স্বৰূপেও শ্রীকৃষ্ণ উচ্চতম আদর্শ, যি আদৰ্শ সহজে ধাৰণা কৰিব পৰা না যায়, যি আদর্শ অদ্ভুত, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত হেতুকে সর্বসাধাৰণ মানৱে শ্রীকৃষ্ণত ঈশ্বৰত্ব আৰোপ নকৰাটৈক নোৱাৰেগে।" ('উপক্রমণিকা')

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> "তিনি (কৃষ্ণ) মানুষী শক্তিৰ দ্বারা কর্ম নির্বাহ কৰেন, কিন্তু তাঁহাৰ চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতি মানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন।" ('কৃষ্ণচরিত্র' ৭।২ 'উপসংহার')

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে সতেরোটি পরিচ্ছেদবিশিষ্ট সুদীর্ঘ 'উপক্রমণিকা' অংশে কৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রায় যাবতীয় তথ্যের সবিশেষ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কোন ধর্মীয় সংস্কার বা দুর্বলতা দেখি না, তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সাত খণ্ডের প্রায় সর্বত্রই যুক্তিবাদ ও বিচার বুদ্ধিকেই একমাত্র মান্য করেছেন। নবদেহী কৃষ্ণ মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত ও অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পন্ন করেন, এ সত্য প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প। গ্রন্থশেষে লিখেছেন,

> "কৃষ্ণ মানুষী শক্তিৰ দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃতও করিয়েছি।"
> ('কৃষ্ণচরিত্র', ৭ ২ 'উপসংহার')

পদ্মনাথের বিশ্বাস এভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে জলকে যে পাত্রেই রাখা যায়, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে। ভগবান যখন যেখানে স্থিত হন, তারই আকার ধারণ করেন। মানব অবতারে তিনি বিকশিত হন মানবীয় চরিত্রে। এর অন্যথা ঘটলে অস্বাভাবিকতার অবতারণা করা হয়। ('পাতনি', 'শ্রীকৃষ্ণ' অন্ত্যলীলাখণ্ড) এ বিশ্বাস সত্ত্বেও পদ্মনাথ আদ্যলীলায় ব্যক্ত সংকল্প থেকে চ্যুত হলেন। এর কারণ সামাজিক চাপ। এর ফলে পদ্মনাথ অন্ত্যলীলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাকেই ভক্তির

দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন। পদ্মনাথ এই চাপকে অস্বীকার করতে পারলে 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের মূল্য আরো বেড়ে যেতো।

> "আদি আৰু মধ্যলীলাত কল্পনাৰ পাখি-কাটি অলৌকিকতাৰ ঠাইত পাৰ্য্যমানে লৌকিকতাৰ আৱেশ অবতাৰণা কৰাৰ বাবে যি সকল ভক্তপ্ৰাণ অলপ ব্যথিত হৈছিল, অন্ত্যলীলাৰ অলৌকিকতাৰ অবতাৰনাই সি সকলৰ সেই ব্যথা নিশ্চয় পাতল কৰিব। ('পাতনি', 'শ্ৰীকৃষ্ণ', অন্ত্যলীলাখণ্ড)

বঙ্কিমচন্দ্র 'গ্রন্থের উদ্দেশ্য' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচনা করিব" (১।১)। কোথাও তিনি তাঁর অঙ্গীকার বা সংকল্প থেকে চ্যুত হন নি। শ্রীকৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপ করা তাঁর লক্ষ্য নয়—তাঁর লক্ষ্য সেই মানব চরিত্রের উপস্থাপনা, যে চরিত্র বিশ্বের সকল মানুষের মনুষ্যত্ব অনুশীলনে নির্মলতম আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ মানুষী শক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁর সেই মানুষী শক্তির চরম বিকাশ লৌকিক আচরণের চরম উৎকর্ষের সূত্র ধরে প্রতিভাত হয়। ধর্ম মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের অনুশীলন ও সাধনাসূত্রে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত, পরিশুদ্ধ করে পূর্ণ হয়ে উঠবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ দু'টির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য; একটি অন্যটির পরিপূরক। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম বারের প্রকাশনা 'ধর্মতত্ত্বে'র পরবর্তীকালে হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন, কারণ 'ধর্মতত্ত্বে' তত্ত্ব, 'কৃষ্ণচরিত্রে' উদাহরণ। এ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশ্বাসে অটল না থাকলে, তাঁর পরিকল্পনা, অভিপ্রায় সবই বিধ্বস্ত হয়ে যেতো এবং সেক্ষেত্রে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের গৌরবের হানি ঘটতো।

পদ্মনাথের পরিকল্পনার উৎস ও অভিপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার মতো গূঢ়-সঞ্চারী নয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে অলৌকিকতা যেখানে বর্জিত বা খণ্ডিত, পদ্মনাথ সেখানে কিছুটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। পদ্মনাথ কংসের মথুরা আগমন থেকে কংসবধ--এই পর্বটির বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত বিষয়কেই প্রায় স্থান দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেসব প্রসঙ্গে হরিবংশ, ভাগবত ইত্যাদিতে ইতিহাসের অপলাপ লক্ষ্য করেছেন। 'সামন্তকমণিবৃত্তান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—"উপন্যাস", 'খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত' —"বড় আষাঢ়ে রকম", "দুর্বাসার সশিষ্য ভোজন"—"ঘোর অনৈসর্গিক ব্যাপার", 'শাল্ববধ বৃত্তান্ত'—"এক অদ্ভুত ব্যাপার"। বঙ্কিমচন্দ্র কুরু-সভায় কৃষ্ণ-বন্ধন ও কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রসঙ্গ যুক্তিসহ নস্যাৎ করে দেন, জরাসন্ধ ও ভীমের যুদ্ধ প্রসঙ্গে সকৌতুক মন্তব্য করেন--"চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল। (যদি সত্য হয়), বোধহয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশগত যুদ্ধ হইত।" পদ্মনাথ কিন্তু এগুলিকে ঠিক বর্জন বা খণ্ডন না করে এগিয়েছেন, জরাসন্ধের জন্ম, মৃত্যুর অনৈতিহাসিকতা ও অলৌকিকতাকে গ্রহণ করেছেন।

'কৃষ্ণচরিত্র' সাত খণ্ডে বিভক্ত: উপক্রমণিকা, বৃন্দাবন, মথুরা-দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উপপ্লব্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস। 'শ্রীকৃষ্ণ' তিনটি লীলায় বিভক্ত: আদ্যলীলা (শ্রীকৃষ্ণের

১৪ বছর বয়স পর্যন্ত), মধ্যলীলা (১৫-৭০), অন্ত্যলীলা (৭০-১২৬)। দীর্ঘ কৃষ্ণ-জীবনীর বিন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই দুটি গ্রন্থে সাদৃশ্য বর্তমান। সমালোচনাংশ বঙ্কিম রচনার মূলদেহে, পদ্মনাথের রচনার পাদটীকায়, সমালোচনাংশে বঙ্কিমচন্দ্র যতোখানি গভীর সঞ্চারী, যুক্তিবাদী ও নির্মম, পদ্মনাথ ততখানি নন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি "যেমন গভীর তেমনই অপলক, সংকল্পও তেমনি অবিচলিত"।[২২] পদ্মনাথের রচনায় এই দৃষ্টির গভীরতা ও সংকল্পের অবিচলতার অভাবের কারণ কি? "সংস্কৃত ভাষাৰ অনুচচ জ্ঞান" ও "ভাৰতীয দৰ্শনৰ লগতে তেওঁৰ অপৰিচয়"[২৩] (—মহেশ্বৰ নেওগ) কে এর কারণ বলে নির্দেশ করতে পারি কি? এর কারণ অন্যত্র হতে পারে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "—তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) স্মৃতি-সংহিতার হিন্দু ধর্মকে বড় করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার জাতিপ্রেমের প্রধান প্রেরণা ছিল হিন্দু-চিন্তার ধারা, ভারতীয় সাধনার ভাবগত আদর্শ। ——'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণের চরিত্র যে যুক্তি ও গবেষণার সাহায্যে যে-রূপে খাড়া করিয়াছেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব ভক্ত-সাধকের পক্ষে শুধুই অগ্রাহ্য নয়—ধর্ম-হানিকর।"[২৪] পদ্মনাথের মনের ভক্তি ও যুক্তির বিরোধ বা দ্বন্দ্ব তাঁকে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিঃসংশয় হতে দেয় নি। রাম-কৃষ্ণাখ্যান পদ্মনাথের আজন্ম শ্রুতি-স্মৃতি। অন্যান্য ভক্তজনের মনোব্যথা লাঘবের জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর নিজের ভক্তিভাব 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের সর্বত্র অভ্রান্ত যুক্তি ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠার নিপুণতা প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই নিপুণতা যে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের আগাগোড়া পরিস্ফুট হয়েছে তা নয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণাদি তথা পাশ্চাত্যের নানা শাস্ত্র ও মতবাদ চর্চার ফসলরূপে উপস্থিত হয়েছে। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ও প্রত্নতত্ত্বের উৎকৃষ্ট গবেষণারূপে রচনা দু'টি চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পদ্মনাথও অনুব্রতীর মতো মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ তথা পাশ্চাত্যের কৃষ্ণ-বিশেষজ্ঞদের সূত্রে প্রাপ্ত জটিলতার মাঝখান থেকে যুক্তিসাধ্য কৃষ্ণ-জীবনী রচনার কঠিন কর্মের সূত্রে অসাধারণ অধ্যবসায়, সাহস ও চমৎকার রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

'কৃষ্ণচরিত্র' উচ্চপর্যায়ের মনীষাপ্রসূত বিরল-সম্ভব রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ এবং যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য মহত্তম জীবনাদর্শ সমার্থবোধক। বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী আলোচক। সুতরাং পদ্মনাথের কৃষ্ণজীবনীর আলোচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রকে' অগ্রাহ্য করা অসমীচীন। পদ্মনাথের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র "প্রতিভার জীবন্তরূপ"। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বিরাট পুরুষ-মহিমা' পদ্মনাথকে যৌবনেই আকৃষ্ট করেছিল, সেই মধুর-স্বীকারোক্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর শেষ জীবনে 'শ্রীকৃষ্ণ' রচনাকালে। পদ্মনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল সত্তার আকর্ষণ থেকে তাঁকে দূরে রাখেন নি, অন্ততঃ বিষয় যেখানে

২২। মোহিতলাল মজুমদার, 'বঙ্কিম-বরণ', পৃষ্ঠা ১০৫
২৩। মহেশ্বৰ নেওগ, 'গোহাঞিবৰুৱা ৰচনাৱলী' ভূমিকা পৃষ্ঠা ১৩-১৪
২৪। মোহিতলাল মজুমদার, 'বঙ্কিম-বরণ', পৃষ্ঠা ১১৬

কৃষ্ণচর্চা। আমরা আমাদের ধারণার সমর্থনে তাঁর আত্মজীবনীর অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

> "এইখিনিতে প্রতাপচন্দ্র চাটুর্জ্জিৰ লেনৰ চিনাকি দি থোৱাও লাগতিয়াল বোধ কৰোঁ। ৺প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বনাম-প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ৰ ৺পিতৃ। ——সেই ছেগতে মোলৈকে৷ এটি সোনাময় সুযোগ মিলিছিল, প্রত্যহ সেই প্রতিভাশালী সাহিত্যিক পুরুষ, ৺বঙ্কিম-বাবুৰ দর্শন লাভলৈ। ——নিতৌ ঠিক ১০।। বজাত তেঁও আদালতলৈ যাবলৈ বুলি আমাৰ মেচৰ বাৰাণ্ডাৰ তলত কলেজ ষ্ট্রীটৰ দক্ষিণ দাঁতিত থিয় দি তেঁওর ঘোৰাগাড়ী অহালৈ বাট চায় হি। মই ওপৰৰ পৰা অলক্ষিত হই সেই প্রতিভাৰ জীবন্তৰূপ প্রাণভৰি চাওঁ।" ২৫

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে পদ্মনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে নীরব। কিন্তু সেই নীরবতা শতগুণে পূর্ণ হয়ে উঠল বঙ্কিম-বন্দনার অর্থগৌরবে।

২৫। 'মোৰ সোঁৱৰণী', পৃষ্ঠা ২৯। আত্মজীবনী 'আবাহন' পত্রিকায় ১৮৫৩-৫৪ শকে ধারাক্রমে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের আন্তলীলা খণ্ড ১৮৫২ শকে প্রকাশিত, মধ্যলীলাখণ্ড প্রকাশিত হয় এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৩ শকে।

হিন্দী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এবং বঙ্কিম উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ

ডঃ শিবেশ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দী উপন্যাসের ইতিহাসে বাংলা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাধারণভাবে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের উপর সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের উপরই বাংলার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। সম্ভবত আধুনিক যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য-আঙ্গিক বলেই হিন্দী ভাষার লেখকগণ উপন্যাসের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন বেশী। বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে, হিন্দীর তেমনি বাংলার প্রভাবে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাবটিকে হিন্দী সাহিত্যিকগণ সোজাসুজি গ্রহণ না করে, করেছেন বাংলার মাধ্যমে। কারণ সেটাই তাঁদের পক্ষে সুবিধেজনক ছিল। বিদেশী ভাষার চেয়ে প্রতিবেশী প্রদেশের ভাষা আয়ত্ত করা তাঁদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ উপন্যাসের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। যুগগুলি হিন্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের নামাঙ্কিত :

(ক) প্রেমচন্দ পূর্বযুগ : ১৮৮২ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত

(খ) প্রেমচন্দ যুগ : ১৯১৭ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত

(গ) প্রেমচন্দোত্তর যুগ : ১৯৩৬ থেকে

বাংলা উপন্যাসের প্রভাব প্রধানত প্রথম যুগের লেখকদের উপরই বেশী পড়েছিল। এই কালসীমার মধ্যে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক আবির্ভূত হলেও মৌলিক উপন্যাস খুব একটা রচিত হয় নি। লেখকগণ প্রধানত অনুবাদের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের পথিকৃৎ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০–১৮৮৫) সমসাময়িক লেখকদের বাংলা সাহিত্য পাঠে এবং বাংলা থেকে হিন্দীতে অনুবাদে উৎসাহ দিতেন। এই যুগে কিছু কিছু মৌলিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস যে দেখা যায় নি তা নয়, তবে সেগুলির ভাষা, প্রকাশভঙ্গী এবং শিল্পকৌশলের উপরও বাংলার প্রভাব পড়েছিল। বাংলার প্রভাবের একটা শুভ ফল এই হয়েছিল যে হিন্দী সাহিত্য তোতা-ময়না, বিজয়-বসন্ত, আলিফ-লয়লা, হাতিমতাই ইত্যাদি অলীক কিস্সা কাহিনীর থেকে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব মানেই অবশ্য বঙ্কিমপ্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এই যুগের সাহিত্যকদের প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তেমন আর কেউ নয়। এই বঙ্কিম-প্রভাব দুদিক থেকে বিচার্য : (এক) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদে (দুই) মৌলিক উপন্যাস রচনাতে বঙ্কিমানুসরণে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুটি দশক থেকে এই যুগের শুরু। আলোচ্যকালে প্রথম মৌলিক হিন্দী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে—এটির নাম 'পরীক্ষাগুরু'—১৮৮২তে

প্রকাশিত। অবশ্য কোনটি প্রথম মৌলিক হিন্দী উপন্যাসের মর্যাদার অধিকারী শ্রদ্ধারাম ফুল্লোরীর 'ভাগ্যবতী' (১৮৭৭) অথবা পণ্ডিত গৌরীদত্ত রচিত 'দেবরানী জেঠানী' অথবা লালা শ্রীনিবাস দাসের 'পরীক্ষাগুরু' (১৮৮২) তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। সে যাই হোক ইতিমধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর প্রথম দশটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে, তিনি বাংলার সাধক ঔপন্যাসিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সেই বার্তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছেও গিয়েছে। হিন্দিভাষী বিশাল অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেযুগে প্রায় সকল হিন্দী সাহিত্যিকই বাংলা ভাষা শিখতেন এবং বাংলা সাহিত্য পড়তেন। অবশ্য এ যুগেও বেশ কিছু হিন্দী সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন; তবে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না। যাই হোক আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বাংলা সাহিত্যে হিন্দী অনুবাদে উৎসাহী ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদেও তিনিই উৎসাহ দিয়েছেন। সেই ১৮৮২ থেকে বঙ্কিমানুবাদের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হিন্দী অনুবাদ দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে। অনুবাদক বাবু গদাধর সিংহ। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল—প্রথম খণ্ড ১৮৮২ তে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ তে। বছর দুয়েক আগে থেকেই অবশ্য এই অনুবাদটি হিন্দী মাসিক 'কবি বচন সুধা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। সেই সময় জনৈক বন্ধুর পরামর্শে বাবু গদাধর সিংহ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অনুমতি চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। প্রথমে তো তিনি এই অনুমতি দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পরে বহু অনুনয় বিনয়ের পর গ্রন্থ বিক্রয়ের লভ্যাংশ তাঁকে দিতে হবে এই শর্তে তিনি দুর্গেশনন্দিনীর হিন্দী অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। সে যুগে উপন্যাস প্রকাশনা খুব একটা লাভের ব্যবসা ছিল না, তা ছাড়া হিন্দী বই বিক্রীর সংখ্যা বাংলার তুলনায় কমই ছিল; অনুবাদক নেহাৎ দেশহিতের জন্যই দুর্গেশনন্দিনীর হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন। তবে এই ঘটনা থেকে অনুমান করা চলে যে মূল দুর্গেশনন্দিনীর বিক্রী থেকে লেখক বেশ কিছু আয় করেছিলেন এবং সম্ভবত সেজন্যই হিন্দী সংস্করণ থেকেও তাঁর প্রত্যাশা জেগেছিল। উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের একটি খণ্ড পাটনার চৈতন্য পুস্তকালয়ে রাখা আছে। অনুবাদক বঙ্কিমের সঙ্গে পত্রালাপের ঘটনাটি ভূমিকাতে লিখে রেখেছেন।

এর পর থেকে বঙ্কিম উপন্যাসের অনুবাদ ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে এবং প্রেমচন্দ যুগ পর্যন্ত এই অনুবাদ অব্যাহত থাকে। বাংলায় শরৎচন্দ্র এবং হিন্দীতে প্রেমচন্দের আবির্ভাবের পর থেকে এই অনুবাদের ধারা ক্রমবিলুপ্ত হতে থাকে।

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম যুগে বঙ্কিম উপন্যাসের এই ব্যাপক অনুবাদ শুধু যে হিন্দীভাষী পাঠকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে তাই নয়, হিন্দী ঔপন্যাসিকদেরও বঙ্কিম যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। এই প্রভাব উপন্যাসের ভাষা, কাহিনী, গঠনশৈলী এবং এমন কি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গীকেও প্রভাবিত করেছিল। এই সর্বগ্রাসী প্রভাব হিন্দী সাহিত্যের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে শুভ হয় নি বলে কেউ কেউ মনে করেন। কারণ যাঁরা হিন্দী ভাষার প্রতিভাশালী লেখক তাঁরা বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অথবা প্রভাবিত হয়ে উপন্যাস রচনা

করলেও একেবারে নিজস্বতা হারান নি। কিন্তু কিছু জনপ্রিয় অথচ কম শক্তিশালী লেখক বঙ্কিম প্রভাবিত হয়ে একেবারে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমন কি এঁদের হিন্দী ভাষার উপরও বঙ্কিমী বাংলার এমন প্রভাব পড়েছিল যা কাম্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে জনৈক আধুনিক গবেষকের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি :

"হিন্দী উপন্যাসের বিকাশে বাংলার ভূমিকার কথা গভীরভাবে বিচার করলে বড় নিরাশা হবে। ভারতেন্দু যুগ যে হিন্দীকে রূপ দিয়েছিল তা ছিল সহজ সরল এবং আড়ম্বরহীন। উপন্যাসে এই ভাষাই উপযুক্ত। বাংলা উপন্যাসের কৃত্রিম ক্লিষ্ট এবং সংস্কৃতনিষ্ঠ ভাষার প্রভাবে হিন্দীর স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে থাকল। এমন কি হিন্দী গদ্য এমন বদলে গেল যে তার শব্দ বাক্য এবং বাগ্‌ধারা থেকে বাংলার গন্ধ বেরোতে লাগল।"

[হিন্দী উপন্যাস : পৃষ্ঠভূমি আউর পরম্পরা, ডঃ বদরী দাস, পৃঃ ৪৪০]

লেখকের এই মন্তব্য আংশিক সত্য মাত্র। শক্তিমান হিন্দী লেখকদের উপর সংস্কৃত নিষ্ঠ বাংলাভাষার প্রভাব ক্ষতিকর তো হয় নি বরং আরবি ফার্সীর বাহুল্য থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্যিক হিন্দী গদ্য একটা স্বচ্ছন্দ গতিপথ খুঁজে পেয়েছিল। যাই হোক গবেষকের অভিযোগ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে হিন্দী গদ্যের ভাষাকে বঙ্কিমী গদ্য বহুলপরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমের রোমান্সপ্রিয়তাও হিন্দী উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করেছিল। হিন্দীতে উপন্যাসের উদ্‌ভবের আগে শিক্ষামূলক এবং সমাজ সংস্কারমূলক যে সমস্ত কথা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো স্বাভাবিক-ভাবেই বাস্তবমুখী ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব এবং হিন্দীতে বঙ্কিমের ব্যাপক অনুবাদ পরবর্তীকালীন হিন্দী ঔপন্যাসিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উপরোক্ত গবেষকের মতে এই প্রভাবও ক্ষতিকর হয়েছিল। তিনি তাঁর গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন—

"যেভাবে ভারতেন্দুকালে নির্মিত গদ্যশৈলীর পক্ষে বাংলার প্রভাব অহিতকর প্রমাণিত হয়েছিল সেইভাবে আলোচ্য যুগে মৌলিক উপন্যাসের যে মহান পরম্পরা আরম্ভ হয়েছিল বাংলা রোমান্টিক উপন্যাসের আগমনে তার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেল। ভারতেন্দু-যুগের ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাসের শ্রদ্ধাশীল পাঠক এবং অনুবাদক ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বঙ্কিমের রাজনৈতিক রোমান্সের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ দেখা যায় নি। পরে শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে কেবল কিশোরী লাল গোস্বামী, গোপালরাম গমহরী এবং ব্রজনন্দন সহায়ের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। গোস্বামীজি বঙ্কিমের আদর্শানুযায়ী কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তার ফল এই হল যে উনি দেশ কালের কথা ভুলে গিয়ে প্রেমলীলা বর্ণনায় মত্ত হলেন.........। এই তিনজন লেখক যাঁরা মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যদি বাংলার বশীভূত না হতেন তা হলে তাঁদের শিল্পকলার উন্নতি হত এবং তাঁরা হিন্দীর প্রকৃত মহৎ ঔপন্যাসিক বলে গণ্য হতে পারতেন। বাংলা উপন্যাসের অশুভ প্রভাবের ফলে মৌলিকতা মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না।" (ঐ পৃঃ ৪৪১)

প্রেমচন্দপূর্ব যুগের হিন্দী উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের এই বিশ্লেষণ সঠিক কি না

সে বিতর্কে না গিয়েও একথা অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া যায় যে এই যুগের অন্যান্য প্রায় সকল ঔপন্যাসিকের মত সফল এবং প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক কিশোরীলাল গোস্বামী, ব্রজনন্দন সহায়, মেহতা লজ্জারাম শর্মা প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণও সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষ করে কিশোরীলাল গোস্বামী ভাষাশৈলী, কাহিনীগঠন দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পকলা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই বঙ্কিমানুসারী ছিলেন। সমসাময়িক যুগে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্গুণ উপন্যাসও (৬০ টি)* তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিভার দিক থেকে তিনি বঙ্কিমের ধারে কাছেও যেতে পারতেন না—অথবা শুধু অনুসরণ এবং অনুকরণ মহৎ ঔপন্যাসিকের জন্ম দিতে পারে না। তাই কিশোরীলালের খ্যাতি একজন অনুকারকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। তা না হলে কিশোরীলাল গোস্বামী হিন্দী উপন্যাসের বঙ্কিম বলে পরিগণিত হতে পারতেন।

যে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়াও এই যুগের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই বঙ্কিমপ্রভাবিত। এই প্রসঙ্গে দু'একজনের নাম উল্লেখ করছি। প্রতাপনারায়ণ মিশ্র এই রকম একজন ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত 'রণধীর সুন্দরা' নামে একটি উপন্যাস মার্চ থেকে আগষ্ট ১৮৮৭ পর্যন্ত হিন্দী মাসিক 'প্রদীপে' প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের কাহিনীতে রণধীর নামে একজন জমিদারের সঙ্গে বাদশাহ আকবরের সংঘর্ষ এবং আকবরের সেনাপতির মেয়ের সঙ্গে তার প্রেমের বর্ণনা আছে। কাহিনীর সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীর সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট—শুধু চরিত্রগুলোর নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।

আর একজন ঔপন্যাসিক মিশ্রবন্ধু 'বীরমণি' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটি আলোচ্য যুগের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯১৭ তে প্রকাশিত হয়েছিল। বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে বঙ্কিমের এই আপ্তবাক্যটিকে আশ্রয় করেই যেন লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসটিতে স্পষ্টত 'চন্দ্রশেখরে'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মিশ্রবন্ধুর নায়িকার নাম নলিনী এবং নায়ক ললিতকিশোর। উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়। কিন্তু নলিনীর বিয়ে হল বীরমণির সঙ্গে—বীরমণি গ্রন্থকীট, অধ্যায়নের নেশায় তিনি নলিনীর প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ও পান না; নলিনী মনে মনে বাল্যপ্রণয়ী ললিতকিশোরের প্রতি মিলনাকাংক্ষা পোষণ করতে থাকে এবং একদিন এই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গিয়ে পড়ে মুসলমান নবাবের হাতে তারপর যুদ্ধবিগ্রহ মিলন বিচ্ছেদ ইত্যাদি সবই চন্দ্রশেখরের মত।

উপরোক্ত উপন্যাস দুটির প্রথমটি ১৮৮৭ এবং দ্বিতীয়টি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত। অর্থাৎ আলোচ্য যুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমানুসরণ অব্যাহত থেকেছে।

বঙ্কিমের অনুবাদের দিক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে আলোচ্য কালসীমার মধ্যেই বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাস হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুবাদক অনুবাদ করেছেন এবং অনুবাদগুলির একাধিক মুদ্রণও হয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির হিন্দী অনুবাদের একটি তালিকা নিচে দিচ্ছি। তালিকাটিতে ১৯৫৮ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে।

১। দুর্গেশনন্দিনী

অনুবাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল
বাবু গদাধর সিংহ	লহরী প্রেস, কাশী	১৮৮২ (১ম খণ্ড)
,,	,,	১৮৮৪ (২য় খণ্ড)
,,	,,	১৯০৪ (৩য় সং)
,,	,,	১৯১৮ (৪র্থ সং)
,,	,,	১৯২১ (৫ম সং)
রাধাকৃষ্ণ দাস	খড়্গবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৪
শ্রীকার্তিকেয়চরণ মুখোপাধ্যায়	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩২ (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড)
কবিরাজ কৃষ্ণকুমার অবস্থী	প্রভাকর সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৪
গোবিন্দ সিংহ	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী	১৯৫৮ (শিশুপাঠ্য সং)

২। কপালকুণ্ডলা

অনুবাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল
পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ সিংহ	খড়্গবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৯০১
দেবকীনন্দন সিংহ	বাবু দামোদরদাস খত্রী	১৯১৪*
চন্দ্রশেখর পাঠক	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯৩২
শ্রীকার্তিকেয়চরণ মুখোপাধ্যায়	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩২ (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ২য়)
পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি 'নিরালা'	ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ	১৯৪৬

৩। মৃণালিনী

অনুবাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল
জয়রাম দাস	উপন্যাস বাহার অফিস, কাশী	১৯১৫ (১ম সং)
		১৯১৮ (২য় সং)
পণ্ডিত শুকদেবপ্রসাদ বাজপেয়ী	নবল কিশোর প্রেস, লখনৌ	১৯১৬
রামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৮
অজ্ঞাতনামা	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী	১৯৫৫

৪। বিষবৃক্ষ

অনুবাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল
গুলজারীলাল চতুর্বেদী	হরিদাস বৈদ্য, কলিকাতা	১৯১৫
পণ্ডিত জনার্দন ঝা	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯১৫
রামাশীষ সিংহ	,, ,,	১৯৩৪
সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি 'নিরালা'	ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ	১৯৪৯
অজ্ঞাত	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী	১৯৫৭ (৩য় সং)

---

* 'নবকুমার আউর কপালকুণ্ডলা' শীর্ষকে প্রকাশিত

৫। ইন্দিরা

পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র	খড়্গাবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৪
পণ্ডিত কিশোরীলাল গোস্বামী	,, ,,	১৯০৮ (১ম সং)
		১৯১৮ (২য় সং)
রামেশ্বরপ্রসাদ পাণ্ডেয়	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১৬
গিরিজা কুমার ঘোষ	রামনারায়ণ লাল, এলাহাবাদ	১৯১৯
পণ্ডিত জনার্দন ঝা	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯২৩
শ্রীরামাশীষ সিংহ.	,, ,,	১৯৩৫
লালধর ত্রিপাঠি	প্রবাসী হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী	১৯৫২
অজ্ঞাত	কিতাব মহল, এলাহাবাদ	১৯৫৭

৬। যুগলাঙ্গুরীয়

পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র	খড়্গাবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৪
শ্রীরুদ্রনারায়ণ	ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রযাগ	১৯১০ (১ম সং)
,,	,, ,,	১৯১৪ (২য় সং
,,	,, ,,	১৯২৩ (৩য় সং)
পণ্ডিত কাত্যায়নী দত্ত ত্রিবেদী	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১৮
শ্রীরামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৫

৭। চন্দ্রশেখর

বাবু ব্রজনন্দন সহায়	খড়্গাবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৯০৭
পারসনাথ ত্রিপাঠি	আর্যভাষা পুস্তকালয়, কাশী	১৯১৫ (১ম সং)
		১৯১৮ (২য় সং)
শ্রীকার্তিকেয়চরণ মুখোপাধ্যায়	হিন্দীপুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩২
শ্রীকমল বি, এ,	প্রভাকর সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৩
অজ্ঞাতনামা	কিতাব মহল, এলাহাবাদ	১৯৫৭
অজ্ঞাতনামা	ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ	১৯৫৮
অজ্ঞাতনামা	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারাণসী	১৯৫৮

৮। রাধারাণী

জনৈকা পতিপ্রাণা অবলা	চন্দ্রপ্রভা প্রেস, বারাণসী	১৮৯৩
পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র	খড়্গাবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৪
,,	,, ,,	১৮৯৭ (ঐ, সংশোধিত সং)
পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ উপাধ্যায়	,, ,,	১৯১৪
	,, ,,	১৯২১ (ঐ, সং)

গিরিজা কুমার ঘোষ	গৃহলক্ষ্মী কার্যালয়, প্রয়াগ	১৯১১
পণ্ডিত কাত্যায়নী দত্ত ত্রিবেদী	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১৮
কার্তিকেয়চরণ মুখোপাধ্যায়	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯১২
নারায়ণ দাসগুপ্ত	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারাণসী	?
অজ্ঞাতনামা	কিতাব মহল, এলাহবাদ	?

৯। রজনী

বাবু ব্রজনন্দন সহায় এবং বাবু রঘুনাথ সিংহ	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১১ ১৯১৮ (২য় সং)
অক্ষয়বট মিশ্র	খড়্গবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৯১৭
অজ্ঞাতনামা	উপন্যাস বাহার অফিস, কাশী	১৯২৭
রামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৫, ১৯৩৭
অজ্ঞাত	কিতাব মহল, এলাহাবাদ	১৯৫৭
অজ্ঞাত	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কাশী	১৯৫৮
অজ্ঞাত	ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ	১৯৫৮

১০। কৃষ্ণকান্তের উইল

পণ্ডিত অযোধ্যা সিং উপাধ্যায়	খড়্গবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৮ ১৯১৮ (২য় সং)
গুলজারীলাল চতুর্বেদী	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১৬[১]
শ্রীরামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৪
শ্রীকমল বি, এ,	সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৩
শ্রীকৃষ্ণ হসরত	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারাণসী	১৯৫৪ (৪র্থ সং)[২]
অজ্ঞাতনামা	ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ	১৯৫৮

১১। রাজসিংহ

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র*	খড়্গবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৮৯৪
পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র	" "	১৮৯৪
শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী	" "	১৯১০
পণ্ডিত রামানন্দ দ্বিবেদী	বর্মন প্রেস, কলিকাতা	১৯১২[৪]

১। ভাবানুবাদ

২। প্রথম তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায় নি।

৩। অনুবাদটি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নামে প্রকাশিত হলেও প্রথম পরিচ্ছেদটি ছাড়া বাকী অংশ ভারতেন্দুর বাঙ্গালী স্ত্রী মল্লিকা দেবী অনুবাদ করেছিলেন এবং প্রকাশের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ দাস কিছু সংশোধন করেছিলেন।

৪। অনুবাদটির চারটি সংস্করণ হয়েছিল।

হরিদাস বৈদ্য	হরিদাস এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা	১৯১৮[৫]
রামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৭[৬]
শ্রীকৃষ্ণ হসরত	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারাণসী	১৯৫৪[৭]

১২। আনন্দমঠ

শ্রীকমলানন্দ সিংহ	ডায়মণ্ড জুবিলী প্রেস, কানপুর	১৯০৬
পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ শর্মা	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯২২
শ্রীযুক্ত মোহন	সরস্বতী পুস্তকমালা কার্যালয়	১৯২২
শ্রীকার্তিকেয়চরণ মুখোপাধ্যায়	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩২
শ্রীকমল বি, এ,	প্রভাকর সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৫
অজ্ঞাতনামা	কিতাব মহল, এলাহাবাদ	১৯৫৭
অজ্ঞাতনামা	ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ	১৯৫৮
অজ্ঞাতনামা	স্বরেন্দ্র এণ্ড কোং, এলাহাবাদ	১৯৫৮

১৩। দেবী চৌধুরাণী

বলদেব প্রসাদ মিশ্র[৮]	বেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানা, বোম্বাই	১৮৯৯
শ্রীজয়রাম দাস[৯]*	দর্পণ কার্যালয়, কাশী	১৯০৭
পণ্ডিত অক্ষয়বট মিশ্র এবং পণ্ডিত প্রভুদয়াল পাণ্ডেয়	খড়গবিবিলাস প্রেস, বাঁকিপুর	১৯১৩
পণ্ডিত জনার্দন ঝা 'দ্বিজ'	মনোমোহন পুস্তকালয়, বারাণসী	১৯১৩
শ্রীরামাশীষ সিংহ	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৭
শ্রীকমল যোশী	প্রভাকর সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৪
অজ্ঞাতনামা	হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, বারানসী	১০
অজ্ঞাতনামা	কিতাব মহল, এলাহবাদ	১০
অজ্ঞাতনামা	স্বরেন্দ্র এণ্ড কোং, এলাহবাদ	১০
অজ্ঞাতনামা	ইণ্ডিয়াদ প্রেস, প্রয়াগ	১০

৫। অনুবাদটির দুটি সংস্করণ হয়েছিল।

৬। অনুবাদটির তিনটি সংস্করণ হয়েছিল।

৭। অনুবাদটির তিনটি সংস্করণ হয়েছিল।

৮। দেবী (সত্যঘটনাপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস) শীর্ষকে প্রকাশিত। অনুবাদ হয়েছি ১৮৯০-এ কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮৯৯-এ.

৯। 'ফুলকুমারী' শীর্ষকে প্রকাশিত

১০। অনুবাদকের নাম এবং প্রকাশকাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে নিশ্চিতরূপে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ এর মধ্যে প্রকাশিত।

১৪। সীতারাম

রামেশ্বর প্রসাদ পাণ্ডেয়	হরিদাস এণ্ড কোং	১৯১৯[১১]
রামাশীষ সিংহ সাহিত্যভূষণ পণ্ডিত	হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৩৪[১২]
মহাবীর প্রসাদ মিশ্র	প্রভাকর সাহিত্যালোক, লখনৌ	১৯৫৪

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (হিন্দী)

১৯৫৮র মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল :

১। কলকাতার হিন্দী পুস্তক এজেন্সী থেকে হিন্দী বঙ্কিম গ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। তিনটি খণ্ডে এই গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে-বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং সীতারাম, দ্বিতীয় খণ্ডে দেবী-চৌধুরাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, রজনী এবং যুগলাঙ্গুরীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা এবং রাধারাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদক রামাশীষ সিংহ, প্রকাশকাল ১৯৩৭। তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদক কার্তিকেয় চরণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৯৩২। তৃতীয় খণ্ডটি কেন এবং কিভাবে প্রথম দুটি খণ্ডের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়নি।

২। ১৯২৭ সালে মনোমোহন পুস্তকালয়, কাশী থেকে তিন খণ্ডে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দমঠ, লোকরহস্য, দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা, রজনী, বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী এবং সীতারাম এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অনুবাদক ছিলেন বিশ্বনাথ শর্মা।

১১। 'বঙ্গশার্দুল সীতারাম' শীর্ষকে প্রকাশিত। ভূমিকায় প্রকাশক বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশের সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

১২। বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে সংকলিত।

বাংলাদেশে বঙ্কিম-চর্চা

ড. ওয়াকিল আহমদ

॥ এক ॥

ঢাকা-কলিকাতার ভৌগোলিক দূরত্ব সামান্য, কিন্তু বঙ্কিম-চর্চার কথা বললে সে ব্যবধান অনেকখানি বেড়ে যায়। বিভাগোত্তর চল্লিশ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণা হয়েছে, তার একটি জরিপ নিলে উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় না। এ যাবৎ পি-এইচ-ডি গবেষণা হয়েছে একটি : ডক্টর সারোয়ার জাহান বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী পান ১৯৮৩ সালে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল' নামে অভিসন্দর্ভটি ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আহমদ কবির 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচেতনা ও সমাজচিন্তা' শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ লিখছেন বলে আমি জানি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডক্টর দিলওয়ার হোসেনের 'বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার' শীর্ষক গবেষণাপত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অংশতঃ স্থান আছে। উক্ত গবেষণার জন্য তিনি ১৯৮১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আলোচনা-সমালোচনা পুস্তক সর্বসাকুল্যে দুটি : ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক' (১৯৭৯) এবং ডক্টর সারোয়ার জাহান প্রণীত 'বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র' (১৯৮৪)। প্রথম গ্রন্থখানি প্রকাশ করে ঢাকার 'বর্ণমিছিল', দ্বিতীয়খানি বাংলা একাডেমী। কলিকাতার 'চিরায়ত প্রকাশন' ডক্টর চৌধুরীর গ্রন্থ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করবেন বলে আমি শুনেছি।

এরপরই প্রবন্ধের কথা বলতে হয়। নানা আলোচনা পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা খুঁজলে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক ৫০-৬০টি প্রবন্ধের তালিকা তৈরী করা যায় কিন্তু সত্য কথা বলতে কি আলোচনা-যোগ্য অর্থবহ প্রবন্ধ ১০-১২টির বেশী হবে না। মূল্যায়ন করা যায় এমন প্রবন্ধের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :—

১। ডক্টর আহমদ শরীফ : বঙ্কিম-বীক্ষণ : অন্য নিরিখে, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, ১৯৭৯

২। ডক্টর আনিসুজ্জামান : দুর্গেশনন্দিনী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী, ১৯৭৬

৩। ডক্টর সারোয়ার জাহান : উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনা ও বঙ্কিমচন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮১

: বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতিক্রিয়া ও বঙ্কিম-প্রভাবিত ঔপন্যাসিকদের প্রবণতা, ঐ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩

: বঙ্কিম-উপন্যাসের উপসংহার, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ—১ম সংখ্যা ১৩৮৩-৮৪

: বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বিচার, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৭

৪। মাহমুদা খাতুন : কপালকুণ্ডলা ও মৃণ্ময়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৭৯
৫। রশীদ আল ফারুকী : বঙ্কিমচন্দ্র : আয়েষা, কপালকুণ্ডলা ও সীতারাম, বাংলা সাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ, ঢাকা, ১৩৯২ (২য় সং)
৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক : বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ, প্রিয়ম, ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৯৩
৭। ইজাজ হোসেন : পরাভূত বঙ্কিমচন্দ্র, সামাজিক উপন্যাস-প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১৩৮৬
৮। আকিমুন রহমান : আইভ্যানহো ও দুর্গেশনন্দিনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের দশ কোটি মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ আলোচনা খুবই অপ্রতুল।

সম্প্রতি বাংলা একাডেমী 'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা : রচনাপঞ্জি' (১৯৮৬) প্রকাশ করেছে। এতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অনূর্ধ ৩৮½ বছরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধের তালিকা আছে। গ্রন্থে ৪০ জন লেখকের ৪৭ খানি পুস্তক-পুস্তিকা এবং ৭১৪ জনের ১৩২৯ টি প্রবন্ধের এন্ট্রি আছে। নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অনুরূপ রচনা পঞ্জি তৈরীর কাজ চলছে; সম্পাদক আমাকে জানান যে তালিকাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের তালিকার প্রায় দ্বিগুণ হবে। আলোচনায়-গবেষণায় নজরুল ইসলাম প্রাধান্য পেয়েছেন তার প্রথম কারণ জাতীয় কবি হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পান। দ্বিতীয় কারণ নজরুলকে নিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান আছে—নজরুল একাডেমী, নজরুল ইন্‌ষ্টিটিউট। উভয় প্রতিষ্ঠান সরকারের দান-অনুদানে চলে। মুখপাত্র হিসাবে পত্রিকা ও নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করে। তৃতীয় কারণ প্রতি বছর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নজরুল জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে। রেডিও ও টেলিভিশন এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পত্র-পত্রিকাগুলি সাময়িকী ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে 'নজরুল চেয়ার' আছে যেখানে প্রবীণ অধ্যাপক নিয়োগ পান।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় বটে কিন্তু কোন রবীন্দ্র একাডেমী বা ইন্‌ষ্টিটিউট নেই। নজরুলের সঙ্গে তুলনায় আনুপাতিক হার অধিক না হলেও রবীন্দ্র-চর্চা অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথের স্থান বাংলার মানুষের হৃদয়ের গভীরে—এটা প্রমাণিত হয় পাকিস্তান আমলে যখন সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল মহল রবীন্দ্র সাহিত্য-সংগীতের বিরোধিতা করে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। যশোহরের সাগরদাঁড়ির কবি মধুসূদন দত্তের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়; যশোহরে একটি সংগঠনও আছে যা মধুসূদনের বিশিষ্ট লেখককে প্রতি বছর পুরস্কার দিয়ে থাকে। কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকী ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালিত হয় না; এবং বঙ্কিম-চর্চার কোনরূপ প্রতিষ্ঠানও নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কোনরূপ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা আমি শুনি নি। এতে প্রমাণিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যতখানি আগ্রহ থাকার কথা ততখানি আগ্রহ প্রকশিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন একটাই, 'কেন'? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ও বৃটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন বাংলা ভাষার চর্চা করেন। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা

অসাধারণ : বাংলা উপন্যাস শিল্পে, মননশীল ও সরস রচনায় তাঁর দান তুলনারহিত। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রকৃত প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপেক্ষা করতে পারে না।

॥ দুই ॥

বঙ্কিচন্দ্রের সমকালে ও উত্তরকালে তাঁর সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা হয়। এক দল অভিযোগ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সমাজ, পরিবার ও ধর্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তাঁর উপন্যাস পাঠ করে বিধবারা প্রণয়ে অনুপ্রাণিত হচ্ছে আর যুবতী সধবারা পূর্বপ্রণয়ীদের সাথে মিলনে উৎসাহিত হচ্ছে। আর এক দল অভিযোগ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তাঁর রচনায় হিন্দুর গৌরব এবং মুসলমানদের নিন্দা আছে। বিশ শতকের গোড়ায় প্রথম দলের কণ্ঠ স্তিমিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দলের কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠে সাতচল্লিশ সালে পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এসবের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এর দায়ভাগ কলিকাতারই তবে পুরানো কাসুন্দির কথা তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

To Nation Theory বা দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের সাথে বাংলাও বিভক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সহর হিসাবে ঢাকার উপর সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ভার পড়ে। শাসকগোষ্ঠীর অভিপ্রায় এবং রক্ষণশীল শ্রেণীর অভিমত অনুযায়ী ঢাকায় 'পাকিস্তান কালচার' গড়ে তোলার প্রয়াস চলে। এর জন্য রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রলোভন সমানভাবে কাজ করে। গবেষণায় politics ও fund সব সময় প্রভাব বিস্তার করে। পাকিস্তানের ধর্মীয় ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী বঙ্কিমচন্দ্রকে সহজে মেনে নেয় নি। 'পাকিস্তান কালচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে আছে। ডক্টর আনিসুজ্জমান ১৯৫৩ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আলোচনায় মুসলিম সমালোচকদের অনুসৃত ধারা মেনে চলেন নি ; এতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং কেউ কেউ তাঁকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারের কথা বলেন। আনিসুজ্জামান সাহেব শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আনন্দমঠের' সৌন্দর্য বিচার করেন। তৎকালীন 'দৈনিক সংবাদে' প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

ঢাকার মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে কিন্তু একথা প্রযোজ্য নয়। বাহান্নর 'ভাষা আন্দোলন' ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। কিন্তু স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম অব্যাহত থাকায় তাঁরা সমকালের সংকট ও সমস্যা-বলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় রবীন্দ্র সাহিত্য-সঙ্গীতের উপর আঘাত আসে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তার ও কৃষ্টির কবি : পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী রবীন্দ্র সাহিত্য বর্জন করার প্রস্তাব উঠে। একজন বুদ্ধিজীবী তো বলেই ফেললেন রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করতে প্রস্তুত আছেন। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করা যায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও ছিলেন না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির বাংলা বি, এ, অনার্স ও এম, এ, শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছাত্র বঙ্কিম সাহিত্য বর্জন করেন নি। আমরা শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য একটি অদৃশ্য চাপ ছিল। মুনীর

চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছু লেখেন নি, কিন্তু এম, এ, শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পড়াতেন—তাঁর অনবদ্য বাগ্‌ভঙ্গিমায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা, সৃষ্টিক্ষমতা, জীবনবোধ, চরিত্র-নির্মান ও ভাষা-সৌন্দর্য ও অপূর্ব গদ্যরীতির কথা বলে মোহিত করতেন বলে তাঁর ছাত্রগণ অনেকে জানিয়েছেন। বঙ্কিমকে স্রষ্টা হিসাবে দেখার এটি ছিল নতুন দিক্-নির্দেশনা। ১৯৫৬ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই 'কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা' অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ) প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল এবং ভারতের মুসলমান সম্পর্কে সংকীর্ণ মনোভাবের উল্লেখ করেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ও গদ্যশৈলীর প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে "বাংলা গদ্য মৌলিক সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং সুষমা লাভ করেছে।" মুনীর চৌধুরীর 'তুলনামূলক সমালোচনা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। ঐ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। সেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "'রাজসিংহ" কি কেবল জাতিবৈরিতা-উৎপাদক পাক-ভারতের এক ঐতিহাসিক বিষবৃক্ষ মন্ত্র? আমরা সে রকম মনে করি না। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের এবং বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই কৃতিত্ব বঙ্কিম অর্জন করেছেন তাঁর সামাজিক সত্তার অনুদার মনোভাবের জন্য নয়, তাঁর শিল্পীসত্তা—অনন্য সাধারণ প্রতিভাবলে—অনুপ্রাণিত সৃজন কর্মের মুহূর্তে সকল সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিল বলে। ...জীবনের মহত্তম আবেগ, তার গূঢ়তম সত্য, তার সহস্র জটিলতার মোহনীয় লীলা ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়ে এক বিস্ময়কর মহামূল্যবান জগৎ সৃষ্টি করে। জেবউন্নিসা যখন থেকে প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হতে শুরু করেছে সেই মুহূর্ত থেকে বঙ্কিম তার যবনী নাম ভুলে গেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে এই রমণীরত্নের সঙ্গে নিজেও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেছেন। মবারককে যেই এই বহ্নিশিখা স্পর্শ করল অমনি সেও প্রদীপ্ত হয়ে রাজসিংহকে নিষ্প্রভ করে দিল।" (পৃঃ ৩২)। বঙ্কিম-মূল্যায়নের এ-স্বর নতুন। একেই স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্কিম-সমালোচনার দিক্‌সূচক বলে আমরা উল্লেখ করেছি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-অর্জন বাংলাদেশের ইতিহাসে মহোত্তম ঘটনা। বাঙ্গালী জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এ-সময়। স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অভূতপূর্ব সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আমরা বঙ্কিম-চর্চার যে তালিকা দিয়েছি তার সবগুলি সত্তরের ও আশির দশকে রচিত। প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হলেও শূন্যতা ও উদাসীনতা কাটিয়ে উঠছে, এটাই বড় কথা।

॥ তিন ॥

এবার আলোচ্য গ্রন্থের ও প্রবন্ধের মূল্যায়ন করা যায়। ডক্টর সারোয়ার জাহান তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) পর্যন্ত সময়সীমায় রচিত প্রায় দেড়শত বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কাহিনী-নির্মাণে, জীবন-দৃষ্টিতে ও রচনা-শৈলীতে - কিভাবে পড়েছে, তার তথ্যবহুল যুক্তিনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দান করেন। Comparative

method বা তুলনামূলক পদ্ধতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যাচাই করেছেন। এর জন্য তাঁকে উপন্যাসের ডিটেলে যেতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পকর্মের জন্য নন্দিত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নিন্দিত হয়েছেন।

সারোয়ার জাহান দ্বিতীয় গ্রন্থে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ ও সীতারাম—এই সাতটি উপন্যাসে বর্ণিত 'মুসলিম প্রসঙ্গ' ও 'চরিত্র' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এসব বিষয়ে পূর্বসূরীদের অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া কতখানি বাস্তবসম্মত, কতখানি ভ্রান্ত তার পরীক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেন, কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্র হীন ও লঘুরূপে চিত্রিত হয়েছে, তবে অধিকাংশ কাল্পনিক চরিত্র 'শিল্পী বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ আবেগ ও মমতায় অবিস্মরণীয় দীপ্তি' পেয়েছে। ডক্টর সারোয়ার জাহান দীর্ঘকালের স্পর্শকাতর বিষয়টি উত্থাপিত করে ও বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণ করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন যে 'শৈল্পিক বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণ' কোন সরল রৈখিক বিচার দ্বারা হয় না। বঙ্কিম-উপন্যাসের নানা মাত্রিকতা আছে; তাঁর বিচারের মাপকাঠিও হবে নানা মাত্রিক।

সারোয়ার জাহানের চারটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম তিনটি পূর্বোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। চতুর্থ প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির সেমিনারে পঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা, মানসিক প্রবণতা, সমাজ-মনস্কতা, নীতিবোধ, শিল্পচেতনা ইত্যাদি বিষয় প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচিত হয়েছে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের উপর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন।

ডক্টর দিলওয়ার হোসেন তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও রাজসিংহ তিনটি উপন্যাসকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী তিনি মুঘল ইতিহাসের ঘটনাগত ও চরিত্রগত উপাদান বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের "ইতিহাসবোধ তাঁকে অসম্ভব সৃজনশীল করে তুলেছিল।" (পৃঃ ১৫৩)। তাঁর আরও ধারণা যে মুঘল ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে "স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পরিস্ফুট করেছে।" (পৃঃ ১৭৫)। প্রধানতঃ এরূপ ধারণা সামনে রেখে ডক্টর দিলওয়ার হোসেন ১০৮ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সরস মিশ্রিত উপন্যাসত্রয় ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাস ও সমাজকে অতিক্রম করে গেছে মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র-চিত্রণ—লেখক সেদিকটিও আলোকপাত করেছেন।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক' পুস্তিকাখানি নামে প্রমাণ করে ভিন্নধর্মী রচনা। মার্কসবাদী লেখক-সমালোচক হিসাবে তিনি পরিচিত। গ্রন্থের প্রচ্ছদে আছে—"জমিদার ও কৃষকের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এদের সম্পর্কে তাঁর অনুভব ও চিন্তা নিয়েই বর্তমান বই। আলোচনার বিস্তারকে ছাড়িয়ে গেছে আলোচনার গভীরতা।" বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী এই চারটি উপন্যাসে জমিদার আছেন কিন্তু জমিদারী নেই। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, মহেন্দ্র ও ব্রজেশ্বর নামেই জমিদার—জমিদারের দম্ভ, দাপট, ক্ষমতা, প্রজাপীড়ন ইত্যাদি প্রকাশিত হয় নি—কৃষক তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কৃষকের কথা আছে প্রবন্ধে, তাও সামান্য। প্রফেসর চৌধুরী বলেছেন, জমিদার ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধার পাত্র, কৃষক অনুকম্পার পাত্র। তিনি জমিদার গৃহে

গেছেন, কিন্তু কৃষকের কুটীরে গমন তাঁর পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। তাই বঙ্কিমের 'কল্পনাধর্মী সাহিত্যে' কৃষক আসেনি। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার প্রীতি তাঁর সামন্তবাদ প্রীতিরই অপর পিঠ। জাতীয়তাবাদী লেখক স্বীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। উপনিবেশের সৃষ্ট বুর্জোয়া বঙ্কিমের পক্ষে তা আরও অসম্ভব ছিল। জাতীয়তাবাদ, হিতবাদ, মানববাদ, সাম্যবাদ, সামন্তবাদ, ভক্তিবাদ, ইংরাজ প্রীতি, মোঘল বিদ্বেষ ইত্যাদি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান-ধারণার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। বঙ্কিমের যুগে বঙ্কিমের শ্রেণী-অবস্থানের কারণেই এরূপটি হয়েছে। কেবল বহির্জীবন নয়, জমিদারের অন্তর্জীবন, ব্যক্তি-চরিত্র ও সামাজিক সমস্যার কথাও প্রফেসর চৌধুরী বলেছেন। আর এখানেই তাঁর অলোচনা বিস্তারকে ছাড়িয়ে গভীরতায় পৌছেছে। তাঁর ভাষা তীক্ষ্ণ, মননশীল ও আকর্ষণীয়।

ডক্টর আহমদ শরীফের 'বঙ্কিম বীক্ষা ; অন্য নিরিখে' অত্যন্ত সারগর্ভ রচনা। বঙ্কিম সাহিত্যে বঙ্কিম-মানসের পুরো চালচিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতা ও শৃংখলার সাথে তুলে ধরেছেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। রম্যরচনায় তাঁর মন মুক্ত, জীবনদৃষ্টি উদার, চিন্তাভাবনা বেপরোয়া ; প্রবন্ধে তিনি হিতবাদী, বিবেকবান ও পরিবেশ সচেতন আর উপন্যাসের শুরুতে জীবনবাদী ও মানবদরদী শিল্পী, শেষের দিকে জাতিসত্তা নির্মাণে ও হিন্দুত্ব প্রচারে আগ্রহী। ডক্টর শরীফের ভাষায়, "সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু 'মানুষ' হিসেবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি 'হিন্দু' হিসেবে।" (পৃঃ ২০১)। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগপটভূমি, ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য-কর্ম বিশ্লেষণ করে এ-সত্যই উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন এই প্রবন্ধে। তিনি বলেন, "বঙ্কিম-চন্দ্রের দুর্ভাগ্য তিনি নাস্তিক হতে পারেন নি।" (পৃঃ ১৮৩)। অসাধারণ প্রতিভা বলে তিনি 'মানুষ' এঁকেছেন, কিন্তু আস্তিক বলে দেশ-জাতি-সমাজ-শাস্ত্র-নীতি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাধিক মুসলিম চরিত্র অঙ্কন করেছেন, আর তাঁর সহানুভূতি পেয়ে কোন কোন চরিত্র হয়েছে 'অনন্য'।

রশীদ আল ফারুকী 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা, 'কপালকুণ্ডলা'র কপালকুণ্ডলা এবং 'সীতারামে'র সীতারাম চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক সংকলিত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "চরিত্র মনোনয়নের ক্ষেত্রে আমি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত আনন্দ ও বোধকেই প্রাধান্য দিয়েছি।" এ যুগের সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন আছে তাঁর উক্তিতে। রশীদ আল ফারুকী তিনটি চরিত্র আঁকতে গিয়ে উপন্যাস ও উপন্যাসকারকেও বাদ দেন নি। তাঁর আলোচনা বর্ণনাধর্মী, কিন্তু পাণ্ডিত্য-বর্জিত নয়।

অধ্যাপিকা মাহমুদা খাতুন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সাথে দামোদর মুখো-পাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী'র পাশাপাশি আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, লেখিকার ভাষায় তা হল, "সাহিত্য-রচনায় তাঁর শক্তি ও আন্তরিকতা, শিল্প ও মনুষ্যত্ববোধ, তাঁর সবল ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড আশাবাদ অনুকরণের অতীত। সেজন্য সমকালীন লেখকেরা তাঁর উপন্যাসের বহিরঙ্গ লক্ষণগুলিরই অনুকরণ করেছেন, কিন্তু বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রাণ তাঁদের রচনায় সঞ্চারিত হয় নি।" (পৃঃ ২৩০)।

পি-এইচ-ডি গবেষক আকিমুন রহমান 'আইভ্যানহো ও দুর্গেশনন্দিনী' প্রবন্ধে স্কটের 'আইভ্যানহো'র এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করে স্কটের প্রভাবের কথা বলে মন্তব্য করেন, "স্কটের থেকে স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বড়। স্কট যেখানে রোমান্স রচয়িতা, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সৌন্দর্য ও জীবনবোধসম্পন্ন উপন্যাসিক। তাই দেখা যায় 'আইভ্যানহো'র সমাপ্তি ঘটেছে রূপকথার ভঙ্গিতে আর 'দুর্গেশনন্দিনী' পরিসমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসের রীতিতে।" (পৃঃ ১০৯)।

'অপরাভূত বঙ্কিমচন্দ্র, সামাজিক উপন্যাস প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে তরুণ অধ্যাপক ইমাজ হোসেন 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসদ্বয়ের আলোচনা করেন। নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র আলোচনা করে তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা তাঁর প্রচার ধর্মকে ছাড়িয়ে গেছে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' প্রবন্ধে আবুল কাসেম ফজলুল হক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যনীতির উদাহরণ তুলে ধরেন এবং কলাকৈবল্যবাদের নামে অনাচার সৃষ্টি অপেক্ষা নীতি ও আদর্শের বন্ধন মানব সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রেয়ো মনে করেণ। তিনি বলেন, "আজ বঙ্কিমের চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান আমাদের করা দরকার অনুকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা বঙ্কিমের কালে ফিরে যাওয়ার অভিপ্রায়ে নয়; একালের নতুন আদর্শ নির্মাণে অতীত থেকে প্রয়োজনীয় রস আহরণের উদ্দেশ্যে।" (পৃঃ ৬)।

আলোচনার এখানেই সমাপ্তিরেখা টানতে চাই। বাংলাদেশে বঙ্কিম-চর্চার জমি তৈরী হয়েছে, আলোচনার ধারা পাল্টিয়েছে, সাহিত্যিক বঙ্কিম প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন তাঁর অসামান্য শিল্পীসত্তার গুণেই। বেশীদুর এগোয়নি, তবে যে-পথে এগুবে, তা ঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা আশা করি, বঙ্কিম-চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকা-কলিকাতার দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসবে এবং একদিন তা আর থাকবে না।

বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা : ১৯৫২-১৯৮৫

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, পত্রিকাসম্পাদক এবং স্বকালের প্রথম উচ্চশিক্ষিত বাঙালি। বিগত এক শতাব্দীকাল ধরে তাঁর জীবন ও কর্মপ্রসঙ্গে প্রচুর আলোচনা হয়েছে—একশ্রেণীর সমালোচকের নিকট তিনি ঋষিরূপে নন্দিত, অন্য শ্রেণীর নিকট সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান সমালোচকরাই যে তাঁর নিন্দা করেছেন তাই নয়, তাঁর স্বজাতীয় সমালোচকগণও তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের সমালোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের সনাতন মূল্যবোধগুলোকে চূর্ণ করেছেন, পাশ্চাত্য আচার-আচরণ আমদানি করেছেন, বিধবাদের প্রেম ও পরিণয়ের প্রশ্রয় দিয়েছেন, বিবাহিত হিন্দু রমণীদের পূর্বপ্রণয়ীদের সঙ্গে মিলনে উৎসাহ দিয়েছেন,[১] ইত্যাদি।

এক শ্রেণীর মুসলমান লেখকের নিকট তিনি সাম্প্রদায়িক এবং মুসলিম বিদ্বেষী, মুসলিম ইতিহাস বিকৃতকারী—এইসব অভিযোগ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অর্জন করেছে বিপুল জনপ্রিয়তা এবং বিস্তার করেছে গভীর প্রভাব।

॥ এক ॥

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর রচনাবলী কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে সেটি পর্যবেক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য। বলতে গেলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা মুসলমান লেখকদের বহুজনের রচনায় পাওয়া যায়। তাঁরা শুধু প্রবন্ধ লিখে নয় উপন্যাস লিখেও তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে প্রথম মুসলিম প্রসঙ্গের বিকৃতির অভিযোগ এনে বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনা করেন।[২] এর পর 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৮৯৮) কলকাতা অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩] এতে বঙ্কিম-প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মতীয়র রহমান মিহিরও সুধাকর পত্রিকায় মোক্ষপ্রাপ্তি (১৩০৯) উপন্যাস লিখে, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রবন্ধে এবং বঙ্কিম উপন্যাসের বিপরীত

১। ডঃ সারোয়ার জাহান, বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র, প্রঃ সঃ ঢাকা ১৯৮৪, পৃঃ ১১৮

২। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা পরিবর্ধিত দ্বিঃ সঃ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ১৮৭

৩। পূর্বোক্ত সারোয়ার জাহান, পৃঃ ১২৪

কাহিনী রচনা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সিরাজী রায়নন্দিনী, তারাবাঈ, নূর উদ্দীন (১৯১৬), মুজিবর রহমান হাসানগঙ্গা বাহমনি (১৯১৭), শেখ মোঃ ইদ্রিস আলী বঙ্কিমদুহিতা (১৯২৫), সৈয়দ আফতাব হোসেন অশ্রুরেখা (১৯২৭) ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিম উপন্যাসের বিক্ষুব্ধ প্রত্যুত্তর লিখে এবং 'মুসলিম' সমাজ আনন্দমঠ এর বহ্নুৎসব করে বঙ্কিম বিরোধিতা করেছিলেন।

॥ দুই ॥

'কুরুচিপূর্ণ' সমালোচনাকে মুসলমান সমাজ সর্বৈব সমর্থন করেনি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ ধরনের রচনা সম্পর্কে বলেছিলেন '----অনেক সময় হিন্দুরা পরিহাস-প্রিয়তাবশে, বা প্রকৃত ভ্রমক্রমে মুসলমানদের অগৌরবজনক কোন কথা লেখে অমনি মুসলমান তাহাতে মুসলমান বিদ্বেষের গন্ধ অনুভব করিয়া হিন্দুদের চতুর্দশ পুরুষে মায় দেবদেবীর পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করিয়া নিজের কল্পিত ক্ষোভের নিবারণ করে।'[৪] বঙ্কিম সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচার করবার প্রয়াস মুসলমান সমাজে ক্রমশ একটি প্রবণতারূপে দেখা দেয়। ডঃ শহীদুল্লাহ্র পর কাজী আবদুল ওদুদ 'প্রবাসী'তে 'মুসলমান সাহিত্যিক' (১৩২৫) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন কিছু হিন্দু সাহিত্যিক মুসলমান চরিত্রকে হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন বলে মুসলমান সাহিত্যিকগণ তার উল্টো সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। 'আমরা মুসলমান সাহিত্যিকদের নিকট পূর্ণ সৃষ্টি চাই, শুধু নিন্দাবাদ চাইনা'।[৫] বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে কাজী আবদুল ওদুদ[৬] এবং আবুল ফজল[৭] প্রবন্ধ লিখেন।

ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান (Islamic Republic of Pakistan) সৃষ্টির পর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চলেছিল ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া—পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র সাহিত্য তথা হিন্দু রচিত সাহিত্য বর্জনের প্রয়াস চলেছিল। তবে, বাংলা ভাষা সাহিত্যকে ধর্মীয় রং দেবার অদ্ভুত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবার সংগ্রামী প্রবণতাও জন্মেছিল সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তার প্রমাণ।

সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে হিন্দু লেখকদের রচনা সম্পর্কে কর্তা ব্যক্তিদের কারো কারো অনীহা দেখা যায়—প্রয়োজনের খাতিরে সেই অনীহাকে মূল্য দেয়া যায় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার কৃষক, বিড়াল, বাঙ্গালা ভাষা মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় বারবার এসেছে—সম্মান এবং এম, এ শ্রেণীতে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বঙ্কিম পাঠ্য ছিল। পরবর্তী কালে এখানে, অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়েও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ষাটের দশকে

৪। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা, আল এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩

৫। কাজী আবদুল ওদুদ, মুসলমান সাহিত্যিক, প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৫, পৃঃ ২২২, ২২৪

৬। কাজী আবদুলওদুদ, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, শাশ্বত বঙ্গ, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ১২৬

৭। আবুল ফজল, আবুল ফজল রচনাবলী (বঙ্কিমচন্দ্র), চট্টগ্রাম, ১৩৮৫, পৃঃ ৬৭১

শাসক গোষ্ঠি যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র সাহিত্য পঠন-পাঠন নিয়ে নানা প্রকার বিতর্ক উত্থাপন করে তখন সাধারণভাবে বাঙ্গালী পাঠক তার মাতৃভাষায় রচিত কাব্য সাহিত্যের প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে। বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতি একটা বৈরদৃষ্টি দ্বিজাতিতত্ত্ব সমর্থকদের মধ্যে প্রবলভাবেই সক্রিয় ছিল। তবু ঢাকা থেকে বঙ্কিম উপন্যাসের প্রচুর পুনর্মুদ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে বঙ্কিম রচনাবলী পুথিঘর, বইঘর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় বই যখন পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্মুদ্রণের ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয় তখন গোপনে প্রকাশস্থান লাহোর করাচি বলে পশ্চিমবঙ্গের রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত ও পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা-গবেষণাও হতে থাকে।

বঙ্কিম সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা অজস্র হলেও বঙ্কিম সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নগণ্য সংখ্যকেরই পদচারণা ঘটেছে। তবু প্রবন্ধাকারে গ্রন্থাকারে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম সাহিত্যের মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন কিছু-কিছু লক্ষ্য করা গেছে। মুসলিম মধ্যবিত্তের উন্মেষযুগে মুসলমান পাঠকের কাছে বঙ্কিম সমাদর পেয়েছেন কম। হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতির কালে বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অনেকটা বাধা বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। সে কারণে বঙ্কিম আলোচনায় তাদের উৎসাহ ছিল সীমাবদ্ধ।

॥ তিন ॥

যতদূর জানা যায়, বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তরুণ-কবি আতাউর রহমান ১৯৫২ সালে 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা'[৮] শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেন তাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো : ইংরেজ-বিরোধিতা না-করা কালের দৃষ্টিতে বঙ্কিমের অপরাধ না হলেও ব্রাহ্মদের সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা অসঙ্গত। কোন-কোন মুসলমান চরিত্র বঙ্কিমের হাতে হেয় হলেও সব মুসলমান চরিত্রই তা হয় নি। মীরকাসেম দলনী-আয়েশা উজ্জ্বল চরিত্র —আয়েশা-জগৎসিংহ প্রেমচিত্র প্রতিক্রিয়াশীল নয়। পূর্ববর্তীকালের আবেগ-চালিত বঙ্কিম সমালোচনা থেকে এটি সুস্থ বিবেচনার সূত্রপাত।

১৯৫৩ সালে তরুণ সমালোচক অনিসুজ্জামান (পরে ডক্টর) 'আনন্দমঠ'-এর একটি সমালোচনা লিখেন।[৯] তা ছিল মুসলমানদের বঙ্কিম-সমালোচনার প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। সেই কারণে কেউ কেউ তাঁকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[১০]

৮। সাপ্তাহিক পূর্ববাংলা, (সম্পাদক : আলী আহমদ খান), ঈদ সংখ্যা ১৯৫২।

৯। আনিসুজ্জামান, আনন্দমঠ।

১০। ডঃ আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, ভূমিকা, ডঃ সারোয়ার জাহান রচিত বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ছ।

অতঃপর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'[১১] প্রণেতারা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'বাংলা গদ্যের পরিণতি' শীর্ষক আলোচনা লেখেন মুহম্মদ আবদুল হাই। এখানে তিনি বঙ্কিম সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা এবং মশাররফ সম্পর্কে ৪০ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করেছেন। এই অসমতাকে সমর্থনে লেখকের হয়তো যুক্তি আছে। তাঁর বঙ্কিম বিচারের বৈশিষ্ট্য আমাদের বিবেচ্য।

অধ্যাপক হাই-এর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ—তিনি বলেছেন: 'দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ও বাংলার বাইরে যেভাবে বঙ্কিম পঠিত হয়েছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বঙ্কিমের সমালোচনা' তেমন হয় নি। ----রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিভূ হিসাবে বঙ্কিম বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ----সাহিত্যিক বঙ্কিম সেজন্য তাঁদের হাতে ঋষি বঙ্কিমে পরিণত হয়েছেন।[১২] লেখকের মতে সামাজিক উপন্যাসগুলোতে বঙ্কিম 'নীতিবিদ' এবং 'রক্ষণশীল' 'হিন্দু সমাজমনের আদর্শের পূজারী'। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের অভিমত 'ইতিহাস অংশ অবাস্তব এবং মৃতকল্প'—চরিত্রগুলো লেখকের 'বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক।' 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাই বলেছেন: 'ইংরেজ রাজত্বকে বরণ করে তিনি যে জয়োল্লাস করেছেন তা রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধির পরিচয় বহন করে না।'

অধ্যাপক আবদুল হাই মনে করেন সব উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি 'অবাস্তব' ও 'কল্পনাশ্রয়ী'। 'জীবনের সঙ্গে নাড়ির প্রত্যক্ষ যোগ তাঁর ছিল না। হিন্দু ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় উপন্যাসগুলোতে তিনি আবেগপ্রবণ ও রোমান্টিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক 'কমলাকান্তের দপ্তর'কেই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এ গ্রন্থেই মানব চরিত্র সম্পর্কে 'সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের' প্রকাশ ঘটেছে। অধ্যাপক হাই বঙ্কিমকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেন নি তবে তাঁর মধ্যে রক্ষণশীলতা ও মুসলিম বিদ্বেষ ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের শিল্পসৌকর্য ব্যাখ্যা করে লেখক বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনীতেই বাংলা সাহিত্যের দৈন্য নিবৃত্ত হয়েছিল এবং সাহিত্যিকদের কল্পনাজগতের অসাধারণ প্রসার হয়েছিল। ----বাংলা গদ্য মৌলিক সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং সুষমা লাভ করেছে।'[১৩] তিনি মনে করেন বিদ্যাসাগরী এবং আলালী ও হুতোমী বাংলাকে ভেঙে চুরে বঙ্কিম বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। —তাঁর ভাষা এবং ভাষানুসৃত কল্পনার মুক্তভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়েছিল।'[১৪] প্রফেসর হাই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদৃষ্টিকে প্রয়োজনে সমালোচনা করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর ভাষাশৈলীর। ইতিপূর্বে কম মুসলমান সমালোচকই বঙ্কিম সাহিত্যের এমন স্বচ্ছ ও নির্মোহ সমালোচনা করেছেন।

১১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রঃ সঃ ঢাকা, ১৯৫৬

১২। তদেব পৃঃ ৭০

১৩। তদেব পৃঃ ৬৮

১৪। তদেব পৃ ৬৯

ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ ১৩৬৭ (১৯৬০) সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পাদনা করেন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করে নিউ এজ পাব্লিকেশন, ঢাকা। সম্পাদক এই উপন্যাসের প্রারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সংযোজিত করেছেন। অতঃপর কৃষ্ণকান্তের উইল এবং বঙ্কিম উপন্যাস সম্পর্কিত নয়জন লেখকের নয়টি আলোচনা—(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীল কুমার দে, সুকুমার সেন, যোগেশচন্দ্র বাগল অরবিন্দ পোদ্দার, অচ্যুত গোস্বামী) সন্নিবেশিত করেছেন।

অধ্যাপক গুহ প্রণীত ভূমিকানিবন্ধটি বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন এবং ভাষাশৈলী সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন গতানুগতিকতা মুক্ত। তিনি মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্তরের উপন্যাসগুলিতে 'গভীর জীবনবোধ, সামাজিক জীবনযাত্রার পটভূমিতে চরিত্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও পরিণতি, ঘটনা সংস্থানের সুসমঞ্জস পারম্পর্য, হৃদয়বৃত্তি ও বিধিবিধানের বিরোধে'র অভাব রয়েছে এবং সেখানে 'বঙ্কিমের কল্পনাশ্রয়ী, বর্তমান পরিবেশ থেকে পলাতক কবি-মানসের সাক্ষাৎ পাই।' বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এর 'ব্যতিক্রম'। বস্তুত, সার্থক সামাজিক উপন্যাস।'[১৪ক]

বাংলার হিন্দু সমাজে প্রধান দুই সমস্যা—বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ এ-দুই উপন্যাসের মূল উপাদান। এ দুই সমস্যাকে বাংলা সাহিত্যের তিন প্রধান কথাশিল্পী—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে দেখেছেন লেখক তার সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে তিনি সহনশীল ভাষায় বলেছেন: 'পৃথিবীর সর্বসুখ বঞ্চিতা মাতৃত্বের-অধিকার বিচ্যুতা আনন্দলেশহীন বিধবার জীবনের বেদনাময় সমস্যাকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত কোরলেন।' তিনি নীতিবিগর্হিত হৃদয়বৃত্তিকে ক্ষমা করতে পারেন নি এই অভিযোগ বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনার সর্বকালের প্রসঙ্গ। নীতিহীন হৃদয়বৃত্তির শোচনীয় পরিণাম চিত্রিত করে বঙ্কিম সমাজে যে ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তার পরিবর্তে 'গভীর মানবিক সহানুভূতি পাঠক চিত্তকে অশ্রুসজল করে তুলেছে' ...এ কথা ভাবতে আনন্দ হয় যে নীতিবিদ বঙ্কিমচন্দ্র বারবারই শিল্পী বঙ্কিম চন্দ্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে।'[১৪খ] নীতি ও জীবনের যে বিরোধে উপন্যাস শেষ হয়েছে, অধ্যাপক গুহ মনে করেন সেখানেই ঘটনার অনুরণন শেষ হয় নি।

১৯৬৫ সালে ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ 'বঙ্কিম সাহিত্যে নারী / আয়েষা' শীর্ষক একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা প্রকাশ করেন। আয়েষা-জগৎসিংহ প্রেম এতকাল মুসলিম সমাজকে যেভাবে বিক্ষুব্ধ করে রেখেছিল ডঃ দীন মহম্মদ সে-ধারাকে উপেক্ষা করে আয়েষার জীবন-আলেখ্য ব্যাখ্যায় নিরপেক্ষ ও নান্দনিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেন—তাঁর বক্তব্য বঙ্কিম সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন আহ্বান:

১৪ক। অজিত কুমার গুহ সম্পাদিত কৃষ্ণকান্তের উইল, ঢাকা ১৩৬৭, পৃঃ ৵
১৪খ। তদেব পৃ ।৵

> 'আমরা এস্থলে কাব্যরূপে যাহা যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ নিরূপণের কষ্টিপাথরে শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধার কাছে ইহাদের আবেদনের রস পরিণাম বিচার করিতে চেষ্টা করিব।[১৫]

লেখক শিল্পরসের দিক থেকে নারীচরিত্র রচনায় বঙ্কিমের দক্ষতা বিবেচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে আয়েষা একজন নারী মাত্র। তিনি ভালবেসেছেন একজন পুরুষকে—আয়েষা মুসলমান এবং জগৎসিংহ হিন্দু বলে প্রেমের ক্ষেত্রে বৈকল্য ঘটেনি। হতে পারে লেখকমনে আদর্শবোধ বেশী সক্রিয় ছিল কিন্তু আয়েষা হৃদয়হীনা, আদর্শের পুতুল নয়—তার যেমন আছে রূপ তেমনি আছে হৃদয়-ঐশ্বর্য। সমালোচক লক্ষ্য করেছেন জগৎসিংহ-তিলোত্তমার মিলন তার হৃদয়ে যত বেদনারই সঞ্চার করুক, প্রতিবাদহীন সহনশীলতায় তা হয়েছে মহৎ। এক ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজনাময় পরিবেশে ডঃ দীনমুহম্মদের এই ব্যাখ্যা অবশ্যি ব্যতিক্রমধর্মী।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ চারখণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন (১৯৬৫)। এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে—এতে 'উপন্যাস সাহিত্য' অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক নাতিদীর্ঘ আলোচনাটি সরল এবং বস্তুনিষ্ঠ। 'মৃণালিনী' প্রসঙ্গে কাজী সাহেব পুরনো কথাটি নতুন করে বলেছেন—যেমন, বঙ্কিম হিন্দুজাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা, যে কারণে 'শিল্পী' হয়েছেন 'ঋষি' ইত্যাদি। তবে বঙ্কিমসৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো সম্পর্কে লেখক বলেছেন, তারা 'নবযুগের নায়িকা', ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে প্রখর।[১৬] সমকালীন পাকিস্তানী শাসকদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এবং ইসলামীকরণের তোড়কে উপেক্ষা করে লেখকের বিচারবোধ আশ্চর্য মধ্যপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

একই বছরে (১৯৬৮) ডঃ আহমদ শরীফ 'বঙ্কিম মানস' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবোধ ও মানস বিশ্লেষণ করেছেন। একটি বিরোধী পরিবেশে বলে নয়, ডঃ শরীফ ব্যক্তিগত অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি, মুসলিম বিদ্বেষ, স্বজাতিপ্রীতির সাহসী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে ডঃ শরীফের মন্তব্য কঠোর বলে মনে হবে। তবে তিনি নিজেই উপসংহারে বলেছেন :

> বঙ্কিমের চিন্তায়, বচনে ও আচরণে কোন অসংগতি নেই। বরং বলতে গেলে তাঁর মধ্যেই উনিশ শতকী মানসের স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছে। সে হিসেবে বঙ্কিম যুগস্রষ্টা, যুগন্ধর ও যুগপ্রতিভূ।[১৭]

এ প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিম সাহিত্যের কতকগুলো মূল ধারণাকে আপন ভাবনার অনুকূলে স্পষ্ট করে তুলেছেন :

১৫। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, সাহিত্য সম্ভার, প্র-প্র, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬১ ১৬২

১৬। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, প্র-প্র, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৯-১৯০

১৭। ডঃ আহমদ শরিফ বিচিত চিন্তা (বঙ্কিম মানস) প্র স ঢাকা ১৯৬৮ পৃঃ (৩০৯-৩২১) ৩২১

১। বঙ্কিমে ভারতীয় জাতীয়তা নেই, আছে বাঙালী হিন্দু জাতীয়তা।
২। বঙ্কিমের পক্ষে য়ুরোপের মহিমা প্রকাশ্যে স্বীকার করায় বাধা ছিল, তাই তিনি খিড়কী পথেই য়ুরোপের অবদান অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছেন।
৩। যে জাতিদ্রোহী রাজপুত মুঘলের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল বঙ্কিম তাদের স্বদেশপ্রেমের মহিমা প্রচার করেছেন।
৪। তাঁর সাম্যবাদে দুকূল রক্ষার অপচেষ্টা প্রকট—ধর্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য র‍্যাশনালিজমের অপপ্রয়োগ।
৫। প্রগতিবাদী ও জাতিগত প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন জাতীয় উন্নয়নমূলক আন্দোলনে সমর্থন দেন নি।
৬। বঙ্কিম ছিলেন বিজাতি বিদ্বেষী; তাই তিনি যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন তারা তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠী···। তাদের বিরুদ্ধে যে 'প্রতিহিংসাবৃত্তি তিনি উসকিয়ে দিলেন', তাতে হিন্দু মনে মুসলিম বিদ্বেষ জাগল 'ভাঙল মুসলমানদের মন'।

ডঃ শরীফের এই সব ধারণা কতটা সত্য, কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে। এখানে যেমন আছে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ ,তেমনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিবাদী ডঃ শরীফ নতুন চিন্তার পথ-রেখা সৃষ্টি করেছেন বলেও ধরে নেওয়া যায়।

॥ চার—১ ॥

স্বাধীন বাংলাদেশে 'নিরাবেগ ও বস্তুনিষ্ঠ' বঙ্কিম আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির আশাবাদ কেউ কেউ ব্যক্ত করেছিলেন। এদিক থেকে ডঃ আহমদ শরীফের 'বঙ্কিম বীক্ষা: অন্য নিরিখে' [১৮] বিবেচ্য। এটি খুব সম্ভব, বাংলাদেশকালে, বঙ্কিম বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি, প্রতীচ্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকালে ইয়োরোপীয় নব্যতত্ত্বের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফের সমাজ-নিন্দিত প্রেম, দুর্গেশনন্দিনীর লাম্পট্যদুষ্ট অভিরাম স্বামী ও বীরেন্দ্র-সিংহ এবং তাঁদের অবৈধ সন্তান বিমলা-তিলোত্তমা বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করেছে। ডঃ শরীফ খুশি হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, দিগন্তবিসারী দৃষ্টি' লক্ষ্য করে—তিনি অ-খুশি হয়েছেন অন্য কারণে—তিনি মনে করেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভাগ্য তিনি নাস্তিক হতে পারেন নি'।[১৮] ডঃ শরীফের একটি তাত্ত্বিক ধারণা হলো, সন্ত অগাস্তিন থেকে করকুখ আহমদ পর্যন্ত সকল আস্তিক মানুষ যে মোহের (ধর্ম ?) শিকার হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, বঙ্কিমও তেমনি তাঁর দিগন্তবিসারী দৃষ্টিকে বন্দী করেছেন শাস্ত্র ও সংস্কারের খাঁচায়।[১৯] রামমোহন থেকে ইকবাল শাস্ত্রে নবজীবনের আবেহায়াত অনুসন্ধান করেছেন তার স্বরূপ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি কারণ অন্ধচেতনা ও বন্ধ্যা বাঞ্ছা এসেছে নতুন প্রতিবেশ থেকেই। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে

১৮। ডঃ আহমদ শরীফ, বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরিখে, ভাষা সাহিত্য পত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮২, পৃঃ ৫২

১৯। তদেব পৃঃ ৫১

বঙ্কিম দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি, একালে মানুষ আব মনুষ্যত্ব তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। —'তাঁর সেবকসত্তা শিল্পীসত্তার কাছে পুনঃ পুনঃ হার মেনেছে'।[২০] এই চেতনা নাস্তিক্যবাদী ডঃ শরীফের প্রবন্ধে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করেছে। নতুন ভাবনা ও বিশ্বাসে ডঃ শরীফের বক্তব্য লাভ করেছে গতানুগতিকতাহীন চরিত্র ; সংক্ষেপে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : জেবুন্নিসা-মবারক, আওরঙ্গজেব-নির্মল কুমারী ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এতকাল মুসলিম সমাজে যে ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে ডঃ শরীফ তার পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। 'কখনও কাহাকেও ভালবাসি নাই, এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিযাছি'—আওরঙ্গজেবের এই সংলাপ প্রসঙ্গে ডঃ শরীফের মন্তব্য 'এখানে আওরঙ্গজেব অতি উৎকৃষ্ট রুচি-সংস্কৃতি সম্পন্ন হৃদয়বান অতুল্য মানুষ...... শুধু অনিন্দ্য প্রেমিক নন—মহৎ সুহৃদও বটে।'[২১]

জেবুন্নিসা-মবারক প্রেম 'কামজ' বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন এবং শাহজাদী সম্পর্কিত সেই কাহিনী মুসলিম সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মবারকের মৃত্যুর পর জেবুন্নিসা অনুভব করলো : 'বাদশাজাদীরাও ভালবাসে, বাদ-শাজাদীও নারী' এ প্রসঙ্গে ডঃ শরীফের মন্তব্য হলো : 'জেবুন্নিসা পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হযে, প্রেমৈক চিরন্তন নারী হয়ে অপূর্ব মহিমায় ও সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে উঠলো। সে প্রেমধন্যা, সাধনা সুন্দর নারীরূপে আমাদের চিত্তলোকে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে' আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরানীতে মুসলমানদের প্রতি অশালীন কটূক্তি আছে। মুসলিম বিদ্বেষ বশে এমনটি ঘটলে দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, সীতারামেও তা ঘটতো বলে লেখক মনে করেন। তাঁর ধারণা ঐ কটূক্তির কারণ 'আরও গভীরে'। সে কারণ ঐতিহাসিক।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানের গ্রামে ও ঘরে আগুন দিয়ে ভস্মাবশেষ করার যে চিত্র বঙ্কিম অঙ্কন করেছেন তা বহুবৎসর ধরে মুসলমানের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। নিকট অতীতে (১৯৫৬) অধ্যাপক আবদুল হাই এ বিষয় স্মরণ করে লিখেছেন যে বঙ্কিম 'উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।'[২২] এবং ডঃ কাজী আবদুল মান্নান একই অনুভূতির প্রকাশ করে বলেছেন "আনন্দমঠ" 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত'[২৩] (১৯৮৭)। প্রসঙ্গটি ডঃ শরীফ ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। এমনভাবে দল বেঁধে গ্রামে আগুন দিয়ে ঘরবাড়ি পোড়ানো এবং লুটতরাজ করা নিশ্চয়ই অরাজক পরিস্থিতির পরিণাম। ডঃ শরীফ লিখিত একটি উদ্ধৃতি দিলে তা পরিষ্কার হবে :

'মুরশিদ কুলি খানের পরে কখনো বাংলায় নানা কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতা, বর্গীর লুন্ঠন, নওয়াবদের অযোগ্যতা .. সামন্ত স্বৈরাচারের বৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে য়ুরোপীয়

২০। তদেব পৃঃ ৫১–৫২

২১। তদেব পৃঃ ৫৪

২২। পূর্বোক্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৭২

২৩। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক কালে বাঙ্গালী সমাজের পরিপ্রেক্ষিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বিদ্যা বক্তৃতা) (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃঃ ৪৭

বেনেদের প্রাবল্য প্রভৃতি জনজীবনে দারিদ্র্য; অনিশ্চয়তা,......অনিবার্য...হয়ে উঠে। ...'যে সরকারের উপর জনজীবন রক্ষার......দায়িত্ব রয়েছে সে যদি উদাসীন, অসমর্থ, হয়' তবে 'মানুষ ক্ষিপ্ত, বিরক্ত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ তখন অক্ষম অসহায় মানুষ নিন্দা গালিতেই মিটায়।'[২৪] বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষের পটভূমি এই। আসলে এ চিত্র একটি অরাজক অবস্থার পরিণাম।

ধর্মতত্ত্ববিদ বঙ্কিমচন্দ্র একালের নাস্তিক সমালোচকের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিকতার শিকার। তিনি মনে করেন ইয়োরোপীয় নব্যতত্ত্বের মানসসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম মরীচিকার শিকার হবারও কারণ আছে—জাতিবৈরের প্রাবল্য, ব্রাহ্ম ও পাদ্রীদের সনাতন হিন্দুধর্মের ওপর হামলা, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিবাদ, দাম্ভিকতা-প্রসূত নৈঃসঙ্গ তাঁকে 'শাস্ত্রীয় সত্য সন্ধানে প্রলুব্ধ করেছিল'।[২৫] যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মানবীয় দৃষ্টি ক্রমে ধর্মীয় তত্ত্বচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে। ডঃ শরীফ তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলেছেন 'বঙ্কিম সাহিত্য মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে পরিণত হবার ইতিকথা'।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন বিদেশী লেখকের সঙ্গে তুলনা করে বেশী সংখ্যায় প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক আবদুস সুবহান রচিত 'ফিল্ডিং ও বঙ্কিমচন্দ্র'[২৬] সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একমাত্র উদাহরণ। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে হেনরি ফিল্ডিং ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও শিল্প সাধনার সাদৃশ্য আলোচিত হয়েছে। লেখক বলেছেন উভয়েই ঔপন্যাসিক, সাময়িকী সম্পাদক, চাকুরী জীবনে বিচারক এবং শেষ বয়সে সমাজ সংস্কারক। তুলনামূলক আলোচনার চরিত্র প্রবন্ধটিতে পরিস্ফুট। আলোচনাটি শৈক্ষিক মেজাজের—এতকালের বঙ্কিম সমালোচনার ঐতিহ্যিক বিশষত্ব-কঠোরতা এবং ভক্তিময়তার স্থলে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ-ভাবনার বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন ইংরেজি সাহিত্যের আরো একজন অধ্যাপক--প্রফেসর আমানুল্লাহ্ আহমদ। তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবার প্রেম : বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল'[২৭] একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। সংশ্লিষ্ট উপন্যাসদ্বয়ে প্রতিফলিত আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বকে লেখক অনুধাবন করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সবাই একই ধরণের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের চাপে বাঁধা পড়েছিলেন। যুক্তিবাদ ও ধর্মানুভূতি এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[২৮] শরৎচন্দ্র রোহিণীর পরিণতি-

---

২৪। পূর্বোক্ত বঙ্কিম বীক্ষা, পৃঃ ৫৭–৫৮

২৫। তদেব পৃঃ ৬৮

২৬। আবদুস সুবহান, ফিল্ডিং ও বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষা সাহিত্যপত্র, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৩ (১৯৭৬), পৃঃ ৫৭–৭৮

২৭। আমানুল্লাহ আহমদ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবার প্রেম : বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল, সাহিত্যিকী, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪শ বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৩৩–৫৩

২৮। তদেব পৃঃ ১৩৫

নিয়ে যে অভিযোগ করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রফেসর আহমদ বলেছেন শরৎচন্দ্র নিজে ঐ ধরণের কাহিনীতে 'গোঁজামিল' দিয়েছেন।

উপন্যাস দুটির কাহিনীর মধ্যে প্রতিফলিত সমস্যাকে সমালোচক দুইভাবে দেখেছেন—দুই নায়কের জীবনে সুখের যাবতীয় সাংসারিক উপকরণ থাকলেও তা সম্পূর্ণ মানসিক সুখের কারণ হতে পারে নি। 'দীর্ঘকাল সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের পর দুই নায়কই এক চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাদের সুখী অথচ নিস্তরঙ্গ জীবনে অতুল রূপের অধিকারিনী দুই বিধবার আবির্ভাব ঘটে এবং এমন ঘটনাস্রোতের সৃষ্টি হয় যার ফলে উভয় কাহিনীর পরিণতি বেদনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কুন্দ ও রোহিণী নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের অন্তরে এক অপ্রতিরোধ্য অথচ নিষিদ্ধ কামনার জন্ম দেয় যা তাদের সকল সুখ বিনষ্ট করে। পরস্পরের প্রতি নারী ও পুরুষের এই যে আকুতি যা সংসার ও সমাজের সকল বন্ধনের উর্ধ্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিজ আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে তাকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন। নারী পুরুষের প্রেমের এমন কাহিনী বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন।'[২৯]

প্রফেসর আহমদ উপন্যাসদ্বয়ে নারী-পুরুষ প্রেমের অপ্রতিরোধ্য সম্পর্কের উপরই প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অতঃপর 'সনাতনী মূল্যবোধ ও আধুনিক ভাবধারা দ্বন্দ্ব' ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্ম ও সমাজ বড়ো, না মানুষ বড়ো এই তত্ত্বগত প্রশ্ন বঙ্কিম-চন্দ্রের কালের যুগ জিজ্ঞাসা', উপন্যাস দুটিতে তারই প্রতিধ্বনি পাই।[৩০]

প্রফেসর আহমদ বলেছেন উপন্যাস দুটিতে সমকালীন সংস্কার আন্দোলনের প্রতি বঙ্কিম যে কটাক্ষ করেছেন এবং তার মধ্যে যে রক্ষণশীল মনোভাব ফুটেছে তা-ই এদের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।[৩১] 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এতে প্রাচীন ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মনোভাবের সংমিশ্রণ' ঘটেছে। এখানে তাঁর 'সৌন্দর্যানুভূতি অতি প্রবল'। তিনি অংকন করেছেন 'ভালবাসার মোহন রূপ' 'অবিস্মরণীয় রোমান্টিক পরিবেশ'।[৩২]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য হলো—এখানে লেখকের 'নীতি প্রচারের অবাধ প্রবণতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে'। ভালবাসার 'দুর্নিবার আকর্ষণ' রূপায়িত হয়ে উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'অবিমিশ্র বেদনার কাহিনী'।

প্রফেসর আমানুল্লাহ্ আহমদের বঙ্কিম প্রসঙ্গে দ্বিতীয় রচনা 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা'।[৩৩] এ বিষয়ে তিনি ইন্‌স্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)-এ আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৪] বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক বলে এক শ্রেণীর সমালোচক চিহ্নিত

২৯। তদেব পৃঃ ১৩৬
৩০। তদেব পৃঃ ১৩৬–৩৭
৩১। তদেব পৃঃ ১৩৭
৩২। তদেব পৃঃ ১৩৭–৪০
৩৩। আমানুল্লাহ আহমদ, বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা, ইন্‌স্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ (আই,বি,এস্) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃঃ সং ১৬
৩৪। ঐ

করেন, এখানে লেখক তার বিরোধিতা করেছেন। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন নয়, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে, নিরাবেগভাবে তথ্যভূয়িষ্ঠ ব্যাখ্যা। তিনি মনে করেন মুসলিম শাসকশ্রেণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের জন্য ঐতিহাসিক কারণ দায়ী।[৩৫] লেখক প্রশ্ন করেছেন : যদি ধরেও নেয়া হয় যে, বঙ্কিম 'মুসলিম বিদ্বেষী এবং হিন্দু ঐতিহ্য ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী' ছিলেন তবু, আমাদের কালে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে 'ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে' এবং 'অসংখ্য লোকের জীবনে যে অশেষ ক্লেশ নেমে এসেছে তার তুলনায় বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িকতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? সাম্প্রদায়িকতার বিষময় প্রভাবে আমরা যারা দিশেহারা, বিচারবুদ্ধিহীন, তাদের পক্ষে কি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা শোভনীয় ?[৩৬]

লেখকের এ প্রশ্ন অবান্তর নয়—বঙ্কিম সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নবচেতনার জন্ম দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বৎসর পূর্বে রেজাউল করিম 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' (১৯৪৪) গ্রন্থে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন প্রফেসর আমানুল্লাহ্ আহমদ তারই সার্থক উত্তরসূরী। শ্রীরেজাউল করিমকে বেশী স্মরণ করি এই কারণে যে তিনি যে কালে এবং যে পরিবেশে বঙ্কিমের পক্ষে কথা বলেছিলেন তা ছিল বিক্ষোভে তপ্ত। সেদিন যুক্তি শুনবার মত মন তৈরী হয় নি। তা ছাড়া সেদিনের আলোচনাও সম্পূর্ণ নিরাবেগ ছিল না। অধ্যাপক আমানুল্লাহ আহমদের বক্তব্য অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ, তাঁর কাল তাঁর বক্তব্য গ্রহণে অধিকতর প্রস্তুত। বঙ্কিমের কাল থেকে সাংস্কৃতিক সঙ্কটের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সচেতন থাকলে 'ধর্মীয় ব্যবধান সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে আমাদের নৈকট্য স্থাপিত হয়'[৩৭] বলে লেখক বিশ্বাস করেন। বঙ্কিম সাহিত্যের সার্বজনীনতা এ বিশ্বাসের ভিত্তি।

কবি-সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান রচিত 'প্যারালাল বাস্তব এবং বঙ্কিমচন্দ্র'[৩৮] শীর্ষক প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে একালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। হাসান বলেছেন 'আমি বঙ্কিম বিচারে বসিনি এ-চেষ্টা তাঁকে আমার নিজের কাছে আবিষ্কারের।'[৩৯] প্রকৃতপক্ষে, খুব বলিষ্ঠতার সাথেই তিনি বঙ্কিমের লেখক চরিত্রকে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য দ্বিধাহীন। নিজ রচনার নামকরণের পক্ষে হাসান হাফিজ বলেছেন, বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল 'অভিপ্রেত বাস্তবের প্রতিরূপ রচনা, প্যারালাল বাস্তব রচনা।'

৩৫। পূর্বোক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা, পৃ: ৩

৩৬। তদেব পৃ ৬—৭

৩৭। তদেব পৃ: ১৬

৩৮। হসান হাফিজুর রহমান, প্যারালাল বাস্তব এবং বঙ্কিমচন্দ্র, সমকাল (ঢাকা) উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪—১৯৭৭, পৃ: ১-২১। প্রবন্ধটি লেখক বইঘর (চটগ্রাম) প্রকাশিত পৌষ, ১৩৮৪) বঙ্কিম রচনাবলীর 'ভূমিকা' হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩৯। তদেব পৃ ১৯।

এ প্রবন্ধের সব কথাই নতুন এ দাবি করা চলে না, তবে তিনি যা বলেছেন তা আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সাথেই বলেছেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড় যে অভিযোগ সে বিষয়ে লেখকের বক্তব্য 'বঙ্কিমের বহুস্তর মানসের গভীরে না তাকিয়ে হুট করে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে শনাক্ত করলে তা প্রাইমাফেসি বিচার হবে এবং তা একতরফা না হয়েও পারে না। বস্তুত, বহিরাগত আক্রমণকারীর বিরোধিতাই তাঁর মূল মনোভাব। এইটে প্রশংসনীয়, কারণ এই মনোভাব প্রতিরোধ চেতনা।'[৪০]

তাঁর চোখে বঙ্কিম অসাধারণ শিল্পী হলেও তাঁর সীমাবদ্ধতাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েই বলেছেন, মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ দেশে স্থায়ী অবস্থানগত সত্যকে বঙ্কিম বুঝতে চান নি। তাই এদেশ ও সমাজের মধ্যে তিনি 'ভেদরেখা' টেনেছেন। এটা হয়েছে বাস্তব বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তিনি বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাতে সনাতনী সংজ্ঞায় তাকে নাকচ করবার উদ্দেশ্যই ছিল প্রবল। লেখক মনে করেন এর মধ্যে ছিল সংশোধনের 'আশা ও বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ঘৃণা ও কোপ নয়'। মুসলমানকে বহিরাক্রমণকারীরূপে নিন্দা করে এবং নীতিবিদরূপে আপন সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আপাতত ব্যর্থ হয়েছেন :

> ''কিন্তু তবু আশ্চর্য এই, বঙ্কিমের সিদ্ধির তুলনা নেই। তাঁর জাগরণ মন্ত্রে আদর্শ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নি, কিন্তু তাতেই জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহা বিপুল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সনাতনী আর্যসমাজ বাস্তবের ভিত পায় নি কিন্তু তাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর করেছিল'।[৪১]

হাসান হাফিজের প্রবন্ধে আছে আরও একটি প্রবল বিশ্বাস--সে হলো বঙ্কিমের আধুনিকতাবাদী চরিত্র। সনাতনের প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিমকে আধুনিক করে নি। 'সীতারামকে সন্ন্যাসের মুক্তি দিতে পারেনি শ্রী, শান্তিকে জীবনানন্দ থেকে আলাদা করে রাখতে পারে নি আশ্রমের ক্রূর রীতিনীতি। —শূদ্রী গাহরু বিমলার ব্যাপ্টিজমে রাজগৃহিনীর সম্মানে সতীধর্ম পালনের অধিকার পেয়েছিল। শিরায় জারজ রক্তের প্রবাহ নিয়ে তিলোত্তমাও পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ রাজপুত অশ্বরাধিপতি জগৎ সিংহের মহিষী ও পুরনারী হওয়ার মর্যাদা। সম্মুখ অভিসারী জীবনের এই তো বিপ্লব।'[৪২]

ইতিহাস বিকৃতি, নীতিপরায়ণতা, জীবন বিমুখতা, সনাতনের প্রতি মোহ এ সব অভিযোগ লেখক বিবেচনা করেছেন। অতঃপর তিনি মনে করেছেন অভিযোগগুলোতে জীবনের বিজয় সংবাদ নেই। অথচ জীবন জয়ের লক্ষ্যেই তিনি ছুটিয়েছেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। 'বাস্তবতার চাপ' এবং 'অবস্থা বিপাকের অনিবার্যতায়' বঙ্কিমের 'পরাভব' ঘটেছে। এখানেই হাসান হাফিজের কথা শেষ হয় নি—তিনি লক্ষ্য করেছেন 'জীবনের তৃষ্ণা কী তা তিনি জানতেন, জানতেন বলেই তাঁর হাতে বিস্ময়কর কপালকুণ্ডলা সপ্রাণ হয়, অনিন্দ্য কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে। জীবনের আনন্দ কী তা তাঁর বোধে সজীব ছিল। ছিল বলেই রোহিণীর যৌবন-খর অস্তিত্ব ফুঁড়ে

৪০। তদেব পৃঃ ১৬।
৪১। তদেব পৃঃ ১৯।
৪২। তদেব পৃঃ ২১।

ওঠে তাঁর জগতে, আয়েষার সুতীব্র হৃদয়াবেগ কোরক মেলে তাঁর ধ্যানে।' ইতিহাসের পুনর্গঠন আর সামাজিক পুনর্বিন্যাস তাঁর সৃষ্টিতে এনেছে 'কঠোরতর নীতির জপমালা'। তা হার মেনেছে ভিন্ন কোটিতে 'সব কিছুর পরে থেকে যায় জীবনের তৃষ্ণা।' এখানেই তাঁর জয়। হাসান বঙ্কিমের সেই প্রবল জীবনতৃষ্ণার অনুসন্ধানী।

বাংলাদেশের পত্রিকা এবং সংকলনে ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র দুটি প্রবন্ধ প্রদান করেছিলেন দুই বিশেষ উপলক্ষে। 'আনন্দমঠ' এর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'আনন্দমঠ' : বিষণ্ন বাস্তব : বিদ্রোহের প্যারাবল'[৪৩] বঙ্কিম-বীক্ষায় নতুন তথ্য এবং নতুন ভাবনার উপস্থাপন করে। 'সাম্প্রদায়িক' এবং 'স্বজাতিপ্রেমিক' ইত্যাদি বহুকথিত বিষয়ে সময়-ক্ষেপণ না করে তিনি চেয়েছেন 'আনন্দমঠ'-এর ইতিহাস, ভূগোল, নৃমণ্ডল, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রসঙ্গে উপেক্ষিত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে। 'আনন্দমঠ'কে তিনি কেন 'বিদ্রোহের প্যারাবল' বলেছেন তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে : 'প্যারাবেলে জাতি বর্ণ গাঁই গোত্র—এ সব বিচার মিথ্যা, তাতে বক্তব্যটাই প্রধান। ভ্রান্তির ধূলোঝড় শতবর্ষ পরেও চোখকে কষ্ট বা রুদ্ধ করলে প্রশংসার ব্যাপার হবে না।'[৪৪] ডঃ মৈত্র প্রমাণ করেছেন আনন্দমঠ—এর ইতিহাস বহুক্ষেত্রে 'অনৈতিহাসিক এবং ভূগোল প্রচণ্ড রকমে 'অভৌগোলিক'।

'প্যারাবেলের পাত্রপাত্রীদের জীবনের যন্ত্রণা লেখককেই ভোগ করতে হয়'—লেখকের এই বক্তব্যের তাৎপর্য কালান্তরের বঙ্কিমবীক্ষায় লক্ষ্য করা যায়। হাসান হাফিজের 'প্যারালাল বাস্তবতা'-য় আমরা তার আভাস পেয়েছি। উভয় সমালোচকই এ গ্রন্থের বক্তব্যে এক ধরণের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশের বঙ্কিম আলোচকগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে নব্য ইয়োরোপের মানস-সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। একজন সমকালীন কবির সংবর্ধনা উপলক্ষে[৪৫] উৎসর্গীত 'ইউরোপীয় নব্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে, কিভাবে, বঙ্কিম-রচনায় প্রত্যক্ষবাদ (কোঁৎ), পরিণামবাদ (ডারবিন), সাম্যবাদ (রুশো), হিতবাদ ও স্বৈরবাদ (মিল) ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করেছে তাই বিশ্লেষিত হয়েছে। ডঃ মৈত্রের মতে বঙ্কিমের সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন মিল, স্পেনসার (১৮২০—১৯০৩), সিলি (১৮৩৩—৯৫), লেকি, কোঁৎ (১৭৯৮—১৮৫৭), বার্কলে (১৮২১—১৮৬২)। পাশ্চাত্য ইতিহাস, দর্শন ও নব্যতত্ত্ব বঙ্কিম আগ্রহভরে পাঠ করেছিলেন। তা কতটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে-সূত্র বিবেচনা করে ডঃ মৈত্র মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিম ভক্তিবাদী নন এবং গুরুবাদীও নন।'[৪৬] অবশ্যি লেখক বিশ্বাস করেছেন

৪৩। ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, আনন্দমঠ : বিষণ্ন বাস্তব : বিদ্রোহের প্যারাবল, সাহিত্যিকী (বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৮শ বর্ষ, শরৎ—বসন্ত, ১৩৮৮, পৃঃ ৫৩—৯০।

৪৪। তদেব পৃঃ ৮৬।

৪৫। সৈয়দ আলী আহসান-এর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে যে 'সংবর্ধনা গ্রন্থ' উপহার দেওয়া হয় তাতে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; পৃঃ ১৬৩—৮৫১।

৪৬। ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী সম্পাদিত সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা ১৯৮৫, পৃঃ ১৮০।

যে, 'নব্যযুক্তিবাদে বঙ্কিম আশ্রয়' গ্রহণ করলেও 'অপূর্ব পলায়নী মন্তব্য'ও তা থেকে উপহার পাওয়া যায়।[৪৭] ডঃ মৈত্র বঙ্কিম-সাহিত্যের এই স্বল্পালোকিত ক্ষেত্রে আলোকসম্পাৎ করে বঙ্কিম বিচারে সৎ-সহযোগী হতে পেরেছেন।

॥ চার—২ ॥

মোহম্মদ ইদরিস আলী রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল ও বঙ্কিম'[৪৮] গ্রন্থখানি নানা কারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ—সম্ভবত এটি বাংলাদেশকালে বঙ্কিম সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, দ্বিতীয়ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস-আশ্রিত প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তৃতীয়ত এর রচনাকাল ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনগুলিতে—মে থেকে নভেম্বর মাস।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বস্তুত রোহিণীর জীবনকথা। তার মত রূপ-প্রতিমাকে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর মত শিল্পী সংসারে নিশ্চয়ই দুর্লভ কিন্তু সেই প্রতিমাকে স্রষ্টা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছে। 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন জোট বেঁধে আইনগত ব্যবস্থায় সমাজে তার প্রচলন চেষ্টা তখনো সজাগ। বঙ্কিম কেন তার বিরোধিতা করলেন। বিধবা রোহিণী তাই বঙ্কিমের হাতে সুবিচার পেতে পারে না'। (পৃঃ ৩)। বর্তমান গ্রন্থের নাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল ও বঙ্কিম' হলেও সমগ্র রোহিণী চরিত্র আলোচিত হয়েছে—সমালোচনা যদি পুনঃসৃষ্টি হয় তবে এ গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

রোহিণীর রূপ যৌবন এবং অসংযমের পরিচয় বঙ্কিম যথেষ্টই দিয়েছেন—ইদরিস আলী পাঠককে রোহিণী চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়েছেন। কৃষ্ণকান্ত যখন চুরির অপরাধে 'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে' বের করে দেবার রায় ঘোষণা করলেন—তখন রোহিণী গোবিন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে 'ক্ষতি কি।' —এতে 'গোবিন্দলাল শুধু বিস্মিত হলো না' 'আতঙ্কিত হয়ে উঠলো'। 'এ কি চরিত্র রোহিণী। কান্না নেই, আহাজারি নেই, বিপদে পড়ে উদ্ধার পাবার জন্য আকুলতা নেই,' (পৃ : ৪৪)। উদ্ধারের জন্য অস্থির হয়ে আবেদন-নিবেদন করলে 'সাহায্যের ভরসা দিয়ে' গোবিন্দলাল কাছে এগোতে পারত। রোহিণী-চরিত্রের এই দৃঢ়তা এবং জমিদার-নন্দনের লোলুপতার প্রতি ইদরিস আলী তীব্র আলোক সম্পাৎ করেছেন। গোবিন্দলালের সঙ্গে একাকী কথা বলার সময় রোহিণী চরিত্রের দৃঢ়তাকে লেখক বলেছেন 'তুলনারহিত'। (পৃ : ৪৮)

তিনি আরও বলেছেন 'গোবিন্দলাল যদি মনে প্রাণে নিষ্পাপ হতো' এবং স্থির লক্ষ্যে 'রোহিণীকে সর্বক্ষণ এবং সর্বাবস্থায় অনুসরণ করে চলবার চেষ্টায় না থাকতো তবে বুঝি এই দুঃখিনী বিধবার জীবন এমন কলঙ্ক দুঃখের পসরা বয়ে শেষ হতো না'। (পৃ : ৫১-৫২)। গোবিন্দলালের আচরণ বঙ্কিম ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'তার পূর্ণ

৪৭। তদেব পৃঃ ১৭২।

৪৮। মোহম্মদ ইদ্রিস আলী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও বঙ্কিম, প্র—স, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ সং ৮ ১৪০ ২ - ১৫০।

যৌবন, মনোবৃত্তি উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র ; ভ্রমরে সে তৃষ্ণা মেটেনি : প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখে নেচে উঠেছিল'। এই রূপমোহ এবং ভোগ লোলুপতা গোবিন্দলালের রক্তে মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য—তার অসংযম রোহিনীর ট্র্যাজিডির জন্য মুখ্যত দায়ী। লেখকের বক্তব্য 'মোহে মুগ্ধ লালসালিপ্ত ভোগতৎপর গোবিন্দলাল সংসার ভুলে পুরোপুরি মজেছে' (পৃ : ৮৮)। উইলের ভূমিকাকেও ইদরিস আলী ট্র্যাজিডির উপাদান হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। (পৃ : ৮৮)

'রূপমোহ' সম্পর্কে ইদরিস আলীর ব্যাখ্যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—'রূপ নেই বলে বালিকা স্ত্রী ভ্রমর তার মনে ঠাঁই পায় নি, রূপসুধা পানে মত্ত থেকে গোবিন্দলাল যুবতী রোহিণীর হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার তত্ত্ব রাখে নি।' (পৃ : ১৩৪) তাই সে 'নিষ্পাপ দুটি প্রাণের অবসান' ঘটাতে পেরেছে। তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তিলে তিলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য শিল্পের কঠোর সমালোচকও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন জীবন পিপাসা। কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিসমাপ্তি এবং বহুবিতর্কিত রোহিণী জীবনের শেষ পর্যায়ে তা সহজবোধ্য। ইদরিস আলী বলেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ দরদী সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' ; এ উপন্যাসে এটি মূল 'আশ্রয়'।

> সমাজ বলতে তিনি তাঁর নিজের সমাজ তথা হিন্দু সমাজকেই প্রধানত লক্ষ্য করে থাকবেন। ...তবে শিল্পীর দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণতা টেনে দেখা বোধ হয় সঙ্গত হবেনা, কেননা সমাজ হিসাবে তিনি সমগ্র মানব গোষ্ঠীকেই বোঝেন এবং মানস চক্ষে দেখেন ; বক্তব্য তাঁর সম্প্রদায় বিশেষকে কেন্দ্র করে হলেও অপরাপর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এমনি ব্যবস্থায় সম্ভাবের ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে এ ইঙ্গিতও সেই সঙ্গে থাকে। সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই তবে আমরা লেখককে এবং তাঁর লেখাকে সমগ্র করে বুঝতে পারবো। কাহিনীর অভ্যন্তরে দৃষ্টি দিলে বঙ্কিমের লক্ষ্য পরিচয়ের সে সন্ধান আমরা পাব। (পৃ : ১৩৫-১৩৬)

বিচারের নামে সরকারী আদালতে যে প্রহসন চলে তার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করেছেন রোহিণী হত্যার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে। সমাজের নিকৃষ্ট অপরাধ সম্পর্কে বঙ্কিম সচেতন ; তাঁর রোহিণী কুন্দ সর্বকালের পাঠককে কাঁদায় তাতে 'শিল্পীর বেদনাক্ত সংযোগ' ছিল বলেই। 'বিধবাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ না করলে 'গোবিন্দলালের পথই আমাদের জন্য অবশেষ থাকবে'। এখানে সমালোচক শিল্পীর প্রতি সুবিচার করেছেন।

বাংলাদেশে বঙ্কিম প্রসঙ্গে মার্কসীয় সমালোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—তিনিও ইংরেজীর অধ্যাপক। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক'।[৪৭] বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ; বঙ্গদেশের

৪৭। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক, প্র—স, ঢাকা ১৯৭৯, পৃঃ সং ৬৮।

কৃষক ও সাম্য থেকে লেখক তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসগুলোতে আছে জমিদার ও জমিদার গৃহ, সেখানে কৃষক অনুপস্থিত। বঙ্কিম উপন্যাসের পরিমণ্ডল সামন্তবাদী। কৃষ্ণকান্তের উইল সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেছেন: 'সামন্তবাদী সমাজে বিদ্রোহের কোন ক্ষমা নেই—তাই রোহিণী নিহত হয়, ভ্রমর অকালে মরে।'[৫০]

আলোচনার প্রথমাংশেই ডঃ চৌধুরী একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন মানুষের জীবন প্রভূত পরিমাণে অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত··· শুধু যে অর্থনীতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তাই নয়, কথা সাহিত্যেও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে নিয়ে এসেছেন সামনে'।

জমিদার এবং কৃষক উভয় জীবন সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতূহল ছিল। জমিদারদের যাঁরা 'কেবল নিন্দা করেন,' বঙ্কিম তাদের 'বিরোধী' কারণ 'অনেক জমিদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, সত্যনিষ্ঠ'। প্রজাদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: 'অনেক জমিদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয়না'। 'বঙ্গদেশের কৃষক' দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'জমিদারেরা আর সেরূপ অত্যাচারী নাই। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক বলেছেন: 'ব্যাপার তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে? বাদীপক্ষের প্রধান উকিল কি বিবাদী পক্ষে গিয়ে যোগ দিলেন? আমরা কি তা হলে বলবো সমস্তটাই প্রতারণা, সবটাই কুম্ভিরাশ্রু?'

ডঃ চৌধুরী তাও বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁর জিজ্ঞাসা 'কেন এই জমিদার প্রীতি? আসলে বঙ্কিম জমিদারকেই ভালবাসেন, করুণা করেন কৃষককে। তাই উপন্যাসে কৃষক অনুপস্থিত।' লেখক মনে করেন 'শিল্পী বঙ্কিম কৃষকের পক্ষে, মানুষ বঙ্কিম জমিদারের পক্ষে।'[৫১] বঙ্কিম সমাজ বিপ্লব পছন্দ করেন নি—দেশের উন্নতি বলতে তিনি স্বশ্রেণীর উন্নতি বুঝেছেন। ডঃ চৌধুরীর গ্রন্থখানি একটি অনালোচিত প্রসঙ্গে আলোকসম্পাৎ। তাঁর আলোচনাটি পরিচালিত হয়েছে একটি বিশেষ আদর্শগত লক্ষ্যে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম বিচারের একটি আদর্শগত উদাহরণ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস'—'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক' রচনায় তার ছায়া পড়লেও তথ্যের প্রাচুর্য বা বিশ্লেষণের গভীরতা এখানে যথেষ্ট নেই। বিষয়ের নতুনত্ব এবং রচনার হাল্কা ছাঁদ গ্রন্থের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

একই আদর্শে অনুপ্রাণিত অধ্যাপক শান্তনু কায়সার বঙ্কিমচন্দ্র—১, বঙ্কিমচন্দ্র—২ শীর্ষক দুটি পুস্তক রচনা করেছেন।

বাংলাদেশে বঙ্কিম-চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন ডঃ সারোয়ার

৫০। তদেব পৃ: ৩১, ৪৪।

৫১। তদেব পৃ: ৮।

জাহান। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ[৫২] ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন 'বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র' (১৯৮৪) এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালা বদল' (১৯৮৫) শীর্ষক দুখানি গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁর উপাধি-সন্দর্ভ। সারোয়ার জাহানের প্রবন্ধগুলো তাঁর অভিসন্দর্ভের উপ-সৃষ্টি। তবে তাঁর 'বঙ্কিম উপন্যাসের উপসংহার' এবং 'বঙ্কিম উপন্যাসের ব্যঙ্গানুকরণ' তথ্যসমৃদ্ধ এবং নতুন আলোকসম্পাৎকারী রচনা।

'বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র' গ্রন্থে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ ও সীতারাম এই সাতখানি উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ এবং চরিত্র আলোচনা করে লেখক বলেছেন, 'বঙ্কিম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কয়েকটি মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছেন, মুসলমানদের সম্পর্কে কোন কোন অন্যায় এবং অসঙ্গত মন্তব্য করেছেন'—এখানেই লেখকের কথা শেষ হয় নি, তাঁর আসল বক্তব্য :

> 'যে কোন শিল্পীর মানস-বিশ্লেষণের পক্ষে এ জাতীয় সরল রৈখিক বিচার কোন সময়েই অভ্রান্ত বা নিরাপদ নয়,.... নিরপেক্ষ এবং ভাবাবেগহীন দৃষ্টিতে যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকে দেখি, তাহ'লে দেখবো 'মুসলমান বিদ্বেষী' বঙ্কিমের হাতে এমন কিছু মুসলমান চরিত্র নির্মিত হয়েছে যা পাশাপাশি হিন্দু চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশী জীবন্ত ও শিল্প-বিভাসিত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ঐতিহাসিক মুসলিম-চরিত্র সুবিচার থেকে বঞ্চিত, কিন্তু কল্পিত মুসলিম চরিত্র সমূহের প্রতি তাঁর মমতা......যে শতমুখী, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[৫৩]

লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

ডঃ সারোয়ার জাহানের অভিসন্দর্ভ বঙ্কিম বিচারের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান দলিল। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি (১৯০৩) প্রকাশকাল পর্যন্ত তৎকালীন বাংলাদেশে বঙ্কিম-বিষয়ে যে সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এ বই তার 'বিশ্বস্ত বিবরণ'। একদিকে বঙ্কিম-বিচারে যে বিপর্যয় ঘটেছে তার ইতিহাস লেখক উপস্থিত করেছেন। অন্যদিকে নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ থেকে তার পুনর্বিবেচনা করেছেন। 'দুরূহ ক্ষেত্র' থেকে তিনি অজস্র অজ্ঞাত 'বিষয়বস্তু-আহরণ' করে তা পরীক্ষা করেছেন নিরাবেগ ভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে।

৫২। এক, বঙ্কিম উপন্যাসের উপসংহার, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮৩–৮৪, মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা, পৃঃ ৩৩-৬৯

দুই, বঙ্কিম উপন্যাসের ব্যঙ্গানুকরণ, ভাষা সাহিত্য পত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১১শ বর্ষ, ১৩৯০

তিন, বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৯৪

৫৩। ডঃ সারোয়ার জাহান, বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র, প্র—প্র ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৪৩–৪১

যেভাবে তিনি বঙ্কিম উপন্যাসের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী, বঙ্কিমের রচনাশৈলীর প্রভাব, অনুসন্ধান করেছেন তা শুধু গবেষকের উদ্দেশ্য চরিতার্থই করে নি, তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আন্তরিক উপলব্ধির তথ্য-সমর্থিত বিবেচনা। সারোয়ার জাহান মনে করেন ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র রচনায় বঙ্কিম 'দ্বিধাগ্রস্ত' এবং 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি'র দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু 'যখনই বঙ্কিম মুসলিম চরিত্র এঁকেছেন তখনই এই ভেদবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে'—ডঃ বিজিত কুমার দত্ত বলেছেন : বঙ্কিম মানস ব্যাখ্যায় সারোয়ার জাহান 'উদার মানবিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন'।[৫৪] ডঃ দত্ত মনে করেন লেখক বঙ্কিম মানসের এই 'দ্বিধা' বিশ্লেষণ করেন নি। আমরাও মনে করি এটি গবেষকের সীমাবদ্ধতা। তবে ডঃ দত্ত এই 'দ্বিধা'এবং 'ভেদবুদ্ধি' স্বীকার করেনিয়ে নিজেই তার যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তা মূল্যবান এবং চিন্তাকর্ষক।

॥ পাঁচ ॥

সাতচল্লিশোত্তরকালে, ১৯৫২ থেকে ১৯৮৫ অবধি, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি। বিষয়টি সামাজিক, সাহিত্যিক এবং শৈক্ষিক অনুষঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। আমার আলোচনার ক্ষেত্র একটি নিরবধি প্রক্রিয়ারূপে চিহ্নিত হতে পারে; তাই আজকের সংক্ষিপ্ত পরিসর এবং স্বল্প-উপাদান ক্রমাগত বিস্তৃততর এবং সমৃদ্ধতর হবে বলে আমরা আশাবাদী। বর্তমান প্রবন্ধে আমি যে-সব প্রাবন্ধিক ,ঐতিহাসিক এবং গবেষক লেখকের রচনা আলোচনা করেছি তার বাইরে কোন রচনা নেই আমি তা মনে করি না। আমি শুধু প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় শক্তিমান গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে প্রাক্-সাতচল্লিশে এক শ্রেণীর সমালোচক আবেগ চালিত হয়ে তাকে 'দেবতা' ভেবেছিলেন অন্য শ্রেণী তাকে 'দানব' ভেবেছিলেন।[৫৫] উত্তর-সাতচল্লিশে আমাদের বঙ্কিম-সমালোচকগণ ঐ ধারণার নিরসনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের কাছে বঙ্কিম মানুষ ও শিল্পী।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিক্রিয়া, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সংকটময় দিনগুলোতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আমাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদ ও লেখক বঙ্কিম পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নে নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত পুরানো অভিযোগ সমূহকে পুনঃ পরীক্ষা করে তার কতকগুলোকে বাতিল করে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলোকে মূল্যায়নের পরিপূরক বলা যায়।

৫৪। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত, বাংলাদেশে বঙ্কিম চর্চা, চতুরঙ্গ (কলকাতা) সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃঃ ৪১৯

৫৫। কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, প্র- প্র কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ১২৬

মানুষ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কালের প্রবাহ এবং অবস্থা বিপাকের প্রতি দায়ভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্যি নীতিবাদী বঙ্কিম আপন সৃষ্টির প্রতি অবিচার করেছেন এমন গতানুগতিক আলোচনাও একালে দুষ্প্রাপ্য নয়।[৫৬] মতাদর্শ প্রচারের অভিযোগ ছাড়াও বঙ্কিম সাহিত্যের আরও মূল্য আছে তা কেউ কেউ ভুলে যান, তবে অসাধারণ প্রতিভাশালী বঙ্কিম মেধার অনাবিষ্কৃত দিকের প্রতি সাম্প্রতিক লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

শতাব্দীর পঞ্চাশোত্তরকালে বঙ্কিম সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে একটি মিশ্ররূপ লক্ষ্য করা গেছে। আবদুল হাই-এর মত মনস্বী সমালোচকও বঙ্কিম এবং মুসলমান প্রাসঙ্গিক আলোচনায় কঠিন মন্তব্য করেছেন। হয়তো প্রাথমিক পর্যায় বলে, হয়তো ইতিহাস অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতার কারণে, অথবা ঔচিত্যবোধের ব্যক্তিক ধারণার ফলে এমনটি ঘটেছে। তবে তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' স্রষ্টা বঙ্কিম এবং বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী বঙ্কিমের প্রশংসা করেছেন মুক্ত কন্ঠে।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ কালে বঙ্কিম সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নে পুরাতন আবর্জনাকে দূর করে, পরিচ্ছন্ন চেতনার প্রয়োগ ঘটছে। একদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে উদার মানবিক দৃষ্টির পরিচয়, অন্যদিকে বাঙালির সামাজিক

৫৬। ক, বাংলা উপন্যাসে বিধবা (খোন্দকার রেজাউল করিম,) গ্রন্থে(ঢাকা, ১৯৭৯) 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'বিধবার প্রেম করতে নেই, করলে তার শাস্তি এই। কি করে বিধবার পাপের শাস্তি বিধান করা যায়--বঙ্কিম জীবন দর্শনের এই ছিল মূল কথা', পৃঃ ১০, ১৪।

খ, অধ্যক্ষ আমিনুদ্দীন আহমদ, 'স্রষ্টার অবিচার' প্রবন্ধে রোহিণী হত্যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ বার্ষিকী, (১৯৫৫-৫৬) দ্রঃ।

গ, ডঃ আসাদুজ্জামান, (কৌষিক, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৬।১৯৮০, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) 'বঙ্কিম উপন্যাসে প্রধান সংকট' প্রবন্ধে 'রূপজ মোহ'কেই উপন্যাসের সংকট বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে নিছক রূপমোহ নয় প্রবৃত্তির ভয়াবহ অসংযমেই মূল সংকট ঘনীভূত হয়।

ঘ, অধ্যাপক রশীদ আল ফারুকী 'ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে 'বঙ্কিম সাহিত্য পরিক্রমা' (কার্তিক, ১৩৯৪ ; মুক্তধারা, ঢাকা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন সম্পাদনা করেন। এতে ১৩টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। চারটি প্রবন্ধ বাংলাদেশের লেখকদের—তন্মধ্যে ডঃ আহমদ শরীফের 'বঙ্কিম বীক্ষা' আমরা আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ডঃ আনিসুজ্জামানের দুর্গেশনন্দিনী, মুনীর চৌধুরীর রাজসিংহের ঐতিহাসিকতা, নুরুল আমিনের বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। অন্য সাতটি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের।

ঙ, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার : ডঃ দিলওয়ার হোসেন।

পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দায়বদ্ধ করবারও অনুসন্ধান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বঙ্কিমের গৌরব রয়েছে অটুট। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমকে বিবেচনার প্রয়াস স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছে—অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং অধ্যাপক শান্তনু কায়সার এ ধারায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনায় বঙ্কিম সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা বাংলাদেশে লক্ষ্য করা গেছে।

বঙ্কিম সাহিত্যের প্রকরণ সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এখানে হয় নি। তবে কখনো কখনো আমাদের সমালোচকরা শিল্পবেত্তা বঙ্কিম সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন গর্বিত বাক্যাবলী। অধ্যাপক আবদুল হাই, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমানের নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এঁরা মনে করেন বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ নির্মাণে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ সুন্দরের সাধক। লৌকিক বাংলার সুঠাম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসাধারণ। বাঙালির রসবোধে তিনি শ্রেষ্ঠ কথক।[৫৭] যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনা করেছিলেন সেই ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করেছি—সেদিক থেকে বঙ্কিম আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এখন বাংলাদেশে বঙ্কিম সাহিত্যের বহুমাত্রিক বিবেচনা চলছে। এই অমর কথাশিল্পী এবং প্রজ্ঞাবাদী প্রাবন্ধিক হয়ে উঠেছেন আমাদের সংস্কৃতির এক নিরবধি অনুষঙ্গ।

৫৭। হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত সমকাল, পৃঃ ২১।

ভারতীয় উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দান

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

প্রাক্-বঙ্কিম ভারতীয় উপন্যাসের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে একথা মনে না হয়ে পারে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের রসসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তা না ঘটলে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভারতীয় কথাসাহিত্য হয়ত অনেক আগে থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে সমকালীন সমাজ-জীবনের দর্পণ হয়ে উঠতে পারত। বিষয়টি পরিস্ফুট হবে যদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কয়েকখানি সাধারণ ও বিশিষ্ট উপন্যাসের কথা ভাবা যায়।

মারাঠি ভাষায় বাবা পদমনজী প্রণীত বালবিধবা যমুনার নানা অবস্থা ও অভিজ্ঞতার কাহিনী 'যমুনা পর্যটন' (১৮৫৭)। বাংলায় 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। গুজরাতী ভাষায় শাশুড়ী পুত্রবধূর মনোমালিন্য ও কলহ নিয়ে রচিত মহীপতরাম নীলকন্ঠের (১৮২৯-৯১) গার্হস্থ্যজীবনমূলক উপন্যাস 'সাসু বহুনী লড়াই' (১৮৬৬)। উর্দুর প্রথম উপন্যাস বলে পরিচিত নজীর আহমদের (১৮৩৬-১৯১২) 'মিরাত উল্-উরূস' (বধূদর্পণ, ১৮৬৯) এবং তারই অনুবৃত্তিরূপে রচিত 'বিনাত-উন্-নাশ' (মৃতের কন্যারা, ১৮৭৩)। বাংলার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪)। অসমীয়া লেখক হেমচন্দ্র বরুয়ার নকশা জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়াভাতুরী' (বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন, ১৮৭৬)। বেদনায়কম্ পিল্লাই (১৮২৬-৮৯) রচিত অতিকল্পনা রঞ্জিত তামিল সামাজিক উপন্যাস 'প্রতাপ মুদলিয়ার চরিত্রম্' (১৮৭৯)— সুশিক্ষিত নায়ক প্রতাপের উত্তম পুরুষে কথিত কাহিনী। আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের জনক বীরেশলিঙ্গম্ পন্তুলু (১৮৪৯-১৯১৯) রচিত মধ্যবিত্ত তেলেগু ব্রাহ্মণের চিত্র 'রাজশেখর চরিত্র' (১৮৮০)। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রধানত ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত তখন কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাহিত্যে সমকালীন সমাজজীবনের কথা বলারই চেষ্টা চলছে।

১৮৮০-র দশকে বঙ্কিমের উপন্যাস সোজা বাংলা থেকে হিন্দী ও কন্নাড়া ভাষায় অনূদিত হয়। প্রথম ইংরেজী অনুবাদেরও প্রকাশকাল ১৮৮০ (দুর্গেশনন্দিনী)। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ হতেই তা যে সর্বভারতে দ্রুত প্রচারলাভ করেছিল এমন ভাববার কারণ নেই। মারাঠি, তেলেগু, মালয়ালম্ প্রভৃতি ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয় ১৯০০ সাল নাগাদ। মোটকথা, দুর্গেশনন্দিনীর ইংরেজী অনুবাদের সময় থেকে ধরলে বঙ্কিম-উপন্যাসের ব্যাপক প্রচার হতে আরও দুটি দশক কেটে যায়।

এই দুই দশকে আরও কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় রচিত হতে দেখা গেল। যেমন, মারাঠি লেখক হরিনারায়ণ আপ্‌টে (১৮৬৪-১৯১৯) লিখিত 'মধলী স্থিতি' (মধ্যম অবস্থা বা মধ্যবিত্ত, ১৮৮৫), বেদনায়কম্ পিল্লাই রচিত নারীমুক্তিবিষয়ক প্রথম তামিল উপন্যাস 'সগুণ সুন্দরী' (১৮৮৭) গুজরাতী

লেখক গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠির (১৮৫৫-১৯০৭) কৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এপিকধর্মী সামাজিক উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র' (চার খণ্ডে প্রকাশকাল ১৮৮৭-১৯০১), চন্দু মেনন (১৮৪৭-১৯১৯) কৃত মালয়ালম্ ভাষার স্মরণীয় সামাজিক উপন্যাস 'ইন্দুলেখা' (১৮৮৯), তামিল লেখক রাজম্ আইয়ার (১৮৭২-৯৮) লিখিত তিরুনেলভেলি জেলার একটি গ্রাম্য উপাখ্যান 'কমলাম্বাল চরিত্রম্' (১৮৯৬)। রাজম্ আইয়ারের অনুসরণে আরও যে কখানি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয় তার মধ্যে এ. মাধবৈয়ার (১৮৭৪-১৯২৬) 'পদ্মাবতী চরিত্রম্' (১৮৯৮), মুত্তুমীনাক্ষী (১৯০৩) প্রভৃতি গ্রন্থে বাল্যবিবাহ, বিধবা নির্যাতন, একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় ভাঙন ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্ণিত।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন ভাষায় ভালোমন্দ এত সব সামাজিক উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার পরেও কিন্তু সেই ধারা ক্রমান্বয়ে পুষ্ট না হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে।

শঙ্করাচার্যের অনুমোদিত বলে প্রচারিত কেরলের নায়ার-নাম্বুদিরি সম্প্রদায়ের অসবর্ণ যৌন সম্মিলনের বিরুদ্ধে 'ইন্দুলেখা'র মতো সামাজিক উপন্যাস রচিত হওয়ার পরেও শক্তিশালী লেখক সি, ভি, রামন্ পিল্লা (১৮৫৮-১৯২২) 'মার্তণ্ডবর্মা' (১৮৯১) এবং আরও দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে এই ধারার পথ প্রশস্ত করেন। মালয়ালম্ সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা বলেন 'মার্তণ্ডবর্মা' রচনায় রামন্ পিল্লা স্কটের আইভ্যানহো বইটির কাছে ঋণী ছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পরে বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ একটা কথা উঠেছিল। আমরা মনে করি একই উৎসের কাছে ভিন্ন ভাষার ভিন্ন লেখকের ঋণী হতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ইতিহাসের দৃষ্টিতে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'মার্তণ্ডবর্মা'র ২৬ বছর আগে রচিত এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র ইংরেজী অনুবাদও অন্তত এক দশক আগে বেরিয়ে যায়। সুতরাং রামন্ পিল্লার কাছে দুর্গেশনন্দিনী হয়ত অপঠিত ছিল না। এবং এইভাবে মালয়ালম্ সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের বদলে প্রবর্তিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা।

উর্দু সাহিত্যেও দেখি সেই একই অবস্থা। নজীর আহমদের সামাজিক উপন্যাস দিয়ে যে উর্দু উপন্যাসের সূচনা পরবর্তী লেখক আবদুল হালিম শারর্ (১৮৬০-১৯২৬) প্রথমদিকে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করে খান দু'য়েক সামাজিক উপন্যাস লিখে অচিরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জীবনের প্রথম সতেরো বছর (১৮৬০-৭৭) কলকাতায় বাস করে তিনি নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং আমাদের বিশ্বাস ১৮৯৬ সালে তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর উর্দু অনুবাদ ('এক জমিনদারকী লড়কী') মূল বাংলা থেকেই করা হয়েছিল। সুতরাং উর্দুর সামাজিক উপন্যাসের গতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা প্রতিহত হওয়ার মূলে বঙ্কিমেরই প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল অনুমান করি।

মারাঠি লেখক হরিনারায়ণ আপ্‌টেও 'মধলী স্থিতি', 'পণ লক্ষ্যাত কোণ ঘেতো' (কিন্তু কে খবর রাখে, ১৮৯০-৯৩) প্রভৃতি কয়েকখানি সমাজ-আশ্রয়ী উপন্যাস লিখে দৃষ্টি ফেরালেন ঐতিহাসিক রোমান্সের দিকে, যার সংখ্যা প্রায় এক ডজন। পরবর্তী লেখক নাথমাধব (১৮৮২-১৯২৮)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ খাত বদল লক্ষ্য করা যায়।

ওড়িয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ফকীর মোহন সেনাপতি (১৮৪৭-১৯১৮) সামাজিক উপন্যাস লিখেই খ্যাতিলাভ করেন। তবু তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রলোভন

সংবরণ করতে পারেন নি। বাংলার নবাব আলীবর্দী এবং বর্গী নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'লছমা'। ফকীর মোহনের পরবর্তী লেখক রামচন্দ্র আচার্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হিসাবেই ওড়িয়া সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাসকার রজনীকান্ত বরদলৈ (১৮৬৭-১৯৩৯) শুরু করেছিলেন সমকালীন মিরি উপজাতিদের কাহিনী নিয়ে। লখিমপুর জেলার সোবনশিরী (স্বর্ণশ্রী ?) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের জংকী ও পানেই নামের দুটি মিরি কিশোর-কিশোরীর ব্যর্থ প্রেমের উপাখ্যান 'মিরি-জিয়ারী' (মিরি কুমারী, ১৮৯৫)। কিন্তু উত্তরকালে রজনীকান্ত সরে গেলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে এবং তা যে বঙ্কিমের প্রভাবজাত সেকথা তিনি তাঁর 'দন্দু বা দ্রোহ' (১৯০৯) উপন্যাসের ভূমিকায় অকপটেই স্বীকার করেছেন। 'মিরি-জিয়ারী'র পরবর্তী তাঁর আটখানি উপন্যাসই 'বুরঞ্জীমূলক'।

কন্নাড়া ও তেলেগু উপন্যাস তো গোড়া থেকেই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিপুষ্ট। এই শতকের প্রথম ২৫।৩০ বছর পর্যন্ত কালসীমাকে বলা হয় তেলেগু সাহিত্যের 'অনুবাদযুগ', বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুবাদযুগ। বঙ্কিমের অনুবাদ যে তেলেগু উপন্যাসকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয়ে তেলেগু সমালোচক-রাও একমত। তামিলেও বেশ কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর এ যুগের প্রখ্যাত গদ্য লেখক রা. কৃষ্ণমূর্তি অর্থাৎ কল্‌কি-র আবির্ভাব (১৮৯৯-১৯৫৪)। কল্‌কি নিজেও কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস লিখলেও তামিল কথাসাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ঐতিহাসিক উপন্যাসকার রূপে। গুজরাতীতেও 'সরস্বতীচন্দ্র'-এর মতো ক্লাসিক সামাজিক উপন্যাসের পরেই বঙ্কিমের অন্যতম অনুবাদক ঠক্কর নারায়ণ বিসনজী (১৮৮০-১৯৩৮) পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেই খ্যাতি লাভ করেন।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) এই দুখানি সফল সামাজিক উপন্যাস থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ভারত জুড়ে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি লেখকদের এই প্রীতি-পক্ষপাত কেন ? আমাদের মনে হয় বাংলা-সহ ভারতীয় কোন ভাষাতেই বঙ্কিমের সমকালে বা অব্যবহিত পরে সমকালীন সমাজ জীবনের চিত্রাঙ্কনে কোনো শক্তিধর কথাশিল্পীর আবির্ভাব না হওয়াতেই সামাজিক উপন্যাসের ধারাবাহিক উৎকর্ষ এই শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) লেখার পরে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথকেও অন্তত দেড় দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা

সুধী প্রধান

সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, শিক্ষাব্যবস্থা এবং নীলকর ও গ্রামস্থ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার প্রভৃতি নিয়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে যখন তুমুল আন্দোলন চলছিল--বঙ্কিম তখন শুরু করেছিলেন ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের মধ্য দিয়ে মানুষ এবং তার কতগুলি চিরন্তন সমস্যাকে বাঙালী জীবন, সমাজ, পরিবার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিলায়িত করতে। নারীর প্রেমিক নির্বাচনে স্বাধীনতা বিধবাবিবাহের সমস্যা, বিবাহিতা নারীর পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনেচ্ছা প্রভৃতি মানবিক, সমস্যার সঙ্গে দেশের পরাধীনতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, কৃষক সমস্যা এবং ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিষয় উপন্যাস, রসরচনা ও প্রবন্ধের আকারে যত বিস্তৃত ও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন--তার জন্য তিনি জীবিতকালেই মহান পথিকৃতের সম্মান পেয়েছিলেন।

অবশ্য শুরুতে তিনি কিছু বিরূপ সমালোচনার পাত্রও হয়েছিলেন। কোন কোন সাহিত্য-সমালোচক ও সমাজহিতৈষী অভিযোগ করেন যে তাঁর উপন্যাস পাঠ করে বিধবারা প্রণয়ে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। বিবাহিতা যুবতীরা বিবাহপূর্ব প্রণয়ীদের সঙ্গে মিলনে উৎসাহিত হচ্ছে। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে বিধবারা আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বসু (কাব্যসুন্দরী, কলিকাতা ১২৮৭) অন্যতম। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বঙ্কিমের জীবিতকালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্কিমের রচনার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছেন। মজিলপুরের (২৪ পরগণা) হারাণচন্দ্র রক্ষিত ১৮৯৯ সালে 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থে বঙ্কিমের ত্রুটী ও সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেও প্রথম স্বীকার করেছিলেন, বঙ্কিম নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যকে দুর্গতি ও দারিদ্রের অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন---এই উক্তির পর রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিম সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেছেন। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত (বঙ্কিমচন্দ্র, ঢাকা ১৩২৭) থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ বঙ্কিম আলোচনাকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করলেও সেগুলি সাহিত্য সমালোচনার প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করেনি--যদিচ প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা দিয়ে পূর্বেকার আলোচনাগুলির ফাঁক পূরণের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু ১৯৪৯ সালে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রয়াত নেতা ভবানী সেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' প্রবন্ধে (মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ১ম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত) বঙ্কিম সমালোচনার এক নতুন দিগন্তের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রয়াত অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘ প্রচারিত সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি দিয়ে যে

আলোচনা চলছিল, এছাড়া প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা পূরণচাঁদ যোশীর উৎসাহে অধ্যাপক সুশোভন সরকার 'Notes on Bengali Renaissance' শীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিম ও উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রয়োগ করেছিলেন—সে সব অতিক্রম করে ভবানী সেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে তৎকালীন রাজশক্তির সঙ্গে কখনো সহযোগিতা কখনো সংঘর্ষের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের বিকাশ কিভাবে হচ্ছিল এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাহিত্যক্রিয়া সেই বিকাশে কি ভূমিকা নিয়েছিল তারই নিরিখে ঐ যুগের সাহিত্য বিচার করেছিলেন। শ্রী সেনের প্রবন্ধ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে সে সময় প্রবল বাক্‌-বিতণ্ডার সূচনা করে—যার ফলে প্রবন্ধটির পার্টিগত দায়িত্ব অস্বীকৃত হয়—কিন্তু শ্রী সেন নিজে কখনো প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করেন নি। যদিচ ভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য করেন। এরপর ১৯৫১ সালে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস' তাঁর Doctoral thesis হিসবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির মাসিক পত্র 'পরিচয়'-এ তার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়াত অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় যেসব মন্তব্য করেন-তা নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ মহলে নূতন করে বিতর্ক শুরু হয়। ডঃ পোদ্দার নিজেকে মার্কসবাদী বলেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই 'বঙ্কিম মানস' আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Doctoral thesis-এর উপযোগী বলে মেনে নিয়েছে বলেই এই আলোচনার গুরুত্ব ছিল। বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোধকরি এই প্রথম মার্কস-বাদী দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য সমালোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক হিসাবে গণ্য করল।

ডঃ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস' নিয়ে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক রবীন্দ্র নাথ গুপ্ত এবং অধ্যাপক গোপাল হালদার যে আলোচনার সূত্রপাত করেন আজ সেগুলি পড়লে দেখা যাবে ভবানী সেনের বিশ্লেষণের অনেক কিছু অস্বীকৃত হলেও তাঁর মূল বক্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যে দুটি যুদ্ধমান শিবির তৈরী হয়েছিল—তারই সম্প্রসারণ কেবল পশ্চিম বাংলায় নয়—বাংলাদেশেও চলছে। ডঃ পোদ্দার বঙ্কিমের স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যায় কলোনিয়াল বুর্জোয়াদের সীমাবদ্ধতা প্রসূত দ্বৈতস্বভাব (চোখ যা দেখে, মন তা মানে না)-এর যে ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দির অধিকাংশ শিক্ষিত সমাজের আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন—প্রায় সেই ধরণের ব্যাখ্যা আরো বিস্তৃত পরিসরে ডঃ ভবতোষ দত্ত দিয়েছেন, তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিম' গ্রন্থে—যদিচ তিনি মার্কসবাদের দায় স্বীকার করেন নি। অপর পক্ষে অধ্যাপক অসিত ভটাচার্য, বাংলা-দেশের বদরুদ্দিন উমর, নাজমা জেসমিন চৌধুরী প্রমুখ ভবানী সেনের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকেই অগ্রসর হয়েছেন। সত্তর দশকে যখন মূর্তি ভাঙার আন্দোলন তুঙ্গে—তখন বঙ্কিম কেন রেহাই পেলেন—এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিশিষ্ট কবি সাংবাদিক সমর সেন তাঁর সম্পাদিত 'Frontier' পত্রিকায়।

অধ্যাপক অসিত ভটাচার্য ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ ডঃ ভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশের অল্পদিন পরে এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার অনেকদিন আগেই 'বাংলার নবযুগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা' গ্রন্থে ভবানীবাবুর যুক্তি ও তথ্যের অনেক সম্প্রসারণ করেছেন। নামের তালিকা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা আমি করিনি, আগ্রহী পাঠক এ যুগের অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত, অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এবং পুরোনো দিনের খ্যাতনামা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুণ কবীরের রচনায়

সঙ্গে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অনেক গবেষক পাবেন যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্কিম আলোচনায় রত আছেন।

ভবানীবাবুর প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজের সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে চিত্র এঁকেছিলেন তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। অপরপক্ষে ডঃ পোদ্দারও তাঁর বইয়েতে তাঁর বিবেচনা মত যে ব্যাখ্যা দেন তা নিয়ে বিশেষ বিতর্ক শুরু হয়নি। আসলে নতুন সমালোচনায় এই ব্যাপারটি প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে যা এঁদের পূর্ববর্তীদের আলোচনায় পায়নি। দ্বিতীয়ত আজকাল আমরা আঠারো ও উনিশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু তথ্য পেয়েছি—ভবানীবাবুর যুগে তেমন সংগ্রহ কিছু ছিল না। যদিচ অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ শুরু করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষকদের সে যুগের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এই ধারণা নিয়ে ভবানীবাবু প্রগতি সাহিত্যের উৎস তাদের মধ্য থেকে অনুসন্ধান করে পেলেন—দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে।

ভবানীবাবুর ভাষায়: এঁদের সাহিত্যে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছিল বলিষ্ঠভাবে; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচার এই ছিল তাঁদের সাহিত্যের বিশেষত্ব। ... ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ চাই একথা বলার মত চেতনা দীনবন্ধু-মধুসূদন-কালীপ্রসন্নের না থাকলেও দেখতে হবে তাদের সাহিত্য সমাজের কোন ধারাকে এবং কোন সাহিত্যকে বলশালী করেছে। এঁদের সাহিত্য শাসক শ্রেণী এবং অভিজাত শ্রেণীকে আঘাত করেছে; ফিউডাল সমাজের কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করেছে, ধর্মের গোঁড়ামি নষ্ট করে দিয়েছে এবং সাহিত্যে নতুন আদর্শ প্রচার করেছে।'

'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে দুটো ধারার সংঘাত দেখা যায়—তা হল এই নিয়ে যে কোন পথে ভারতের বুর্জোয়া অগ্রগতি হবে—ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং তাকে অস্বীকার করে অথবা ইংরাজ শাসনের সাহায্যে এবং তার সঙ্গে আপোষ করে। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য হ'ল প্রথম ধারার বাহক, বঙ্কিম সাহিত্য হ'ল দ্বিতীয় ধারার বাহক।' ভবানীবাবু আবার বলেছেন—'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার, এক বিবাহ, প্রাচীন সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধের বিরুদ্ধতা এইগুলিই হ'ল গণতান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম উপকরণ। এই সমস্ত উপকরণ বর্জিত হয়েছে বঙ্কিম সাহিত্যে।' "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রমাণ করতে চেয়েছে যে স্ত্রীলোক তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে চাইলেই সংসারে ট্র্যাজেডী দেখা দেয়, একমাত্র ধর্মের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার উদ্ধার নেই। "সীতারাম ও দুর্গেশনন্দিনী" প্রমাণ করতে চেয়েছে বহু বিবাহের মধ্যেও প্রেম কি করে বিজয়ী হতে পারে। বিষবৃক্ষের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে বঙ্কিম হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবারের শান্তি রক্ষার জন্য কামনার বীজ গোড়াতেই টেনে উপড়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই গোঁড়া হিন্দু সমাজে বঙ্কিম এত সমাদৃত হয়েছিলেন। জাতিভেদ এবং আভি-জাত্যের রক্তমাহাত্ম্য বঙ্কিমের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটে বেরিয়েছে। গণতন্ত্রের

প্রত্যেক উপাদানকে তিনি সমাজের প্রতিকূল শক্তি হিসাবে খাড়া করেছেন। এ সাহিত্যকে গণতান্ত্রিক সাহিত্য কিছুতেই বলা যেতে পারে না। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম রসসৃষ্টি করেছেন—সন্দেহ নেই। কিন্তু সে রস অভিজাত শ্রেণীর উপভোগ্য, গণতন্ত্রী জনসাধারণের কাছে তা বিষের সমতুল্য। ——অভিজাত শ্রেণী তখন ইংরাজের প্রধান স্তম্ভ। ফরাসী বিপ্লবের মর্মই ছিল অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পরিচালিত গণ অভিযান।' —যা ভবানীবাবুর মতে বঙ্কিমে অনুপস্থিত। তা ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষণ হ'ল ধর্মের প্রভাব হ্রাস ও বিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি। ভবানীবাবুর মতে বঙ্কিমের রচনায় ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি আছে এবং সেই বিচারে 'আনন্দমঠ' এর 'আধ্যাত্মিক দেশাত্মবোধ' সকল ধর্মের সমান স্থান নেই। ভবানীবাবুর এই সকল মতের বিরুদ্ধে সে যুগে অনেকে অনেক কথা বলছেন যাদের মধ্যে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের বক্তব্যের সারাংশ উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করছি এই কারণে যে ইদানীংকালে যেসব বক্তব্য শোনা যাচ্ছে তা প্রধানত: এই তিনজনের বক্তব্যের সম্প্রসারণ বলে গৃহীত হতে পারে।

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর প্রবন্ধ 'প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা'য় কেবল বঙ্কিম নয়, রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রমুখের আলোচনা করেছিলেন কালমার্কস বর্ণিত ভারতে ইংরাজ শাসন সম্পর্কিত রচনার প্রেক্ষাপটে। কার্লমার্কস যা বলেছেন তার মর্ম হ'ল যে, ভারত অধিকার এবং শাসন ইংরাজরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে করলেও রেলপথ, টেলিগ্রাফ, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও ভারতীয় সৈন্যদল, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ক'রে এমনি এক কাজ করেছে—যা অনড় ভারতীয় সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তার ফলে ভারতীয় জনগণ একদিন এই শাসনকে উচ্ছেদ করবে। মার্কস ভারতে ইংরাজ আগমনের ধ্বংসাত্মক চেহারা এবং গঠনমূলক চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন—"যতদিন বিলাতের শ্রমিকরা শাসক শ্রেণীকে নিষ্কাশিত না করে কিম্বা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তি বলে ইংরেজের শাসন শৃংখল চূর্ণ না করে, ততদিন ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, সেই বিশাল চিত্তাকর্ষক দেশের পুনরুজ্জীবন আসবে।"

মার্কসের বক্তব্যের পর শ্রীরায় প্রখ্যাত সোভিয়েট সমালোচক মিখায়েল লিফশিৎস-এর বক্তব্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে উদ্ধৃত করেন: The confusion of revolutionary and re-actionary tendencies in the consciousness of the great representatives of the old culture is an established historical fact. Revolutionary ideals have seldom been reflected directly and immediately in literature. Leninism teaches us how to discriminate the historical content of work of art, how to separate the living from the dead in them, how to determine what belongs to the future and what is the mark of slavish past. In this concrete critique lies the class analysis. এই উদ্ধৃতির পর

শ্রী রায় লিখেছেন মার্কসীয় বিচারে ফিউডাল হইতে বুর্জোয়া—তার থেকে সমাজতন্ত্রবাদের অভিমুখে পরিবর্তন ঘটাই সামাজিক প্রগতির লক্ষণ। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্বের সাহিত্য বিচারে সেই প্রগতির লক্ষণ আছে কি না তাই বিচার্য। কিন্তু সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ শাসন ও তার অত্যাচারকে উদ্‌ঘাটন করেছে কি না—এই নিরিখে ভবানীবাবুর বিচার রাজনৈতিক বিচার—সাহিত্যিক বিচার নয়। শ্রী রায় সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে চান নি। এমন কি সেই আন্দোলনগুলির নেতৃত্বে যারা ছিল তাদেরকে 'কৃষক-বুর্জোয়া' বলতেও তাঁর আপত্তি ছিল। এই রচনার প্রায় দু'বছর পরে শ্রী রায় 'পরিচয়' পত্রিকায় ডঃ পোদ্দারের 'বঙ্কিমমানস' -এর সমালোচনা করেন। শ্রী রায় এই প্রসঙ্গে বলেন বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের সমাজে যে জটিল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল বঙ্কিম, বালজাক ও শেক্‌স্‌পীয়রের দক্ষতায় তার সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। বৃটিশ শাসন সামন্ততন্ত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করেনি এবং দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেনি যাতে ভারতীয় ধনতন্ত্র বৃটিশের সাহায্য ব্যতীত বিকাশ লাভ করে। অথচ রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে সে এমন শিক্ষিত শ্রেণী তৈরী করেছে যারা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রাচীন ভারতের আচার-আচরণ সব ক্ষেত্রে মানিয়ে নিতে পারছে না। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রী রায় আরও বলেছেন যে ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ সমাজ কাঠামোর প্রতিঘাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধনবাদী সাহিত্য তাই প্রধানত ব্যক্তিমানসের বিস্তারে চিত্রণ ও বিশ্লেষণ। শ্রী রায়ের মতে 'দুর্গেশনন্দিনী' এই ধরণের সাহিত্যের সার্থক উদাহরণ কারণ ধনবাদী চেতনার অবশ্যম্ভাবী দিক শুধুমাত্র অন্তরের তাগিদে প্রেমাস্পদকে নির্বাচন করবার স্বাধিকার নারীর পক্ষে স্বীকৃতি লাভ। আয়েষার বিখ্যাত উক্তি 'এই বন্দিই আমার প্রাণেশ্বর' সেকালের কোন বাঙালী বালিকার মুখে বসানো অবাস্তব হতো বলে বঙ্কিম এক অবাস্তব ঐতিহাসিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'তে সেই ধারণা বিস্তৃত করার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিতপালিত সমাজশাসনমুক্ত এক নারীকে প্রধান চরিত্র করা হল। নর-নারীর বিবাহ সম্পর্কে যে নিতান্ত সামাজিক—দৈব বা প্রকৃতিগত নয় সেই সিদ্ধান্ত 'কপালকুণ্ডলা' ফুটে উঠেছে। এক উদ্‌ভট ও হাস্যকর গল্প 'মৃণালিনী'তে জাতীয় স্বাধীনতার অস্পষ্ট পূর্বাভাস যার মধ্যে ধনবাদী চেতনার স্বাধীন বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত ও দ্বিখণ্ডিত। শ্রী রায়ের মতে 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছেন, যদিচ বঙ্কিমের উচ্চতম প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক হিসাবে। তাই 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ তিনি দেখালেন সামন্তবাদী সমাজে ধনবাদী চেতনা কি উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য শ্রীরায়ের মতে একটি অপ্রধান ঘটনা। আসল সমস্যা বিবাহিত নগেন্দ্রনাথের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি। বঙ্কিমের সামনে অবিবাহিতা ভদ্র নারী ছিল দুর্লভ। যখন বহুবিবাহ নিন্দিত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ কল্পনাতীত তখন সেই হৃদয়হীন সমাজে কুন্দনন্দিনীকে বিসর্জন দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিম দেখালেন বিধবা বিবাহে নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানলেও সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না। অপরদিকে, ভ্রমরকে দিয়ে বলালেন "স্বামী যতক্ষণ ভক্তির যোগ্য

ততদিনই সে স্বামী"। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীর বিবাহপূর্বের প্রেম ছাড়াতে অতি-প্রাকৃতের সাহায্য নিয়ে বঙ্কিম উপন্যাসটিকে দুর্বল করেছেন। আসলে শৈবলিনীর সমস্যা রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর চারু এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ীর সমস্যা—যার কোন সমাধানের ইঙ্গিত ওঁরাও দিতে পারেন নি। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী'-তে জাতীয় আন্দোলনের সংকীর্ণ ভিত্তিতে কি করে নেতৃত্ব দিতে হয় তাই বঙ্কিম বলেছেন। অপরপক্ষে 'সীতারাম'-এ শ্রীরায় পেলেন—নেতৃত্ব যদি নিরঙ্কুশ হয় তার ভয়ঙ্কর দিক। 'রাজসিংহ'-তে শ্রীরায় যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গতিশীলতার বর্ণনায় টলষ্টয়ের War and Peace -এর স্বাদ পেয়েছেন। শ্রীরায় বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি আলোচনাই করেন নি।

শ্রীরায়ের জবাবে অধ্যাপক রবীন্দ্রগুপ্ত 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখেন 'দেবী চৌধুরানী' বঙ্কিমের পরিনত বয়সের রচনা—যাতে বহুবিবাহের সমর্থন আছে এবং 'পতিই নারীর দেবতা'—এই হিন্দু ধারণার পোষকতা আছে। বঙ্কিমের শিল্পী মানসে সামন্তবাদী জীবন চেতনার সঙ্গে ধনবাদী চেতনার দ্বন্দ্ব যেমন সত্য—তেমনি এও সত্য যে বিকাশোন্মুখ ধনবাদী চেতনাকে দুর্বলতা গণ্য করে তা পরিহার করার প্রবণতা। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' ব্যতীত তাঁর সমস্ত সাহিত্য সাধনাতে এই প্রবণতাই প্রাধান্য পেয়েছে। আয়েষার মুখ দিয়ে বঙ্কিম যা বলিয়েছেন আর কোন উপন্যাসে তেমন কোন উক্তি নাই। 'মৃণালিনী'-তে বঙ্কিম স্পষ্টই বলেছেন যে প্রেম মহৎ—কিন্তু ধর্ম মহত্তর। 'ধর্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে'। শ্রীগুপ্তের মতে 'কপালকুণ্ডলা'র গঙ্গায় আত্মবিসর্জন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'শান্ত প্রতিবাদ'। বঙ্কিমের ধারণাতে প্রেম দাম্পত্যসীমার বাইরে নয়। 'মৃণালিনী'-তে বালিকা মনোরমার সহমরণের প্রসঙ্গ সহানুভূতিহীন এবং সতীদাহ প্রথাকে সর্বজনস্বীকৃত সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমের ইচ্ছা থাকলে এই ঘটনার নিষ্ঠুরতার একটা চিত্র আঁকতে পারতেন। কুন্দনন্দিনীকে বিধবা হিসাবে চিত্রিত করার পক্ষে যে যুক্তি শ্রীরায় দিয়েছিলেন তা খণ্ডন করার পক্ষে শ্রীগুপ্ত সঠিকভাবে বলেছেন—সে সময়ে বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা কুলীনকন্যার অভাব ছিল না। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রধান সমস্যা বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি এবং উভয় উপন্যাসে বিধবা বিবাহের সমস্যা আনা হয়েছে। শ্রীগুপ্তের মতে বঙ্কিম যে কথা 'বিষবৃক্ষ'-এ বলতে পারেন নি তা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বলেছেন। সেইজন্য রোহিনীকে সৎ নারী হিসাবে উপস্থিত করেন নি যদিও প্রথম খণ্ডে ধনবাদী চেতনা নিয়ে রোহিনীকে উপস্থিত করেছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'-তে বঙ্কিম যাদুবিদ্যার সাহায্যে পূর্বরাগের সমস্যা সমাধান করেছেন। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহে বঙ্কিমের অকুন্ঠ সমর্থন ছিল বলেই বঙ্কিম 'লবঙ্গলতিকা'-কে পুতুল গড়েছেন। কমলাকান্তে বঙ্কিম জাতীয় পুনরুত্থানের দিন গুণছেন—'যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে। লক্ষণসেনের সে গৌড় কই। সে যে কেবল যবনলালিত ধ্বংসাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই।' বঙ্কিমের দুঃখ সামন্ততন্ত্র পতনের জন্য। সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যখন নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, মিথিলা থেকে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে চলে এসেছে—তখন বঙ্কিম 'চাহিব কোন দিকে' বলে পুরানো নবদ্বীপের দিকে তাকাচ্ছেন।

'আমার মন' শীর্ষক প্রবন্ধে Railway, Telegraph প্রভৃতির উল্লেখ করে

বঙ্কিম বলেছেন 'material prosperity'-র সন্ধানে দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। 'আনন্দমঠ' নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলনে ভারতবাসীর বিরাট অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ' পরিকল্পিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের কুফল কতখানি তা ভারত বিভাগের পর নতুন করে বলার নেই। 'রাজসিংহ' সম্পর্কে বঙ্কিম নিজেই বলেছেন যে হিন্দুদের বাহুবল ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। টলস্টয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা প্রসঙ্গে শ্রীগুপ্তের মন্তব্য হ'ল এই যে টলস্টয়ের বয়স যত বেড়েছে তিনি ততই সামন্তবাদী কুসংস্কার ত্যাগ করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের পক্ষে ঘটনাটি বিপরীত ঘটেছে। অধ্যাপক গুপ্ত তাঁর বক্তব্য শেষ করার আগে একটি দিকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যেদিক বঙ্কিমের নজরে আসেনি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত উল্লেখ করে শ্রীগুপ্ত বলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনে যুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সে যুগের 'হিরো' ছিলেন। কিন্তু তিনি মুক্তি আন্দোলন কেবল ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি—শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন, আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থার তদন্ত—যার ফলে কুলী আইন সংশোধিত হ'ল প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমের কোন উৎসাহ ছিল না। এমন কি বঙ্কিমের শিল্পগুরু ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষা প্রকাশিনী সমিতিতে ধর্মের আলোচনা বন্ধ ছিল—তার তাৎপর্যও বঙ্কিম বুঝতে চেষ্টা করেন নি। শ্রীগুপ্ত অবশ্য এই বলে শেষ করেছেন যে চরিত্র সৃষ্টির আশ্চর্য্য নৈপুন্য এবং উন্নত কলার যোগ্য ভাষা সৃষ্টি বঙ্কিমকে মহৎ করেছে। উপন্যাস হয়েছে art এবং philosophical occupation. যার জন্য তাঁর উপন্যাসের চিরায়ত মূল্য।

এই তিনজনের বক্তব্যের গুরুত্ব কেন দিয়েছি আশাকরি বঙ্কিম গবেষকরা বুঝতে পারবেন। ডঃ পোদ্দারের বক্তব্যের যে অংশটি পূর্বোক্ত দুই বিদগ্ধ সমালোচকের আলোচনায় অবহেলিত, তা হচ্ছে—সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের নগ্নরূপ প্রকাশ, যার প্রতিক্রিয়ায় সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মরা সমেত সমস্ত শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মের পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে জাত্যাভিমানের সান্ত্বনা অনুসন্ধান করতে থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় এই সময় শাসককুলের মধ্যে যারা orientalist তারা anglicist-দের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেছিলেন—বনিবনা হচ্ছিলনা বলে। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু ১৮৭২ সালেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে শুরু করেন। নিজ চেষ্টায় প্রণীত সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট ভঙ্গ করে কেশব সেন নিজের কন্যাকে হিন্দুমতে কোচবিহারের রাজার সঙ্গে বিয়ে দেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হয় এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম হিন্দুমতে পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে থাকেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্যসমাজ' ও হিন্দুমানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে থাকে। একই সময়ে বাংলা নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ', 'শরৎ-সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ', 'হীরকচূর্ণ' প্রভৃতি বৃটিশ বিরোধী নাটক হতে থাকে। কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরেও বঙ্কিমকে ইংরেজের কাছে অপদস্থ হতে হয়—যার ফলে তাঁর মানসিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম তো বিদ্যাসাগর নন—তাই তিনি ইউরোপের বহির্জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের অন্তর্জ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করার জন্য ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে নতুন জীবনের আদর্শসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু ভারতের বাস্তব অবস্থা এই সামঞ্জস্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না। এই প্রসঙ্গে

ডঃ পোদ্দারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—"প্রথম পর্বের 'মৃণালিনী'-তে এবং দ্বিতীয় পর্বের 'চন্দ্রশেখর' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ আমরা তাঁহার অধ্যাসের পরিচয় পাই। তাহতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অথবা পুনরুদ্ধারের সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় পর্বের রচনায় তাহা পূর্ণাঙ্গ সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করে।" 'আনন্দমঠ'-এ ইংরাজ বিরোধিতা থেকে বঙ্কিমের পশ্চাদপসরণের কারণ দেখাতে গিয়ে ডঃ পোদ্দার বলেন : "নূতন ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্ত্তক বিত্তশালী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বর্ণশংকর চরিত্র...একদিকে সুউচ্চআদর্শবাদ...অপরদিকে প্রয়োজন বোধে অত্যাচারকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন; গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা—অপরদিকে সেই গবর্ণমেন্টকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার—বঙ্কিমযুগ এই ঐতিহ্যের অধিকারী।" অর্থাৎ, বঙ্কিম যেন যুগের অবস্থাকেই ভাষা দিয়েছেন।

বঙ্কিমের পক্ষে এইসব যুক্তি দেওয়ার সময় মনে রাখা উচিত—যুগের চিন্তাকেও তিনি প্রভাবান্বিত করেছেন। 'ইংরাজস্তোত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন 'আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেননা তাহা হইলে তুমি আমাকে সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।' এই উক্তি প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করেই; সূর্য্যমুখীর মুখ দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলানো এবং বহুবিবাহ নিরোধক আন্দোলনের জন্য বিদ্যাসাগরের চেষ্টাকে quixotic বলাতে বর্ত্তমানের যেসব গবেষক বঙ্কিমের কড়া সমালোচনা করেছেন —তাঁরা কিছু অন্যায় করেন নি। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ মন্তব্য করেছেন—বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমের অবচেতন ঈর্ষা ছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম কেন ইংরাজীতে উপন্যাস লেখা শুরু করে বাংলায় ফিরে এলেন—সে সম্পর্কে কোন কোন গবেষক প্রশ্ন করেছেন। বঙ্কিম উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন 'নীলদর্পণ'-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য কয়েকটি বিদেশী ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে এবং বিলাতের বিখ্যাত লেখক ডিকেন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তখন তাঁর মনস্থির করতে দেরী হয় নি। তাই বিদ্যাসাগরের ভাষা এবং 'নীলদর্পণ'-এর সাহিত্যগুণের নিন্দা করতেও তাঁর বাধেনি। যদিও 'নীলদর্পণ'-এর প্রভাব Uncle Tom's Cabin-এর সমতুল্য তিনি বলেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের অনুসরণে নারীর স্বাধিকার সম্পর্কে 'সাম্য'-এ অনেক কিছুই লিখে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রচার করলেন—'স্বামী সকল বিষয়ে স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এবং শেষ পর্যন্ত 'সাম্য' প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করলেন। বিধবা বিবাহ সমর্থন করা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ছিল—সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না'—অথচ ভালবাসার এই মানদণ্ডে তিনি পুরুষের একাধিক বিবাহকে সমালোচনা না করে বিষয়টি প্রবৃত্তির উপর ছেড়ে দিলেন। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন—তা পরিত্যাগ করে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু সংস্কার কর্মে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করলেন। নারীর স্বাধিকার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর এবং কিছু ব্রাহ্ম নেতা যে সব চেষ্টা করেছেন তার বিপক্ষে বঙ্কিমের যুক্তি ছিল—"ধর্মসম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (religion and moral improvement) না ঘটিলে কেবল শাস্ত্রের বা কোন গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।" কিন্তু এই উন্নতি কিভাবে হবে তার কোন সদুত্তর না দিতে পেরে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' ও

'কৃষ্ণচরিত্র'-এ নিজেই শাস্ত্র ও গ্রন্থ ঘাঁটতে লাগলেন। বঙ্কিমের স্ববিরোধিতার এও একটি দৃষ্টান্ত।

কৃষক সমস্যা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য তাঁর স্ববিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রাহ্য করা উচিত। ভারতে ভূমি ব্যবস্থার উপরে ইংরেজশাসন যে আঘাত হেনেছিল তাতে কেবল গ্রামের কুটীর শিল্পগুলিই ধ্বংস হয়নি—গ্রামের সামগ্রিক ভিত্তিগুলি ধ্বংস হয়েছিল। যার ফলে ভারতে বারবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজেই বলেছেন: "আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কোম্পানীর শাসনের ফলে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ বন্যজন্তুর বসবাসে পরিণত হয়েছে।" বস্তুত: ভারতকে ইংলণ্ডের—কলকারখানার উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং উক্ত কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ্দারে পরিণত করাই ছিল বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য।

রামমোহন বিলাতে পার্লামেন্টের একটি কমিটির কাছে প্রস্তাব দেন জমিদারদের মত কৃষকদের স্বত্ব ও খাজনার পরিমাণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত করতে। রামমোহনের ধারণা ছিল ইউরোপের ভদ্র ও বিত্তশালী লোকরা যদি ভারতে এসে বসবাস করেন তাহলে তাদের দৃষ্টান্তে এদেশের উন্নতি হবে এবং কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের মতন এদেশেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হবে—যেখানে হয়তো নামে মাত্র একজন ইংরাজ গভর্ণর থাকবেন। আর উন্নত-ধরণের চাষের ব্যবস্থা হলে জমির কৃষক মালিকদের হাতে অর্থ সঞ্চিত হবে, যাতে করে শিল্প—কারখানার জন্য প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ হতে পারে। রামমোহনের যুগ ছিল—উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ—যে যুগে ইউরোপের প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ হয়েছিল পরদেশ লুন্ঠনের দ্বারা, সাধারণ ব্যবসায়ের দ্বারা নয়। ১৭৮৪ সালে হাউস অব কমন্স এ যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা যে কেন রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—তা বলা দুষ্কর। এই প্রস্তাবে ছিল—"পার্লামেন্টারী তদন্তের ফলে যা প্রকাশ তা হচ্ছে এই যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বা ব্যবসা চালানোর দিক থেকে একেবারেই দুর্নীতিপূর্ণ ও আদর্শচ্যুত; সনদের বলে যুদ্ধ ও শান্তির যে ক্ষমতা এদের দেওয়া হয়েছিল লুন্ঠনের উদ্দেশ্যে তার অপব্যবহার করে সে সর্বত্র বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। —যে দেশ এক সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল তাকে নিঃস্ব ক্ষয়িষ্ণু ও জনহীন করে তুলেছে।" অথচ বিখ্যাত পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল—বঙ্কিম প্রমুখ শিক্ষিত বাঙালীরা যাঁর মতামতকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন, তিনি কোম্পানীর পক্ষে যে আবেদন পার্লমেন্টে করেন তাতে বলা হয় কোম্পানী ভারতে যা করেছে তা সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং উপকারী—যা মানব জাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে স্যার জর্জ কর্ণিওয়াললুইস ১৮৫৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন —"১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৪ সালে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেভাবে শাসন চালিয়েছে তার থেকে দুর্নীতিপরায়ণ বিশ্বাসঘাতক এবং লুন্ঠনকারী শাসনযন্ত্র দুনিয়ার কোন সভ্য সরকার চালায় বলে আমি কিছুতেই মনে করি না।"

কাজেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনতন্ত্র কায়েম হলেও ইংরাজ শোষণের রূপ ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমের যুগে এবং বিশেষ করে কৃষকদের জীবনে। বঙ্কিমের আগেই প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কেশব সেন কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে লেখেন। এমন কি 'গ্রামস্থ জমিদারদের কৃষকদের প্রতি অত্যাচার' সম্পর্কে নাটক লেখানোর জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বঙ্কিম তাঁর অনবদ্য ভাষায় জনপ্রিয় বিষয় হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ইংরাজের চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলেও সমাজবিপ্লবের ভয়ে সে ব্যবস্থা রক্ষা করার পরামর্শ ইংরাজকে দিলেন এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' এর ১৮৯২ সালের পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় লিখলেন—'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ এদেশীয় কৃষকদের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আর নাই। জমিদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেকস্থানে দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।'

একেবারে বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমের পরিচিত আর একজন বিখ্যাত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত—যিনি আজও ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসকার হিসাবে বন্দিত। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে—"Cultivation has largely extended under the peace and security assured by the British rule. But no man familiar with the inner life of the cultivators will say that the extension of cultivation has made the nation more prosperous, more resourceful, more secure against famine." দেশের শিল্প-বানিজ্য যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের শিল্প-বানিজ্য দ্বারা প্রভূতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে—আর বৃটেন এদেশ থেকে বিপুল সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে—তখন বঙ্কিম 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখছেন যে, ছয় টাকা দিয়ে বিলাতী থান কিনলে বৃটেনের হয়তো দুই টাকা লাভ হয়—কিন্তু ভারতীয় ক্রেতাদের কোন ক্ষতিই হয় না। যারা বলছেন যে এতে দেশের তাঁতিদের ব্যবসা ধ্বংস হচ্ছে, তাদের উত্তরে বঙ্কিমের জবাব হ'ল-থান বুনে রোজগারের পক্ষে তাঁতিদের কোন বাধা নেই। বঙ্কিম একবারও ভাবলেন না যে সহজে জাত ব্যবসার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষের জমি সংগ্রহ সমগ্র তাঁতি সম্প্রদায়ের পক্ষে সহজ নয়। তাছাড়া বৃটেনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা নিছক বিনিময় প্রথার উপর তৈরী হয় নি—জবরদস্তি ও লুন্ঠনের ভিত্তিতে হয়েছিল, যা বঙ্কিমের সমসাময়িক বিদেশী ও ভারতীয়দের চোখে ধরা পড়েছিল। ১৭৮৩ সালের হাউস অব কমন্সে-এর সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টে বলা হয়েছিল : "কোম্পানী এই দেশ (ভারত—সু. প্র) থেকে ব্যবসায়ের নামে যত জিনিষ রপ্তানী করেছে তা কেনা-বেচার বিনিময় প্রথায় করে নি—একবারে এক পয়সা বা অনুরূপ কিছু না দিয়েই করেছে।' ১৮৪০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা গঠিত একটি তদন্ত কমিটি মন্তব্য করে যে ভারতের ম্যানচেষ্টার ঢাকা একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহর থেকে খুব গরীব ও নগন্য শহরে পরিণত হয়েছে—জনসংখ্যা দেড়লক্ষ থেকে তিরিশ-চল্লিশ হাজারে নেমে গেছে। এই তদন্তের মুখে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথমদিককার ইতিহাসকার মন্টগোমারী মার্টিন বলেন : 'সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য শহরে দেশী কারখানাওয়ালাদের যে ক্ষতি ও ধ্বংস হয়েছে তা এত মর্মন্তুদ যে বর্ণনা করা যায় না। আমি মনে করি না যে, এই কাজ সৎ ব্যবসার দ্বারা হয়েছে। দুর্বলের উপর সবলের শক্তি প্রয়োগের ফলে হয়েছে।' বঙ্কিম যখন সরকারী কর্মচারী, অর্থাৎ ১৮৭৮ সালেই

ভারত সরকার ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিশনের ১৮৮০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা আছে: 'দুর্ভিক্ষের প্রধান একটি কারণ এবং তা প্রতিকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা এই যে, জনসংখ্যার বিরাট অংশ একেবারে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। অন্য কোন শিল্প নাই—জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ নির্ভর করতে পারে।' উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে এই রিপোর্ট দেখার অধিকারী ছিলেন বঙ্কিম। তাঁর নজরে আরো একটি বই (HISTORY OF BRITISH INDIA—H.H. Wilson) পড়া উচিৎ ছিল—যাতে লেখা আছে: ভারতের কারিগরদের আত্ম বলিদান (বৃটেনের) কলগুলি তৈরী হয়েছে। বঙ্কিম Orientalist-দের রচনা যে পড়েছিলেন তার পরিচয় আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র Free trade-এর সমর্থক ছিলেন। ডঃ ভবতোষ দত্ত 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র'-এ বঙ্কিমের উপর স্যার জন রবার্ট সীলি (Seely)-র দুইখানি গ্রন্থের প্রভাব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই Seely-র ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত বই 'Expansion of England' বঙ্কিমের নজরে কেন এল না—তাহলে দেখতে পেতেন—ইংরাজ কি উপায়ে নিজের উন্নতি করেছে। বঙ্কিম শ্রমজীবীদের বেতন, মালিকের মুনাফা ভূমিকর ও সুদ প্রভৃতি সম্পর্কে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ যে সব কথা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় যে তিনি এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মতন বৃটেনের ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের লেখা পড়েছেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ বি, এন, গাঙ্গুলী মন্তব্য করেছেন যে বঙ্কিমের এই বক্তব্য Malthus ও James Mill এর মতের সংমিশ্রণে, বৃটিশ অর্থনীতিবিদদের wage-fund মতবাদের অনুসারে। তাঁর উক্তির সমর্থনে শ্রীগাঙ্গুলী এ্যাডাম স্মিথ থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন—তা পড়লে মনে হয় বঙ্কিম স্মিথের কিছু অংশ নিয়ে শেষ দিকটার তাৎপর্য এড়িয়ে গেছেন: 'The demand for those who live by wages cannot increase but in proportion to that increase of funds which are distined to the payment af wages' এই চাহিদা 'necessarily increases with the increase of the revenue and stock of every country and cannot possibly increase without it'. দেশের ধনবৃদ্ধি কি করে হতে পারে সে প্রশ্নে না গিয়ে বঙ্কিম শ্রমিকদের বিদেশে বসবাস করতে এবং রামধন পোদকে ছেলের বিয়ে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এ্যাডাম স্মিথের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "wealth of nations"-এর প্রথম অধ্যায়েই মন্তব্য আছে, ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সম্পর্কে: "যাদের শাসন করা হচ্ছে—তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি রাজত্বকে এমন করে শোষণ ও ক্ষয় করার প্রতি এবং শাসন ও শোষণের সুনাম বা দুর্নামের প্রতি চরম ঔদাসীন্য আজ পর্যন্ত কেউ কখনো দেখায় নি—দেখাবেও না।"

কোটি কোটি লোক দরিদ্র কেন—তার যে উত্তর বঙ্কিম দিয়েছেন তাতেও তাঁর পশ্চাদগামিতা প্রকাশ পেয়েছে। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি বলেছেন 'ধন, গ্রাসাচ্ছাদন, আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা তাহা সংগ্রহের মানসিক ও শারীরিক শক্তির অনুশীলন করে নাই।' এর পর বলেছেন: 'সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—তার কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। অতএব অনুশীলনের অধীন।' এরপর যদি Herbert Spencer—এর

"The acts received for continued self—preservation including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisits to universal welfare."
এই উক্তি মনে রাখা যায় তাহলে বঙ্কিমের নিম্নলিখিত উক্তির সূত্র মেলে। "যদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে পরের হিতসাধনও যেমন আমার ধর্ম—তেমনি আমার নিজের হিতসাধনও আমার ধর্ম। আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত···আত্মপ্রীতি ও জগতপ্রীতি এক।" বঙ্কিম ধর্মতত্ত্বে" ই স্বীকার করেছেন—অনুশীলন দ্বারা সামঞ্জস্য করা সব লোকের কর্ম নয়। এই কারণে তিনি দেব-মানবের সন্ধানে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বঙ্কিমের মতে ইংরাজ শিখিয়েছে স্বতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিম ও তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাবিদরা ইউরোপের বুর্জোয়া বিকাশ থেকে সৃষ্ট Nation State গঠন দেখে স্বদেশে তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ধরণের বিকাশের পক্ষে প্রধান বাধা যে বৃটিশ শাসন—এ বোধ তাদের ছিল না। ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষে জাতি প্রতিষ্ঠা যে কঠিন তা বঙ্কিম তার 'ভারত পরাধীন কেন?' (১৮৭২) প্রবন্ধে লিখেছেন: "এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানে প্রভেদ, ভাষায় প্রভেদ, ধর্মে প্রভেদ। বাঙালী, পাঞ্জাবী, মহরাষ্ট্রীয়, রাজপুত জাঠ, হিন্দু-মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে ঐক্যে যুক্ত হইবে। ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই।" এই অবস্থায় জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হিন্দু ধর্মের বন্ধন শ্রেয় মনে করলেন—"সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কাজ করে—এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ—অর্দ্ধাংশ মাত্র" আর দ্বিতীয় ভাগে বল্লেন: "জগতে অনেক জাতি আছে যাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। পর জাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া যদি আমাদের মঙ্গল সাধন করিতে হয় তাও করিব—তাতে যদি পরজাতির পীড়ন করিতে হয়—করিব।" অথচ ইংরাজের Patriotism- মর্মার্থ এই ধরণের বলে তিনি তার নিন্দা করেছিলেন। 'কমলাকান্ত'-তে মনুষ্যপ্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলেছেন; 'ধর্মতত্ত্ব'-তে মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলেছেন এবং এক পত্রে বঙ্কিম লিখেছেন যে হিন্দুধর্ম বলে ইংরাজ আসার আগে কোন কিছু ছিল না—হিন্দু কথাটা ইংরাজের সংযোজন।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কেও বঙ্কিমের সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তিনি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন—"শাসনকর্ত্তা বিজাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই যে রাজ্য স্বতন্ত্র হয় না—তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজের অধীন আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র রাজ্য বটে।....যে দেশের রাজা অন্য দেশে সিংহাসনারূঢ় এবং অন্য দেশবাসী সেই দেশ পরতন্ত্র। দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে একটি স্বতন্ত্র অপরটি পরতন্ত্র।" কিন্তু বঙ্কিমের মতে—পরতন্ত্র রাজ্যকে কখন স্বাধীন বলা যাইবে? —"আমরা কুতুবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলিব, আকবর শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলিব।....যে যাহা হউক প্রাচীণ ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন।" কারণ রাজা দূরে থাকিলে

সুশাসনের বিঘ্ন হয় এবং রাজা দেশে থাকিলে সে দেশের মঙ্গলের জন্য দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গল করেন। 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাভারতের সভাপর্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে রাজনৈতিক উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বঙ্কিম মন্তব্য করেন যে ইউরোপের তৎকালীন রাজনীতির তুলনায় সেগুলি কোনক্রমে হীন ছিল না—বরং তাদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদের যে এই বিষয়ে কোন ধারণা ছিল—তার প্রমাণ নেই। বর্তমান গবেষকদের মতে মহারাষ্ট্রের বলবন্ত বাসুদেব ফাড়কের বিদ্রোহের কাহিনী বঙ্কিমকে 'আনন্দমঠ' লিখতে উৎসাহী করে। ফাড়কেও কিন্তু সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় প্রকাশ বঙ্কিম 'আনন্দমঠ'-এর অংশ বিশেষ পাঁচবার পরিবর্ত্তন করেন, ইংরাজ শাসকদের বিরূপতা হ্রাস করতে। এই কাজ না করতে হলে হয়তো মুসলমান সমাজ তাঁর প্রতি বিরূপ হত না বা বদরুদ্দিন উমরের ভাষায় বঙ্কিমকে দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক বলা হ'ত না। গীতা, 'আনন্দমঠ' ও বিবেকানন্দ পড়ে আমরা যারা বোমা-রিভলবার নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলাম তাদের অধিকাংশই যে মুসলমান বিদ্বেষী হইনি—একথা নিশ্চিত বলতে পারি। যারা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' এবং অন্যান্য রচনা পড়েছেন—তারা আমার এই উক্তির সমর্থন খুঁজে পাবেন। তিনিও লিখেছেন যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কি হবে—তা প্রথমে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেন নি। আর কংগ্রেস সমেত সমস্ত জাতীয় দল ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ইংরাজের অধীনেই স্বায়ত্ত শাসন দাবী করেছে।

পূর্বেই বলেছি সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ শাসন যে রূপ নেয়—তাতে রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্ম সংস্কারবাদীরা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে আশাহত, লাঞ্ছিত এবং শোষিত জাতির মনে প্রাচীন গৌরবের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। ফলে সামন্ততন্ত্রবাদী আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পক্ষে অক্ষয় দত্তের চেষ্টার আদর্শগত ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। বিদ্যাসাগর জনসমাজ ত্যাগ করে কর্মাটারে এবং অক্ষয় দত্ত বালীতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। বিরাট কৃষক সমাজ—যারা সে যুগের ভারতের শতকরা আশিভাগ লোক—তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থের বিরোধী পক্ষে থেকে যে শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল—তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। একটি হ'ল ইংরাজের সহায়তায় এবং শাস্ত্রের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল মধ্যযুগীয় আচার-আচরণ আছে, তাকে পরিবর্ত্তন করে ইংরাজের সমকক্ষতা দাবী করা, অথবা সব কিছু বাদ দিয়ে প্রথমে ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ করে পরে সমাজ সংস্কারে মন দেওয়া। ভারতীয় রাজনীতিতে এই ধারণা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রবল ছিল, এবং 'আনন্দমঠ' তারই রূপরেখা এঁকে দিয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতের নিষ্কাম ধর্ম মিলিত হলে মানুষ দেবতা হবে। যে অনুশীলনের সাহায্যে নিষ্কাম ধর্মে উত্তরণ সম্ভব হয়—তা সহজসাধ্য নয়, এবং অল্প লোকই তেমন ধার্মিক হতে পারে (যাকে Elitism বলা হয়) এ ধারণাও বঙ্কিম দিয়েছেন। আর কার্লাইল অনুসারে কেশব সেন কর্তৃক মহাপুরুষবাদ প্রচার আগেই শুরু হয়েছিল। এরই ফলে দেশে সমাজপতি সন্ধান (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং

গুপ্ত সমিতিতে সত্যানন্দের মতন কর্মীর তৈরীর জন্য অনুশীলন সমিতি সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিমের গৃহদেবতা ছিল রাধাগোবিন্দ এবং কেবল বঙ্কিমের পিতার সঙ্গে নয়—তাঁর নিজেরও সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীদের যোগাযোগ ছিল। বাঙালীর দুর্বলতাকে কাটাতে বঙ্কিম তাই রাধাকে বাদ দিয়ে গোবিন্দের শরণাপন্ন হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত গীতার সেই অংশের উপর জোর দিলেন—যাতে 'ছিন্নবাদ' পরিত্যাগের ন্যায় জীবন ও মৃত্যুকে গণ্য করা যায়। সন্ত্রাসবাদী ইংরাজবিরোধী আন্দোলন হিন্দুদের আগে মুসলমানরাই শুরু করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা মুসলিম ধর্মে গীতার মতন কোন গ্রন্থ ছিল না—যার দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হতে পারতো।

বর্তমানে যারা মনে করেন বঙ্কিমের প্রভাব কমে গেছে—আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে বঙ্কিম সাধারণ গৃহী মানুষ ছিলেন এবং তখনকার দিনে সত্যাগ্রহী বা শহীদ হওয়ার মতন কোন পরিস্থিতি ছিল না। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম গবেষক যিনি এপার বাংলার বঙ্কিমকে ঋষি বা ভবিষ্য দ্রষ্টা থেকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় বঙ্কিম গৃহীজীবনের সব শর্ত পালন করেও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে শিখিয়ে গেছেন ইউরোপের কাছে জাতীয় সম্মান বজায় রেখে কি নিতে হবে যার দ্বারা ভারত ইউরোপের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে—গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন না ঘটিয়েই। 'কমলাকান্ত'-এ রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ভারতে প্রবর্তন করা সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করলেও বঙ্কিম গান্ধীজীর পূর্বসূরী নন। গান্ধীজী কল-কারখানা ভিত্তিক শিল্পপ্রসারের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তিনি এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের Civilisation : its cause and cure' পড়ে বিজ্ঞান ও আধুনিক ভেষজ বিদ্যার কুফল সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছিলেন। রাসকিনের 'Unto the Last' পড়ে আধুনিক অর্থনীতির নৈতিক সমালোচক হয়েছিলেন এবং রুশিয়ার নারদনিক মতবাদেও টলস্টয়-এর প্রভাবে আধুনিক রাষ্ট্র সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যারা যুক্তিবাদ ও শিল্পবিস্তারের বিরুদ্ধে একটা রোম্যান্টিক সমাজ নির্মানের ধারণা দিয়েছিল—গান্ধীজী সেইসব ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কাজে লাগলেও আজ তা তারা পরিত্যাগ করেছে।

ভারতের বণিক-ধনিক শ্রেণী (পার্শী ব্যতীত) যে কোন উপায়ে মুনাফা অর্জনের পাপস্খালন করতে ধর্মস্থানে মন্দির ও ধর্মশালা নির্মানের যে পথ নিয়েছে, এবং যাকে জহরলাল নেহরু কর্তৃক 'গণতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজতন্ত্রবাদ'-এর সমগোত্র বলা হচ্ছে—বঙ্কিম বরং তাদের কাজে লেগেছে—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। জহরলাল তাঁর 'Discovery of India'-তে বলেছেন: "The modern mind, that is to say the better type of the modern mind, is practical and pragmatic, ethical and social, altruistic and humanitarian. It is governed by a practical idealism for social betterment. The ideals which move it, represent the spirit of the age, the Zeitgeist, the Yugadharma. It has discarded the philosophical approach of the ancients, there search for ultimate

reality, as well as devotionalism and mysticism of the medieval period. Humanity is its god and social service its religion. We have therefore to function in line with the highest ideals of the age we live in. Those ideals may be classed under to heads: humanism and the scientific spirit" বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে' ইউরোপের 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান' এবং ভারতের 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান'-এর মিলন এবং মনুষ্যত্বকে ধর্মজ্ঞানে ইউরোপের বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং ভারতে নিষ্কাম কর্মদ্বারা মানুষকে দেবতায় পরিণত করার যে স্বপ্ন বঙ্কিম দেখেছিলেন—তার উত্তরসাধক জহরলাল নেহরু। লক্ষ্য করার বিষয় বঙ্কিম যেমন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সাম্য'-এর প্রচার বন্ধ করেছিলেন—তেমনি জহরলাল নেহরুও তাঁর শেষ জীবনে মার্কসবাদ-এর উপযোগিতা অস্বীকার করেছিলেন। আত্ম-স্বার্থ, পরিবার স্বার্থ ও গোষ্ঠিস্বার্থের রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনুষ্যত্ব ধর্মে পৌঁছাবার চেষ্টায় বঙ্কিম যেমন স্ববিরোধিতা অতিক্রম করতে পারেন নি, তেমনি অবস্থা হয়েছে জহরলাল নেহরুর নিজের এবং তাঁর অনুসরণকারীদের ক্ষেত্রে।

ভারতের বর্তমান সংকটময় অবস্থায় বঙ্কিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার আলোচনা এইসব কারণেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সূত্র নির্দেশিকা

১। বঙ্কিম রচনাবলী—২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৮৪

২। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূল্যায়নের পালাবদল / সারোয়ার জাহান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৩। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক—ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত, ১ম-৩ খণ্ড, প্রাইমা পাব্লিকেশন, কলিকাতা

৪। বঙ্কিম মানস / ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, ৪র্থ মুদ্রণ ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা, ১৯৬৬

৫। বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমের চিন্তাধারা /অসিতকুমার ভটাচার্য, গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা, ১৯৬৪

৬। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র / ডঃ ভবতোষ দত্ত, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৩

৭। বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি / নাজমা জেসমিন চৌধুরী, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮০

৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাংলা সমাজ / বদরউদ্দিন উমর, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮১

৯। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ / অমলেন্দু দে, রত্না প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪

১০। উপন্যাস প্রসঙ্গে / রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, তুলিকলম, কলিকাতা, ১৯৭১
১১। শিল্পভারতের প্রতিরোধ / সুধী প্রধান, অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৯৪৬
১২। Nationalist thought and the Colonial World/Partha Chatterjee, Oxford University Press, Calcutta-1986
১৩। British Orientalism and Bengali Renairssance/David Kopt, Colifornia, 1969
১৪। "ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বাঙালী ইতিহাস বোধ"--রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ত্রৈমাসিক 'কালধ্বনি', মে-১৯৮৭, সংখ্যা -৮, কলিকাতা

বিষবৃক্ষ ঃ কাহিনী-নির্মিতি

মানস মজুমদার

—১—

সন্দেহ নেই, গল্প বা কাহিনী-রসই উপন্যাসের মূল আকর্ষণ। E. M. Forster-এর প্রবাদপ্রতিম সেই উক্তিটি মনে পড়ে; 'yes, . . oh dear yes . . the novel tells a story'[১] কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন Forster, ঔপন্যাসিকের কাজ কী নিছকই কাহিনী রচনা? কাহিনী তো ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ মাত্র, 'And then?'—'তারপর কী হ'ল'—এই কৌতূহল-পূরণই কাহিনীর লক্ষ্য। যথার্থ ঔপন্যাসিক যিনি, Froster-এর বিবেচনায় ঘটনা-পরম্পরাকে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত করে তোলেন। 'why' বা কেন সংঘটিত হচ্ছে, তার কারণটি তিনি নির্দেশ করেন। রহস্য-কৌতূহলের সঙ্গে যুক্তি আর বিশ্লেষণের মিশ্রণ ঘটান। ঘটনার অনিবার্যতা ও এপরিহার্যতা বিষয়ে সতর্ক থাকেন। নিছক কাহিনী-কথন নয়, কাহিনীকে প্লটে বাঁধাই তাঁর লক্ষ্য। রহস্য যেখানে যুগপৎ পুঞ্জীভূত ও উন্মোচিত। এ আলোচনায় উপন্যাসের কাহিনী বলতে তাই নিছক গল্প বুঝবো না, বুঝবো তার চেয়েও বেশি কিছু। সংক্ষেপে যুক্তি-পারম্পর্য আর কার্য-কারণ শৃংখলা-আশ্রয়ী ঘটনা-বিন্যাসকে।

কাহিনী-নির্মাণ ঔপন্যাসিকের একটি বড়ো কাজ। কিন্তু শুধুমাত্র কাহিনীকার, হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। একজন কাহিনীকার তখনই ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পান, যখন তিনি বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিকোণের (point of view) অধিকারী নন। এই দৃষ্টিকোণের অভাবের জন্যই ইংরেজী সাহিত্যের ভিক্টোরীয় যুগের বা বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের অধিকাংশ লেখক কাহিনীকার মাত্র, যথার্থ ঔপন্যাসিক হন না। জীবন থেকে সংগৃহীত উপাদান-উপকরণকে পরিকল্পনামতো গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপনই যথার্থ ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। আর এখানেই দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব। উপন্যাসের কাহিনীতে আমরা তাই জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধেরও প্রত্যাশা করবো। বেশ বোঝা যাচ্ছে উপন্যাসে কাহিনীর দায়-দায়িত্ব কম নয়। নিছক গল্পরস পরিবেশনই তার কাজ নয়।

—২—

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। পাঠকসমাজে যুগপৎ নন্দিত ও নিন্দিত। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে বোধকরি অধিকতর আলোচিত গ্রন্থ। এক-কথায় মাইলস্টোনতুল্য।

১। Aspects of the Novel, Penguin, 1963, p. 49.

'বিষবৃক্ষ' ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিণত রচনা। 'বিষবৃক্ষ'-পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র মূলত রোমান্স-রচয়িতা। রহস্য-সৌন্দর্যাবৃত স্বপ্নকল্পনাময় অতীত জগতে তাঁর পদচারণা। কিন্তু বিষবৃক্ষে প্রকাশ পেল পরিচিত জীবনের রসরূপ। বিষবৃক্ষের সেই অনন্যতাটুকু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় প্রকাশিত :

"বঙ্গদর্শনের যে জিনিষটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় সে নিয়ে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"[২]

'বিষবৃক্ষ'-পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে বাস্তব জগতের কঠোর কার্যকারণ-শৃংখলা প্রায়শই উপেক্ষিত। অন্যদিকে বিষবৃক্ষের বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক।

—৩—

পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পাই তিনটি কাহিনী। মুখ্য কাহিনী নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর কাহিনী। কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাবে নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর দাম্পত্য-জীবনে যে বিপর্যয়, সে বিপর্যয়ের হেতু ও পরিণতির আনুপূর্বিক উপস্থাপনা ঐ কাহিনীতে। এ বিপর্যয়ের সূচনা নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর পারস্পরিক আকর্ষণে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণ নিতান্ত আকস্মিক নয়। একদা অনাথা বালিকা কুন্দনন্দিনীর প্রতি যা ছিল নিছক সহানুভূতি, কালক্রমে সেই সহানুভূতিই আসক্তিতে রূপান্তরিত। সদ্যযৌবনা কুন্দনন্দিনীর রূপসৌন্দর্য এই আসক্তিকে তীব্র করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, চিত্ত-সংযমের শিক্ষা নগেন্দ্রনাথের ছিলনা।[৩] সে তাই সহজেই প্রবৃত্তির বশীভূত। বিত্তপ্রাচুর্য তথা জমিদারী প্রতিপত্তি এবং বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ-প্রথার সুযোগ গ্রহণকারী।[৪] বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) অবশ্য এক স্ত্রী বর্তমানে বিধবা বিবাহের কথা বলেন নি। বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। নগেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মতাদর্শের প্রতি যে যথার্থ শ্রদ্ধাশীল নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে সে সুযোগসন্ধানী এবং প্রবৃত্তি-প্রাবল্যে অপযুক্তির প্রশ্রয়দাতা।

মুখ্য কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দুটি গৌণ কাহিনী। একটি গড়ে উঠেছে দেবেন্দ্র-হীরাকে নিয়ে। অন্যটি শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি-আশ্রয়ী। কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের আকর্ষণ এবং দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার আকর্ষণ আর কুন্দের প্রতি হীরার ঈর্ষা মূল কাহিনীতে জটিলতা এনেছে। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিতেও হীরা নিয়েছে গুরুত্ব-

২। ভূমিকা, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

৩। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষ কি?

৪। একাদশ, ষোড়শ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখীর পত্র, না, খোস্ খবর।

পূর্ণ ভূমিকা। কুন্দের আত্মহত্যার উপকরনও হীরাই জুগিয়েছে। সে দিক থেকে এ কাহিনীর তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতায় নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর দাম্পত্য-জীবনের শূন্যতাটুকু সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে শূন্যতা সন্তানহীনতা। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী নিঃসন্তান না হ'লে ঐ বিপর্যয় সম্ভবত রোধ করা যেত। সন্তানের উপস্থিতি তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থিটুকু অটুট রাখতে সাহায্য করতো। শ্রীমান সতীশ-চন্দ্রের হাসি কী নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর জীবনের বিষাদময়তাকে প্রগাঢ় করে তোলে না? শ্রীশচন্দ্র-কমলমনির গুরুত্বের আর একটি দিক হ'ল, তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন বা পত্র-বিনিময়সূত্রে নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর গোপন মনোজগতটি বিভিন্ন সময়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। আলোচ্য উপন্যাসে মূল কাহিনী-উপকাহিনীর সম্পর্ক এভাবেই সমর্থন-যোগ্যতা লাভ করেছে।

—৪—

বিষবৃক্ষের কাহিনী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এক বিশেষ দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণ কাহিনীকারের মতো সুলভ কাহিনী পরিবেশন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। জীবন-জিজ্ঞাসু তিনি। জীবনের মূল্য সম্পর্কে সচেতন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তিনি মানুষের প্রবৃত্তিলীলার বিষময় পরিণামটি নির্দেশ করলেন। উপন্যাস-নাম সেদিক থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ। 'রিপুর প্রাবল্য' বিষবৃক্ষের 'বীজ'। লেখকের মতে, :

> "চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।"

(ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষ কি?)

নগেন্দ্রনাথ-দেবেন্দ্র-হীরা এই রিপু প্রাবল্যের বশীভূত। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর মতো সুন্দরী শিক্ষিতা রুচিশীলা স্ত্রীরত্নের অধিকারী হয়েও কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত। কুন্দ-রূপমুগ্ধ পতঙ্গ সে।[৫] বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের মতোই দহনজ্বালায় দগ্ধ। সূর্যমুখীর পবিত্র প্রণয়ের অমর্যাদাকারী। কুপিত প্রেম নগেন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাচারিতাকে ক্ষমা করে নি। শাস্তি দিয়েছে। চারিত্রিক ত্রুটি ও দুর্বলতাই নগেন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডির হেতু।

৫। দ্রঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা : "আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতি স্থৈর্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে।"

দাম্পত্য-জীবনের প্রণয়-মাধুর্যের আস্বাদবঞ্চিত দেবেন্দ্র কাম রিপুর বশীভূত। অসংযত তার চিত্ত। ন্যায়-নীতি বিবেক লঙ্ঘনে অকুণ্ঠিত। সেজন্য তাকে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের তুলনায় তার শাস্তির পরিমাণ বেশি। অবশ্য অকারণ নয়। নগেন্দ্রনাথ অন্যায়-সচেতন।[৬] বিবেক-দংশন-কাতর। কৃতকর্মের জন্য শেষপর্যন্ত অনুতপ্ত।[৭] কিন্তু দেবেন্দ্র বিবেকশূন্য।

হীরা ঈর্ষা ও কামনা-প্রাবল্যের শিকার। তার শাস্তিও মর্মান্তিক।

আর কুন্দ? তাকে কেন্দ্র করেই নগেন্দ্রনাথ-দেবেন্দ্র-হীরার চিত্তদাহ। তার অকাল-মৃত্যু বিষ-পরিণতির বেদনাকরুণ একটি অংশ।

বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিকল্পিতভাবে বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম থেকে বিষবৃক্ষের ফল-পরিণতি নির্দেশ করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী হয়ে উঠেছে তাৎপর্যমণ্ডিত, জীবনাবেদন-সমৃদ্ধ।

—৫—

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী প্রধানত লেখকের জবানীতেই পরিবেশিত। মাঝে মাঝে অবশ্য নাট্যরীতি-সহায়তায় পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে কাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

আর একটি কৌশলে কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছেন লেখক। তা হ'ল পত্ররীতির প্রয়োগ। পত্ররীতির প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশ কয়েকটি রচনাতেই করেছেন। কিন্তু বিষবৃক্ষে এ রীতির সাহায্য যতখানি নিয়েছেন

৬। দ্র° (১) একাদশ পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখীর পত্র : "আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যেদিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।"

(২) ষোড়শ পরিচ্ছেদ : না : "শুন কুন্দ! ...আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না।"

(নগেন্দ্রনাথের উক্তি)

৭। দ্র° দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল : "...আমি এ-পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি।"

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

ততখানি আর কোন রচনায় নেন নি। বিষবৃক্ষে মোট ১৪টি পত্র সন্নিবিষ্ট। সেগুলি হ'ল :

লেখক/লেখিকা	প্রাপক/প্রাপিকা	পরিচ্ছেদ	পত্রসংখ্যা
সূর্যমুখী	কমলমণি	১১ : সূর্যমুখীর পত্র ১২ : অঙ্কুর ২৫ : খোস্ খবর ২৮ : আশীর্বাদ পত্র	৪
নগেন্দ্রনাথ	হরদেব ঘোষাল	৫ : অনেক প্রকারের কথা ১২ : অঙ্কুর ৩২ : বিষবৃক্ষের ফল ৩২ : ঐ	৪
হরদেব ঘোষাল	নগেন্দ্রনাথ	১২ : অঙ্কুর ৩২ : বিষবৃক্ষের ফল	২
সূর্যমুখী	নগেন্দ্রনাথ	৫ : অনেক প্রকারের কথা	১
কমলমণি	সূর্যমুখী	১১ : সূর্যমুখীর পত্র	১
নগেন্দ্রনাথ	শ্রীশচন্দ্র	২৫ : খোস্ খবর	১
ব্রহ্মচারী	নগেন্দ্রনাথ	৩৫ : আশা পথে	১

এছাড়া আরো ৪টি পত্রের উল্লেখ আছে, উদ্ধৃতি নেই :

নগেন্দ্রনাথ	সূর্যমুখী	৫ : অনেক প্রকারের কথা	১
ঐ	দেওয়ান	৩৫ : আশাপথে	১
ঐ	শ্রীশচন্দ্র	৪৯ : সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না	১
শ্রীশচন্দ্র	নগেন্দ্রনাথ	২৫ : খোস্ খবর	১

উদ্ধৃত পত্রসমূহের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্রহ্মচারীর পত্রটি সূর্যমুখীর সংবাদ-জ্ঞাপক, অবশিষ্ট পত্রসমূহে সংবাদ একেবারে উপেক্ষিত না হলেও পাত্রপাত্রীর মনোজগত বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, একাদশ ও দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদদ্বয় একান্তভাবেই পত্র-আশ্রয়ী। লেখক নেপথ্যচারী।

'বিষবৃক্ষ' পত্রোপন্যাস (Epistolary novel) নয়। কিন্তু পত্ররীতির প্রয়োগে কাহিনী হয়েছে গতিশীল, পত্র-লেখক অথবা লেখিকার অন্তর্দ্বন্দ্বগতটি পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী-কমলমণি, নগেন্দ্রনাথ-হরদেব, এবং নগেন্দ্রনাথ-শ্রীশচন্দ্রের পত্র-বিনিময় উল্লেখযোগ্য। হরদেবকে লেখা নগেন্দ্রনাথের প্রথম পত্রে কুন্দের চক্ষু-প্রশস্তি কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের দুর্বলতার আভাস দেয় :

"বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্বদাই জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে ; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা)

সূর্যমুখীর পত্র : স্বামী নগেন্দ্রনাথের পত্রের প্রত্যুত্তর। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের মানসিক দুর্বলতাটুকুই যেন সূর্যমুখীর পরিহাসদীপ্ত প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। —এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচাগিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা)

কমলমণির প্রতি সূর্যমুখীর পত্রে নগেন্দ্রনাথের চিত্তবৈকল্যের ক্রমবিস্তৃতি মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে উপস্থাপিত :

"কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কন্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময় গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? —একদিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বালবৈধব্য, অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল ; তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁর চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুত বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?" (একাদশ পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখীর পত্র)

হরদেব ঘোষালকে লেখা নগেন্দ্রনাথের পরবর্তী পত্রসমূহে তার কুন্দাসক্তি ও কুন্দ-অনাসক্তি স্তর-পরম্পরায় উদ্‌ঘাটিত। যেমন :

১। "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অঙ্কুর)

২। "সূর্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। .. কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি। এখন চেতনা হইয়াছে। এখন সূর্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, আমি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্যমুখী কোথায় গেল?" (দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল)

৩। "··গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। একমাস হইল, আমার সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। ·· কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না! আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে, আমি কি করিব?" (ঐ, দ্বিতীয় পত্র)

কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের মোহ, মোহের বিস্তার, মোহভঙ্গ, মোহভঙ্গজনিত অবসাদ ও মর্মপীড়ার পরিচয় এ সমস্ত পত্রে বিধৃত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণে পত্ররীতির প্রয়োগে লেখকের মুন্সীয়ানা অনস্বীকার্য।

—৬—

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী নাট্যরসাবেদনযুক্ত। আন্তর ও বাহ্যদ্বন্দ্বে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। সুতীব্র নাট্যগতিসম্পন্ন। নাট্যশ্লেষের কৌশলী প্রয়োগে কাহিনীর আকর্ষণ ও উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ :

১। সূর্যমুখী কুন্দকে গৃহ থেকে বিতাড়ণ করতে চেয়েছে[৮], অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে তাকেই গৃহত্যাগ করতে হয়েছে।[৯]

২। নিরুদ্দিষ্টা কুন্দের অন্বেষণে নগেন্দ্রনাথ দেশান্তরে গমনের সংকল্প নিয়েছে, সূর্যমুখীর আচরণে ব্যথিত হয়েছে[১০]; শেষপর্যন্ত কিন্তু সূর্যমুখীর অন্বেষণেই তাকে দেশান্তরে যেতে হয়েছে, কুন্দের প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে।[১১]

৮। কুন্দনন্দিনীর প্রতি সূর্যমুখীর উক্তি স্মরণযোগ্য : "কুন্দ!···তুই যা তা জানিলাম! আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

(সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ)

৯। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্যমুখী ও কমলমণি

১০। একবিংশ পরিচ্ছেদ : হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

১১। দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল

৩। দেবেন্দ্রের চক্রান্ত-উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত[১২] হীরা শেষপর্যন্ত দেবেন্দ্রের কাছেই আত্মবিক্রয় করেছে।[১৩] নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর ক্ষতি সাধন করতে গিয়ে সে নিজেরই ক্ষতি করেছে।

৪। বিচ্ছেদ-অন্তে পুনর্মিলিত নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর প্রতি সমস্ত বিরূপতা ত্যাগ করে যখন তাকে সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছে, ঠিক তখনই আত্মঘাতিনী হয়েছে কুন্দনন্দিনী। তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।[১৪]

—৭—

কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আরো কিছু কৌশল অবলম্বন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেমন :

১। দেবেন্দ্র ও হীরার কন্ঠে সংগীত সন্নিবেশকরণ।

২। করুণ রসাত্মক কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক রসের অবতারণা। 'হীরার আয়ি' প্রসঙ্গটি (একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) এক হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। কৌতুক রস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জ্ঞাপিত হয়েছে। হীরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হীরা-জননীর উন্মাদগ্রস্ততার সংবাদ হীরার পরিণতিকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

৩। নিসর্গ প্রকৃতির সহায়তায় কাহিনীকে ব্যঞ্জনামণ্ডিতকরণ। উপন্যাসের সূচনায় দুর্যোগময় পটভূমিকায় কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ নগেন্দ্রনাথের শান্ত নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য-জীবনে কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাবে যে দুর্যোগের উদ্ভব, তার সঙ্গে পটভূমি-চিত্রণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার উপন্যাসের উপসংহারে দুর্যোগ-রাত্রির অবসানে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সূর্যমুখীর যে পুনর্মিলন নিসর্গ প্রকৃতিতে যেন তারই পূর্বাভাস।

৪। স্মৃতিচারণার সুনিপুণ প্রয়োগ। 'স্তিমিত প্রদীপে' নামক চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে বহুবিচিত্র চিত্ররাজি সুশোভিত সূর্যমুখীর শয্যাকক্ষ বর্ণনা-সূত্রে নগেন্দ্রনাথের চিত্তে অতীত স্মৃতির জাগরণে স্বল্পতম ইঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুতাপদগ্ধ নগেন্দ্রনাথকে, সূর্যমুখীর সঙ্গে পুনর্মিলন-প্রত্যাশী নগেন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের পটভূমিকা রচনায় কক্ষপ্রাচীর শোভিত চিত্ররাজির আশ্রয়ে অতীতের যে উদ্ভাস ঘটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তা ব্যঞ্জনাগভীর।

১২। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

১৩। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : অবতরণ

১৪। অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : কুন্দের কার্যতৎপরতা
উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : এত দিনে মুখ ফুটিল

—৮—

কাহিনী-নির্মাণ কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমস্ত প্রয়াস-প্রযত্ন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নন তিনি। প্রথম ত্রুটি, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-প্রসঙ্গের অবতারণা। অতি প্রাকৃতের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকর্ষণ যুক্তি-বিচারে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে[১৫] সম্পূর্ণ অপরিচিত নগেন্দ্রনাথ ও হীরার আবির্ভাব রীতিমতো অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। পরলোকগতা জননীর নির্দেশ তো সে অমান্যই করেছে। তাই প্রথম স্বপ্নের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। প্রথম স্বপ্ন অবান্তর হলে দ্বিতীয় স্বপ্নের[১৬] আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বপ্নের সঙ্গে তার আত্মহত্যার সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বিশেষ ঐ মানসিক অবস্থায় স্বপ্ন-নির্দেশ ছাড়াও যে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করতো, একথা মনে হয় না কি?

উপন্যাস-সূচনায় স্বপ্ন-প্রসঙ্গের অবতারণা করে বঙ্কিমচন্দ্র কী কাহিনীর ভাবী পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল ক্ষুণ্ণ করেন নি? কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-প্রসঙ্গ বর্জন করলে উপন্যাস-কাহিনীর কোনো ক্ষতি হতো না, অথচ কাহিনীটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতো। কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-প্রীতির নিদর্শন।

দ্বিতীয় ত্রুটি, কাহিনী-পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে নীতিকথার অবতারণা। ঔপন্যাসিকের লেখনীকে বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছেমতো নীতিবিদের বেত্রদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উপদেশকের ভূমিকা নিয়েছেন। কাহিনী-কথনের কথা বিস্মৃত হয়ে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় যেন ব্রতী হয়েছেন। দেবেন্দ্র-হীরার শাস্তি-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদী মানসিকতারই প্রাধান্য।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে পুরনো বিতর্কে যেতে চাই না। শুধু বলতে চাই, সাহিত্যে নীতিকথা আশ্রয় পেলেও প্রশ্রয় পাবে না। আর্টের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কখনো কখনো সে কথা বিস্মৃত হয়েছেন। লোকশিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। কাহিনী-কথন-সূত্রে যা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারতো, তাকে প্রচারধর্মী করে তুলেছেন। নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তাই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সর্বত্র সুবিচার করেন নি। তিনি চিত্তসংযমের কথা তুলেছেন, কিন্তু লেখনী-সংযমের পরিচয় দেন নি। কাহিনী-কথনের মাঝে মাঝে তাই পাত্রপাত্রীর পাপাচরণে তাদের ভর্ৎসনা করেছেন, পাঠককে সতর্ক করেছেন। কাহিনী শেষ হলেও তাই নীতিবেত্তার আসন থেকে ঘোষণা করেছেন:

"—বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

———

১৫। তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ছায়া পূর্ব গমিনী

১৬। সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ: সরলা এবং সর্পী

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১২৭৯ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ (১৮৭২ খ্রীঃ) বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর।

তিনি তখন কৃতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং তিনখানি উপন্যাসের এক সমাদৃত লেখক। সহজেই মনে প্রশ্ন জাগে, সেই ইংরেজ আমলে—যিনি একজন দক্ষ ডেপুটি ও যশস্বী লেখক—তিনি অকস্মাৎ একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে উদ্যোগী হলেন কেন?

যদিও তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তথাপি বলতে পারি তাঁর লেখার হাতেখড়ি হয়েছিল বাংলা সাময়িক পত্রের পাতাতেই। যখন তাঁর বয়স চোদ্দ পূর্ণ হয় নি তখন থেকেই তিনি পত্রিকার পাতায় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন—সেটি সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালে বঙ্গদেশের যে মানুষটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল—তিনি সংবাদ প্রভাকরের সুবিখ্যাত সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী।" শুধু তিনি নিজে কেন, তাঁর ভাষায় "এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।.....বাংলা সাহিত্যে এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মানি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন।"

সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সেই বাল্যকালেই বুঝেছিলেন—তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দেশবাসীর উপর একজন লেখকের যে প্রভাব, একজন সম্পাদকের প্রভাব তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ১৮৫২-৫৩ সালে সংবাদ প্রভাকরের পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন একটির পর একটি কবিতা লিখে চলেছিলেন, তখন কি তিনি মনে মনে কেবল ঈশ্বর গুপ্তের মত একজন গীতিকবি হবারই স্বপ্ন দেখেছিলেন, না কি ঈশ্বর গুপ্তের মত একজন প্রভাবশালী সম্পাদক—যে পত্রিকাটিও হবে একদিন বাংলা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা।

দেশের কাছে, সমাজের সামনে একজন সম্পাদকের দায় দায়িত্ব কতখানি, সম্পাদকের কাজ যে কি পরিমাণ গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে দ্বিতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনের (১২৮০ আশ্বিন) একটি প্রবন্ধে ('বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য')। এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্র হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধের একস্থানে বাংলা পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব কর্তব্য ও যোগ্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। বঙ্গদর্শনের পাতা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

"সমাজকে বন্ধন করিবার রজ্জু সংবাদপত্র। কিন্তু সেরূপ সংবাদপত্র বাংলায় বড় অধিক দেখা যায় না। সম্পাদকের মধ্যে অনেক দেশহিতৈষী বিদ্বান ও উন্নতস্বভাব-সম্পন্ন আছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদেরই মধ্যে ঐক্যমত্য নাই। ঐক্যমত্য না থাকাও অনেক সময়ে ভাল এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেইজন্য ইচ্ছাপূর্বক অনৈক্য হওয়া অনুচিত। সংবাদপত্র সম্পাদকের কার্য অতি গুরুতর: সকলের দ্বারা তাহার সম্পাদন সম্ভবে না। সংবাদপত্র লেখক রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু এবং সমাজের শিক্ষক। এই কার্য সম্পাদন করিতে গেলে অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য, বহুদর্শিতা, সকলের সহিত সহৃদয়তা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই সকল গুণ আমাদের দেশে সম্পাদক মাত্রেরই যে আছে, এমত বোধ হয় না এবং সকলের নিকট তাহা প্রত্যাশাও করা যায় না। কেহ কেহ সকল কর্মে অকর্মণ্য বলিয়া সম্পাদক হইয়াছেন, ভাবিয়াছেন সংবাদপত্র সম্পাদন অতি সহজ কথা। কতকগুলা গালিগালাজ করিতে পারিলেই হইল। কটূক্তি যত লেখা যাইবে পাঠকের তত মিষ্ট লাগিবে। আবার তাহাতে গ্রাহক বাড়িবে, বড় লোকে ভয় পাইবে, হাকিমেরা হাতে ধরিবে, ক্রমে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারিব। এরূপ নীচাশয় সম্পাদক অধিক দিন স্থায়ী হয়েন না।"

বঙ্কিমচন্দ্র যখন একখানি মাসিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদনে উদ্যোগী হন তখন দেশে যথার্থ উন্নত মানের কোনো সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্র ছিল না। অথচ তেমন একটি পত্রিকার অত্যাবশ্যকতা ছিল সন্দেহাতীত। যথার্থ বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শন প্রচার করেছিলেন—'রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, এবং সমাজের শিক্ষকের' ভূমিকা নিয়েই।

১৮৬৫ থেকে '৬৯-এর মধ্যে পরপর তিনটি উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন—এই রোমান্সের মায়াজাল সৃষ্টি করে হয়তো দেবী সরস্বতীকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন করা যেতে পারে—কিন্তু সেই সামান্য অর্ঘ্য দিয়ে দেশজননীর সেবা করা সম্ভব নয়। দেশের সেবা দেশবাসীর সমবেত উদ্যোগে সম্পাদন করতে হয়, কেবল ব্যক্তিগত সাধনায় তা সম্ভব হতে পারে না। বঙ্গভাষার স্বার্থে বঙ্গদেশের মঙ্গল কামনায়—বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার অধিকারী শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাঠকক্ষের লেখকের নিভৃত সুখাসনটি থেকে উঠে এসে গ্রহণ করলেন 'বঙ্গদর্শন' নামক নূতন বাংলা মাসিক পত্রিকার এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ পরিশ্রমসাধ্য কার্যভার। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন থেকে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে বাংলা সাহিত্যের নূতন যুগ নূতন অধ্যায় নূতন প্রভাত নূতন দিগন্তের সূচনা।

১৮৭২-এ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলেও তার দু-বছর আগে থেকেই—১৮৭০-এর একেবারে গোড়া থেকেই যে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রয়োজনের কথা গভীরভাবে অনুভব করছিলেন—তা বুঝতে পারা যায়। আর সেই কারণেই হয়তো দেখি ১৮৬৯-এর নভেম্বরে মৃণালিনী প্রকাশের পর থেকে ১৮৭২-এর এপ্রিল—বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত—এই দীর্ঘ আড়াই বছরের মধ্যে আর কোনো উপন্যাস লিখে সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি তিনি। কারণ তিনি তাঁর দেশকালের পটভূমিতে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বতন্ত্রভাবে এক-আধজন এক-আধখানি উন্নতমানের কাব্য-কবিতা বা উপন্যাসের বই ছাপিয়ে সামগ্রিকভাবে

দেশের সাহিত্য তথা দেশ বা দেশবাসীর উন্নতি করতে পারবে না। বঙ্গভাষাকে তার বাল্যকাল থেকে সত্বর যৌবনে উপনীত করতে গেলে প্রয়োজন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে বাংলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলা। বাংলা ভাষাকে প্রস্তুত করতে হবে শিক্ষিত বাঙালীর মনের ও মননের ভাষারূপে। অসম্মানিত বাংলা ভাষাকে সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর অবহেলা দূর করতে না পারলে স্বদেশের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেউ অপসারিত করতে পারবে না।

সুতরাং দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'পত্রসূচনা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নিবন্ধ। এই নিবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বারবার বলেছেন সে-কথারই প্রাথমিক চিন্তা-সূত্রের সন্ধান পাই ১৮৭০-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় এক বিদ্বজ্জন সমাবেশে প্রদত্ত A Popular Literature of Bengal শীর্ষক এক লিখিত ভাষণে। ১৮৭০-এ প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের সঙ্গে ১৮৭২-এ মুদ্রিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধের বক্তব্য মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, ১৮৭২-এর ভাবনা ১৮৭০-এর গোড়াতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রদত্ত ভাষণে আকাঙ্ক্ষিত যে-কাজ হল না দু'বছরে—সে কাজের দায়িত্বভার সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে একাই কাঁধে তুলে নিতে হল বঙ্গদর্শন নামক এক অভিনব মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই। এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।"

বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে সহসা প্রাবন্ধিকের ভূমিকায় পুরদস্তুর অবতীর্ণ হতে হয়। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় তাঁর লেখনী সঞ্চালিত হতে থাকে বাংলা ভাষাকে বাহন করে। যিনি ইতিপূর্বে কোনো দিন বাংলা ভাষায় কোনো একটিও প্রবন্ধ রচনা করেন নি—তিনি বঙ্গদর্শনের সূচনাতেই লিখলেন অনেকগুলি প্রবন্ধ নিবন্ধ। ধারাবাহিক বিষবৃক্ষ উপন্যাসের সঙ্গে শুরু হল তাঁর ইতিহাস-চিন্তা সমাজ-চিন্তা বিজ্ঞান-চিন্তা দর্শন-চিন্তা, এমন কি স্বাস্থ্য ও সংগীত-চিন্তা পর্যন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেছিলেন মোট চার বৎসর : ১২৭৯ বৈশাখ থেকে ১২৮২ চৈত্র পর্যন্ত। চার বছরে ৪৮ মাস এবং ৪৮ মাসে ৪৮ সংখ্যা। আরও লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠার পরিমাণও ৪৮। রয়েল ৮ পেজি ফর্মার ৬ ফর্মার কাগজ। অর্থাৎ ৪ বছরে বঙ্গদর্শনের মোট পৃষ্ঠার পরিমাণ ২৩০৪। এই ৪ বছরে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমের উপন্যাস বেরিয়েছে কয়েকটি।

সেগুলি হল বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী এবং কৃষ্ণকান্তের উইল-এর কিছুটা। এছাড়া এই পর্বে উপন্যাস বেরিয়েছে দু'জন মাত্র লেখকের—দীনবন্ধু মিত্রের ও বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথম বর্ষের একটি সংখ্যায় দীনবন্ধুর ক্ষুদ্র উপন্যাস 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ', দ্বিতীয় বর্ষের এক সংখ্যায় পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী'—ছোট উপন্যাস বা ছোট গল্প এবং চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে পূর্ণচন্দ্রের লেখা ধারাবাহিক 'শৈশব সহচরী' (চতুর্থ বর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় নি)। ৪ বছরের বঙ্গদর্শনে ২৩০৪ পৃষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন উপন্যাস মিলিয়ে পত্রিকায় জায়গা নিয়েছে ৪৮৭ পৃষ্ঠা। বাকি ১৮১৭ পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা নিয়েছে প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি জাতীয় রচনা। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হয়ে বসলেও তাঁর পত্রিকায় চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণও স্থান পায় নি উপন্যাসের জন্য। পরিবর্তে চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি জায়গা নিয়েছে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের জন্য।

পত্রিকা কেমন করে চালাতে হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট চিন্তা ভাবনা ধারণা ছিল। পত্রিকায় কারা লিখবেন, লেখার মান কেমনতর হবে, কোন সংখ্যায় কোন লেখা যাবে—কোন লেখা যাবে না, কিংবা পত্রিকার আয়তন কি হবে, মুদ্রণ কি-রকম হবে, কত ছাপা হবে, দাম কেমন হবে—এ সব বিষয়েই সবিশেষ সচেতন ছিলেন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র।

এখানে প্রসঙ্গত 'প্রচার' পত্রিকা সম্পাদনে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠির দু-একটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। দ্বিতীয় বর্ষের প্রচার পত্রিকার কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্র :

"তিন হাজার [গ্রাহক] না হয় প্রচার বাহির করিবে না। যতদিন না তিন হাজার হয়, ততদিন প্রচার বন্ধ রাখ। Advertise কর যে তিন হাজার গ্রাহক না হইলে প্রচার বাহির করিব না। তিন হাজার পুরিলেই প্রথম সংখ্যা বাহির করিব। যতদিন না বাহির করি কাহার নিকট টাকা চাই না। কেবল নাম ও ঠিকানা চাই; প্রথম সংখ্যা বাহির হইলে দাম পাঠাইতে হইবে। নহিলে কেহ দ্বিতীয় সংখ্যা পাইবে না। ......তোমার আপত্তি আকার কমাইলে অগৌরব আছে। আমার বিবেচনায় আকার না কমাইয়া দাম কমাইলে অগৌরব আছে।"

সাময়িক পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সম্পর্কে একবার মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকার তরুণ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্তা হয়। সবদিক বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাহিত্যে'র বার্ষিক দাম দুই টাকার স্থলে তিন টাকা রাখা যুক্তিযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। অর্থের অভাবে পরিকল্পিত পত্রিকা দু-দিন চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থহীন। সুরেশচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—'সাহিত্যে'র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা দুই টাকা কিছুই দিতে পারেনা, তাহারা কিছুই কেনে না। 'বঙ্গদর্শনে'র সময়েও দেখেছি, 'প্রচারে'ও দেখিয়াছি; যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।"

প্রচার পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'তে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িকপত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের

তুল্য আকার; দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতা এবং গাম্ভীর্যে কল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে উঁহারা কন্টেম্পোরারি বা নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্মা সুপার-রয়েল (৪৮ পৃষ্ঠা) মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে।"

ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙালীর অর্থ সামর্থ্য ও অধ্যয়নস্পৃহার পরিমাণের কথা চিন্তা করেই বঙ্কিমচন্দ্র কন্টেম্পোরারি বা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মাপে পত্রিকা না করে বাঙালীর সাধ্যের দিকে তাকিয়ে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের সামনে বা মনের মধ্যে আদর্শ সাময়িকপত্রের একটা ছবি ছিল। দশ বিশটা বই যে কাজ করতে পারে না, প্রতি মাসে পাঠকের হাতে একটি উন্নত মানের সাময়িকপত্র তুলে দিতে পারলে সে-কাজ হওয়া সম্ভব। সাধারণ পাঠক সমাজের নিকট সাময়িক পত্র তথা সাময়িক সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তি:

"আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা বৃদ্ধির এবং জ্ঞান বিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্য, দুর্বোধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগরগর্ভনিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কাইত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সু-পরিচিত হয়। এমন কি সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।"

পত্রিকায় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হবে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বোধ করি সব চেয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করতে হত। চার বছরের বঙ্গদর্শনে দেখি সাহিত্য সমাজ দর্শন রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি বিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহু বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়ে স্বয়ং সম্পাদক ও তাঁর লেখকগোষ্ঠীর মূল্যবান নিবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন, "গ্রন্থ রচনায় ও সাময়িকপত্র সম্পাদনে প্রভেদ আছে। গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু সাময়িকপত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে।" এই সমবেত উদ্যম সফল না হলে দেশের মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানোন্নতি সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা' করেছিলেন। যে বাংলা ভাষা ছিল আমাদের নিকট একান্তই অনাদৃত ও অবহেলিত, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাতেই একটির পর একটি বিজ্ঞান দর্শন অর্থনীতি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত বাঙালীর নিকট এই বঙ্গভাষার সামর্থ ও মহিমা সপ্রমাণ করে দিলেন। কিন্তু শুধু নিজে লিখেই তো তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না। বঙ্গদর্শনের পাতায় লেখক হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি।

যিনি বড় সম্পাদক, তাঁর আর একটি বড় কাজ, ভাল লেখক নির্বাচন করা—

একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠি গড়ে তোলা। ভাল লেখক নির্বাচন করা মানেই অনেক নিকৃষ্ট লেখক পরিহার করা। লেখকরূপে পত্রিকায় যাঁদের গ্রহণ করা হল না, স্বভাবতই তাঁরা ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ। অমনোনীত লোকের সংখ্যা মনোনীত লেখক থেকে কয়েকশত গুণ বেশিই হয়, বলা বাহুল্য। এঁদের মধ্যে প্রিয়জন বন্ধুবান্ধব নারী পুরুষ কতই না থাকেন। ফলে সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিদিন এই সুহৃৎ সংহার করা খুবই কঠিন কাজ। আর যিনি একই সঙ্গে সম্পাদক এবং সৃষ্টিশীল লেখক, তাঁর পক্ষে একান্ত কঠিনতর। কারণ যে বৃহৎ সংখ্যক লেখকগোষ্ঠিকে তাঁর পত্রিকার জন্য মনোনীত করা হল না সেই ব্যর্থ কবিযশঃপ্রার্থীদের কাছে তাঁকে অপ্রিয় হতেই হয়। আর যে কোন স্রষ্টার পক্ষে অন্যের অপ্রিয় হওয়াটা মহৎ ক্ষতি। কারণ লেখা বুঝতে বুদ্ধির যেমন আবশ্যক প্রীতির আবশ্যক তার চেয়ে কিছু কম নয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাঠকসমাজের প্রীতির আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল না হয়ে সম্পাদকের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—ব্যক্তিগত লেখক জীবনের ক্ষতির আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ বিবেচনা করেই।

বঙ্গদর্শনের সব লেখকের লেখাই সম্পাদক স্বহস্তে সংশোধন ও সম্পাদন করতেন। বিশেষতঃ ভাষাকে পরিশুদ্ধ ও সুন্দর করে তোলার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি ছিল প্রথমাবধি। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাট না? আমি ত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এদিকে বড় উদাসীন। তোমাদের 'সাহিত্যে'ও দেখি অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন? বঙ্গদর্শনের আমলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া রিভাইজ" না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না।"

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক অক্ষয় কীর্তি 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগটি। এই বিভাগে তিনি তীব্র কঠোর ভাষায় সমকালীন সাহিত্যের সমালোচনা করে গেছেন মাসের পর মাস। সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা কাকে বলে তা বোঝবার জন্য আজকের লেখক ও সমালোচক উভয় সম্প্রদায়েরই এই দুর্লভ সমালোলোচনাগুলির সঙ্গে একবার পরিচিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এই তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কশাঘাত জর্জরিত নিরপেক্ষ সমালোচনা নিবন্ধগুলি আজও আমাদের সকলের অগোচরেই থেকে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর অসামান্য প্রতিভারশ্মি বিকিরণ করে গেছেন, তেমনি বাংলা সাময়িকপত্রের পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাবও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের পর সঞ্জীবচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র ও শেষে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে—এই বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় হাত দিতে হয়। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সম্পাদকীয়তে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "এ কথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন তো বঙ্গদর্শন একটা নাম মাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্তমান নাই, তখন কোনো মাসিক পত্রের পক্ষে 'বঙ্গদর্শন' নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই।

কিন্তু আমরা নামকে নাম মাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেরই জনক নন, বাংলা ভাষায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক এবং বাংলা সাংবাদিকতার জগতে এবং বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনের ইতিহাসে নিঃসংশয়ে তাঁকেই প্রথম অগ্রগণ্য আধুনিক পুরুষ বলে অভিহিত করতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে নিবেদন

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখনো কয়েকটি বিষয়ে প্রথম অথবা প্রধান। তিনি বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, এবং অনেকের মতে (বর্তমান লেখক সানন্দে সেই অনেকের অনুগত) তিনি অদ্যাবধি প্রধান ঔপন্যাসিক। দ্বিধা-হীনভাবে বলা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর লেখক সংগঠিত ধর্ম ও দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর মধ্যে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানের যে সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে, তার তুল্য কিছু বাংলা সাহিত্যে নেই; ব্যাপক সাম্যবাদী চিন্তাও তিনি বাংলা সাহিত্যে এনেছেন। পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে এখনো তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে হয়। আর, স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তাঁর সঙ্গীত ও সাহিত্য বাংলা ও ভারতের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার অনুরূপ কিছু অন্য কোনো সাহিত্যিক দাবি করতে পারেননা।

এহেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা ও ভারতে প্রচুর প্রশস্তি পেয়েছেন, নিন্দা তুলনায় অল্প। স্বাধীনতার পরে সে প্রশস্তি কমেছে (আর তো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হচ্ছে না।)—বেড়েছে নিন্দার পরিমাণ। শোনা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে কিছুই নন, তিনি কেবল গালগল্পের রোমান্স লিখে অপরিণত মনের পাঠক ভুলিয়েছেন; তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী; তিনি প্রগতির ঢেউ আটকানো মূঢ় ঐরাবত ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যই কি তিনি তাই? অতি বিশ্লেষণের প্রতিকথনে ঘুরপাক না খেয়ে যদি কেউ অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও মর্মভেদী কল্পনার শক্তিতে মানবজীবনেব দারুণ বাসনা ও প্রদাহ, মানবভাগ্যের উত্থানপতনের রহস্য উন্মোচন করেন—তিনি নিছক রোমান্সকর হয়ে পড়বেন? ছোট বাঙালী আঁকলেই বড় লেখক, আর বড় বাঙালী বা ভারতীয় আঁকলে ছোট লেখক? কিংবা অত্যাচারী হিন্দু বা ইংরাজ শাসকের ছবি আঁকলেই তবে কেউ সত্যবাদী, আর অত্যাচারী মুসলমান শাসকের ছবি আঁকলেই তবে তিনি সাম্প্রদায়িক—খুবই সুবিধাজনক রাজনৈতিক সরলীকরণ নয় কি? পুনরুত্থানবাদী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ ঐতিহাসিক (বা প্রাগৈতিহাসিক) যুগে আমাদের উল্টোপাকে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন—তা কি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে? পুরনো যুগের গৌরবকথা স্মরণ করলেই, কিংবা সেই যুগের শ্রেয় আদর্শকে গ্রহণ করতে বললেই কেউ পুনরুত্থানবাদী হয়ে পড়বেন? যদি কেউ ঈশ্বরবিশ্বাসের পক্ষে কথা বলেন—তাঁকে কি ঐ একই শব্দে অর্চনা করা হবে? তাহলে তো হিন্দু মুসলমানসহ কোটী কোটী ভারতবাসী পুনরুত্থানবাদী—এখনো।

স্বচ্ছন্দ সমালোচনার সুবিধা এই—বিরোধী যুক্তিকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা যায়। সেমিনারের উদ্দেশ্য অপরপক্ষে নির্মোহ আলোচনার দ্বারা সত্যনির্ণয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-ভাগ্য উজ্জ্বল, সৃষ্টি-ভাগ্যও তাই, কিন্তু সেমিনার ভাগ্য উজ্জ্বল নয়। তাই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার বাংলা সাহিত্যের সেই এতিকায় পুরুষের আপাদমস্তক দর্শনের প্রয়াসী হবে—এই শুভ কল্পনা আমরা করিই। বলা বাহুল্য, এটি 'শুভকল্পনা'—কারণ আমরা, এখনো পর্যন্ত, আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য—বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত কোনো জীবনী রচনা করে উঠতে পারি নি।*

বঙ্কিমচন্দ্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দীনেশ চন্দ্র সিংহ

ইউরোপীয় আদর্শ ও পদ্ধতিতে পরীক্ষা-গ্রহণ ও ডিগ্রী-বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৭। প্রতিষ্ঠা দিবসের তিন মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়। এপ্রিল, ১৮৫৭-র এনট্রান্স পরীক্ষায় ২৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে।

এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয় সমূহের মধ্যে বাংলাও অবশ্যপাঠ্য ছিল। সে বছর বাংলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল :

(ক) রামায়ণ

(খ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।

বাংলার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শ্রীমধুসূদনকে মাইকেল মধুসূদনে রূপান্তরে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ এনট্রান্স পরীক্ষার ঠিক এক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, পরীক্ষা গৃহীত হল। যদিও, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এনট্রান্স পরীক্ষার পাশের চার বৎসর পর বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু সর্বপ্রথম পরীক্ষা বলে নিয়মের কড়াকড়ি হ্রাস করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন বৎসর এই নিয়ম প্রয়োগ করা হয় নি। যে কেউ এনট্রান্স পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারলেই বি, এ, পরীক্ষায় বসতে পারতেন। সে মতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষার জন্য ১৩ জন ছাত্র ফি জমা দেয়। তন্মধ্যে তিন জন অনুপস্থিত থাকে ও দশ জন পরীক্ষায় বসে। এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। কেউই সব বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রেরিত দুইজন ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন; যদিও ষষ্ঠ বিষয়ে মাত্র ৭ নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হন। কিন্তু পরীক্ষকবৃন্দ এই দুজনের সামগ্রিক ফলাফল বিবেচনা

* স্মারক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

করে সন্তুষ্ট হয়ে দুইজনকেই ৭ নম্বর করে অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণার সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এই সুপারিশ গ্রহণ করে যে প্রস্তাব পাশ করে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিচে উদ্ধৃত হল :

"8. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 candidates for the degree of B.A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending that, two candidates, viz. Bankimchandra Chatterjee and Juddoonath Bose who had passed creditably in five of the six subject, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

Resolved —That the two candidates mentioned, be admitted to the degree of B.A.

(Minutes of the syndicate of University of Calcutta, dt. 24.4.1858)

বি, এ, পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাও আবশ্যিক বিষয় ছিল। বাংলার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলায় পাঠ্যপুস্তক ছিল:

(ক) মহাভারত ১—৩ পর্ব

(খ) বত্রিশ সিংহাসন

(গ) পুরুষ পরীক্ষা।

ভাবী সাহিত্যসম্রাট যে সকল পুস্তক পাঠ করে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তা থেকেই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের দৈন্য সুপ্রকট।

যা হোক, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮'র ২৪শে এপ্রিল বি, এ, পাশ করলেন আর ৬ই আগষ্ট বঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্ণর কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। অর্থাৎ তাঁর বেকারত্ব সাকুল্যে কিঞ্চিদধিক তিন মাস। অবশ্য তখনো তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়নরত ছিলেন, যদিও চাকুরীতে যোগদানের ফলে তাঁর আইন অধ্যয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এপ্রিল মাসে বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ডিগ্রী লাভ করেন ৮ মাস পরে ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৫৮। সেদিন সিনেটের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় টাউন হলে, কারণ তখন পর্যন্ত সিনেট হল তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অফিস বাড়িও ছিল না। ভাইস-চ্যানসেলার তাঁর বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন, এবং উভয়কেই বি, এ, ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়।

সেদিনের সে মহতী সেনেট সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে সেনেটের বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার পরীক্ষকও ছিলেন। সদ্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে বিদ্যাসাগর কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে মাত্র ৭ বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী রচনা ও প্রকাশ করে ঐ যুবক বাংলা সাহিত্যে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করবে।

যাক সে কথা। বি, এ, পাশের পর দীর্ঘদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের আপাততঃ ইতি ঘটে। অবশ্য চাকুরীরত অবস্থায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তো তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টার পদে স্বীকৃতির পথে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে; জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বর্ষে। ঐ বৎসর তিনি ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর কর্তৃক সেনেটের সদস্য মনোনীত হন। দীর্ঘ ২৭ বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর আবার যোগাযোগ স্থাপিত হল, যখন তিনি বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। ব্রিটিশ সরকারের একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেবক হলেও ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদের মহামন্ত্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত রচনা করে রেখেছেন।

সেনেট সদস্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্‌টি অফ্ আর্টসের সভায়। সেদিন সেনেটের তরুণতম সদস্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন উপাচার্য মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবর্তন ভাষণের সূত্র ধরে এফ, এ,, বি, এ, ও এম, এ, পাঠক্রমে ও পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ স্থান লাভের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র আশুতোষের আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। যদিও ভোটাধিক্যে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, তবু সে ঘটনা আজ ইতিহাসের অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ (selection) প্রণয়ন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সিণ্ডিকেট বঙ্কিমচন্দ্রকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য বাংলা সঙ্কলন তৈরীর ভার দেয়। তদনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নোক্ত পাঠ্যসূচী তৈরী করে দেন :—

গদ্য

মহাভারত	:	রুরু-পার্শ্ব নকুল
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	:	তপোবন, শকুন্তলার বিদায়
অক্ষয়কুমার দত্ত	:	স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক
প্যারীচাঁদ মিত্র	:	প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	:	অর্থ-সঞ্চয়, অতিথি সেবা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যব্রত
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	:	সভ্যতা; মনুষ্যত্ব, বাহ্যজগৎ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	:	মনুষ্যে ভক্তি, ভালবাসার অত্যাচার, একা

পদ্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	:	প্রকৃতি
ভারতচন্দ্র	:	শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞ নাশ, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি, মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ
ঈশ্বর গুপ্ত	:	ঝড়
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	:	সীতা ও সরমা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	:	চাতক পক্ষীর প্রতি, অশোক তরু, দেবনিদ্রা
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	:	উষা

বাংলা সাহিত্য মাত্র ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে (১৮৫৭-১৮৯২) উন্নতির কোন উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র পঠিত এন্ট্রান্স পরীক্ষার বাংলা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেই একই পরীক্ষার জন্য তাঁরই সঙ্কলিত বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকৃত সঙ্কলন গ্রন্থ নিয়ে পরীক্ষার্থীরা যখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিচ্ছে (১৮৯৫), তখন শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ইহজগতের সঙ্গেই সাহিত্য সম্রাটের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে গেছে, ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪।

আজকাল তো বিশ্ববিদ্যালয়ে কথায় কথায় নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়, রাতারাতি নতুন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা হয়, নতুন 'চেয়ার' ও অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়; এবং সে জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার থলি নিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বসে থাকে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যোগ্য স্থান ও মর্যাদা দানের জন্য এবং স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ স্থাপনের জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে নিরলস সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা যে কোনও ভাষা-আন্দোলনের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। প্রত্যেক বাংলাভাষাসেবী ও সাহিত্য প্রেমিকের সে ইতিহাস জেনে রাখা উচিত। রীতিমত লড়াই করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের আসন দখল করতে হয়েছে বাংলা বিভাগকেই; হঠাৎ করে প্রস্তাব পাশ করে বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় নি। আনন্দের কথা, এই ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে জড়িত ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।*

•

স্বাধীনতা, দেশভাগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

আর একবছর পরে ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী। সেই যুগান্তকারী ঘটনার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা ধর্মনৈতিক কারণ যথেষ্ট ছিল। উপরন্ত ছিল তাত্ত্বিক কারণ। যা না থাকলে বিপ্লবের জন্য মানুষের মন প্রস্তুত থাকতো না। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে বিপ্লবপূর্ব যুগের চিন্তানায়ক রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো প্রমুখ চিন্তানায়কদের পুরোগামীর ভূমিকা স্বীকার করা হয়। বিপ্লবের পক্ষে যাঁরা

---

* স্মারক গ্রন্থ থেকে গৃহীত

তাঁরা এঁদের জিন্দাবাদ করেন। বিপক্ষে যাঁরা তাঁরা করেন নিন্দাবাদ। বিপ্লব কতক লোকের পৌষমাস আর কতক লোকের সর্বনাশ।

ভারতের তথা বঙ্গের স্বাধীনতা তার জন্মলগ্নেই দেশকে তথা প্রদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। স্বাধীনতা ও পার্টিশন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। চল্লিশ বছর বাদেও জিন্দাবাদ ও নিন্দাবাদের জের মেটেনি। যাদের জীবনে পৌষমাস এসেছে তাঁরা একদিকে, যাদের জীবনে সর্বনাশ ঘটেছে তাঁরা অন্যদিকে। এ জটিলতার জট খোলা সহজ নয়। তাই জটিলকে সহজ করা হয় ইংরেজদের দোষ দিয়ে। ওদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসিই নাকি এর জন্য দায়ী। কিন্তু তারাও তো চিরদিন শাসন করতে চায়নি। শাসন করা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সময় ডিভাইড করতে চাইবেই বা কেন? গান্ধীজী যখন হাঁকেন "কুইট ইণ্ডিয়া" জিন্না সাহেব হাঁকেন, "ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট"। শেষে জবাহরলাল ও বল্লভভাই বলেন, "ডিভাইড যদি করতেই হয় তবে কেবল ইণ্ডিয়াকে কেন, পাঞ্জাবকেও করা হোক, বেঙ্গলকেও করা হোক"। "তথাস্তু।" ইংরেজরা কুইট না করলে দেশভাগও হতো না, প্রদেশভাগও হতো না। স্বাধীনতাও কি হতো? না, স্বাধীনতাও নয়। রাত না গেলে যেমন দিন হয়না, তেমনি পরাধীনতা না গেলে স্বাধীনতাও হয়না। তা বলে দেশভাগ কেন হবে, প্রদেশভাগ কেন হবে?

এর উত্তর, দেশে ও প্রদেশে হিন্দু মুসলমান বলে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল। হিন্দুরা ছিল বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম সুলতান ও বাদশাদের অধীন, তাই তারা চেয়েছিল ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে নতুন করে মুসলিম শাসকদের অধীনতা নয়, তাঁদের হাত থেকেও স্বাধীনতা। মুসলমান শাসকরা তা হলে রাজত্ব করতেন কোথায়? ভারতে থাকলে তো তাঁদের হিন্দুদের অধীনে থাকতে হতো। তাই যদি হবার তো ইংরেজ-দের তাড়ানো তাঁদের পক্ষে লাভজনক নয়। বরং ক্ষতিকর। তাঁরা যখন বুঝতে পারেন যে ইংরেজরা নিজেরাই আর থাকতে রাজী নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যেতে উদ্যত, তখন ভারতের এক ভাগ মুসলিম বাসভূমি রূপে দাবী করেন। না গেলে লড়াই করে নেবেন। লড়াই যে বড়াই নয়, কলকাতা, নোয়াখালী, বিহারের দাঙ্গায় তার নমুনা দেখা গেল। সবরকম আপস প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। আপস হলে ভাগাভাগি হতো না। হলো যে, তার জন্যে ব্যক্তিকে দায়ী করা বৃথা। উভয় পক্ষে দায়ী নৈর্ব্যক্তিক মতবাদ।

আমাদের শাস্ত্রে জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলা হয়েছিল কিন্তু এমন কথা বলা হয়নি যে জন্মভূমিই জননীস্বরূপা। তাই যদি হতো তবে জন্মভূমির পর 'চ' অব্যয় ব্যবহার করা হতো না। জননী ও জন্মভূমি এক নয়, দুই। সংস্কৃত শিক্ষা থেকে আমরা জন্মভূমির জননীত্ব লাভ করিনি। করেছি ইংরেজী শিক্ষা থেকে। গত শতাব্দীতে পাই 'মাদারল্যাণ্ড'। যার পারিভাষিক শব্দ 'মাতৃভূমি'। 'জন্মভূমি' নয়।

বঙ্গমাতা বা ভারতমাতা কি একজন দেবী না মানবী? ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে, যাঁরা ব্রাহ্ম রিফর্মিষ্ট তাঁরা পিতামাতাকে পিতৃদেব ও মাতৃদেবী বলেন না। দেশকেই বলতে রাজী হবেন কেন? তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপর আরো এক দেবী? সবাইকে বিদায় করাই তাদের মতে শ্রেয়। তাতেই দেশের মঙ্গল, দেশকে

দেবী বানিয়ে নয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে যারা হিন্দু রিভাইভালিষ্ট তারা দেশকে দেবী বলে বন্দনা করার পক্ষপাতী। তা না করলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলা যায় না, একলা চলতে হয়। একলা চলে কেউ দেশকে স্বাধীন করতে পারে না। চাই জনতার যোগদান। জনতা দেবদেবী ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। অতএব দেশ হচ্ছে দেবী। দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে। সংস্কৃত পণ্ডিতরা নন, তাঁদের আসনে উপবিষ্ট ইংরেজী মাষ্টাররাই এর প্রবর্তক।

দেশকে নতুন এক দেবী বলে মনে করলেও তাকে পুরাতন দেবীদের সঙ্গে একাকার করতে ইংরেজী মাষ্টাররাও প্রস্তুত ছিলেন না। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা। "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা কমলদলবিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।" বঙ্গমাতাই মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মধ্যে নয়, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে মা জগদ্ধাত্রী ও মা কালীও আছেন। দেশকে নিরাকার রূপে নয় সাকার রূপে পূজা করতে হবে। দেশের মানুষরা প্রতিমাপূজায় অভ্যস্ত। সুতরাং দেশকে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়ে পূজা করবে।

ততদিনে দেশের আদমসুমারি হয়ে গেছে। জানা গেছে, সপ্তকোটি কন্ঠের থেকে তিন কোটি বিহারী ওড়িয়া কন্ঠ বাদ দিলে বাকী চার কোটির অর্ধেকের উপর মুসলিম কণ্ঠ। আর দ্বিসপ্তকোটি ভুজের মধ্যে সেই অনুপাতে মুসলিম ভুজ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সব ক'টি খর-করবাল ক্লাইভাসুরের উপর প্রযুক্ত হলে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভাসুর জয়ী হতো না। ইংরেজ রাজত্বও কায়েম হতো না। কিন্তু 'আনন্দমঠ' পাঠ করলে মনে হবে যত নষ্টের গোড়া মুসলমান শাসকরাই, তাঁদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে হিন্দু-রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই মাতৃদেবীর সন্তানদের জীবনব্রত। সেইরকমই তো হবার কথা ছিল। হলো না যে, তার কারণ মাঝখানে থেকে এক নতুন শাসককুলের আবির্ভাব। তাদের কামান বন্দুক খর করবালের চেয়েও মারাত্মক। তাই তাঁদের উপর দেশ শাসনের ভার অর্পণ করে সন্তানদের মহানিষ্ক্রমণ। কালক্রমে ইংরেজরাও মহাপ্রস্থান করবে। তখন মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুসলমান প্রজারা কি সুবোধ বালকের মতো সেটা মেনে নেবে? তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কন্ঠ যদি কল কল নিনাদে হাঁক দেয়, "আল্লা হো আকবর" আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভুজ যদি কাফের নিধনে মত্ত হয় তা হলে বঙ্গমাতা কি ছিন্ন ভিন্ন হবেন না?

মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকেই নমস্কার করে না। মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, মা জগদ্ধাত্রী, মা কালীকে তো নয়ই, বঙ্গমাতাকেও না, ভারতমাতাকেও না। সেটাই ওদের ঐতিহ্য। মাতাকে বন্দনা করতেই ওদের আপত্তি। অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু কন্ঠে যেই ধ্বনিত হতো 'বন্দেমাতরম্' অমনি মুসলিম কন্ঠের রব উঠত 'আল্লা হো আকবর'। তবু তো তখন ওরা মিলেমিশে লড়াই করছিল। পরে মেলামেশার পাট উঠে যায়। তখন একপক্ষের রণহুঙ্কার হয় 'বন্দেমাতরম্' তো অপর পক্ষের 'আল্লা হো আকবর'। একপক্ষ ডাক দেয় মা দুর্গাকে তো অপর পক্ষ আল্লাহ্‌কে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়ানোর এই হয় চরম পরিণতি।

দেশে যদি হিন্দু রিভাইভালিজ্‌ম্‌ বনাম প্যান-ইসলামিজ্‌ কেবল এই দুটি মতবাদ থাকত, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে তৃতীয় একটি মতবাদ না থাকত, তবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্যে কংগ্রেসের মতো একটি প্রতিষ্ঠানও থাকত না। কংগ্রেস ছিল বলেই অমঙ্গলের গর্ভ থেকে মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হয়। খণ্ডিত ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেকুলার ষ্টেট। 'বন্দেমাতরম্‌' তার দেবীগণকে নিয়ে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারত না। তাই তার প্রথম অংশটুকুকেই অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। জাতীয় সংগ্রামে সেটুকু অংশ ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় কংগ্রেস-কর্মীদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে-মাতরম্‌' কখনও মুসলমান কংগ্রেস-কর্মীদের স্বীকৃতি পেত না। কংগ্রেস মুসলিম-বর্জিত হতো। একই কথা খাটত খ্রীস্টান, পার্সী, শিখ, আর্যসমাজী, ব্রাহ্ম ও জবাহরলালের মতো হিন্দুদেরও বেলা। কংগ্রেস আর একটি হিন্দু মহাসভায় পরিণত হতো। ইংরেজকে ছেড়ে সে মুসলমানকেই ভারত ছাড়ার নোটিস দিত। বেধে যেত রীতি-মতো সিভিল ওয়ার। সেটা এড়ানো গেল মাউন্টব্যাটেন তথা র‍্যাডক্লিফের মধ্যস্থতায়।

কংগ্রেস যখন সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ছিল না তখন সংগ্রাম যারা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা প্রধানত মারাঠি, বাঙালী ও পাঞ্জাবী হিন্দু সন্ত্রাসবাদী। তাদের প্রেরণার উৎস পূর্ণাঙ্গ 'বন্দেমাতরম্‌'। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ না থাকলেও সংশ্রব ছিল না। তাদের আত্মত্যাগ এখন এক লেজেণ্ড। স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের স্থান অবিসংবাদিত। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে তাদের অনুসৃত পথেই দেশ স্বাধীন হবে তবে সেই সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে দেশ হতো 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের অভীষ্ট হিন্দু রাষ্ট্র। যেসব প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেসব প্রদেশে গৃহযুদ্ধ লেগে থাকত। নিরাপত্তার অন্বেষণে হিন্দুরা ছুটে আসত পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে। শেষপর্যন্ত যেটা দাঁড়াত সেটা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। তফাত তা হলে কোথায়? সেটা এইখানে যে কংগ্রেসপন্থীদের রাষ্ট্রের নাম হিন্দুস্থান নয়, ইণ্ডিয়া তথা ভারত। সেটা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানকার জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ 'জনগণমন অধিনায়ক'।

হালে হিন্দু মুসলমানের মনে পরস্পরের উপরে আস্থা এসেছে। জন্মাত না, যদি হিন্দু রিভাইভালিজম রাষ্ট্রের মূলনীতি হতো। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমকালীন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের সম্বন্ধে সমান্তরাল ভাবে সক্রিয় ছিলেন ব্রাহ্ম রিফর্মিষ্টরা তথা রিফর্মড হিন্দুরা। কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জনসাধারণের উপর এঁদের তেমন প্রভাব না থাকলেও শিক্ষিত শ্রেণীর উপর যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ অতিক্রম করার কাহিনী। 'ঘরে বাইরে' দেখিয়ে দেয় কেমন করে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ থেকে আসে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল হয়েছে! তাঁর সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও ধীরানন্দ অর্ধবঙ্গের সিংহাসনে বসেছেন ও বসিয়েছেন। তাঁদের একালের নাম প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ। একজন বাদে সকলেই চিরকুমার। তিনি জীবানন্দ স্বরূপ।

কিন্তু এপারে যাদের পৌষমাস ওপারে তাদের আত্মীয়দের সর্বনাশ। তেমনি ওপারে যাদের পৌষমাস এপারে তাদের আত্মীয়দের সর্বনাশ। অথচ এরাও বাঙালী,

ওরাও বাঙালী। জন্মাবার পর কথা বলে একই ভাষায়। জন্মই আগে, ধর্ম তার পরে। অথচ সঙ্কটকালে ধর্মই অগ্রস্থান নিল। বাঙালী বলে একটি জাতির ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠা থেকে শক্তি সঞ্চয় করছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই তার পুরোধা। তবে তার প্রবর্তন ডিরোজিও প্রভাবিত 'ইয়াং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ক্ষণ থেকে। ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী ছিল 'বেঙ্গলী সেঞ্চুরী'। 'হিন্দু সেঞ্চুরী' নয়। ডিরোজিও খ্রীষ্টান, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান, মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টান, তরু দত্ত খ্রীষ্টান। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লোকের ধারণা তিনি খ্রীষ্টান। সেটা ভুল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁর স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, কনিষ্ঠা কন্যা খ্রীষ্টান। অন্যান্য পুত্রকন্যা হিন্দু। কিন্তু সকলেই ইঙ্গবঙ্গ। ইঙ্গবঙ্গদের নিয়ে রঙ্গরস করলেও কঙ্গরেসে তাঁরাই তো ভ্যানগার্ড। তাঁদেরই প্রাধান্য—ভয়ে ভীত ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, রাডিয়ার্ড কিপলিং, লর্ড কার্জন। তাঁদের খর্ব করার জন্যেই পার্টিশন, তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যেই সেপারেট ইলেকটোরেট। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টিশনের সেট্‌লড ফ্যাক্টকে আনসেট্‌ল করতে পারলেন। কিন্তু সেপারেট ইলেকটোরেটকে মেনে নিয়ে তাকেই সেট্‌লড ফ্যাক্ট করে গেলেন। মুসলমানদের জন্যে এক নির্বাচকমণ্ডলী, অমুসলমানদের জন্যে আরেক, সেটা পার্টিশনের চেয়েও মারাত্মক। সেই রোগেই মারা গেল বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

আমাদের দেশের মতবাদঘটিত ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। লিখলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদ একই কালে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদ। প্রথমটা প্রবল হলে দ্বিতীয়টা দুর্বল হবেই। 'বঙ্গদর্শন' ছেড়ে তিনি 'প্রচার' নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন। তাতে যেসব তত্ত্ব প্রচার করা হলো সেসব বাঙালী মুসলমানের জন্যে তো নয়ই, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের জন্যেও নয়। উপন্যাসকে প্রচারের সাধ্যম করলে উপন্যাস সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। যদিও তা উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম। অদৃষ্টের পরিহাস বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র তাঁর 'বন্দেমাতরম্'কে বর্জন করে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'কে বরণ করেছে। 'বন্দেমাতরম্' মূলত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিরই বর্ণনা। সে ভূমি শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদলশোভিনী সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী, সুখদা বরদা। সেইখানে দাঁড়ি টানলে সঙ্গীতটি বাংলাদেশের উদারমনা শিক্ষিত মুসলমানদেরও গ্রহণযোগ্য হতো।

কিন্তু দাঁড়ি টানতে তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সত্তা সায় দিত না। দ্বৈতসত্তায় দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় না। সে একাধারে দুই। হিন্দু তার হৃত রাষ্ট্র ফিরে পেতো, সে রাষ্ট্র পাল সেন যুগের মতো মুসলিমশূন্য হলেও তিনি তাকে বন্দনা করবেন। শুধু সংখ্যায় ও ভুজ সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটাতেন। অথচ এটা তিনি ভাল করেই জানতেন যে মুসলিম চাষী মরে ভূত হয়ে খাজনা না যোগালে হিন্দু জমিদার বাঁচে না। মুসলিম খাতকের ভিটেমাটি নীলাম না হলে হিন্দু মহাজন ফুলে ফেঁপে ওঠে না। সামাজিক অন্যায় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'। জমিদারি আর মহাজনী বিলোপের জন্যে পার্টিশনের প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস বিধাতার বিধান।*

---

* সর্বভারতীয় বঙ্কিম-সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

একটি ধর্মীয় বিতর্ক ও বঙ্কিম

তুষারকান্তি মহাপাত্র

'সমাচার দর্পণে'র ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই-র সংখ্যায় 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি'র একটি চিঠি ছাপা হয়। খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠিটিতে 'হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখ' করে সে-সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। আসলে এই চিঠির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মকে পুরোপুরি অসার পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্মকে বড় করে দেখানো। অনেক হিন্দুই চিঠিটি পড়ে থাকবেন কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন রামমোহন-ই।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অবাক হওয়ার মতো। রামমোহন ইতিমধ্যে পৌত্তলিকতা বর্জন করেছেন এবং আপন ধর্মমতে অবিচল থাকায় তাঁকে স্বজন-পরিজনের সঙ্গে মতান্তর ও মনান্তরের কারণে গৃহত্যাগীও হতে হয়েছে। একেশ্বরবাদকে সমর্থন করে তিনি ফারসি ভাষায় 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' গ্রন্থ রচনা করেছেন (১৮০৩-০৪); আবার প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে রচনা করেছেন 'উৎসবানন্দের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) ও 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০)। মিশনারিদের সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য ছিল না তা নয়,* তবু যিনি হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতায় ঘোর অবিশ্বাসী এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মাচারের আমূল সংস্কারে উদ্যোগী বলে হিন্দু সমাজের চক্ষুশূল তিনিই হিন্দুধর্মের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদীর ভূমিকা নিলেন—এ ঘটনা বিস্মিত হওয়ার মতো।

ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। এর মধ্য দিয়েই আভাসিত হল রামমোহনের একটি বিশিষ্ট মনোভাব যা জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর রূপেই গ্রহণীয়।

ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে বাঙালি উনিশ শতকে স্বাধীনতাচিন্তার সঙ্গে জাতীয়তা-বোধেও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। রামমোহনে তার উন্মেষ, বিকাশ বঙ্কিমচেতনায়। পরবর্তী-কালে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাওয়ার আগে বাঙালির জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পেয়েছিল প্রধানত তিনভাবে: ধর্মীয় বিতর্ককে কেন্দ্র করে, স্বাধি-কারের দাবিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সাহিত্যে।

*'An Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus' (১৮২০) এবং 'Second Appeal to the Christian Public in Defence of the Precepts of Jesus' (১৮২১) পুস্তিকা দুটিতে বিতর্ক ও এই মত-পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে স্বাধীন চিন্তা থেকে জাতীয়তাবোধের জন্ম রামমোহনের ক্ষেত্রে তা অবশ্য প্রাথমিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার দান ছিল না। টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়েই রামমোহন তা অর্জন করেন। বাইশ বছর বয়স থেকে তিনি যখন ইংরেজির চর্চায় মন দেন তার আগে তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারার (বিশেষ ইউক্লিড, অ্যারিস্টটল) যে অল্পসল্প পরিচয় ঘটে তা আরবি-ফারসি ভাষার মাধ্যমেই হয়। ফলত, তাঁর স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির উন্মেষে নয় পুষ্টিতেই ইংরেজি শিক্ষা সাহায্য করেছিল।

যাই হোক, ধর্মের গল্প অংশটিকে কেটেছেঁটে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে রামমোহন যখন হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান ধর্মের সারবস্তুটিকে খুঁজে পেয়েছেন এবং যিশুখ্রিস্টের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় মত ও বিশ্বাসে হিন্দুধর্মের মতোই অনেক আপাতবিরোধ ও যুক্তিহীনতা লক্ষ্য করেছেন (বিশেষ ত্রিত্ববাদ) তখনই ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত চিঠিটা ছাপা হল। তাঁর ভাল লাগে নি যে মিশনারিদের নিজেদের 'ধর্ম যদ্যপি হাস্যাস্পদস্বরূপ হয়' তাঁরাও 'হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দায়' মুখর হওয়ার লজ্জাহীনতা দেখান। তাছাড়া হিন্দুর শাস্ত্রকে পুরোপুরি মিথ্যা বলায় ও নস্যাৎ করার চেষ্টায় তাঁর আত্মসম্মানবোধ ও জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। তাই মিথ্যা অভিযোগ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। সেই মনোভাব থেকেই তিনি মিশনারিদের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দেন। মিশনারিদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন,

> 'ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানের ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তকসকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়।'[১]

মিশনারিদের এমন সুযোগ পাওয়ার কারণ তাঁর মতে—

> 'এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।'[২]

যাইহোক, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামমোহন 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চিঠিটির যথোপযুক্ত জবাব লিখে পত্রিকাসম্পাদকের কাছে পাঠালেন। দর্পণ সম্পাদক 'অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান' হেতু তাঁর পুরো চিঠিটি ছাপতে না চাইলে তিনি বিচলিত না হয়ে 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে (১৮২১) তাতেই তাঁর উত্তরটি ছাপলেন।[৩] 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চিঠিটিতে 'হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের' যত দোষ কল্পনা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির উত্তর দিয়ে পরিশেষে রামমোহন-মিশনারিদেরই প্রতিপ্রশ্ন করলেন ঃ

'কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাদ্রী মহাশয়েরা আছেন, তাঁহাদের পশ্চাল্লিখিত মতগুলি, কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহারা তাহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১ম। তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরও বলেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?

২য়। তাঁহারা কখন কখন যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্যের পুত্র বলেন, অথচ বলেন যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। এই বিপরীত কথার তাৎপর্য কি?

৩য়। তাঁহারা ঈশ্বরকে এক বলেন, অথচ বলেন, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য কি?

৪র্থ। তাঁহারা বলেন যে, পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা অর্থাৎ আত্মারূপে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। তবে তাঁহারা জড় শরীরবিশিষ্ট যীশুখ্রীষ্টকে, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরবোধে আরাধনা করেন কেন?

৫ম। তাঁহারা বলেন, যীশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, অথচ বলেন, 'তিনি পিতার তুল্য। পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে, তুল্যতা সম্ভব হয় না। তবে কেন বলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট পিতার তুল্য?'[৪]

এতকাল হিন্দুধর্মই মিশনারিদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে; এই প্রথম একজন হিন্দু তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে হিন্দুধর্মের তথাকথিত দোষ খ্রিস্টান ধর্মেও বর্তমান।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র তিনটি সংখ্যায় (১৮২১) এই বিতর্কের সূত্রে রামমোহন যে খ্রিস্টান মিশনারিদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় জানিয়েছেন:

'[রামমোহন] ব্রাহ্মণসেবধি প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিশনারি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন।'[৫]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে উইলিয়ম বাটওয়ার্থ বেলি ১০ অক্টোবর, ১৮২২, লেখেন

'ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের [রামমোহনের] প্রবণতা আছে—ইহা জানা-কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্ট-কারক।'[৬]

মিশনারিরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার সুযোগ নিতে গিয়ে মিশনারিদের আক্রমণ করার জন্যে রামমোহনকে একটি 'সুযোগ' করে দিয়েছিলেন বলে বেলির বিশ্বাস।

মিশনারিদের 'হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা'র সমুচিত জবাবের প্রতিক্রিয়া এর থেকেই খানিকটা আঁচ করা যায়। লক্ষণীয়, রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে তাঁর বক্তব্য এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং বিপরীত পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ এভাবে ছাপতেন যাতে হিন্দু পণ্ডিত ও পাদরি উভয়েই তাঁর বক্তব্য সহজে বুঝতে পারেন।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে আইন পাশ হওয়ার পর 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র আর একটি মাত্র সংখ্যা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। একমাত্র ইংরেজিতে প্রকাশের কারণ জানা যায় প্রথম তিনটি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হওয়ার সময় লিখিত রামমোহনের ভূমিকাটি থেকে :

'......the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long period the Hindoo Community (to whom the work was particularly addressed and therefore printed both in Bengallee and English) have made up their minds that the arguments of the BRAHMUNICAL MAGAZINE are unanswerable; and now republish, therefore, only in English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the subject'.[৭]

এই বিতর্ক প্রসঙ্গে চারটি লক্ষণীয় বিষয় :

১। রামমোহনের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় প্রথম এই বিতর্ককে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেল।

২। তিনি শুধু হিন্দু নয়, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসী'র নিন্দাপবাদের বিরুদ্ধেই কলম ধরেছিলেন।

৩। জাতীয়তাবাদের নাম করে হিন্দুত্বের গোঁড়ামিকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাই চেয়েছিলেন 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত চিঠির জবাবে হিন্দুধর্মকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সাধ ও সাধ্য থাকলে হিন্দুরাও তার প্রতিবাদ করুক (দ্রষ্টব্য উপরের ইংরেজি উদ্ধৃতিটি)।

৪। মিশনারিদের মতে হিন্দুধর্মের যা নিন্দনীয় তা যে খ্রিস্টানধর্মেও আছে সেকথা রামমোহন-ই প্রথম অকাট্য যুক্তি দিয়ে আলোচনা করলেন।

রামমোহনের এই যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় মিশনারিরা যে তাঁদের স্বভাবের পরিবর্তন করেছিলেন এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তবে এমন ওষুধে মিশনারিরা যে বেশ বিব্রত বোধ করেছিলেন তার প্রমাণ মূল বিতর্ক বিষয় এড়িয়ে রামমোহনকে 'চারি প্রশ্ন'। 'সমাচার দর্পণে'র ৬ এপ্রিল ১৮২২ সংখ্যায় এটি বার হয় এবং রামমোহন এর উত্তর দেন মে মাসে (১৮২২)। মিশনারিদের আরও একটু নাজেহাল করতে রামমোহন 'কথোপকথনের' ঢং-এ লেখেন 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' (মে, ১৮২৩)। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মিশনারিদের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফের (১৮৩০-এ কলকাতা আসেন) নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকেই : 'অধঃপতিত মানবের কুবুদ্ধি হইতে যে সকল অসত্য ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল। জগতে যত মিথ্যা ধর্ম্ম আছে তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং অধিক প্রকারে ভগবানের প্রচারিত সত্যের বিরোধী মত ও উক্তি স্থান পাইয়াছে।'[৮] এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হওয়ায় এমন প্রশ্নও তাঁদের মনে উদিত হয় যে :

'ব্যভিচারিণী, ইন্দ্রিয়পরায়ণা যে সব কাল্পনিক দেবদেবীর ক্রূরতা ও কামুকতার কুৎসিত কাহিনী হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের নামে (অন্নপূর্ণা, বিষ্ণুপ্রিয়া ইত্যাদি) পিতামাতা যে সন্তানদের নাম রাখিয়াছেন তাহাদের সৎ আচরণ কিরূপে প্রত্যাশা করা যায়।'[১] অতএব সদাচার শিক্ষা দিতে ছলে-বলে-কৌশলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার সঙ্গে চলল হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কুৎসা প্রচার।

রামমোহনের পরে মিশনারিদের কুৎসার বিরোধিতা করার দায়িত্ব বহন করেন প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মিশনারিদের তথাকথিত যুক্তির অসারতা বিচার করা হত। হিন্দুধর্ম ও সমাজের নিন্দায় পূর্ণ আলেকজাণ্ডার ডাফের ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি (১৮৩৪-৪০) 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিশন্স' (১৮৪০) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্স ভিণ্ডিকেটেড' গ্রন্থে (১৮৪৫) তার প্রতিবাদ করলেন। মিশনারিদের জোর করে খ্রিস্টান করার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আন্দোলন এবং মিশনারি পরিচালিত স্কুলের বিকল্প হিসেবে হিন্দুদের স্কুল প্রতিষ্ঠা মিশনারিদের উৎসাহে একটু ভাটা ধরিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের পরে এ-দায়িত্ব গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাতে গোঁড়া হিন্দু এবং মিশনারী দুই পরস্পরবিরোধী দলই তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়। তাঁর বঙ্গদেশ সহ সমগ্র ভারতজুড়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, অসাধারণ বাগ্মিতা, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে এক সার্বভৌমিক ধর্মে মিলিত হওয়ার আহ্বান এবং ইংলণ্ডে বিভিন্ন গির্জায় ও নানা সমাবেশে উদার ধর্মমত সম্বন্ধে বক্তৃতা ও তার ফলস্বরূপ সেখানকার ধর্মযাজকদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভারতে অবস্থিত মিশনারিদের নিন্দাপ্রচারকে স্তিমিত করে দিয়েছিল।

কেশবচন্দ্রের আর একটি আন্দোলন ও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর চেষ্টাতেই সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট (১৮৭২) পাশ হয়। এর ফলে পৌত্তলিকতা সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ছাড়াও (বিবাহানুষ্ঠানে নারায়ণ মূর্তি শালগ্রাম শিলা পূজা ইত্যাদি) হিন্দুর বিবাহ আইনসিদ্ধ বিবেচিত হল।

এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মিশনারি বিতর্কের পুনর্বার সূত্রপাত হয়। এবার লড়াই জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেস্টি বনাম বঙ্কিমচন্দ্রের।

বঙ্কিম তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (পুস্তকাকারে পরে প্রকাশিত হলেও ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে ১২৮৭-৮৯ সালে মুদ্রিত) উপন্যাস এবং লোকরহস্য (১৮৭৪) কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) ও সাম্য (১৮৭৯) তখন প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গলাল-হেম-মধু-নবীন-ঈশ্বরগুপ্ত কবিতায় দেশপ্রেমের বাণী শুনিয়েছেন, ভূদেব 'পুষ্পাঞ্জলি'তে (১৮৭৬) মাতৃভূমির রূপের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন 'দেবীর প্রতিরূপ'।[১০]

শিক্ষিত-বাঙালি স্বাধিকার রক্ষায় (রামমোহনের কাল থেকে) ইংরেজশাসকের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন করে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন ; ঠাকুরবাড়ী ও নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায় হিন্দু মেলা (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বদেশপ্রেমে শিক্ষিত বাঙালির মন অভিষিক্ত করেছে। ফলত, ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা এ-দুয়ের প্রতি বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি তখন অনেকাংশে ভিন্নমুখী।

কোঁৎএর 'পজিটিভিস্ট' চিন্তাধারার প্রভাবে বঙ্কিমের মন তখন দেশপ্রেম ও দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং হেস্টির হিন্দুধর্মের প্রতি কটূক্তিকে তিনি সোজাসুজি স্বদেশের লাঞ্ছনা বলেই গণ্য করলেন। হেস্টির আক্রমণের জবাবে তিনি রামমোহনের মতোই আক্রমণাত্মক উক্তি করেছেন। কিন্তু রামমোহন ও বঙ্কিমের প্রতি-আক্রমণের ভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা কেন এ প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন জানিয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করতে পারেনি যেহেতু সেখানে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট ও 'হোলি গোস্ট' এই তিন ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে (ত্রিত্ববাদ)। পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের বিরুদ্ধযুক্তি হিসেবে তিনি ক্রুশপূজা ও যিশুকে পূজার উল্লেখ করে বলেছেন হিন্দুর 'অযুক্তিসিদ্ধ দোষ' খ্রিস্টান ধর্মেও যখন আছে তখন খ্রিস্টানদের অত গলাবাজি অনুচিত। সেইসঙ্গে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রীয় মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যপক্ষে বঙ্কিমের শ্লেষবাক্য সবই ব্যক্তিগতভাবে হেস্টির উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আক্রমণসূচক কোন কথা তিনি বলেন নি।

আশৈশব ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী এবং ইংরেজ শাসনে মোটামুটিভাবে তুষ্ট বঙ্কিম মনে করতেন যে ইংরেজের 'চিত্তভাণ্ডার' থেকে 'যেসকল অমূল্য রত্ন' বাঙালি সংগ্রহ করতে পেরেছে তার প্রধান দুটি হল 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা'।[১১] অন্যপক্ষে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও পণ্ডিতদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের অনেকের বিচিত্র ধারণায় বঙ্কিম কৌতুক অনুভব করতেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (চৈত্র ১২৮১), 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল',[১২] 'রামায়ণের সমালোচন',[১৩] 'কোন স্পেসিয়ালের পত্র'[১৪] ইত্যাদি রচনায় তার পরিচয় মিলবে। আবার ইংরেজ-বৈরিতাকে তিনি বাঙালিজাতির উন্নতির উপায় বলেই মনে করতেন। 'জাতিবৈর'[১৫] প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন,

> 'যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি।'

হেস্টির সঙ্গে 'মসীযুদ্ধে'র আগে লিখিত এই প্রবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত বঙ্কিম-মনোভাবের সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র 'মাতৃরূপা জন্মভূমি'র স্তুতি ও হিন্দু জাতীয়তার প্রতি অনুরাগের সাক্ষ্য যুক্ত করলে বঙ্কিমের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গির একটা মোটামুটি পরিচয় মেলে।

হেস্টির প্রথম চিঠি (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮২) থেকে বঙ্কিমের সর্বশেষ চিঠি (২২শে নভেম্বর ১৮৮২) পর্যন্ত ধরলে এই বিতর্কের কাল সর্বমোট তিন মাস। শোভাবাজার

রাজবাড়ির মহারাজ কালীকৃষ্ণের স্ত্রীর দানসাগর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। শহরে সাড়া জাগানো (চার হাজার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আমন্ত্রিত হন) এমন একটি খবর স্টেটসম্যান পত্রিকার ২০শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ফলাও করে ছাপা হয়। খবরটি পড়ে হেস্টির বিশেষ উত্তেজিত হওয়ার অন্যতম কারণ এই শ্রাদ্ধ-বাসরে কুলদেবতা গোপীনাথজীর বিগ্রহ আনা হয়েছিল। মহারাজ হরেকৃষ্ণের এই পৌত্তলিকতা সহ্য হয়নি হেস্টির। পিতামহীর শ্রাদ্ধ হলেও সুশিক্ষিত ব্যক্তির এ অসভ্য আচারে হেস্টি ক্ষুব্ধ হন। তাঁর কাছে তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো শিক্ষিত ব্যক্তি সে-সভায় উপস্থিত থাকলেও তাঁরা হরেকৃষ্ণের এই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি। শিক্ষিত হিন্দুর পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসে ক্রুদ্ধ হেস্টি রাগের ঝোঁকে হিন্দুধর্মকে অসার প্রতিপন্ন করে যে চিঠিটি লেখেন তা প্রকাশিত হল ২২শে সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যান-এ। চিঠিটিতে হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেই হেস্টি ক্ষান্ত হলেন না এহেন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করে 'আর্যসন্তান বাঙালি' ধর্মবুদ্ধিতে কোল, ভীল, সাঁওতালের সগোত্রীয়তার পরিচয় দিচ্ছে বলে মত প্রকাশ করলেন।

হেস্টি চিঠিতে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন। তাঁর চিঠিগুলিতে কোথাও ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। সুতরাং রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র বিচার অথবা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিগ্রহ না রাখতে চাওয়ার আন্দোলনের সম্পর্কে কোন উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায় না। তবে এদেশীয় শিক্ষিত মানুষও অনেক হিন্দু আচারকে পালনীয় মনে করেন না তাঁর এ জাতীয় উক্তি থেকে মনে হয় উনিশ শতকে বাঙালিচেতনার বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। তাই শিক্ষিত বাঙালী সম্পর্কেই তিনি বেশি হতাশা পোষণ করেছেন।

হেস্টির মতে শিবমন্দিরে গেলে যেকোন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে; নৃমুণ্ডমালিনী বিকটদর্শনা কালী তো শুধু ভয় আর হতাশারই উদ্রেক করেন। আর গণেশের বিচিত্র মূর্তি শ্রদ্ধার পরিবর্তে বাচ্চাদের মনেও কৌতুক সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ তাঁর ভাষায় 'with all its merry music and mincing movements but the apotheosis of sensual desire and the idolatry of merely finite life'.[১৬]

হিন্দুদের কৃষ্ণপূজায় তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত বোধ করেন কারণ, 'The Hindu alone still disgrace the nobility of the Aryan race by a Syrian worship of idols, inflaming him with lust under every green tree.'

হিন্দুদের পৌত্তলিকতা যে নিরাকারকেই সাকাররূপে ভজনা তা অনুধাবন করেও তাঁর মনে হয়েছে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সমাজে জন্ম নিয়েছে: (দেশীয় লেখকদের সাক্ষ্য অনুসারে) 'a mass of shrinking cowards', 'unscrupulous deceivers', 'bestiful idlers', 'filthy songsters', 'degraded women' আর, 'lustful men'। হিন্দু পৌত্তলিকতার পরিণাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা:

'It has encouraged and consecrated every conceivable form of licentiousness, falsehood, injustice, cruelty, robbery and murder. It has taught the millions every possible iniquity by the example of their gods'.

হেস্টির নিন্দা ও কটাক্ষের মাত্রাতিরেক বাদ দিলে তাঁর চিন্তায় নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। হেস্টির অনেক তির্য্যক ইঙ্গিতের সঙ্গে ডাফ এবং অন্য মিশনারিদের উক্তির (আগেই উদ্ধৃত) সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণে'র চিঠিতেই 'মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়' 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল' ইত্যাদি সদুক্তি পাওয়া গেছে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে জানা যাবে হেস্টির মূল প্রশ্নের (যা সমাচার দর্পণের পত্ররচয়িতাও করেছিলেন) উত্তর রামমোহন আগেই দিয়ে গেছেন :

> 'মিসনরি মহাশয়েরা......পুরাণ ও তন্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নামরূপ কহেন ও স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়াভাগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকে না অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যিশুখ্রিষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না ..তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি, না।'[১৭]
>
> '[মিশনারিরা] এই যুক্তি দেন যে "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন তখন অবশ্যই কোনো আকার গ্রহণ করেন।" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না।'[১৮]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিয়ে রামমোহন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বেদান্ত অথবা বাইবেল পাঠেই তিনি সন্তুষ্ট হননি মুল ভাষায় বাইবেল পড়তে গ্রিক ও হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করেন। এই প্রস্তুতি কিন্তু বঙ্কিমের ক্ষেত্রে ছিল না। আলোচ্য মসীযুদ্ধের কাল পর্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রের অনুরাগী পাঠক হয়েও তিনি গবেষকের অনুশীলনে হিন্দুশাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন নি। ১৮৮২ খ্রিঃ পর্যন্ত বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণসম্পর্কিত রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ (চৈত্র ১২৮১)। অক্ষয় কুমার সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেই প্রবন্ধটি রচিত। বঙ্কিম প্রবন্ধটিতে জানিয়েছেন :

> 'জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগূঢ় —বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের শেষ সীমা। গ্রীক পণ্ডিতেরা বহু কষ্টে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুষ্পার্শ্বে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন'।[১৯]

এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে বঙ্কিম হেস্টিংসকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন :

'[to] obtain some knowledge of the Sanskrit scriptures in the original.'

'[to] study then critically all the systems of Hindu philosophy...[but not] under European scholars for they can not lead the blind.'

তিনি স্পষ্টত জানিয়েছিলেন, 'The fundamental doctrines of the Hindu religion and its vast details are what no European scholar is competent to teach'.

দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধে ও চিঠিতে বঙ্কিম একই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে যে এই কাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে তর্কযুদ্ধের উপযুক্ত করে তুলতে পারেন নি তার প্রমাণ মেলে চিঠিতে তাঁর কয়েকটি উক্তি থেকে। হেস্টির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের জাল বুনতে গিয়ে তিনি কিছু অসতর্ক মন্তব্য করেন যা হেস্টির পক্ষে অনুধাবন করা শক্ত হলেও দেশীয় খ্রীস্টান রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ফলত হেস্টির পক্ষে কলম ধরে স্টেটস্‌ম্যান-এ প্রকাশ করা একটি চিঠিতে (১৪ নভেম্বর ১৮৮২ স্টেটস্‌ম্যান-এ প্রকাশিত) তিনি এই বিষয়গুলির উল্লেখ করে বঙ্কিমকে বেশ কিছুটা বিব্রত অবস্থায় ফেলেন। বঙ্কিম এই চিঠির উত্তরে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেও অন্য প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে নীরব থাকেন। বঙ্কিম চিঠিগুলিতে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। শুধু শেষ চিঠিটিই তিনি স্বনামে পাঠান। অবশ্য তার আগে হেস্টির কাছে একটি কার্ড পাঠিয়ে তিনি 'রামচন্দ্রে'র আসল পরিচয় জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলত মসীযুদ্ধের প্রতি উভয় পক্ষেরই আগ্রহ কমে যাচ্ছিল। কৃষ্ণমোহনের চিঠির উত্তর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্যত এই মসীযুদ্ধের অবসান ঘটে।

মসীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্ব প্রকাশে আগ্রহী হলেও বঙ্কিম এই তর্কযুদ্ধের পরিণামে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে অধিকতর যত্নবান হন। তারই ফল পজিটিভিস্ট যোগেশচন্দ্র ঘোষকে লেখা বঙ্কিমের Letters of Hinduism, 'প্রচার' (১২৯১) ও 'নবজীবন'-এ (১২৯১) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এবং সংকলিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা' (১৯০২)। এমনকি পরবর্তী উপন্যাস 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম'-এও (১৮৮৭) এই চিন্তার প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকে নি। ফলে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় মসীযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনে তা নতুন পথের সূচনা ঘটায়।

শুধু বঙ্কিমের জীবনেই নয়, এজাতীয় বিতর্ক সেকালে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত বাঙালিকে নিজধর্মের মূল অন্বেষণে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলে। সেকালের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঘটনাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

'ইংরাজ পাদ্রী সাহেবদিগের নিরন্তর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষীয়গণ আর্য্যধর্ম্মের সারভূত কথা সকলের সমধিক চর্চ্চা করিতেছেন।'[২০]

এবং

'আর্য্যধর্ম্মের যে ভাগটি খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরূপ সেইভাগই সম্প্রতি বিশেষরূপে প্রকটিত হইতেছে অর্থাৎ দ্বৈতবাদের অনুরূপ ভারতবর্ষের যে বৈষ্ণবতন্ত্রতা তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।'[২১]

বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে এক্ষেত্রে তা আরও গভীরে শিকড় বিস্তারে সমর্থ হয়। তার অন্যতম কারণ বঙ্কিম পারিবারিকভাবেই কৃষ্ণানুরক্ত ছিলেন।

রামমোহন থেকে বঙ্কিম এই কালপর্বের, বিশেষত ১৮২১ থেকে ১৮৮২ এই সময়কালের, বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এই ধর্মীয় বিতর্কের একটি বিশেষ স্থান আছে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী খ্রিস্টান মিশনারিরা ইউরোপীয় মনীষীদের প্রতিভার ফলে প্রস্তুত ধারণা নিয়ে হিন্দুধর্মকে শুধু কুসংস্কারপূর্ণ দেখেছেন। আর ইউরোপীয় দর্শনচিন্তাপুষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবোধের খাতিরে নিজধর্মের মূল অন্বেষণে ব্রতী হয়ে সেই ধর্মকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব তিনি ভূদেবের মতোই গ্যেটের বাণীকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন যে 'ordinary history is traditional, higher history mythical, and highest mystical'. তাঁর 'ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ' করে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের 'সার এবং অসার ভাগ পৃথকীকরণ' বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোক না কেন এ পথের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভায় অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলত, রামমোহনের মসীযুদ্ধে বাঙালি শুধু লাভবানই হয়, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে কিন্তু লাভের সঙ্গে ভোগ করতে হয় কিছুটা লোকসান-ও।

নির্দেশিকা

১। ব্রাহ্মণ সেবধি সংখ্যা ১; রামমোহন গ্রন্থাবলী ৫; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; পৃ ৫

২। ঐ; পৃ ৫-৬

৩। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

৪। দ্রঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; দে'জ পাবলিশিং ১৩৭৯; পৃ ৯৮

৫। বাংলা সাময়িক পত্র: ১ম খণ্ড: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ: ১৩৭৯; পৃ ১৬

৬। ঐ; পৃ ২৬

৭। দ্রঃ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড; ১৩৮৩ পৃ ১০১-১০২

৮। India and Indian Missions দ্রঃ বাংলা দেশের ইতিহাস: রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩য় খণ্ড; ১৯৮১ পৃ ১৮৯

৯। The Calcutta Journal, 11 March, 1822 দ্রঃ ঐ, পৃ ঐ

১০। 'বেদব্যাস স্বজাতি অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণন করা গিয়াছে'—'গ্রন্থের আভাস'-'পুষ্পাঞ্জলি'—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১১। 'জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে'—'ভারতকলঙ্ক'

বঙ্গদর্শন ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১২৭৯

১২। ঐ „ ঐ ঐ ঐ

১৩। ঐ „ নবম „ পৌষ ঐ

১৪। ঐ ৪র্থ „ ৭ম „ কার্তিক ১২৮২

১৫। সাধারণী ১১ কার্তিক ১২৮০ দ্রঃ বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ সাক্ষরতা প্রকাশন পৃ ১২০৩

১৬। এই বিতর্কের উদ্ধৃতিগুলি শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

১৭। ব্রাহ্মণ সেবধি। দ্রঃ রামমোহন গ্রন্থাবলী-৫ ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পৃ ১৭

১৮। ঐ ঐ ঐ পৃ ২৬-২৭

১৯। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ : সাক্ষরতা প্রকাশন (উপন্যাস খণ্ড) ; পৃ ১

২০। 'সামাজিক প্রবন্ধ'। দ্রঃ ভূদেব রচনাসম্ভার : প্রমথ নাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ ১৩৬৪ পৃ ১৭২

২১। ঐ পৃ ২২১

THE BEST USE OF WORDS : STYLISTIC

Notions of Bankim Chandra Chatterji

Prof. Pabitra Sarkar

1. Bankim Chandra Chatterji (1838—1894) lived in an age which had known little of the 'Modern Stylistics' that has come in vogue with the formulations, predominantly of Leo Spitzer (1887-1960), in the late second decade of this century. The major point of departure of this modern stylistics from the 'traditional' one can be noticed at the very first glance. While the new framework tends to study style as features, distinctive and identific, of an author's personality, the older, or one could say 'rhetorical', stylistics looked at style as, (a) from the practitioner's point of view, a norm that one has to work on to achieve a certain standard of retirement, and (b) the best possible 'channel'[1], or medium of communication, in which too prominent a predilection for personal expression may not interfere. A good style, in this view, has to be both—a norm and a vehicle. The personality factor will be tolerated and accommodated in so far as it does not impede communication, and to the extent it serves the communicative act, by making it more appealing or effective, and never beyond that. Europe had of course already established a persona-style equation much earlier, since the days of Aristotle (B. C. 384—322) in point of fact[2], but it was the 18th century French naturalist Buffon (1707—1788) who first put it in a succint and telling form : *le style, cest l'homme même,* i.e. style is the man himself. Bankim Chandra and his contemporaries were either unware of Buffon's statement, which seems unlikely for such an widely read and alert persons, as they no doubt were, or, more probably, they chose to ignore it, having perhaps decided that, what had been true of a democratized, literate and industrialized Europe that had progressed a few centuries after the Renaissance, could not hold good for

a feudalistic and colonized nineteenth century Bengal, which was then just entering into printed literacy. The modern stylistics has a still never version. People like Spitzer and Lucas (see Lucas, 1964) regarded style as something to go with 'high literature' alone, Spitzer must have been scandalized at the idea of seeking out his 'philological circle' not in what he calls "the work of art" (Spitzer, 1967 : 19), but (p. 20), in a sundry written or spoken text of any Tom Dick and Harry, while the 'New' stylistics takes it upon itself to do just that. It discovers the distinctive features and patterns of any linguistic text, be it written or spoken. In this brand of stylistics, style has been delinked from literature and has instead been hinged on to the wider domain of language. People like Bankim Chandra would have even less to do with this stylistics, had it made it appearance some eighty years earlier than it did.

Bankim Chandra, therefore, almost wholly emphasizes the medium aspect of literary style, and its personal aspects take a back seat in his pronouncements. This may seem a little strange at first, because, he was decidedly the greatest prose stylist of his time, as he moulded the rough and shoddy Bengali fictional prose into a fine and engaging personal idiom, which was pliant as well as variegated. The earlier practitioners like Ishwarchandra Vidyasagar (1820—91) had added strength, balance and rhythm to this prose, while Bankim Chandra made it a many-splendoured tool. But the controlling principle behind all his stylistic exercise was still the objective of the best possible communication, or transaction with the reader-receiver of his message. For this, he certainly had to go beyond mere 'communication', as understood by the praguian concept of the term[3], i.e. to convey just the information part of the message, but he also included the accompanying concept of 'expression', i.e., refinement of the linguistic means in order to make the message attractive to the readers. He was aware that this is where the author's personality comes in, but he chose not to underscore the fact. Behind this was his overriding insistence

on the emergence of a *popular* literature of Bengal, by which he means "a literature for the *people* of Bengal" sometime which will be in their language, Bengali, (see Bagal, 1969 : 97-102).

2. We will, in this paper, approach Bankim Chandra's notions about the good style first from the periphery, then slowly move towards the centre. By 'periphery' we mean the texts in which style was not Bankim Chandra's main objective, but he had statements in them, often direct, often metaphorical, which have broad implication on his thoughts about style. In the absence of a thoroughly worked-out system that could present his stylistic thoughts in a coherent and organized manner, we will use these tangential statements along with his direct ones, so that a system, however nebulous, may emerge. This is not as difficult as it sounds. Bankim Chandra had the rare virtue of consistency in everything he said along his creative and critical career, and one cannot find it too onerous a task to build up a system of his stylistic thoughts.

Let us come to the peripheral statements. In *Kamalākānta*[4], a collection of delightful personal essays, Bankim Chandra addresses the Indian cuckoo in the following manner :

> But if only you chanted coo[5] in that fifth note[6], I would accept it as true, and I wouldn't if Mr. Cock comments on my blissful morning slumber by cackling "Cooçcoo, coq coo". He has no tune. The world of course is *intimidated* by voice that is loud, but mere shrill cries won't do. Should you want to win over the world by the chanting of words, you must have that fifth note in your voice.[7]

In another essay, "Vasanta evaṃ Viraha" ("The Spring and the seperation of hearts")[8] in *Lokarahasya,* (1874) another collection of essays, Bankim Chandra makes three women, whose husbands are away, discuss the cruel effect of the approaching spring on their lonesome existence. Two of them indulge in a (mock) lyrical outbursts of sorrow and self-

pity. After their competitive outpourings are over, Rami, one of the two who is rather gratified with her piece, says, "Well, my depiction of the spring has left nothing out, I have mentioned the bee, the cuckoo, the southern breeze and loneliness—all four of them. Can there be anything else (that I have not put in) ?" In reply, Bami, the stolidest of the three, blurts forth, "yes, the rope and the pitcher."[9]

This Bankim Chandra is a far cry from the adoloscent and personality-peddling tyro stylist of the *Sambād Prabhākar* of 1852, in which he wrote extremely verbose and alliterative, hence stilted and abstruse prose, using all the highfalutin words he could lay his hands on in a dictionary. This expectedly, invited a tolerant reproach from his literary mentor of his apprenticeship period, Ishwar Chandra Gupta (1812—1859), the editor.[10] Similarly, much later, when Bankim Chandra included two of his early poems in his *Kavitāpustaka* (1878), he criticizes them himself in the "Vijñāpana" ('preface') by saying that they were dull, full of difficult and vacuous words, as those sought after by an aspiring greenhorn. Self-mockingly, he even quotes a comment by a teacher of his college on these poems—"These are riddles !"[11] What is clearly noticeable to the outsider is that in 1852 he writes in a certain style and in 1878[12] he himself castigates it. His nations about the good style has evidently changed over these years, but it will not be our concern here to trace the path of this transition. We shall, on the contrary, look at what the mature Bankim Chandra has to tell us about Bengali prose style, a glimpse of what we have given right at the beginning of this paper.

3. The thoughts that converge to form Bankim Chandra's notions of a good style, have there well-defined but interacting aspects : (1) Linguistic, (2) Ethical-Utilitarian and (3) social. In the first, we find Bankim Chandra telling us what linguistic means, words in particular, should an author employ in order to make his style ideally communicative, as well as effective. The second aspect deals with the question what is a good style for. And in the third, we notice

Bankim Chandra concerning himself with the choice of style as well as the psychological and social experience which a Bengali author should preferably make, so that his text becomes immediately attractive to his readers.

The linguistic aspect comes to the foremost prominently in his article "Bāngālā Bhāshā" written in 1878[8]. The immediate motivation of writing this came from an English article by Syama Charan Ganguli, "Bengali Spoken and Written"[14] in which the author laments the distance between the spoken and written styles of Bengali, the so-called *Chalit* and *Sadhu*[15], and, showing how the unmindful imposition of the Sadhu style hinders speedy learning of the (written) language, he advocates the adoption and use of the spoken register in school textbooks. But Bankim Chandra's chief concern is the most suitable literary style, and in discussing that he looks back at the stylistic controversies that have been evident in Bengali literature for the last three decades. Bankim Chandra gives us to understand that these debates had the choice of vocabulary or registers as their main concern. His focus is on two contrastive styles : one, the highly Sanskritized Sadhu style practised by Sanskrit collegians whose leader was Vidyasagar, and the very colloquially tinged Sadhu style[16] of Tek chand Thakur (a pen-name of Pyari Chand Mitra, 1814-83), who pitted his diction against that of the Sanskritists, to express his disappointment with their style which he thought elitist, with no concern for the average readers, including children and women.[17] Bankim Chandra in "Bāngālā Bhāshā" uses quite harsh (sometimes unjust) words about the Sanskritic style, while he claims that Mitra's use of the "spoken language" has "watered the dry roots of the tree (of Bengali literature) and language has begun to prosper since." He describes the Sanskritic style as "dull, ugly, weak and strange to Bengali society." Bankim Chandra is manifestly contemptuous of the Sanskritist's dislike for the Tekchand style, but still, he takes pain to keep himself at a distance from this style also. Ganguli, on the other hand, would like to anchor on the colloquial style. He would be happy to expunge all the

learned *tatsama* words from Bengali, prefering the *tadbhava* *matha* to *mastaka*, 'head', *pata* to *patra* 'leave' (of a tree), *bhai* to *bhrata* 'brother' etc. Bankim Chandra wants to go along with Ganguli for some length, but not all the way. He acknowledges that the address *bhai re* ('brother mine !') gets an immediate response from one's heart, but *he bhrātah !*, its chaste counterpart, sounds highty theatrical. And if one leaves tatsama words aside and uses 'Bengali' words instead, the language, to Bankim Chandra, becomes "sweeter, clearer and more vigorous." But still Bankim Chandra does not want, as Ganguli often does, to excommunicate *bhrata*. He wants the "Bengali" or nativized words to be used more and more, and simultaneously intends to retain the "non-current" and learned Sanskritic words, but warns that their use, when unbridled and uncalled for, will hamper people's understanding of the text. If judiciously used, as demanded by the style or context, they have a rightful place in the language, Bankim Chandra has disarmingly plain questions to ask : "The point is, what is literature for ? What are the books for ?" And he answers them himself : "For the understanding of those who read them." A style, therefore, should never seek for target readership among the chosen few, who may be wise or initiated, but among the "people in gereral," In another place, Bankim Chandra compliments Akshaychandra Sarkar (1846-1917) for bringing out a collection of poems[18] that had no conjunct letters in their spelling, as that had made the author keep out the learned Sanskritic words—tongue-twisters all—and stick to the current and popular idiom.[19]

Should one, on the other hand, adopt the too much colloquial and chummy style of Hutom[20] then, as the legitimate diction for literature ? Bankim Chandra does not approve of that either. To him, the language of Hutom is "poor, weak, loose, ungainly, often vulgar, and where it is not those, is impure." This style is marked by an absence of taste and dignity, and no books, commands Bankim Chandra, should be written in Hutom's style. Mitra's style is of course a class above Hutom's Bankim Chandra tells

us, and is good for humour and pathos, but for him it also is not sufficiently equipped to handle serious and noble themes.

Then follows Bankim Chandra's own prescription about the good style. This is the most explicit and most balanced statement in Bengali about which words to use in what context and the passage in question deserves to be quoted at length :

> "We can therefore conclude that the highness or lowness of a style must be dictated by the theme. The foremost quality and primary need of a text ares implicity and transparency. The text which has a nobility of theme and is immediately comprehended by all, is the best. Then comes the question of beauty. Beauty must blend with clarity. Of course there are many texts which show a preference for beauty, and some unfamiliar words may find their place in them for reason of ornamentation. First ask yourself the question : 'which is the style that brings out your intentions most clearly ?' If the simple, current spoken style shapes them up more clearly and charmingly than any other, why should you look for a high style ? If, the Tekchand or Hutom style are found best suited for what you have decided to say, you must go for them. If, (on the other hand,) the Sanskritic style of Vidyasagar or Bhudeb babu[21] are found useful to make your thoughts clearer and more attractive, adopt their style. If those also fall short of your needs, move a step higher. We shall never object if that is found necessary, but shall object when it is not so. You must say clearly what you have to say, you must say it all, and for that, accept words that may be anything English, Persian, Arabic, Sanskrit, rural, whatever,—except for those which are vulgar. Then add beauty to you text—as the ugly has little effect on the human mind."[22]

This, then, is Bankim Chandra's patently utilitarian order of preference—clarity first, beauty next. And in order to achieve these two objectives, he will brook no casteism of words, —accept any word, but for the vulgar—that serves your intentions b st. This, he thinks, is a third and better

alternative to the two offerred by the Sanskritic school on the one hand, and the 'new school' of Mitra and Hutom on the other.

Some years later, Bankim Chandra lays down twelve clear rules for the 'New writers of Bengal,'[23] no. 10 of which says, "The best of all ornaments is simplicity. The best author is the one who can communicate to his readers in simple words. Because, the objective of writing is to comminicate to the reader." In rule 3, he explains why a writer should write at all. "Only when you are certain that by writing you can serve your country or mankind, or can create beauty, you must go ahead with it. It is great sin to write with other motives in mind." Here, too, Bankim Chandra's priority is clear : service first, beauty next. And when service to, or betterment of, the society is concerned, clarity and simplicity are the primary requirements. An author must get his ideas across first, clear and distinct. In his introduction to Mitra's *Luptaratnoddhar*[24] in 1892, Bankim Chandra rebukes the mandar in esoterists once again, and this time, besides the Sanskritists of Bengal, the American essayist Emerson (1803-82) receives a share of his scorn. He however exempts the poets, whom he grudgingly allows some licence for using unfamiliar words. But prose, he thinks, deserves no such licence. "The more easily understood prose is, the more will the profit be accrued from literature."[25] He of course does not hold that literary prose can always be easy to understand. To a student at least, some instances of it may appear difficult, and he does not approve of his shirking away from that prose just because it is difficult. He therefore at one place cajoles the Bengali students to give more "time and attention to Bengali prose which may seem difficult."[26] Finally, in the "Advertisement" of his school text *Sahaj Rachanashiksha*, he arranges "the existing practice of the best writers under three heads, (1) Correctness, (2) Precision and (3) Perspicuity."[27] And the chapter of the book which he refers to here, the second, contains pronouncements like these : "Use the words that will serve you best. Do not listen to objections that it does

not sound good, or is a foreign one, etc." In elaborating the point he plainly tells that the context justifies the use. In the context of the practice in law-courts, one must use the Persian *ishtehar* in place of the Sanskritic *Vijñāpan* 'notice'". In the next section states that simplicity is a great virtue of any composition[9]. In another place, in an act of sweet revenge, he decries the wordiness of Ishwar Chandra Gupta's writings[30]. One may be tempted to refer to Bankim Chandra's fragment of an unfinished story, *Nishīth Rākshasīr Kahinī*, in which a brother, in answering the elder question whether he believed in ghosts, said "Ghosts ? Nope !", and then critized himself by saying that he had used more words than were necessary. The word "ghosts ?" was redundant in his reply[31].

So, the linguistic aspect of Bankim Chandra's pronouncements on the good style concerns itself mostly with the lexicon or the use of words. He allows the author to employ words from any source whatever, provided the context demands them. Next he tells the author not to use more words than is necessary—precision is another great virtue of the good style. The greatest of virtues for him are of course simplicity and clarity, which, he thinks, should be the writer's first objectivers. Beauty has to be considered next, but never at the cost of clarity, at least in prose.

4. We have already touched upon the ethico-utilitarian dimension of Bankim Chandra's stylistic thoughts. In "Uttarcharit" [32] (1872), he proclaims that mere entertainment can never be the sole objective of a literature, it must possess an underlying layer of values. It is common knowledge that Bankim Chandra was influenced and inspired by the preachings of John Stewart Mill and Jeremy Bentham, at least for a part of his creative life, but a deeper concern for the human existence, for a harmonious development of the individual and the society did always control his outlook of life and literature. We have already come across Rule 3 in his "Appeal to the New Writers of Bengal". What brings these commandments into the realm of stylistics is his dictate—"leave only the vulgar words out", as he puts it in "Bāngālā

Bhāshā". That is probably his only negative specification about using words in prose. That is where he draws the line and his lexical liberalism comes to a halt. He finds fault with the poems of Ishwar Chandra Gupta for being vulgar in part, and reports that in preparing an edition of the latter's poems, he has crossed out many of their "vulgar lines", and, what is more, dropped several poems from the collection. To Bankim Chandra, vulgarity is "unpardonable"[33]. Yet he takes a somewhat charitable view of this "vice" of Gupta, considering that he had been born in an age which loved to equate humour and entertainment with a kind of vulgarity, that he had little formal education, that fate had deprived him of mother's affection and of a normal conjugal life[34], and that for these reasons he had considered society as something to fight against. In a similar manner, Bankim Chandra absolves Dinabandhu Mitra (1830—73), the playwright, of the sin of using vulgar expressions in dialogue of his plays, arguing that Mitra's deep sympathy with his characters compelled him to keep their real-life speech unaltered, he had a compulsive loyalty to realism[35]. Bankim Chandra was far from being a rigid puritan or a prude, and the late Nineteenth Century flair for positivistic explanations induced a simple dialectics in his thought process. He therefore places the individual in the greater social and psychological contexts, and while he points out one's short comings, he looks for the reasons behind their occurrence in one[36]. Simpleminded and outright condemnation is foreign to Bankim Chandra's approach to life and literature.

5. The sociological aspect of Bankim Chandra's stylistic statements becomes prominent in his editorial introduction to the collection of Ishwar Chandra Gupta's works[37]. Apart from the use of words or classes of words, he seems to think that there is a certain kind of content, the "genuine Bengali stuff", that goes directly to the heart of a Bengali, even to that of one who is English-educated and widely exposed to Western ideas and manners like Bankim Chandra. He notices a break between the traditional and 'modern' Bengali literature[38]. This is not just a chronological cleavage, but a

social too, as, he ruefully observes, what appealed to the wider Bengali society once, does no longer move the new educated class. And, vice versa, the educated elite rejoices in stuff that does not attract the wider Bengali populace. This is inevitable, Bankim Chandra is certain of that, but still he notices an ambivalence in his own attitude towards the two. While writing about the genius of Ishwar Chandra Gupta, in the text referred to above, Bankim Chandra recounts an anecdote which shows his own precarious stance between the two Bengali culture—the traditional, which he and others of his ilk have all but abandoned, and the emerging 'modern', in which they have found their place. One day, time was hanging heavy on Bankim Chandra's hands, and he was trying to pass it by reading works of 'modern' poets like Madhusudan Dutta (1824—1873), Hem Chandra Banerjee (1838—1903), Nabin Chandra Sen (1847—1909) etc. None could give him the peace and restfulness he was looking for. Then at a distance, as if from the depth of the flowing waters of the Ganges by which he was sitting, there arose the plaintive melody of a boatman, who was singing—"This I cherish in my heart, O mother ! I will, mother Durgā, utter they name, and leave this life in the waters of the Ganges !" Once these notes entered his ears, Bankim Chandra found the thing he was looking for. He says glowingly, "My soul became soothed, mv mind found its tune, I heard the heart's desire of a Bengali in *his* (*own*) *language*"[9]. In the same text he contrasts the poets of the educated Bengali, Madhusudan Dutta, Hem Chandra Banerjee, Nabin Chandra Sen, Rabindranath Tagore for example, with a poet of the "genuine Bengali" people, who, to him, was none other than Ishwar Chandra Gupta[10]. Later he locates the sources of Gupta's experience as revealed in his poems. These are the poet's immediate natural and social environments—"the real, the apparent, the given. "Bankim Chandra makes it amply clear that this is not a matter of experience alone. A certain style, shaped up by words that have been carrying racial memories and emotions around them for centuries. "Collective unconscious" is a phrase that was not invented

them, or Bankim Chandra would have used it. Those were the songs and poems that stirred the traditional Bengali mind, couched in a language that was close to the heart of every Bengali. Now the experience and the language are both things of past for the educated Bengali, who cannot appreciate them any longer.

Bankim Chandra never makes his ethico-utilitarian or sociological positions stylistically elaborate. However, the implication of both on his thoughts on style should not be lost sight of, or our understanding of them will only be partial.

Notes and references :

1. In the sense of Dell Hymes in Hymes, 1970, p. 110.

2. This is how F. L. Lucas (Lucas, 1964 : 39-40) recapitulates the history of European stylistics, tracing the personality factor right from Aristotle.

3. 'Communication' or, as Vacheck (1972 : 14) says, "aesthetically uncharged communication", serves "the needs and wants of the mutual understanding of the individual members of the given language community."

4. Published in 1875. The edition we have used is the one brought out by Vangiya Sahitya Parisad (VSP) to mark Bankim Chandra's centenary of birth. Editors Brajendranath Bandyopadhyay and Sajanikanta Das.

5. Pun with the Sanskrit word *ku* 'evil' was intended by the author.

6. *pa* (*so* in the western tonic scale), the *panchama* or fifth note in Indian tonic scale, is traditionally regarded as the most melodious of the seven notes.

7. This, (*Kamalakanta*, p. 31) and other texts from Bankim Chandra as I have used in this paper, have been rather freely translated by me.

8. The Spring, a season traditionally accepted as the time for the union of lovers, is naturally unbearable to those whose beloveds are away.

9. The time-honoured tools for rural Bengali women to commit suicide with, i.e. by drowning themselves.

10. Gupta encouraged young aspirants for literary fame like Bankim Chandra, Dinabandhu Mitra and others to write whatever they felt like writing in his paper. He even printed their "poetical battle." As the editor of the *Sambad Prabhakar*, he wielded considerable influence on the contemporary literary scene. Two such prose pieces of Bankim Chandra have been collected in *Vividha* [bibidh], pp. 75-76, also edited by Bandyopadhyay and Das.

11. *Gadya Padya ba Kabitapustak*, VSP edn., p. 10.

12. We shall soon see that 1878 was an important year, so far as the evolution of Bankim Chandra's stylistic thoughts were concerned.

13. Printed in *Vividha Prabandha*, VSP edn., pp. 352-60.

14. Ganguli, Syama Charan, 1878.

15. For the linguistic relation of the two, see Dimock, 1960.

16. Although close to the colloquial speech, it still was not the Calit style, as mistakenly reported by Chatterjee and Chatterjee (1979 : 29).

17. Sen (1966 : 73) quotes the editorial comment printed on the top of every issue of the *Masik Patrika* (first pub. 1854), a monthly brought out and edited by Mitra and his friend Radha Nath Sikdar which runs : "This periodical is being printed for the general public, particularly for women. Articles will be written in the language we generally speak. Those who are learned and wise may read it should they desire so, but this periodical is not meant for them." (Translated).

18. *Gocharaner Math* (1880 ?).

19. See Roy, 1981, Appendix p. 30.

20. Hutom or 'The Hooting Owl' was the pen-name of Kali Prasanna Sinha, 1840-70, satirist, whose collection of *naksha* or 'Sketches' was published in 1863.

21. Bhudeb Mukhopadhyay (1827-94), an eminent writer on social and ethical themes.

22. *Vividha Prabandha*, pp. 359-60.

23. Ibid, 192-3.

24. *Vridha*, pp. 143-4.

The Sanskritists, in their turn, did not remain silent on this frontal attack by Bankim Chandra on their style. The *Somprakash* (first pub. 1858), edited by Dwarakanath Vidyabhushan (1820-86, who was jokingly referred to as "The Pot Belly" by Bankim Chandra in his letters written in English), hit back by saying that the style practised by Bankim Chandra and his followers induced by hybridization of the language, by collocating words that do not match. Followers of Bankim Chandra retorted by dubbing Vidyabhushan's style as, translated in the present-day English, "the Bhattacharya brand popcorns." See Sastri, (1897) 1976 : 414.

This pundit-baiting of Bankim Chandra is quite frequently noticed in his writings. In *Kamalakanta*, in the essay "Men as Fruits" he likens the scholar Brahmins with datura (stramonium), a fruit that is a bitter prickly and unedible. "The flowers they give forth are very tall in long compounds and lengthy sentences, but the fruits they bear are the prickly datura," (p. 7). In his English essay "Bengali Literature," (*The Calctta Review*, 1871, 106), Bankim Chandra's contempt about him is, once again, hardly concealed. We quote :

"The Sanskrit school takes for its models the later Sanskrit writers, and are remarkably deficient in originality. The greater originality of the writers of the English school is the point in which their superiority to the Sanskrit school is the most marked. It is characteristic of the Sanskrit school that they seldom venture on original composition. Even Vidyasagar's ambition soars no higher than adaptation and a few translations. When they do venture on original composition, they are rarely caught straying beyond the beaten track, beyond a reverential repetation of things which have been said over and over again from time immemorial. If love to be the theme, Madana is invariably put into requisition with his five flower-tipped arrows ; and the tyrannical king of Spring never fails to come to fight in his cause, with his army of bees, and soft breezes, and other ancient accom-

paniments. Are the pangs of separation to be sung? The moon is immediately cursed and anathematized, as scorching the poor victim with his cold beams. The Kokila is described as singing him to destruction..........

In point of style these writers hardly shine more than in ideas. Time-honoured phrases are alone employed; and *a dull pompous array of highsounding Sanskrit words continues to grate on the ear in perpetual reccurrence. Anything which bears the mark of foreign origin, however expressive or necessary it may be, is jealously excluded.* (Italics ours). See Bagal, 1969. It is also well-known that Bankim Chandra criticized Vidyasagar, probably the best Bengali prose writer to precede him, for his "pedantic purity" more than, "the rough and homely" prose of Tek Chand and Hutom. The latter he approved of. But he was full of praise for the style of Bhudeb Mukherji (see Bagal, 1969 : 114), who seems strange, as Mukherji can stand nowhere near Vidyasagar in the matter of stylistic excellence. People like Sen (1966) have blamed Bankim for personal bias, perhaps with justification.

We shall quote a few more lines from an English letter of Bankim Chandra, written on 30 December, 1874, to Jagadish Nath Ray, he refers to some composition of the latter's son, Khagendranath Ray, whom he fondly calls 'khani.' Bankim Chandra's words are : "Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetoric and ornament. Explain to him that *clearness and simplicity are the best of all ornaments* (Italics ours—P.S.), and that I have arrived at this conviction after much painful experience." (Bagal, 1969 : 182).

25. *Vividha*, p. 143.

26. Preface to *Bengali Selections*, University of Calcutta. See *Vividha*, p. 142.

27. Date of first publication unknown. Second Edition 1894. See *Vividha*, p. 159.

28. *Ibid*, p. 173.

29. *Ibid.*, p. 174.

30. *Ibid.*, p. 135.

31. *Ibid.*, p. 289.

32. In *Vividha Prabandha*, p. 38.

33. *Ibid.*, p. 193.

34. *Vividha*, p. 13.

35. *Ibid.*, pp. 95-6.

36. Das (1984 : 122) correctly comments that Bankim Chandra "anticipated sociological criticism of literature in India.

37. *Vividha*, pp. 100-40.

38. Here, and also in his English essay "Bengali Literature." See Bagal, 1969, pp. 103—24.

39. *Vividha*, p. 101. Italics ours.

40. Bankim Chandra, however, posits Gupta halfway between the 'old'and the 'new' generation of Bengali writers.

Bibliography :

Bengali

Bandyopadhyay, Brajendra Nath, and Das, Sajani Kanta, 1942, *Bankim Chandra Chattopadhyay*, in Sahitya Sadhak Charitmala Series, VSP.

Chatterji, Bankim Chandra : For this paper, I have used the Centenary editions edited by Brajendranath Bandyopadhyay and Sajani Kanta Das, and published by Vangiya Sahitya Parisad, Calcutta.

Dutta, Bhabatosh, 1968, *Bankim Chandra : Ishwarchandra Gupter Jiban Charit O Kabitva*, Calcutta, Jijnasa.

Ghosh, Hendra Prasad, 1962, *Bankim Chandra*, Calcutta, Indian Associated Publishing Co., Pvt. Ltd.

Roy, Gopal Chandra, 1981, *Bankim Chandra*, Calcutta, Dey's Publishing.

Sarkar, Ajar Chandra, 1949, *Bankim Chandrer Bhasha*, Calcutta, University of Calcutta.

Sastri, Sibnath, 1976, *Sibnath Rachanasangraha*, Calcutta, Paschimbanga Niraksharata Durikaran Samiti.

Sen, Sukumar, 1966, *Bangla Sahitye Gadya*, Calcutta, Eastern Publishers.

English

Bagal, Jogesh Chandra (ed.), 1969, *Bankim Rachanavali*, Vol. III, Calcutta, Sahitya Samsad.

Das, Sisir Kumar, 1984, *The Artist in Chains*, New Delhi, New Statesman Publishing Company.

Chatterjee, Suhas & Chatterjee, Sipra, 1979, "Standardization of Bengali in the Social Perspective," in Anna malai, E, (ed.), 1979, *Language Movements in India*, Mysore, Central Institute of Indian Languages, pp. 25—34.

Dimock, Edward C., 1960, "Literary and Colloquial Bengali in Modern Bengali Prose in *Interntional Journal of American Linguistics*, Vol. 26, No. 3, July 1960, pp. 43—64.

Ganguli, Syama Charan, 1878/1927, "Bengali Spoken and Written, in *Selected Articles*, pp. 1—67. The latter contains an Appendix, in which Ganguli comments on Bankim Chandra's observations.

Hymes, Dell H., 1970 "The Ethnography of Speaking" in Fishman, Joshua A., 1970, *Readings in the*

Sociology of Language. The Hague & Paris, Mouton, pp. 99—138.

Lucas, F. L., 1964, *Style*, London, Pan Books Ltd.

Spitzer, Leo, 1967, *Linguistics and Literary History*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

Vachek, Joseph, 1972, "The Linguistic Theory of the Prague School," in V. Fried (ed.), *The Prague School of Linguistics and Language Teaching*, London, Oxford University Press.

————

BANKIM CHANDRA AND HIS CONTEMPORARY ORIYA FICTION WRITERS

Dr. Shrinibas Mishra

It is an interesting coincidence that while we have assembled here in an august academic gathering to celebrate the 150th birth anniversary of Bankim Chandra, the pioneer novelist, poet and seer, in Orissa, the centenary of the first Oriya novel is also being observed. Bankim Chandra was born in 1838 and the famous novelist in Oriya literature Fakirmohan Senapati was born five years later, in 1843. Fakirmohan's early literary career was devoted to the writing of various forms of literature other than fiction and only after he turned out to be a seasoned writer with varied and matured experiences of life and society he experimented in writing his novels. His four novels 'Chhaman Athaguntha', 'Manu', 'Lachhama' and 'Prayaschita' appeared in book forms in 1901, 1910, 1914 and 1915 respectively. Of course, the first book, which is regarded as his masterpiece and translated in Bengali was serialized in Utkal Sahitya, a famous periodical, between 1897-99. But prior to Fakirmohan some other writers also experimented with this modern powerful literary genre. Ramasankar Rai wrote 'Soudamini', 'Bibasini' and 'Unmadini'. Soudamini (1877-78) and Unmadini (1893) were serialized in periodicals and remained incomplete. Bibasini appeared in full form of a book in 1891. But before that in 1885 another incomplete novel "Anathini" written by 'Sri' (anonymous) depicting the life of a peasant girl was serialized in a periodical. 'Padmamali' written by Sri Umesh Chandra Sarcar was published in 1888 which is regarded as the first novel in Oriya literature. So if a comparative estimate is made the first Oriya novel 'Padmamali' appeared twenty three years after the publication of Bankim Chandra's first novel "Durgeshnandini" in 1865. By the time the first novel in Oriya appeared in the literary scene all the novels of Bankim Chandra were published within a

time span of nearly two decades and Bankim Chandra was in his full literary glory exerting indelible impressions.

Compared to Orissa, nineteenth century Bengal was far more advanced in many respects. Calcutta was the seat of learning and culture in Eastern India. In the field of acquisition of knowledge, literary pursuits, religious movements, Bengal gave a lead to the neighbouring states. As Calcutta became the centre of British administration many Bengalis associated with the administrative task in the adjoining states settled there. In the 19th century many domiciled educated Bengalis tried to identify themselves with the educational, administrative and cultural interests of Orissa and had considerable contributions in those spheres. Bankim Chandra served as a Deputy Magistrate in Jajpur and Bhadrak of Orissa. In the field of literature Bengali became an eye-opener and gave a stimulus to modern Oriya literature. Fakirmohan in his autobiography has frankly admitted that the educated middle class Oriyas were impressed by reading the Bengali periodicals and the newly published Bengali literary works. So Bengali fiction as a new genre in the field of literature did surely cast an impression on the minds of the early Oriya novelists. Bankim Chandra as a pioneer and powerful novelist could focus his literary impression on the Oriya fiction writers.

Umesh Chandra Sarcar and Ramasankar Rai were Bengalis by birth settled in Orissa. In the introduction of his novel "Padmamali" Umesh Chandra wrote : "In the present state of Oriya literature any endeavour to create a fictional piece would be considered as some thing very bold. I have undertaken this daring task. I might be ridiculed as one not proficient in Oriya language. Still I have undertaken the task. To give delight to the reading public and aiming at the enrichment of Oriya literature I have attempted in this noble deed." Umesh Chandra termed his work as "An Historical Romance of the Feudatory States." The theme of the novel has been built upon real historical incidents relating to the oppression and invasion of the small estate Nilgiri in the district of Balasore. With this historical

background the novelist has created a plot which is full of romance, adventure and suspense. Though the novelist has followed Bankim Chandra in creating the historical romance his novel gives relative importance to incidents and not to characters. At places there are lengthy descriptions related to the incidents and characters. But these descriptions are more poetical in the manner of mediaeval poetry and fail to arouse an active interest in the minds of the readers. In some places an attempt to create a reader-consciousness by the novelist is marked as is evinced in Bankim Chandra in his 'Kapalkundala' and 'Durgeshnandini'.

In 'Padmamali' the aristocracy revolted against the tyranny and oppression of the administration. The novelist tried to establish the glory of man. In Bankim Chandra's Anandamath the patriot Sanyasis organised a revolt. The leader of the movement Satyananda of Bankim Chandra is transformed as Parikhit Singh in Umesh Chandra. In the social and administrative sphere the oppression was pacified and the novelist dreamt of a peaceful, healthy society based on ideals of morality.

'Bibasini' of Ramasankar Rai is based on the theme of misrule and tyranny of Marhatta administration. Behind the scene there is also the picture of the devastating Orissa famine of 1866 which resulted in the loss of innumerable human lives. During the famine the administrative machinery remained ineffective and the people became revolting. Some brave patriotic youths became organised against the tyranny and were engaged in dacoity for a noble cause of feeding the starved people. The novelist most likely was influenced by Bankim Chandra's Anandamath and Hanuman Das is a prototype of Satyananda of Anandamath. Raghunath Patnaik, the leader of the rebelled group and the hero in the novel was attached towards Kalabati and proposed to marry her. Kalabati, a handsome but a widow lady, was also impressed with Raghunath. But her widowhood and moral restraint kept her away from her passionate feelings. In the prevailing 19th century social conditions widow marriage was an unacceptable concept. Of course, Pandit

Iswar Chandra Vidyasagar and other social reformers boldly advocated the cause, but Bankim Chandra in his "Visabriksha" has not welcomed the after-effect of such a widow marriage which materialised in the union of Kunda with Nagendra. This passionate feelings of Nagendra culminating in the marriage with Kunda ignoring his faithful wife brought miseries for the characters and gave the novel the characteristic touch of a tragedy.

Both Padmamali and Bibasini were designed in the form of Romances. The themes of the novels were chosen from history. The settings were historical and poetic imagination was employed to make them appealing to the readers. Up to Bankim Chandra the vast sphere of history was an untrodden field for novels. Bankim Chandra opened the closed doors and widened the scope and possibilities of the novel. This bold, clever and artistic technique employed by him found a popular appeal among readers. There is no doubt that both Umeshchandra Sarcar in his Padmamali and Ramasankar Rai in his Bibasini followed the techniques of Bankim Chandra. As it was a common practice with Bankim and keeping pace with the traditions of Mediaeval fictional poetry the titles of the romances were chosen from the names of the heroines.

After Umeshchandra and Ramasankar, Fakirmohan appeared in the field of Oriya fiction, with his literary skill as a matured artist. Some critics have tried to establish a link between 'Visabriksha' and 'Chhaman Athaguntha'. The subject matter of both the novels, though apparently different, we find in both the artists a sense of social realism and the inevitable tragedy of human beings. In both the novels two types of women characters are found which have been classified as 'Kamini' or passionate and 'Kalyani' or virtuous. As in the life of Nagendra a passionate love for Kundanandini brought about a disaster and tragic situation for all the characters, in the novel of Fakirmohan also the passionate feelings of Ramachandra Mangaraj, a village landlord for Champa, a villain woman character, brought calamity in the novel and a tragic end. Ramachandra

Mangaraj was an oppressor, had the unlimited greed for acquisition of landed property of poor people by foul means and Champa was his ill adviser and associate. As Nagendra was inconsiderate towards his faithful and dutiful wife Suryamukhi, Mangaraj similarly also ignored his faithful and devoted wife Saantani. In 'Visabriksha' for the first time the readers received intimate glimpses of the middle class domestic life of Bengal in the mid-nineteenth century. Similarly Fakirmohan in his Chhaman Athaguntha depicted the pictures of an agrarian rural society prevalent in Orissa in the early-nineteenth century and the middle class domestic life of Orissa in Manu and Prayaschita. Like Bankim, Fakir Mohan also has asserted himself as a teacher of morality though he was a keen observer and interpreter of human life. Bankim Chandra was influenced to a great extent by the ideas of two western philosophers : Mill advocating utilitarianism and Comte positivism or humanism. Fakirmohan, though not very proficient in western learning, had shown remarkable excellence in depicting both the philosophies in his novels. He was a lover of humanity and had a firm belief in the future of human beings and their essential virtues.

Bankim Chandra was a patriot. His "Vande Matram" was accepted as a national hymn, evoked the masses and initiated them in the love for one's own country. Many poets both in Bengali and Oriya literature composed such songs endowed with patriotic feelings.

Though influenced by western philosophers Bankim Chandra was a believer in God. He realised God as a human being who is endowed with the supreme virtues. He treated Srikrishna as such an incarnation. He read the Bhagabat Gita thoroughly where Srikrishna has propagated the significance of self-less deeds and well-being of humanity. Bankim Chandra sought the highest ideal of man from these ideas. He did not follow the scriptures blindly, rather examined the lessons of the scriptures and the traditional beliefs through rationalism and scientific judgements. So his assessment of Krishna charitra was humane and unique. This assess-

ment also influenced thinkers and writers elsewhere. In Orissa educated devotees of lord Krishna like late Chintamani Acharya, a prominent lawyer and once the Vice-Chancellor of Utkal University who had his higher education at Calcutta wrote his book 'Srikrishna' in this light.

The literary prose style of Bankim Chandra also influenced the prose style of some Oriya writers. Bankim Chandra made a compromise between the Vidyasagari and Alali prose style. The techniques of vivid description of situations and faithful delineation of characters as seen in Bankim's novels were adopted by the early Oriya novelists. Like Bankim Chandra, Umeshchandra, Ramasankar and even Fakirmohan divided the themes of their novels into various chapters and titles were given to the chapters also.

Bankim Chandra influenced the early fiction writers in Oriya language who created romances following him. In subsequent times eminent novelists like Fakirmohan also got their literary inspiration and impressions from the writings of Bankim Chandra and developed Oriya fiction considerably.

IMPACT OF BANKIM CHANDRA CHATTERJI ON TAMIL LITERATURE

Ranganayaki Mahapatra

The name of Bankim Chandra Chatterji would stir nostalgic memories in the minds of Tamil readers. Even upto the 50's there was no Tamil library worth its name without the Tamil translations of Bankim Chatterji, Sarat Chatterji, and Rabindranath Tagore.

Among the 200 and odd translations from Bengali most were directly from the originals and quite a few through Hindi and English. The following list would give an idea of the Tamils', love for Bengali literature and culture, resulting in Tamil translations before Independence.

Bengali novels translated into Tamil	120
Short story collections	26
Drama	12
Poetry	5
Biography	1
Autobiography	1
Religion	2
Essays	3
	170

Of these Bankim Chatterji's novels were the most popular among the general public.

All his 14 novels have been translated into Tamil. Ananda Math was translated five times by different writers in different periods. Krishna Kanter Will, Durgesh Nandini, Devi Chaudhurani, and Bisa Brikkho were translated 2 times each. Mrinalini and Chandra Sekhar had seen three translations. Sarat Chandra's and Bankim Chandra's popularity was understandable, because of their romantic fiction, while

the more serious readers relished Tagore's works. Particularly Bankim Babu's novels thrilled their readers by their out-of-the world fantasies. Though new creative talents were already developing in Tamil in novelists like B. R. Rajane Ayyar and Madhavayya, the commoners were not familiar with them. They were to be applauded much later by the serious critical minded Tamil readers. So those who looked for pure entertainment in literature found the romantic novels of Bankim Chatterji most absorbing. Years later the same magic was to be weaved by the young Tamilian, writer Kalki, Among Bankim's novels, Durgesh Nandini, Visa Vriksha and Kapala Kundala were more popular.

But with Ananda Math it was a different story, "Besides the thrill of a 'real history' with which the ordinary reader identified himself, it gave a lagitimate moral satisfaction ; the capacity to identity with the characters of Mahendra and Jibananda gave one the exalted feeling of taking the cudgel for the motherland," That it was translated 5 times over and again with the fifth one in 1972, more than proves the patriotic enthusiasm it created. So, Ananda Math, for the Tamils was more than a mere novel ; it was a religious experience.

Mahesh Kumar Sarma, in 1906 was the first to translate Ananda Math into Tamil and the song 'Bande Mataram' was immortalised by the magic touch of the great Tamil poet Mahakavi Subramanya Bharati.

Bankim Chatterji himself could not have imagined the role which the song Bande Mataram was destined to play in the Swadeshi movement. Though a Bengali song, it is so rich in Sanskrit vocabulary that it can be understood by educated people from any part of India. In 1906 Rabindranath Tagore set the music for this song and until 1947 this song remained the anthem of the Indian national liberation movement.

Even in 1874 Bankim Babu had created the image of the mother land as the Goddess. In 1880 in Ananda Math he developed the image making use of the image of the Goddess Durga in her various manifestations. This vision of the

motherland as the omnipotent Goddess caught the fancy of Subramanya Bharati. A gifted poet and patriot of the first order he was the fittest person to translate Bande Mataram into Tamil in Ananda Math. He changed the 7 millions people of the original into 30 millions in his second translation. He thus formed the direct heir to Bankim Babu in his worship of the mother land as the Goddess. He translated Bande Mataram twice and he sang many a song in praise of Bharat Mata, using this epithet Vande Mataram, ascribing all the glories of the past to this new Goddess. Bharati developed this conceptof Bankim Chatterji further and created a nationalistic literature in a Tmil, becoming the first national poet of such dimensions in Indian literary history. In Tamilnadu today, in all state functions, it is Bharatis anthem in Tamil which is sung, the last lines of which are,

> "Long live the sweet Tamil,
> Long live the good Tamils,
> Long live our precious country the Bharat
> Vandē Mātaram Vandē Mātaram."

Mother land as Bharatmata, particularly in the form of an omnipotent Goddess like Durga appealed immensely to Bharati who was a staunch worshipper of sakti even before his association with Sri Aurobindo. Bankim's interpretation of Lord Krishna has also a parallel in Bharati whose songs on Krishna (Kaṇṇan Pāṭṭu) are classic. Bharati brings Krishna much closer to the human beings. He sings of Him as not only a Master, but as a father, mother, servant, king, lover and even as a she-lover.

Though it was due to the impact of Swami Vivekananda that Bharati's faith in the revival and rejuvenation of the ancient Hindu culture was strengthened this renaissance of a national religion, national self assertion, and religious patriotism was very much the field of Bankim Babu and Bharati plunged heart and soul into this current. The Upanishads and the Gita were seen in new lights both by Bankim Babu and Bharati,

Another very important field where Bharati reminds us of Bankim Babu is the development of language and literature. Versatile like Bankim Babu, Bharati left nothing untouched in the field of language and literature and broke new grounds at every step.

Students of Tamil literature call the 20th century as the Bharati Era. He was the one who heralded new life for Tamil and decided the path in which it was to move.

And Bankim Babu seems to have had the blue print ready for Bharati. Emphasizing the important role of literature in the life of the nation, the necessity for freeing it from the poverty stricken pundits, calling writers to ignore the norms and traditions pedantic and outwork by time, creating original works of artistic value in the mother tongue, so that even commoners can take part in the literary development, were some of Bankim's ideas for the development of Bengali. And Bharati set a model by himself by achieving every one of these dreams for Tamil.

The weighty social problems of India, the position of Indian peasants, the emancipation of Indian women, distribution of national wealth etc. etc. were some of the concerns which drove Bankim Babu to admire the socialist Utopians of the West and French thinkers. Liberty, Equality, and Fraternity became the slogans of a series of articles by Bankim Babu.

And they became the life mission of Bharati also. All his thoughts on the emancipation of women were aggressively shared by Bharati, who gave a new dimension to the concept of womanhood. Romanticism as a literary movement found both Bankim Babu and Bharati drawing inspirations from Indian, history and mythology. Bharatis 'Panchali Sapatham' is a master piece, seeing the modern Indian woman in the garb of Draupati.

Bankim Babu is accepted by all as a trend setter in writing historical novels. And the late Kalki of Tamilnadu is fondly referred to as the Bankim Chatterji of Tamilnadu by some. He was equally popular as a historical novelist, raised the number of Tamil readers by lakhs by his delightful

style of writing, his humour and penchant for historical romances. He was a journalist to the core and polished Tamil for new ventures, made it a successful vehicle of modern topics, 'Of course, born nearly a hundred years later Kalki did not have to face the onorous task of Bankim Babu. Tamil prose was already modern enough to be moulded by Kalki into magical designs. Tamil critics associate him with Bankim Babu, for the reason that Kalki was the first to write historical novels in Tamil. He is also compared to Sir Walter Scott as Bankim is, and faces similar charges from some modern critics as Bankim Babu does.

Like Bankim Babu, Kalki also controls everything in his historical novels. They abound in intrigues, scaling of walls, sudden nocturnal, invasions, beautiful women brandishing daggers etc-etc.

It is no exaggeration to say that a knowledge of Bankim Chatterji and his contributions make one understand the history and development of modern Indian languages much better. Particularly in Tamil, his admirers Bharati and Kalki have fittingly honoured Bankim Babu by fulfilling every one of his dreams.

A list of Bankim Babu's novels translated into Tamil :

	Title of the original	Title of the translation	Translator	Year
1.	Kapāl Kundalā	Andapurarakasiyam or Rajesvari	M. Ramalinaga Mudaliar	1907
2.	Ananda Math	Anandamatham	Mahesh Kumara Sarma	1906
	,,	,,	C. Tirucitram	1908
	,,	,,	Balam Pillai	1919
	,,	,,	T. N. Kumara Swami	--
3.	Indirā	Indirā	G. Kumara Swamy	..
4.	Kapāl Kundalā	Kapāl Kundalā	T. N. Kumara Swami	1967
5.	Krishnakanter wil	Krishnakanter wil	T. N. Kumara Swami	1938
6.	,,	Cancalkumari	Guhappriyai	1967
7.	Chandrasekhar	Candrasekharan	Tvirucitran Balampillai	1908
	,,	,,	Mahesh Kumar Sarma	1912
	,,	,,	V. R. Venkatesam	..
8.	Sitārām	Sitaraman	C. S. Sundaram Iyer	1910
9.	Chandrasehhar	Saibalini	Ranganatha Attreya	1953
10.	Durgeshnandini	Durgeshnandini	..	1905
	,,	,,	K. P. Rajagopalam	1944

11.	Debi Chaudhurani	Debidhaudhurani	Swarnambal	1939
12.	,,	Parimaḷā	T. V. Krishna Sami Sastry	1907
13.	Rajmohoner Bou	Mādangini	T. N. K.	—
14.	Mrinalini	Mrinalini	R. Shanmuga	1947
	,,	,,	Sundaram	1947
	,,	,,	K. P. Rajagopal	1947
	,,	,,	V. S. Venkatesam	1947
15.	Radhārāni	Radharāni	A. Kandaswamy	1959
16.	Visvṛkhha	Viṣavirut ṣam	T. N. K.	1953
	,,	,,	V. S. Venkatesam	1939
17.	?	Hiranamayi	K. P. Rajagopal	1949

INFLUENCE OF BANKIM CHANDRA IN TAMIL

Dr. A. M. Perumal *

Literary influence in General

Human thoughts and actions are expressed in literature. Really literature is common to all without the difference of language. But literary approachs and techniques differ between authors. The same thing may be expressed differently which produces different effect in the readers. Nowadays with the help of translation the thoughts of one language can be easily carried to another language. Such transmission of thoughts and ideas from one language may easily he influenced by another. It is to be found that many of the renowned scholars of the world influence the oncoming writers of the other languages.

Bankim Chandra Chatterji, the most illustrious Bengali writer of the 19th Century has had his immense influence in many of the Indian languages. Most of his novels were well conceived with useful materials. The form and the techniques of presentation adopted by him were highly effected in giving out facts of life and so attracted authors to follow his principles in writting especially in the construction of Novels. The idealistic thoughts presented by him made powerful impressions which had great attraction and hence followed by many. Some of the Tamil novels particularly the historical have been influenced by Bankim Chandra's novelistic creations.

Kalki and Bankim Chandra

Kalki (R. Krishna moorthy) occupies a very high place in the world of Tamil novels. He wrote historical romantic

novels like Sivakamiyin Sapatham' (The vow of Sivakami) 'Parthiban Kanavu' (The dream of Parthipan) 'Ponniyin Selvan' (The Son of Ponni) etc. They were well received and earned thousands of readers even when they were published in parts continuously in the weekly named 'Kalki'. They were praised for the wonderful technicality enhanced by the novelist in shaping them. The remarkable events which produce horror and terror besides awe and owe, in the hearts of the readers, give much effect in the onward march of the novels. Kalki shaped these events out of the practices found in the historical society. The terroristic actions and practices of the Kapalikas are well brought out in powerful terms in the novel 'Ponniyin Selvan'. They were real happenings of the past. The mode of presentation gives much effect upon the minds of the present day readers.

Bankim Chandra might have been the instrumental force to Kalki for such type of writtings. In the novel 'Kapala Kundala' Bankim Chandra exponed in detail the terroristic activities of the Kapalikas. They have historistic backgrounds. Such events have much effect in building up of the novel. Bankim Chandra gave accounts of the meeting between Navakumara and the Kapalika in addition to the manthric and thanric practises of the Kapalikas. They were the worshippers of the Goddess Kali and resorted to cruel and horror-stricken formalities in their mode of worship. The author created an atmosphere of fear and wonder which creates a feeling of anxiety in the minds of the readers. The same technique was adopted by Kalki in 'Ponniyin Selvan'.

The tallent of Bankim Chandra lies in creating novel episodes from historical events with the help of artistic touches. The literary outputs brought out in this way made great impressions in the mind of the people. This is greatly appreciated by the people of Bengal. When it was adopted by Kalki in his novels they were welcomed with praise by the Tamils. Many of the principles handled by Bankim Chandra in his historical novels had been followed by Kalki which won for him high fame and good name in the field of Tamil novels.

Chandillyan and Bankim Chandra

Chandillyan is one of the famous historical novelists in Tamil. 'Kadalpura' 'Yavana Rani' 'Rajathilagam' 'Mannan Magal' are a few of his important works. They are full of romantic attractions created out of historical materials. No doubt romance attracts people. They should be given in a polished way. Chandillyan is seen describing romantic scenes following the methods adopted by Bankim Chandra. They are really attractive and impressive. The beauty and attraction of Shanthi a described by Bankim Chandra in his novel 'Ananda Math' had their influence in some of the descriptions given by Chandillyan in his novel 'Rajathilagam'. Eventhough Shanthi was a female. She exposed immense courage to withstand any amount of hardships and challenges in life. Chandillyan also created a princess who could summon up courage to face any kind of difficulties.

Bankim Chandra in 'Kapala Kundala' wants to describe the charming beauty 'Mathibibee'. In part II chapter 2 of the novel he appeals to the readers that the beauty of the ladies has to be described but not too much. With this piece of introduction he begins to describe the beauty of Mati impressively and decently. But Chandillyan in certain places finds too much liberty in his romantic descriptions. But Bankim Chandra restricts himself in his romantic descriptions which may be accepted as decent. Anyway Chandillyan's historical novels are influenced to a considerable extent by the novels of Bankim Chandra.

The National Novels in Tamils

When Mother India was fighting for its independence, many novels were written with curiosity to infuse national spirit in the minds of the people. The common people were mostly ignorant of what was happening around them and not aware of the national struggle. The authors had to adopt certain impressive methods in order to get the people

the spirit of nationalism. They should be conscious of what is happening in the society and the country.

R. S. Nallaperumal, Akilan, K. Rajavelu, Naa, Partha-sarathi, Kalki may well be considered a some of the authors who wrote best national novels. They were seen adopting directly or indirectly the methods conceived by Bankim Chandra in his novel 'Ananda Mut'. In this novel Bankim Chandra tries to awaken the people to be conscious about the severe conditions of the famine that spread in Bengal as well as to realise the realities there rule of the Muslims. He pointed out in plainterms about the dealings of the English company in the hope of winning political power in Bengal. Bankim Chandra keenly observed what was really happening in the country and thought over what should be done to avoid future disturbances and unwanted happenings. With good intention and sincere love for the country he presented materials to awaken the people. In Tamil novels also we find some of the methods used by Bankim Chandra create national feeling were followed by the Tamil novelist also.

Bankim Chandra had firm belief in the cultural traditions of India and Hindudharma. He tried to implant in the minds of the people, traditional ideas, cultural traits and Hindu-faiths. Even though his thoughts were considered as conservative by a few, he was firm in his conceptions and decisions. His novels such as 'Visha Virutcha' 'Mrinalini' condemned some of the social customs like remarriage of widow etc. He strongly felt that the old customs and practises were of full meaning. This idea of Bankim Chandra had not so much influence in Tamil writtings.

Bharathi and Bankim Chandra

Subramaniya Bharathi is considered as the greatest national poet in Tamil. He was very much attracted by Bankim Chandra's song 'Vande Mataram' found in 'Ananda Maht'. With great enthusiasm he translated the song into

Tamil. The whole of Tamilnadu found pleasure in singing the song.

The power and spirit evolved out of the song made the Tamils to love their motherland better than their life. Bharathi was much influenced by the thought and aspirations of Bankim Chandra who was original and sincere in his writtings. He estimated India's culture as very high and developed sincere faith in Hindu religion. Bankim Chandra Chatterji was full of rich thoughts and ideas with noble intensions and can very well be considered and respected as one of the best of Indian writters who gave immortal pieces of literature in Bengali which are immensively capable of influencing the various languages of India both in thought and art of literature.

BANKIM CHANDRA IN KANNADA LITERATURE

S. K. Havanur

It was B. Venkatacharya (1845-1914) who introduced Bankimbabu to Kannada readers in 1885, through the translation of 'Durgesha Nandini'. Prior to this, there were hardly four or five novels. Moreover, not one of them was a novel, properly so called, in the form cultivated by Walter Scott and other Westerners.

Since the novel was a new form, 'B. Vem' took pains to explain in his English preface both the concept of the 'novel' and its various types : supernatural, historical and social. He adds : 'A novel in the sense it is understood in English is not familiar to the Kanerese public'. He hopes that the Kannada language would soon flourish with the adoption into it of such an entertaining form of literature.

B. Vem has translated all the works of Bankim except 'Muchiramgudi's rittanta' and a few essays. He has also translated Bankim's poems. Most of these have been published, while some (especially the essays and other minor pieces) appear to have remained in manuscript form. B. Vem has translated Bengali fiction from other writers as well, but Bankim dominates the scene. Even in his independent writing on topics, e.g. 'Anandamatha and love for motherland', 'The need for enriching indigenous languages', and so on, one can notice the impact of Bankim's work. In another essay, namely, 'The consideration to be shown to Kannada writings' B. Vem eulogises the greatness of 'Vishvriksha' in an imaginary dialogue between a couple. It therefore goes without saying that B. Vem attained recognition as a litterateur in Kannada only through Bankim's works. In fact the two names 'Bankim' and 'B. Vem' were synonymous in literary circles in those days.

It is worthwhile nothing how B. Venkatachar got interested in Bengali literature. He learnt Bengali on his own

out of curiosity. The credit for further initiating him in its study goes to Ishwarachandra Vidyasagara whose works, namely 'Bhrantivilasa' (a fictional adaptation of Shakespeare's work) and two mythological narrations were translated even before 'Durgeshanandini'. B. Vem had been regularly purchasing Bengali books and had even built up a big library of such volumes. He had close connections with some celebrities. Among them were Babu Devendranath, Swami Vivekananda and Professors Brojendranath Seal and Radhakumud Mukherji, both of whom belong to the early twentieth century. His feeling for Bengali literature was so intense that he used to send every month a remuneration to one Shri Shashibhusana Vidyananda, a protagonist of ancient Indian Culture. It is said that even the daughters of B. Vem were conversant with Bengali and helped him in his endeavours. It may be interesting to observe that both Bankim and B. Vem had some striking similarities in physical appearance. Both of them also enjoyed some magisterial powers in their government jobs.

There are a few others who have translated Bankim's works into Kannada, but mention may be made here of only those who were thoroughly fluent in the Bengali language. They are R. Vyasarao (Translator of 'Shrikrishna Charitra') and Ahobala Shankara, of the post-Independence era.

'Galaganatha' (1868-1943), another pioneer of modern Kannada fiction, has also brought in Bankim Chandra, but through Marathi adaptations, ('Mrinalini' and 'Rajasimha'). Although a gifted writer, Galaganatha focused mainly on the story element. As a result, his translations are shorn of original beauty and grace. May be the Marathi versions themselves have contributed to this lacuna.

In 'Vishavriksha', the main character Nagendra is named thus because of his firm actions. B. Vem has called him Nāgendra. This may be sheer inadvertance, for B. Vem is generally very faithful to the original. At best he might have occasionally omitted a phrase or modified a sentence. However, his excessive adherence to the original has also

resulted in the retention of certain Bengali expressions and words (Paitrika, Dharāshāyi, Pārāvata, Upakūla, Svetasaikatapulina etc.) which did not really adapt well to Kannada diction.

The impact of Bankim's works during the first phase of Kannada fiction may now be outlined as follows :

The induction of a new literary form, namely the 'Novel'.

The creation of a readership with an unabating taste for enjoying fiction, thus facilitating subsequent novelists.

The arousal of interest in Bengali literature, and respect for the Bengali way of life. This in turn paved the way for appreciating in greater measure the work of Rabindranath and Sharatchandra.

The inducement to write fiction depicting valour, boldness, sacrifice and other similar noble human qualities. Such imitation, however, was on the whole mediocre and unoriginal : even proper names with suffixes like Kumar, Nath, etc. which did not go well with other Kannada names in usage, were sometimes copied from Bengali fiction.

Serving the cause of the national movement through the song 'Vande mataram' and the general patriotic Stance in Bankim's works.

Bankim's works in Kannada ran into several editions. The reasons for this are evident and have to do with the sheer joy of reading this romantic genre whether it belongs to the past or even the near-present times. There was no viable alternative in terms of a similar fiction (at least upto 1910 when Galaganath's historical novels came to the force). Another crucial factor was that a majority of Bankim's works were prescribed as texts at the matriculation and collegiate levels. 'Anandamatha' enjoyed this privilege even in the 1960s. Interest in Bankim's works however, waned somewhat in the 1930s because of the realistic trends and problem-oriented themes in fiction writing.

This lapse was in ample measure compensated by 'Bankim Chandra'—a full-fledged critical study published in 1960. The Author, A. R. Krishnashastri, was a professor of Kannada in Mysore University. His interest in Bankim dates back to approx. 1900 when he chose to purchase 'Anandamatha' from the prize-money he had received as a school boy. He was prompted in this action because of its bulk compared to the other publications in the book shop ! Later, when he was teaching Bankim's works, he felt the need to study them in original. He, therefore, studied Bengali on his own. By the time of the Birth Centenary of Bankim, he had acquired all his works (brought out in nine compact volumes in Bengali) and even wrote articles on his in 'Prabuddha Karnataka'—a scholarly journal from Mysore University. One of these articles was a comparative study of Bankim Chandra and Hari Narayan Apte.

Even when he retired as professor in 1946, it would appear that Bankim Chandra was very much in his mind. He now read most of the critical writings on Bankim Chandra including that of Akshaya Kumar Dutt, but decided also to write his own evaluation of Bankim. This resulted in the publication mentioned above.

I cannot help mentioning one more instance of A. R. Kr's efficacy in Bengali language. He was requested to translate 'Nibandhamala' to be published by the Sahitya Academy during the birth centenary of Rabindranth. You all know how tough it is to translate this particular work of Rabindra. Although A. R. Kr. was seeking clarification on several words, the Bengali Committee under the aegis of the Sahitya Akademy was not able to satisfy him. And when he gave his own interpretation, they accepted most of them. The Authorities of the Academy were so impressed that they requested him to write a foreword to one of Rabindra Volumes, to be brought out during the Centenary Celebrations ; A rare thing indeed for a non-Bengali to be invited thus ! But A. R. Kr. had to decline this offer, as he was buys giving finishing touches to this book on Bankim Chandra.

Coming to the work itself, one can claim that it is comprehensive in this respect that all aspects of Bankim have been covered. Even Bankim's most insignificant writing is noticed and treated appropriately.

A full chapter is devoted to each of the major novels. In each, the theme, the principal characters, the philosophic tone and the subtlety of Bankim's descriptions are vividly dealt with. The study is so exhaustive that the author mentions even the changes made by Bankim in the successive editions of a novel a characteristic for which he was notorious. Even the appropriateness of the names given to the characters has not escaped the attention of A. R. Kr. These apart, Bankim's scholarship, his adherence to our traditional values, his belief in the Tantric system as well as in astrology and fatalism, have all been touched upon. Prof. A. R. Kr. was himself an erudite scholar and we find in his evaluation several allusions to the upanishads, the Mahabharata and the Bhagavadgita. We also find a comparative approach in his study of the various works of Bankim himself and of some of his characters with western counterparts, such as Calleb (Walter Scott), Nidia ('Last days of Pompei') and Ivanhoe. His comparison of Ishwarchandra, Michael Madhusudan Dutt and Deshbandhu and their respective contribution to Bengali literature is unique though brief. All this is naturally voluminous and adds upto a full 500 pages. We do not however, find a single page which is stale or redundant.

It must be conceded, however, that the tone of the book is flattering to Bankim. Such appreciation, however, is fully justifiable, and has a history which begins with the famous eulogy of him by Rabindranath. A. R. Kr.'s A similar trend may be observed in narration. There is admiration here, but without any superlatives. What has struck me personally is the uniform zeal in pointing out Bankim's greatness and the manner in which this is eloquently conveyed to the readers.

Prof. A. R. Kr. was awarded an Honorary D. Litt. by Mysore University for his overall contribution to Kannada Literature. This publication was his latest work at that

time. In the same year, the book received a Sahitya Akademi Award. The publication has stood the test of time and is, even today, considered an outstanding literary work. It would be worthwhile to translate this publication into other Indian Languages, including of course, Bengali.

BANKIM CHANDRA AND 'ANANDAMATH'*

[Influence of History : History Influenced]

• Prof. **Bhudeb Chaudhuri**

The choice of 'Anandamath' here is deliberate. Bankim Chandra himself stated,—to write an historical novel in 'Anandamath' was not his intention, so he did not 'pretend' of historicity.[1] Jadunath Sarkar, the accredited historian, observed, even if viewed most liberally, 'the book can, by no means, claim the attribute of an historical novel.'[2] Yet, and to a great extent for that, 'Anandamath' is apt to expound most eloquently Bankim's intuitive perception of history and his deep involvement with that—both unique in nature.

One of the foremost thinkers, and so also the most gifted creative writer of his time, Bankim devoted his energy and endeavour fully towards the total upliftment of his fellow people subdued by an age-old depredation. And to that end, he was convinced, history happened to be a very powerful weapon. 'History of Bengal is essential.' He exclaimed, 'Otherwise the Bengalees cannot be reckoned amongst men.'[3] Elsewhere his pronouncement was more specific :—'Creation[4] or progress of people's history is the basis of national pride ; history is one of the sources of social sciences and social ambition'.[5] One of Bankim Chandra's fundamental aspirations had been to instill in his countrymen that feeling of 'national pride' and 'social ambition'. His primary concern was with the emergence of a comprehensive Bengalee nationalism, and ultimately with one, Indian.

India's basic apathy towards history became a matter of common regreat among the English educated urban Bengalee thinkers of the day. More so, the ardent desire to

---

* Transliteration of Bengali words are made in consonance with Bengali phonetic order. No seperate diacritical marks are used.

come-up as a well-organized nation derived a universal sense of urgency to construct at least an infrastructure of a national history on 'scientific' lines. Bankim, like some of his contemporaries, deliberated, in quite a number of his prose writings, upon the 'true' historical legacies of Bengal, as also of India. Needless to say that his thoughts were ever provoking. Till the end he longed to write a full-volume history (of Bengal).[6] Amongst all these, the artist Bankim stood singularly aloft with his firm resolve to pursue history in order to make history. Mere reading of history cannot impart adequate impetus for a resurgence. Things become meaningful only when study of history can enthuse a spirit of making history by following the footprints of the hallowed past. And to lead the just blooming nation of his fancy to that enexplicable track, Bankim stoutly took to himself the onerous task of 'creating' history. This mission was best fulfilled in the pages of 'Anandamath'.

The attempt pervaded widely in his creative writings—the novels ; and gradually evolved the artist's nuances. Finally it turned out to be a three-tier exposition of history. Under the veil of a panorama of the past, Bankim consolidated the image of contemporary events, as he viewed them. Finally, on that comprehensive back-drop, was cast his vision of the future life-pattern—and that, indeed, was a vision of a creative idealist.

The model attained its first distinct shape in 'Chandrashekhar' (first edition published in 1874). There Bankim, with the blazing predicaments of the first shooting products—young men and women—of the Hindu College (1817) and Hindu Balikabidyalay (Bethune school of later days—1849) receded more than a century back to the post-plassey days of Mir Kasim (1760-64). On that canvas beamed the author's dream of an ideal life pattern 'mainly around the rise and demise of Pratap, so also over the exceptional self abnegation of Dalani Begam.

In 'Anandamath' the artist's cudgel had been the finest and his nuances adroitly perfect. The story started on a solid base of historical past. That the opening paragraphs

of 'Anandamath', depicting the devastating famine of 1769 (1176 B. S.)—"Chhiattarer manwantar'—represent almost a literal translation of W. W. Hunter's account in 'The Annals of Rural Bengal, is common knowledge today. The narration of the wayside events and landscape during Mahendra and Kalyani's journey synchronize with that ; so also the events of the post 'manwantar' years. The Sanyasi revolt, though thoroughly at variance in the novel with the facts of history, could amass that alarming magnitude both ways only under the impact of the 'manwantar', and its aftermath. And Jadunath Sarkar also felt that the two war episodes involving the British army and the 'Santans' had a bearing of history. All these combined together, imparted an historical background to the novel. Yet the theme proper went far off from that context.

Purna Chandra Chattopadhyay, the younger brother of Bankim Chandra, testified that Bankim, when quite young, listened to the 'manwantar'—story first from a grand uncle of theirs, and the impact reverberated to his mind time and again.[7] The junior Chattopadhyay surmised that his elder, possibly, cherished to write a volume on that perturbing theme. That came off at last in the concluding chapter of the author's creative career. Certainly, that was not all accidental.

Bankim, the indefatigable dreamer of 'national pride', had his firm stand of life on supreme human values. Unstinted faith in humanism, no doubt, played as the highest maxim with the nineteenth century Bengalee revival ; and a clinching attachment to that spirit was a general symptom of the age. But Bankim had his own notions ; and they traversed long, by steps, with the gradual cohesion of his thoughts :—from 'Samya' or 'Bangadesher Krishak'[8] to 'Krishna Charitra' (first edition published in 1886) and thence finally to 'Dharmatattva' (first edition in 1888). 'Anandamath' preceded the latter two volumes in Banhim's creative process. Still, a nucleus of the idea must have had been deeply set in Bankim's thought-stream. Fundamental postulates of 'Krishna Charitra' cast their foreshadows in

Satyananda's elucidation to Mahendra about the Vaisnavism propagated by Chaitanya and the other practised by the 'Santans' in 'Anandamath'.[9] And the spirit of 'Dharmatattva' derived a pre-exposition in the basic fabric of 'Anandamath'.

The phased publication of the novel commenced first in the 'Bangadarshan' of March-April, 1881 (Chaitra 1287 B. S.). Certainly the introductory prologue ('Upakramanika') had been written earlier. The first edition of the book, again, appeared in 1882-December,—within a span of some twenty months. Yet, in the journal, the supreme stake claimed of the mysterious reckoner [in the 'Upakramanika'] for fulfilment of his mission was the 'life's kernel of the dearest one'—'priyajaner jibansarbaswa'.[10] The singular demand of the first edition of the book, on the other hand, was 'Devotion'—'Bhakti' in bold letters.[11] Later in 'Dharmatattva' Bankim Chandra assumed, in general, that of all the activating impulses [of Man], 'devotion', 'love', 'kindness' ['bhakti', 'priti', 'daya'] are the foremost—of these, devotion is most important—devotion to God is supreme.[12] And his final assertion was, 'When all the impulses of man lead towards God or follow God, that condition is bhakti.'[13] In 'Anandamath' the 'Santans' had been activated with that spirit of bhakti. The story of the revolt was contrived not merely to instigate an upsurge on politic-economic grounds; but, more so, to stimulate the spirit of a supreme human emancipation. The final invocation of the theme demanded the consecration of bhakti to jnan; —devotion to be merged in Supreme Knowledge. And that was the message of the artist's intent to be propounded in 'Anandamath'. It was indeed a message of human resurrection, total and perfect, for the stimulation of a dream of our newly pulsating 'nationalism' to flourish. It was a poet's vision of future history as it ought to be. And to curve out a consolidated infrastructure for its depiction, the novelist crept, unperceived, into the precincts of the contemporary history of his time.

To that end, again, the artist's hazards were many. Bankim, like most of his contemporary Bengalee thinkers,

was convinced of the imperatives of fostering a glowing national spirit for the revival of his fallen countrymen. Yet, like them again, he was deterred by the inherent impediments of an exclusive politico-economic nationalism with its blind lures of self-aggrandizement at the cost of all others.[11] It haunted his Indian sense of ethical values. Even while aspiring for an all-round retrieval of his country, Bankim's visions of human perfection knew no compromise. Hence erupted the innate compulsions of striking a judicious via media. And that was to be accomplished in 'Anandamath'. The nascent craze for national 'independence' was to be fused with the immanent 'liberty' of the soul,[15]—a carnal impulse for physical subsistence to be balanced with a serene spiritual identity of life divine.

That, indeed, was a poet's frenzy, and Bankim's was a story-teller's art. Poetry flourishes in fathoming the inexplicable essence of life, while the motiff of fictional exposition lies in delineating that on a conspicuous canvas of objective perspicuity. In order to blend the two in one, the artist's inter-action with the life of his time and surroundings penetrated into the frame of the story. And in that was shrouded the fibres of contemporary history.

The background sequence of plot-formation might have been somewhat like this :—The dismal affect of the 'Chhiattarer manwantar' on Bankim's tender feelings, and its recrudescence in his mind had exercised him in quest of a remedy against the recurrence of such maladies in Bengalee national life. And the pressures of contemporary events, straightly rebounding on the life and experience of the artist, steered clear the course with gradual simmering impact. In fact, the atmosphere became increasingly surcharged with an avowed resolve to crush off the yoke of British subjugation.

The revolt of the indigo-farmers (1859-60) and the more virulent Wahabi reprisals (1871-72) may provide a starting point for us.[16] Bankim (1838-1894) was between his twenties and thirties then in the midst of an impressionable age. Close on the heels followed the seething ebullience created

by Surendra Nath Bandyopadhyay and his distinguished co-patriots. Giuseppe Mazzini of Italy exerted a tremendous influence in fixing up the crescent upsurge. Bharat Sabha (1876) of Surendranath derived its very name from the 'Young Italy Society' propounded by Mazzini.[17] One of the specific mottos of the 'Society' had been, 'Every member is to provide himself with a dagger, a gun and 5 cartridges.'[18] At the bottom of that plan of a relentless struggle, Mazzini sowed the seeds of a spiritual stimulus :—'Ours was not a political association (Setta) but a patriotic religion. Political associations may die under violent treatment : religions never do.'[19] Finally 'Mazzini held that perfect freedom was necessary for the full development of man—that is to say progress.'[20]

Bankim also had a predilection for such 'progress' leading to 'the full development of man', and he must have had felt a deep alignment with Mazzini. In fact, Sri Aurobindo later hailed Bankim's idea as 'the religion of patriotism.[21] Still it would be too much to claim that the visions of 'Anandamath' sharply heading towards a politico-economic crusade borne by spiritual overtones emanated out of Mazzini's model. The idea certainly struck the artist's imagination first through the activities of the Sanyasi revolters of the 'manwantar' days. That gradually derived a more pragmatic canvas in the stirring strides of the 'Young Italy Society'. The fundamental stipulation of the 'Santans' as a secret revolutionary organ composed of the initiated devotee activists and the non-initiated conformists,—particularly the inter-relation between the secret wing and the mass base, all comprehended so precisely, might have had been the stipulation of an impulse inspired by the knowledge of Mazzini. The last shot in the trail was fired by the stunning ventures of Basudev Balwant Phadke (1845-83), a Marathi youngman full of venomous detestations for the colonial tyranny. He raised a band of two hundred people to loot the Khed treasury with an intent of organizing a revolt, and got arrested. Finally he was condemned to imprisonment for life (November, 1879). The news created

a countrywide commotion. The immediate provocation came from the rulers' gruesome apathy on the face of another severe famine that ravaged Bombay, Madras, Hyderabad and Mysore simultaneously in 1876-77. Funds for relief had been diverted to Indo (British)—Afghan War.[22]

Thus emerged again the backdrop of another famine, which easily stirred the creative passions of the artist, that lay latent for all these years. Though not a Sanyasi, Phadke used to move with saffron clothes on, which evoked spontaneous ovation and obedience of the people. He took leave of his wife with a vow to stay away from the family till the country could attain its freedom. Semblance of all these and quite others, can be spotted in the text of 'Anandamath.'[23]

That apart, the very spirit ingrained in the Phadke-episode could equally be discerned behind the visions of 'Anandamath'. The 'Amrita Bazar Patrika' commented on Phadke, 'The great patriots were created by the will of the nation, yet Phadke wanted to create a nation of his will'.[24] In 'Anandamath' Bankim aspired to assume exactly the same role for himself. Phadke failed on the pragmatic platform of life, the artist came out in colours to create a mark in history.

And the 'nation' of Bankim's reflections had always been a Hindu one. To start with, there was hardly any religious tint in his thought stream. Himself he evinced that he happened to be an aethist at the outset. Late came a 'bewildering' attachment to the Hindu scriptures.[25] According to Purna Chandra's conjecture, the transformation could have occurred some time around 1876.[26] Even if of an earlier origin, Bankim should have had little to do with Hinduism when he took to writing 'Mrinalini' (1869). Yet the author's Hindu identity transpired inexorably in that novel also. Bankim always felt baffled to come to terms with the queer anecdote of Nabadwip, the capital of Lakshman Sen's Bengal Kingdom, being usurped by 17 or 18 Muslim cavaliers. Even as late as in 1876, he lamented over it in "Ekti Git" of 'Kamala Kanter Daptar'.[27] Such examples

may be numerous in his prose disertations also. During quite at such times, he was not that much a Hindu by profession, as by a proudly sustained hallowed heritage.

This over-emphatic notions of an exclusive Hindu nationalism, with its pure politico-economic content, was, indeed, the discovery of the English educated urban Bengalee intelligentsia of the nineteenth century. Views are varied on the causes of such manifestations. Yet, the early complicity of the English colonists in fostering the virus of dissention between the two major religious communities of the land—the Hindus and the Muslims can by no means be overlooked. Ramesh Chandra Majumdar also conceded that the communal astrangement first became perceptibly transparent when demands of native participation in the British network of the country's administration gradually became irresistible.[28]

By the time Bankim took to the writing of 'Anandamath', he was thoroughly engrossed in Hindu religious faith. His susceptible imagination embedded at the cross-roads of history got embroiled in the tensions of opposite thought streams ; and the artist craved for a synthesis. Thus was comprehended the idea of a national resurgence for politico-economic freedom fathomed in Hindu religious supplications. "Amar Durgotsab" in 'Kamala Kanter Daptar' is cited as the most pronounced precursor of 'Anandamath'—theme. It was written in 1875, so also, possibly, was the song 'Vande Mataram'.[29] There had been a lot of deliberations over the real identity of the 'Mother' and the proper significance of the verse,—whether it was a propitiation of the Hindu deity Kali or a patriotic invocation to the mother-land. Ramesh Chandra Dutta asserted that it was both blended in one, an attempt at a synthesis of Hindu spiritual idealism and the western patriotic values.[29a] 'Anandamath' strove to provide an objective lay out for that symbolic vision. Thus it assumed the character of a 'parable of patriotism',[30] instead of a well-discerned fictional texture based on pragmatic cohesion. And that emerged as the source of all contentions regarding the theme and its treatment in

the work. Ours, of course, is the purpose of explicating. the creative design—its nature and extent in formulating a vision of future history.

There is no doubt that 'Anandamath' was intended to record an artist's protest against the arrogant despotism of British rule. It seems that Bankim was convinced of the irresistible upsurge that the song 'Vande Mataram' was poised to impart on the future course of history ; and he was never tired of emphasising that.[31] The historical implication of the fact cannot be ignored that though composed some six years earlier, Bankim had to wait all this time in search of a suitable perspective of history for the adequate exposition of the delicate music. His last observations about the prospective immortality of the verse reared in it the artist's assessment of the novel also.[32] It is no over-estimation to claim that the verse 'Vande Mataram', bereft of the context of the novel, would not have soared to that hight of universal ovation.

Still, it was absured to contemplate the story even on a very far-fetched perspective of the historical events relating to the time of writing 'Anandamath'. Bankim, a civil servant of the day, obviously had serious misgivings about the masters' wrath and his own future. In fact, the 'parable' couched in the shades of such a remote course of history raised serious suspicions about the Author's real intentions. To get absolved, Bankim had to go in for the help of Keshab Chandra Sen, his brother Krishnabehari Sen and their reputed journal 'The Liberal'.[33] Apart from all those personal burdens, there had been genuine apprehensions of the work itself being prescribed on charges of sedition. So the artist moved back some one hundred years on a well-calcutated design; and the 'manwantar'—story was ever a ready reckoner to his soul. Yet, this shifting of grounds was not merely a camouflage for the total contemplation.

The lay out of the novel conformed to the period of [illegible]archy (1765-1773) in Bengal. And the artist seized the o[illegible]portunity for his explicit escape. All the burden and responsibility for the calamities of the 'manwantar' and its

aftermath had been wilfully heaped upon the Muslim ruler ; Mirzafar, the traitor, being named personally. All traits of British complicity had been wiped off extensively. The process, even if unknowingly, titled the artists' fancy towards his fond theme, that of an exulted Hindu uprise—the growth of an effervescent Hindu nationalism. Ramesh Chandra Majumdar elucidated in details the aggressive antipathy cherished by the nineteenth century English educated urban Hindus against the excesses of Muslim misrule of the past.[34] An accurate historical appraisal of the position may be derived only if set under the right perspective of the exigencies of the just-over Mughal colonialism in Bengal.[35] It was more an abhorrence against colonialism than any expression of communal frenzi. Yet, with the double purpose of eluding the British rulers out of wit and also to imprint a proud vision of Hindu nationalism, Bankim, at timeswent up to touch the fringe of communal discord even.[36] And in that lay hidden a prognosis of future history, though baffling no doubt.

However, the deleniation of the theme in the first exposition of the work in the journal, and so also, to a great extent, in the first edition of the book, shuttled between the two ends of the author's dual purpose—a thorough reprehension of colonialism, both British and Muslim (Mughal), and an abiding dream of an all found Hindu national upheaval. Though extremely cautious from the beginning, the artist could not fully restrain tangential rebuffs to the abominable vices of the British rule and rulers.

Lastly to be reckoned is the poetic vision fostering the supernatural wrapping up of the story. It evolved not merely out of a deep-seated spiritual instillation, but also of an innate oscillation of the artist's mind. It was to forge the inseparable blemishes of a national spirit to the realm of a total and perfect human emancipation,—as indicated earlier. The ideal that Bankim epitomized later in 'Krishna Charitra' found its first aesthetic manifestation in 'Anandamath'. That was how, the fervant devotees of the mother—the motherland had been scribed as 'Vaisnavas'—devout

adherents of 'Visnu', whose fullest human incarnation Bankim eventually unfolded in 'Krishna Charitra'.

That human identity of most perfect and final measure could be realized, as Bankim felt, only through a total fusion of Supreme Devotion and supreme knowledge—'Bhakti' and 'Jnan'. The sojourn of Satyananda commenced in the novel with an exuberant demand for 'Bhakti'. At the end he was taken off the scene for ultimate initiation to 'Jnan'. Thus the story concluded in a real 'parable' of incomprehensible identity pointing, most graphically, to the artist's visions of the nation of his longing.

The last two sentences installed in the first edition of the novel, which Bankim had to drop subsequently to escape the masters' fury, tuned, though in voice of studied ambiguity, the swan song of the novelist's heart—indeed an invocation at the alter of the history that was to follow: 'The fire that Satyananda lit did not extinguish easily. If I can, I shall narrate that later'.[37]

The constraints of a subjugated nation muted that yearning. Yet, in these words lay dormant the inflamable potentials of the artist's creative impulse. Finally, that set ablaze the pursuing track of history.

Bankim, the visionary, ventured to create history in 'Anandamath' for the consumption of the blooming nation of his dream. And a supercharged nation reacted by plunging heart and soul to make history in its own way—certainly all of that did not conform to his ideals.

And in all that, Bankim the artist stands vindicated in his mission.

NOTES AND COMMENTS

1. Cf. Bankim Chandra Chattopadhyay : 'Debi Chaudhurani'—"Bhumika"—'Bankim Rachanabali' (Bangiya Sahitya Parisad—1364 B. S.), Vol. VI 'Debi Chaudhurani', p. 3.
2. Jadu Nath Sarkar : Cf. 'Anandamath'—"Aitihasik

Bhumika". Cf. ibid. 'Anandamath' p. 4.

3. Bankim Chandra Chattopadhyay : "Bangalar Itihas Samparke Kayekti Katha", 'Bibidha Prabandha II' Cf. 'Bankim Rachanabali' Vol. 2 (Sahitya Samsad : 1376 B. S.) p. 336.
4. The Bengali Word used by Bankim is 'Srishti'; it can connote both 'creation' and 'making'. Here the first meaning has been adopted and that is significant.
5. Bankim Chandra Chattopadhyay : "Bangalar Itihas", 'Bibidha Prabandha II' : Cf. Ibid, p. 330.
6. Cf. Shrish Chandra Majumdar : "Bankim Babur Prasanga : Pratham Prastab" cf. Suresh Chandra Samajpati [Ed.] 'Bankim Prasanga' (1982) p. 118.
7. Cf. Purna Chandra Chattopadhyay : "Bankim Chandrer Balyakatha" Cf. ibid pp. 31-32.
8. 'Samya' was serialized first in 'Bangadarshan' (1280 and 1282 B.S.), so also was 'Banga desher Krishak' (1279). All these had been incorporated in one volume —'Samya', published in 1879. 'Samya' was discarded later, while 'Bangadesher Krishak' prevailed. The secular, profane (?) values of 'Samya' had been later re-assessed under divine measures and spiritual idealism.
9. 'Anandamath' Part II, Ch. 4 s 'Bankim Rachanabali'. Op. Cit Vol. I, p. 750.
10. Cf. 'Bangadarshan'—Chaitra, 1287, p. 537.
11. Cf. 'Upakramanika' : 'Anandamath' (1st Ed.) Photocopy edited by Chitta Ranjan Bandyopadhyay (1783) p. 2.
12. Cf. Bankim Chandra Chattopadhyay : 'Dharmatattva' : Chapter X—"Manushye Bhakti"—'Bankim Rachanabali' (Sahitya Samsad—1376 B. S.) Vol. II, p. 615.
13. Ibid : Chapter XI—'Ishware Bhakti", ibid—p. 620.
14. For Bankim's assessment of such national values Cf. : —"Bharat Kalanka" : 'Bibidha Prabandha' Vol. I 'Bankim Rachanabali Vol. II. Op. cit. pp. 239-240.

15. Bankim Chandra suggested two different connotations for the words 'liberty' and 'independence' in Bengali 'Swadhinata' and 'Swantantrata'. Cf. "Bharat Barsher Swadhinata Ebang Paradhinata" : 'Bibidha Prabandha' Vol. I—'Bankim Rachanabali', ibid : pp. 241-245. The present usage conforms to that.

16. Ramesh Chandra Majumdar accused the Wahabis of fostering violent communal rivalry in Bengal Cf. 'Bangla Desher Itihas' Vol. III (Second edition) pp. 56-60. Notwithstanding such observations, Jogesh Chandra Bagal referred to the anti British stance of the Wahabis as one of the important pioneering factors in the independence struggle of the country.

Cf. 'Muktir Sandhane Bharat' (1347 B. S.) pp. 118-119. Ramesh Chandra also observed that 'many' shared this latter opinion. Cf. Op. cit. p. 60.

17. Cf. Surendra Nath Bandyopadhyay : 'A Nation In Making' (1963) p. 41.
18. 'Plan of the Young Italy Society, Art. 6' Cf. G. F.—H. Berkeley : 'Italy In The Making : 1815-1848' Vol. I (1968)—translated into English and quoted. p. 9 (notes).

19. Mazzini 'Scritti' (Author's Edition) Vol. V. p. 112. Cf. ibid for translation in English and quotation. p. 10 (notes).
20. Ibid. p. 11.
21. Cf. Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol. 17, p. 364.
22. For a detailed account Cf. Chitta Ranjan Bandyopadhyay [Ed.] Photocopy of the first edition of 'Anandamath' (1983) Part I PP. 9-15—"Basudev Balawant Phadke."
23. For a detailed account Cf. ibid pp. 15-30—"Bankim O Basudev" and 'Anandamath O Basudev' pp. 15-21 and 21-30.
24. Cf. Amrita Bazar Patrika, 13.11.1879, appended to ibid p. 61.
25. Cf. Shrish Chandra Majumdar : Op. Cit. p. 119.

26. Purna Chandra observed that Bankim Chandra's accession to Hindu religion was accomplished under the guidance and instructions of his father, and that happened when he was posted at Hooghly. Cf. "Bankim Chander Dharmashiksha" : Op. Cit. pp. 31-32. According to the record collected by Brajendra Nath Bandyopadhyay Bankim's tenure of office at Hooghly was in between 1876 and 1880. Cf. 'Bankim Chandra Chattopadhyay'—Sahitya-Sadhak-Charitmala 22 (1350 B. S.) p. 29.
27. Cf. 'Bankim Rachanabali' (Sahitya Samsad) Op. Cit. Vol. II pp. 83-84.
28. Cf. Ramesh Chandra Majumdar Op. Cit. p. 524.
29. Cf. Amitrasudan Bhattacharyya : "Vande Mataram : Shata Barsha" : 'Desh', August 14, 1976. Also Jagadish Bhattacharyya : 'Vande Mataram' (1978) p. 11.
29a. Cf. Encyclopaedia Britanica (11th edition) Vol. IV pp. 9-10.
30. Sisir Kumar Das prefixed this caption to his discussion on 'Ananda Math'. Cf. 'An Artist In Chain : The Biography of Bankim Chandra Chatterjee' : (1984) p. 129.
31. Cf. testimonies offered by Lalit Chandra Mitra ["Vande Mataram"], Purna Chandra Chattopadhyay [Op. Cit] : Suresh Chandra Samajpati [Ed.] Op. Cit. pp. 170 and 132 respectively. Also Cf. Shachish Chandra Chattopadhyay 'Bankim Jibani' (1395 B. S.) p. 216.
32. Sachish Chandra Chattopadhyay stated that Bankim told his eldest daughter some two and half years before his death that some twenty to thirty years thence Bengal would go 'mad 'over that song, 'Vandemataram' then formed a part of Anandamath. Cf. ibid.
33. Cf. Chitta Ranjan Bandyopadhyay [Ed.] Op. Cit.—Part I pp. 37-40 Keshab Chandra O Krishna Beharir Bhumika".
34. Cf. Ramesh Chandra Majumdar, Op. Cit. pp. 497-501.

35. For a neat account of the history Cf. Tapan Kumar Roy Chaudhuri : 'Bengal Under Akbar and Jahangir'.

36. For a few obvious references Cf. 'Anandamath' : Bankim Rachanabali Vol. I Op. Cit, pp. 757, 768, 773 amongst others.

37. Cf. Chitta Ranjan Bandyopadhyay [Ed.] Part II Op. Cit. p. 191.